মঞ্জরী অপেরা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ডক্টর শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অগ্রজপ্রতিমেষু

তারাশঙ্কর

এক

গ্রে স্ট্রীট আর চিৎপুর জংসনের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে যে বাড়িখানা ; বাড়িখানার বারান্দার উপরে একটা মস্ত সাইনবোর্ড। মঞ্জরী অপেরা। ব্রাকেটে লেখা মেয়েযাত্রা। তার নীচে লেখা প্রোপ্রাইট্রেস শ্রীমতী মঞ্জরী দেবী। ১৯৪৪ সাল। সাইনবোর্ডটায় নতুন রঙ বুলিয়ে সেদিন—রথের দিন আবার টাঙানো হল। ম্যানেজার গোপাল ঘোষ, রাস্তার পুব ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দেখছিল। ট্যারাবেঁকা না হয় এইটেই দেখার উদ্দেশ্য।

ঘোষ দেখে খুশী হয়ে বললে—বাস। এই। কি বলে আর একটুও না এদিক-ওদিক হয়। বাঁধন কষে দাও। বলে সে রাস্তা পার হয়ে এসে বাড়ি ঢুকল।

জংসনের এই বাড়িটা বোধ করি তৈরী হবার পর থেকেই যাত্রা-দলের আপিস। কোন বছর সাইনবোর্ডে থাকে মথুরশা থিয়েট্রিকেল যাত্রাপার্টি, কোন বছর গণেশ অপেরা, কোন বছর থাকে সত্যেম্বর অপেরা, কোন বছর শ্রীচরণভাণ্ডারী অপেরা, কখনও বীণাপাণি অপেরা, কোন বছর রয়েল বীণাপাণি। মঞ্জরী অপেরার আগে এখানে ছিল আর্য অপেরার আপিস। বহু পুরনো কালে মতি রায়, ধর্মদাস রায়, ভূপেন রায়, ফকীর অধিকারী, শশী অধিকারী মহাশয়দের যাত্রাপার্টির যখন জমজমাট পসার হয় তখন আপিস করার রেওয়াজ ছিল না, হয়তো তাঁদের নিজেদের বাড়িতেই আপিস নয়, আসর ছিল, নয় তো এ বাড়িটা তখন তৈরী হয় নি। আপিসের রেওয়াজ হওয়ার বোধ হয় প্রথম থেকেই বাড়িটা যাত্রাদলের আপিস। লোকেদের মোটামুটি ধারণা এই যে, এই বাড়ি যে দলের আপিস সেই দলই এখনকার কালের সব থেকে ভাল দলের অন্যতম। মঞ্জরী অপেরার নামডাক গত দু বছর থেকে প্রায় হৈ-হৈ-করা নামডাক।

বাংলাদেশে মেয়েযাত্রা খুব বেশী হয় নি, যা হয়েছে, তার মধ্যে

ত্রৈলোক্যতারিণী, ভবসুন্দরী, রাধাবিনোদিনীর কথা মনে আছে লোকের। রাধাবিনোদিনীর আগে পর্যন্ত শেষ মেয়েযাত্রার দল, সেও দশ বারো বছর আগে উঠে গেছে। মেয়েযাত্রার পরমায়ু প্রোপ্রাইট্রেসের পরমায়ু আর সক্ষমতার সঙ্গে একসঙ্গে জড়ানো। প্রোপ্রাইট্রেস গত হলেই দল উঠে যায়। আর না হয় তার বয়স হয়ে পার্ট করবার ক্ষমতা গেলেই সে দল তুলে দেয়। সাধারণ যাত্রার দল বড় বড় দল, সবাই দল চালায় পুরুষদের নিয়ে। অভিনেত্রী তাদের দলে থাকে না। তাতে খুব ক্ষতি হয় না। বেটাছেলে মেয়ে সেজে যা অভিনয় করে তাতে তারা মেয়েদের হার মানিয়ে দেয়। সাজগোজ করে যখন আসরে ঢোকে তখন সহজে ঠাওর করা যায় না মেয়ে কি ছেলে। তাছাড়া আরও কথা আছে। যাত্রাদলে কষ্ট তো কম নয়। পুজোর সময় থেকে মফস্বলে বের হয়ে এখান ওখান, শহর, গ্রাম ফিরে গাওনা করে একবার ফেরে অগ্রহায়ণের শেষ। পৌষ মাসটা বিশ্রাম, তার পর মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা থেকে একনাগাড় কলকাতা থেকে সারা বাংলাদেশ, পূবদিকে আসাম সে গৌহাটী থেকে ডিগবয় ওদিকে শ্রীহট্ট শিলচর আবার বেহারে কাটিহার পূর্ণিয়া কিষণগঞ্জ পর্যন্ত। উত্তরে জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ির চা বাগান। বেহারে আর একটা এলাকা যাত্রাদলের মস্ত আয়ের এলাকা, তবে সেটাকে বাংলাদেশের বাইরে বলে মনেই হয় না কারুর। সেটা হল বরাকর নদী পার হয়ে কয়লাকুঠির এলাকা। ওখানে যত টাকা তত খাতির ভাল দলের। গাওনা করেও সুখ। বাঙালী সমঝদার এখানে অনেক। কাঁচা পয়সার দেশ। শুধু দলেরই রোজগার হয় না, এখানে ভাল অ্যাক্টর যারা তারা উপহার পায় অনেক। কিন্তু তবু কষ্ট যাত্রাদলের বিধিলিপি। যাওয়ার কষ্ট খাওয়ার কষ্ট শোয়ার কষ্ট। তারও উপর কষ্ট মেয়েদের পক্ষে চারিদিক ফাঁকায় অ্যাক্টিং করা।- চারিপাশে হাজারদরুণে শ্রোতা, তাদের শোনানো মেয়েদের কোমল কণ্ঠে কুলিয়ে ওঠে না। সব থেকে আসল কথা উপার্জন। মেয়েদের পোষায় না।

অভিনেত্রীর কর্মটি এদেশে এ পর্যন্ত মেয়েদের মধ্যে তারাই করে যারা আসলে দেহব্যবসায়িনী। থিয়েটারে তারা চাকরি করে, তাতে তাদের উপার্জন বাড়ে। আগেকার কালে যখন সারারাত্রি বা রাত্রি ছুটো তিনটে পর্যন্ত অভিনয় হত তখন শনি রবি বুধ পরে বুধের বদলে বৃহস্পতি তিনদিন ছাড়া বাকী চারদিন তাদের পেশার উপার্জন অবকাশ থাকে। কিন্তু যাত্রার দলে, মফস্বলে এ পথ বন্ধ হয়ে যায়। মাইনেও যাত্রাদলে থিয়েটার থেকে কম। তার উপর কষ্ট পথের। কত জায়গায় গরুর গাড়িতে দশ বিশ মাইল চলতে হয়। পুরুষেরা হেঁটে মেরে দেয়। তারা সঙ্গে চিঁড়ে রাখে গুড় রাখে, পথে তাই ভিজিয়ে খেয়ে পথ চলে। মেয়েরা তা পারে না। তার উপর প্রয়োজন রক্ষকের। শাস্ত্রে নারী এবং পুরুষের উপমা দিয়েছে ঘি এবং আগুনের সঙ্গে। চারিদিক বা দশদিক থেকে যখন বিশ তিরিশ আগুন লোলজিহ্বা বিস্তার করে তখন ঘিয়ের বিপদ। সেই কারণে মেয়েদের যাত্রার দলে নেয়ও না, মেয়েরাও যায় না। কিন্তু মেয়ে-যাত্রার দল স্বতন্ত্র। সেখানে কয়েকটি মেয়ে এবং কয়েকটি পুরুষ পরস্পরের প্রতি অনুগত বা অনুরক্ত থাকবার জন্যই দেহব্যবসায়ের এলাকাকে পিছনে ফেলে পথে ঘর বাঁধে। মেয়েরা সেই দেহব্যবসায়িনী শ্রেণীরই মেয়ে—নাচ গান কেউ ভাল কেউ মাঝারি কেউ কম মোটামুটি জানে, পুরুষেরাই এখানে সেই বাউণ্ডুলের দল যারা কেউ বাজিয়ে কেউ গাইয়ে কেউ অ্যাক্টর—এ ছাড়া যারা সংসারে অন্য কোন কাজ পারে কি না পারে পরখ করে দেখে নি। পরস্পরের সঙ্গে কেমন করে কোন সুযোগে মনের মিলের বাঁধনে বাঁধা পড়ে, যাত্রাদলের কষ্টই মাথা পেতে নেয়। দুজনে রোজগার করে, একসঙ্গে পথ হাঁটে, একসঙ্গে খায়, ছ মাস আট মাসের মধ্যে বাসরশয্যা পাতবার কোন সুযোগ মেলে না, শুধু মুখের কথা, একটু হাস্য বিনিময়—এতেই খুশী। যাত্রার দলের সফর শেষ হলে কটা মাস আবার সুখের দিন, কপোত-কপোতীর মত বাস। কিন্তু মূল হল প্রোপ্রাইট্রেস। এমন বাসনা

তার না হলে মেয়েযাত্রা হয় না। প্রোপ্রাইট্রেসকে হিরোইন অ্যাক্ট্রেস হতে হবে, তার অর্থ থাকতে হবে, তার ভালবাসার মানুষটিকে হিরো অ্যাক্টর হতে হবে, তবে মেয়েযাত্রা হবে।

মঞ্জরী অপেরার প্রোপ্রাইট্রেস নাম-করা অ্যাক্ট্রেস এবং রূপবতী মেয়ে। প্রবীর পতনে জনার ভূমিকায় এবং সতীতুলসীতে তুলসীর ভূমিকায় তার নাম দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। মঞ্জরী আসরে ঢুকলেই আসর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

হিরো গোরা চক্রবর্তী ওরফে বিজয় চক্রবর্তীর প্রবীর এবং শঙ্খচূড়ও তেমনি বিখ্যাত। দীর্ঘাকৃতি গৌরবর্ণ গোরাবাবুর প্রবেশ-প্রস্থানগুলি দিগ্বিজয়ী বীরের মত। অনেকে বলে বিখ্যাত নট দুর্গাদাসকে অনুকরণ করে গোরাবাবু। কিন্তু আশ্চর্য স্বচ্ছন্দ অভিনয়—অনুকরণ বলে মনেই হয় না।

এদের সঙ্গে আছে আর একজন প্রবীণ নট। খ্যাতিমান, যাত্রার দলের রাজা অ্যাক্টর রীতুবাবু। রীতেন বোস। দশাসই চেহারা, পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি বুক, লম্বাতেও ছ ফুটের কাছাকাছি, ভরাভর্তি চেহারা, নাক মুখ চোখ সুগঠিত, কিন্তু বড় বড় চোখের দৃষ্টিতে এবং মুখের গড়নের কঠিন পরুষ ভঙ্গিতে মানুষকে থমকে দাঁড়াতে হয়। রাবণ, কংস, শিব প্রভৃতি ভূমিকায় খ্যাতিমান নট। দলের গোড়া থেকেই রীতুবাবু দলে যোগ দিয়েছিল। ওই বাউণ্ডুলে মানুষ। ঘর ছিল দোর ছিল, ম্যাট্রিক পাস করে শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে চাকরি করত। আর শখ ছিল অ্যামেচার থিয়েটারে। তরুণ বয়সে তরুণ নায়কের পার্ট করত। এখানে ওখানে তাকে ডেকেও নিয়ে যেত। কখনও ছুটি নিয়ে যেত, কখনও এমনি বিনা ছুটিতেই চলে যেত। ফিরে এসে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দাখিল করত। এতেই ধরা পড়ে চাকরি গেল। চাকরি যাওয়ার পর মা বাপ ভাইদের গঞ্জনা সে সয়ে নিয়েই অম্লান বদনে অ্যামেচারে পার্ট করেই ফিরতে লাগল, কিন্তু সে গঞ্জনা তার স্ত্রীর সইল না। সে আত্মহত্যা করে বসল। এর পর রীতুবাবু

বাড়ি ছেড়ে এসে থিয়েটারের দোরে দোরে ফিরে এসে ঢুকল যাত্রার দলে। সে আজ চব্বিশ বছর আগের ঘটনা—তখন তার বয়স ছিল চব্বিশ। কয়েক বছর পর দেহব্যবসায়িনী পল্লীতে ঘুরতে ঘুরতে বাসাই নিল একজনের ওখানে। তারপর সেখান থেকে আর একজনের ঘরে। বছর আষ্টেক আগে থিয়েটারের অ্যাক্‌ট্রেস নাচিয়ে গাইয়ে মেয়ে পটলীচারুর সঙ্গে আলাপ হল, মনে হল তাকেই সে খুঁজে বেড়াচ্ছিল এতদিন। কিন্তু যাত্রার দলের অ্যাক্টরদের, যারা এই ধরনের বাসা বাঁধে তাদের বাসা প্রায় প্রতি বছরই ভেঙে যায়। ভেঙে যায় তাদের কর্মের পাকে। তারা দলের সঙ্গে বের হয়, একনাগাড়ে মাসের পর মাস বাইরে ঘুরে যখন ফিরে আসে তখন সে বাসা নতুন মানুষের দখলে এসে যায়। কিন্তু পটলীচারু তা হতে দেয় নি। প্রতীক্ষা করে বসে থাকত। তাই যখন মঞ্জরী অপেরা খুললে চার বছর আগে তখন পটলীচারুকে নিয়েই রীতুবাবু এসে যোগ দিয়েছিল। পটলীচারু সুন্দরী ছিল—গড়নে তন্বী, তিরিশ বছর বয়সেও তাকে পনের থেকে বিশ-বাইশ বছরের নায়িকা মানাত চমৎকার, নাচত-গাইতও ভাল। দুজনে চাকরি নিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল, খুব খুশী হয়েছিল, এবং এই বিক্ষুব্ধ সংসারসমুদ্রে যেন অক্ষয় আশ্রয় মিলেছিল বলে মনে হয়েছিল তাদের। দলের প্রতি মমতারও অন্ত ছিল না এই কারণে। তাদের দুজনের নামেও দলের খ্যাতি রটেছিল।

ওদের সঙ্গে আরও তিনটি যুগল এসে জুটেছিল দলে। রীতুবাবু পটলীচারুর মতন। নাটুবাবু গোপালীবালা, কমিক-অ্যাক্টর বোকাবাবু আর বুঁচি ছায়া, বংশী ড্যান্সিং মাস্টার আর আশা, গাইয়ে নাড়ু আর শোভা। দু বছর আগে পটলীচারু এবং এবারে মারা গেছে নাড়ুবাবু। কিন্তু রীতুবাবু দল ছাড়ে নি, শোভাও ছাড়ে নি। গত বছর পটলীচারুর জায়গায় কুমারী নায়িকার উপযুক্ত মেয়ের খোঁজ করে সহজে মেলে নি, বহু কষ্টে মিলেছিল হাবুলিসরি বা সরস্বতীকে; রূপে গুণে সরস্বতী পটলীচারুর থেকে ভালই ছিল, কিন্তু তার জন্যে

ল নিতে হয়েছিল শিমুলফুলের মত রূপ সার গুণ নেই চালু চারু-দাসকে। এই চালু চারুই দলটিকে আঘাত দিয়ে গেছে। আজ রথ-যাত্রা—আষাঢ় মাসের ২২শে—আজ থেকে আড়াই মাস আগে খুলনা শহর থেকে দল বছরের শেষ পালা গেয়ে কলকাতা ফিরল ; যে যার সব চুকিয়ে নিয়ে বাড়ি গেল। যাবার সময় সকলেই অনুরোধ করে গেল, যেন আগামী গাওনার মরসুমে দলে তাকে নেওয়া হয়, শুধু বোকাবাবু বলল, আমার কিন্তু ফারখত। আমার জায়গায় লোক দেখবেন।

—কেন ? কি হল ?

—না। আমি আর—

কথা শেষ না করেই সে চলে গেল। এমন কি বুঁচির জন্যেও অপেক্ষা করল না।

বোকাবাবুর প্রণয়িনী বুঁচি ছায়াকে প্রশ্ন করল গোপাল ম্যানেজার—বুঁচি ? ব্যাপার কি রে ?

—জানি নে। বলে সেও চলে গেল।

মঞ্জরী গোরাবাবু রীতুবাবু এরা শুনে একটু হেসে বলেছিল, যাক না দশ দিন। ঝগড়াটগড়া হয়েছে। বলেও অবশ্য তারা কেউই সন্তুষ্ট হতে পারে নি। কারণ এ প্রেমে ঝগড়া যা হয়—তা তো চারখানা দেওয়াল ঘেরা ঘর বা বাড়ির মধ্যে হয় না। হয়ে থাকলে হয়েছে পথে বা দলের বাসায় বা সাজঘরে, দলের সকল লোকের মাঝখানে। তাহলে কেউ দেখতে পেলে না, শুনতে পেলে না ?

ঝগড়া হয় নি তাই কেউ দেখে নি বা শোনে নি। হয়েছিল অন্য কিছু। হয়েছিল চালু চারুদাস আর বোকাবাবুর প্রণয়িনী বুঁচি ছায়াতে গোপন প্রেম। অতি গোপন। শিমুলফুল চালু চারুদাস আসরে অভিনয়ে অপটু কিন্তু জীবনে অভিনয়ে মাস্টার। নিজের প্রণয়িনী হাবুলিসরি পর্যন্ত বুঝতে দেয় নি। দল থেকে হিসেব বুঝে নিয়ে যাবার সময়েও তুজনে একসঙ্গে গেল। এক সপ্তাহ

পরে শোনা গেল হাবৃলিসরি বুঁচি ছায়ার বাড়ি চড়াও হয়ে চারু আর বুঁচিকে খ্যাংরাপেটা করে এসেছে তুপুরবেলা। এবং নিজের ঘর থেকে চারুদাসের স্যুটকেসটা টেনে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। মাসখানেক যেতে-না-যেতে সে থিয়েটারের সখীর দলে কাজ নিয়েছে।

ম্যানেজার গোরাবাবু খবরটা পেয়ে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার গোপাল ঘোষকে ডেকে বলেছিল, তাহলে তো লোক দেখতে হয় গোপালবাবু।

মঞ্জরী অপেরার প্রোপ্রাইট্রেস মঞ্জরী দেবী, গোরাবাবু ম্যানেজার। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার গোপাল ঘোষ, যাত্রাপার্টির ম্যানেজারি করে চুল পাকিয়েছে, ঝাতু লোক। প্রকৃতপক্ষে গোপালই ম্যানেজার। গোরাবাবুর একটা বড় পদ না হলে মানায় না বলেই নামে সে ম্যানেজার। গোরাবাবু দলের হিরো, পদে ম্যানেজার এবং মঞ্জরীর স্বামী। বৈষ্ণবমতে তুজনের বিয়ে হয়েছে। কিন্তু লোকে তা মানে না। মঞ্জরী দেহব্যবসায়িনীর কন্যা, তার আবার জাত এবং তার সঙ্গে আবার বিয়ে! কিন্তু তারা তা মানে।

গোপাল ঘোষ বলেছিল, হ্যাঁ দেখতে হবে বইকি। লোক তো একজন না তিনজন। তুজন ফিমেল, একজন মেল, একে বলে গিয়ে ইম্পর্ট্যাণ্ট! বোকাবাবুর মত কমিক পার্ট করার লোক মেলা তো সহজ নয়। তার পরেতে কুমারী নায়িকা। সে আরও ইম্পর্ট্যাণ্ট। চেহারা বয়েস গানের গলা—। একে বলে, দেখতেই হবে। না হলে যখন চলবে না, তখন পেতেই হবে।

ঠিক ওই মুহূর্তটিতেই বাড়ি ঢুকেছিল রীতুবাবু। গলা ঝেড়ে সাড়া দিয়ে ভরাট মোটা গলায় ডেকেছিল তার মুখস্থ করা পার্টের মত ডাকটি—আছেন কি দেবতা?

গোরাবাবু সাগ্রহে সারা দিয়েছিল, আসুন, আসুন মাস্টারমশাই! তারপর মঞ্জরীকে ডেকে বলেছিল, মঞ্জরী, মাস্টারমশাই এসেছেন।

যাত্রাদলে প্রবীণ এবং বড় অ্যাক্টর মাত্রেই মাস্টারমশাই নয়তো বাবু, সে বলে নেহাত গ্রাম্য ছোট অ্যাক্টরেরা। গোপাল ঘোষও তাকে মাস্টারমশাই বলে। গোপাল ঘোষের বয়স ষাটের উপর। তবুও রীতুবাবু নাটুবাবু এরা তার মাস্টারমশাই। গোরাবাবু এবং মঞ্জরীর কাছেও রীতুবাবু মাস্টারমশাই। অন্য সকলের মধ্যে বড়দের নামের সঙ্গে বাবু যোগ করে ডাকে। বাকীদের নাম ধরেই ডাকে। আর একজন ছিল মাস্টারমশাই। বুড়ো নাড়ুবাবু, গাইয়ে নাড়ু, নারাণ ঘোষ—কিন্তু সে মারা গেছে মাস কয়েক আগে।

দলের লোকের কাছে মঞ্জরী আড়ালে প্রোপ্রাইট্রেস বা মালিক, কেউ কেউ বলে গিন্নী। সামনে বলে, মা। গোরাবাবু আড়ালে কর্তা সামনে বড়বাবু কিংবা স্যার। রীতুবাবু গোরাবাবুকে বলে দেবতা। মঞ্জরীকে বলে প্রোপ্রাইট্রেস। সাধারণের সামনে শুধু আপনি বলেই কথা সারে।

গোরাবাবুর ডাক শুনে মঞ্জরী ঘর থেকেই সাড়া দিয়েছিল—বসুন মাস্টারমশাই, আমি পাঁপর ভাজছি। পুড়ে যাবে। তুলেই নিয়ে যাচ্ছি। গোপালমামা আপনিও যাবেন না।

গোপাল ঘোষকে মঞ্জরী বলে মামা। গোপাল মঞ্জরীর মা তুলসীকে বলত দিদি।

রীতুবাবু আহ্বান পেয়েই গান ধরে দিয়েছিল। এই গান ধরাটা তার অভ্যাস। গলা মোটা, গাইয়েও নয় রীতুবাবু কিন্তু মোটামুটি চালিয়ে যায়। গান ওর একখানি, অন্তত গোরাবাবুদের বাড়িতে অথবা ওদের তুজনে ছাড়া যেখানে অন্য কেউ জানে না সেখানে ওই একখানা গানই গেয়ে থাকে। তাও তু কলি। গান ধরেছিল—

এ মায়া প্রপঞ্চ মায়া, ভবের রঙ্গমঞ্চ মাঝে—
রঙ্গের নটবর হরি যারে যা সাজান সেই তা সাজে।

কলি তুটির অর্থ এবং দার্শনিকতা যাই হোক আর যেমনই হোক রীতুবাবুর গানের লক্ষ্য গোরাবাবু; তার সঙ্গে মঞ্জরীও আছে।

সে কথা গোরাবাবু এবং মঞ্জরীর কাছে অস্পষ্ট নয় ; শুধু ওরা দুজনেই বা কেন, দলের প্রায় অনেকেই ওর ভিতরকার প্রচ্ছন্ন সরল রসিকতাটুকু বোঝে।

কমিক অ্যাক্টর বোকাবাবু দল ছেড়ে চলে গেল, সে বলত, হরির চরণে তেলই দিন আর তুলসীই দিন মাস্টারমশাই, কংস রাবণ সাজতেই হবে আপনাকে।

রীতুবাবু বলতেন, যা বলেছ বোকা। হরি নিজের পার্টটি কাউকে দেয় না।

বোকা বলত, দেখুন না আমাকে ন্যাকা বোকা সাজিয়ে বাপের দেওয়া নামটাই চাপা দিয়ে দিলে মশাই। বোকাই হয়ে গেলুম। যা গান ধরেন আপনি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। রঙ্গের নটবর হরি যারে যা সাজান সেই তা সাজে।

সেদিন গানের কলি দুটি গাইতে গাইতে রীতুবাবু উপরে উঠতেই গোরাবাবু বলেছিল, হরি যে বিপদে পড়েছেন মাস্টার মশাই! সাজাবার যে লোক পাচ্ছি নে! শুনেছেন ব্যাপার?

শুনেছি। ক দিন ছিলুম না এখানে। বাড়ি মানে শ্রীরামপুর গিয়েছিলুম—সেখেন থেকে বাবা তারকেশ্বর। ফিরেছি পরশু। শুনলাম সব বোকার কাছে।

তাকে কোথায় পেলেন?

বলছি। ওরে শিউনন্দন, কোথায় গেলি রে? এক গ্লাস জল খাওয়া তো। হ্যাঁ। কাল বেরিয়েছিলুম একবার অভিসারে। মিনার্ভা থিয়েটারের সামনে হঠাৎ মুখোমুখি দেখা। দেখা তো দেখা একেবারে বাড়িটার দরজায়। ও বেরুচ্ছে আমি ঢুকছি। বললুম বোকা? পায়ের ধুলো নিয়ে বোকা বললে, হ্যাঁ দাদা আমি!

মঞ্জরী এসে দাঁড়াল, হাতে কাচের প্লেটে মিষ্টি আর তকতকে মাজা মোরাদাবাদী গেলাসে জল। স্নান হয়ে গেছে, মাথায় আধঘোমটা,

কপালে সিঁদুরের টিপ ; পরনে কালাপাড় ফরাসডাঙার শাড়ি ; সব মিলিয়ে বড় প্রসন্ন দেখাচ্ছে মঞ্জরীকে। মঞ্জরী দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে, স্বাস্থ্যবতী, বয়স তার সাতাশ আটাশ কিন্তু বয়সের অনুপাতে গম্ভীর। রূপে বয়সে তারুণ্যে সন্দেহ হয় না কিন্তু তারুণ্যের চাপল্য নেই তার মধ্যে। প্লেট এবং জলের গ্লাস নামিয়ে দিয়ে বললে—শিউনন্দনকে আসবামাত্র বলেছি যা মিষ্টিজল দিয়ে আয়। আমার হাত জোড়া। তা সে শসা পেঁয়াজ কাটতে বসে গেছে। মাস্টারমশায়ের নাম করে বলে—উনি আসিয়েছেন। সাদাপাণি কি হোবে? লিয়ে যাব তো দুয়ো দিবন। উনি দিবেন, হামারে বাবু ভি দিবেন। তারপর ভাল খবর তো সব?

সব? সব তো আমার নেই প্রোপ্রাইট্রেস? আমার বলতে তো শুধু আমি। তা দেখছেনই তো ভালই আছি! হাসলে রীতুবাবু।

গোপাল এতক্ষণ চুপ করেই বসে ছিল, ফরাসের উপর বসে আঙুল দিয়ে দাগ টানছিল—হয়তো কিছু লিখছিল—দুর্গা কালী কৃষ্ণ যা হোক কিছু, আবার হাত দিয়ে মুছে ফেলছিল এবং কথাগুলি শুনেই যাচ্ছিল। ওদের দুজনের মধ্যে যে সম্পর্ক সে সম্পর্কের মধ্যে তার প্রবেশাধিকার নেই সে গোপাল জানে। কিন্তু এবার সে বললে—একটা কথা বলব মাস্টার মশাই?

—বলুন। কিন্তু তার আগে দেবতার কাছে বর প্রার্থনা করে নি দাঁড়াও। একটা এ্যাসপ্রো কি অ্যাসপিরিন যা হোক চাই যে স্যার। কাল একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল—মাথা খসে যাচ্ছে। এবং সেখান থেকেই সরাসরি আসছি। আপনি তো রাখেন!

শিউনন্দন ট্রেতে করে মদের বোতল, গ্লাস, শসা, পেঁয়াজকুচি পাঁপর ভাজা এনে নামিয়ে দিল এবং অভিবাদন জানালে—নমস্কার বাবু!

—নমস্কার শিউনন্দনজী! তুমি বাবা সাক্ষাৎ শিবপুত্র গণেশ,

সিদ্ধিদাতা। একটা অ্যাসপিরিন আন দেখি, জলে নয় কারণের সঙ্গে মেরে দি!

মঞ্জরী উঠে গেল—আমি এনে দিচ্ছি। লুকোনো আছে।

—লুকোনো? তা হ্যাঁ, যা যুদ্ধের বাজার—লুকোনোর মত দ্রব্য বটে। আমি খাই। কিন্তু আজ দোকানে অ্যাসপ্রো আনলাম, কাল আনতে গিয়ে দেখি নেই। আর একটা কি বের করে দিয়ে বলে এইটে নিয়ে যান।

গোরাবাবু গেলাসে মদ ঢেলে হাতে দিয়ে বললে—এটা খান ততক্ষণ। গোপালবাবু—

—দিন একটু।

গ্লাসটা তুলে নিয়ে রীতুবাবু বললে—যাত্রার দলের জীবন এই জন্যেই ভালবাসি! যত সব আধপাগল—কর্মে কুঁড়ে, অভিনয়-পাগলের দল। রাত্রে রয়াল ড্রেস পরে রাজা সাজি। দিনের বেলা ফকীর, ছেঁড়া কাপড়জামা পরে খড়ের উপর চ্যাটাই পেতে শুয়ে বিড়ি টানি। এই দ্রব্যটি ছাড়া বাঁচি কি করে? তা দিনকাল যা পাল্টাচ্ছে না, তাতে আমাদের সঙ্গেই এ সব শেষ!

—রাইট। গোরাবাবু মদ খেয়ে গ্লাস শেষ করে নামিয়ে রেখে বললে—রাইট। খুব ঠিক বলেছেন। আর আছে কি আমাদের? মঞ্জরী এই কথাটা বোঝে না। কাল আমাকে বলছিল, আজকাল অন্য অন্য দলে নতুন পাস-করা ছোকরারা ঢুকছে, তারা নাকি খাচ্ছে না। আমি বললাম, খাচ্ছে না, খাবে। আর যদি না খায় তবে অ্যাক্টর হতে পারবে না। তখন বলে আসরের লোকে ও সইবে না। শোন কথা! নেশা না হলে অ্যাক্টিং হয়? নেশা না হলে আমি ভাবব কি করে, আমি গোরা ওরফে বিজয় চক্রবর্তী, আমি ধাঁ করে দেবতা হয়েছি কি রাজা হয়েছি কি মরে যাচ্ছি! নিন, সিগারেট নিন। গোপাল মামার বিড়ি চাই—

আমার কাছে আছে। গোপাল পকেট থেকে বিড়ি বের করে

ধরিয়ে বললে—কি বলে আপনারাই বা কি খান! আমার যাত্রাদলে চল্লিশ বছর হল। মা ত্রৈলোক্যতারিণীর দলে ঢুকেছিলাম, কি বলে অ্যাক্টিং করব বলে; হল না, ম্যানেজার হলুম। ত্রৈলোক্য মায়ের দলের হিরো—কি বলে জগৎবাবু আসরে ঢুকতেন—ঢুকবার মুখে গেলাস আমার হাতে দিয়ে ঢুকতেন। কি বলে আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম। পার্ট সেরে এসেই আমার হাত থেকে নিয়ে কি বলে চুমুক দিতে দিতে সাজঘরে গিয়ে ঢুকতেন। তাঁর কাছে শুনেছি তিনি বলতেন, গোপ্‌লা বাবা, কি দিনকালই গেছে রে! মেদিনীপুরে জমিদার বাড়ি যাত্রা করতে যেতাম, বাবুরা জালায় করে মদ রাখত। আর ডাঁই করা থাকত মাটির গেলাস। চুবিয়ে নাও, আর খাও, আর ফেলে দাও।

মঞ্জরী ফিরে এলো অ্যাসপ্রো নিয়ে। নামিয়ে দিয়ে বললে—নিন মাস্টারমশাই। খেয়ে নিন। এর পর কিন্তু আমার আর্জি আছে।

গোরাবাবু হেসে বললে—বোতল তুলতে চাচ্ছ তো!

—চাচ্ছি! অন্যায় করছি?

—যা সব বলছিলাম, তা তো শুনেছ?

—শুনেছি বইকি!

—তবে?

—তবে এখন তো যাত্রার আসরে নামছ না পার্ট করতে! এখন দল গড়ার কথা হচ্ছিল। সেটা তো নেশার ঝোঁকের মাথায় করা ঠিক হবে না।

রীতুবাবু সসম্ভ্রমে বললে—যুক্তি অকাট্য। নে বাবা—

গোরাবাবু হাত চেপে ধরলে—উঁহু। আমি অবাধ্য। আর এক ডোজ করে হুকুম হয়ে যাক। তারপর আমি সুবোধ এবং সুশীল বালক—তাহার পর প্রোপ্রাইট্রেস মঞ্জরী তাহাকে যাহা বলিবেন তাহাই শুনিবে।

মঞ্জরী হেসে বললে—শিউনন্দন, দে, আর একটু করে ঢেলে দে।

না—তুমি ঢালতে পাবে না। আর মামাকে দিস নে। এইবার উঠিয়ে নিয়ে যা।

রীতুবাবু বললে—বোকার কাছে সব শুনলুম। ও বললে মাস্টার-মশাই, ও শালা চালু চারুকে আপনারা জানতেন না, আমি জানতাম। আগে ও অ্যামেচার থিয়েটারে মেয়ে সাজত। বড় বড় রাজা জমিদারদের থিয়েটারে চাকরি নিয়ে থাকত। যত জায়গায় গেছে, সব জায়গায় শালা ভদ্রঘরের মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করেছে, ধরা পড়েছে, মার খেয়েছে। শেষ যাত্রায় ঢুকেছিল। পার্ট করতে পারে না। যা পারে সে মেয়ের। হঠাৎ হাব্‌লিসরিকে মজালে। সরি কোথায় ওর মেয়ে সাজা রূপ দেখে মজেছিল। থিয়েটার ছেড়ে সে এসে আমাদের দলে ঢুকল। কিন্তু শালা তো কুত্তা। চোট্টা কুত্তা। নজর দিলে বুঁচির ওপর। চালাকের অগ্রগণ্য। হাবলিও ধরতে পারে নি কিন্তু আমি ধরেছিলাম। তু একবার বুঁচিকে বলেছি—সাবধান বুঁচি, সাবধান। মফস্বল, কেলেঙ্কারি করতে চাই নি, পারিও না তা। ছাড়বার মুখে বেশ বুঝলাম, বুঁচি আমাকে ছাড়বে। তাই নিজেই ছেড়ে দিলাম। বুঁচি অন্যলোকের কাছে যাবে—তারপর দলে থাকাটা কি রকম দেখায় আপনি বলুন?

রীতুবাবু একটু থেমে সিগারেটে কটা টান দিয়ে বললে—আমি বললুম, হাব্‌লিসরির সঙ্গে একটা আপোস করে নিয়ে তুই যেমন ছিলি তেমনি থাক। দল কেন ছাড়বি? মাইনে ভাল দেয়। প্রোপ্রাইট্রেসের মত মালিক হয় না। স্যার তো আমীর লোক। তারপর ধর, অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসের দল। তা বোকা বললে, সে সব হয়ে গেছে। হাব্‌লি থিয়েটারে চাকরি নিয়েছে। আমি মোহন অপেরায় চাকরি নিয়েছি—মাইনেও বেশী দিয়েছে। তারপর বলে, আপনিও আসুন না মাস্টারমশায়—ওখানে আপনাকে একশো পঁচাত্তর দেয়, এরা তুশো দেবে। দল গড়বে, এবারকার সেরা দল! আসবেন? মঞ্জরী

অপেরাকে ডাউন করবে—এ হল ওদের মালিকের প্রতিজ্ঞা। ওদের কটা বাঁধা ঘর এরা নিয়ে নিয়েছে—ঘর কেন বরাকর এলাকাটাতেই ওদের ডাউন করেছে মঞ্জরী অপেরা—এইজন্যে ওরা মঞ্জরী অপেরার লোক বেশী মাইনে দিয়ে নেবে।

গোরাবাবুর সুগৌর মুখখানা টক্‌টকে রাঙা হয়ে উঠল। ভুরু কুঁচকে স্থির হয়ে শুনছিল সে। রীতুবাবু থামতেই চমক ভেঙে এদিক ওদিকে দেখে সে উঠে চলে গেল ভেতরে। মঞ্জরীও ত্রস্ত হয়ে উঠে পড়ল। কিন্তু সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগেই গোরাবাবু মুখ মুছতে মুছতে ফিরে এল। মদ খেয়ে এল সে। তারপর বসল। চেহারাটা তার পাল্টে গেছে। একজন জেদী গোঁয়ার বেরিয়ে এসেছে তার মধ্যে থেকে। সিগারেট ধরিয়ে বললে—গোপাল মামা!

বিড়ি টানতে টানতে গোপাল বললে—বলুন।

—বাজারের সেরা দল গড়তে পারবেন?

—তা কেন পারা যাবে না!

—হ্যাঁ। সেই যদি পারেন, তবে দল থাক। নইলে কাজ নেই। কি-বলেন মাস্টারমশাই?

রীতুবাবু বললে—নিশ্চয়! এতে আমি একমত। তারপর হাত নেড়ে বক্তৃতার সুরে বললে—জ্যেষ্ঠ নয়—শ্রেষ্ঠ; শ্রেষ্ঠ হতে চাই।

এ ভুবনে শ্রেষ্ঠ একজন—একজন শুধু!
তারপর নিকৃষ্ট সকলে! সকলের সাথে
নিকৃষ্ট হইয়া কোনমতে বেঁচে থেকে
কিবা প্রয়োজন! তার চেয়ে মৃত্যু ভাল!
তাই দ্বন্দ্ব মোর ভগবান—ব্রহ্মাণ্ডের
একমাত্র বিধাতার সাথে। দেবলোক
জয় করি তাই মোর মেটে নি পিপাসা—
খুঁজে ফিরি ভগবানে। তার সাথে
দ্বন্দ্ব মোর। সে বড়? কি আমি বড়?

রীতুবাবুর চোখ দুটো বড় বড়। লাল হয়ে এসেছে সে দুটো। থমথম করছে মুখ। নেশাটা তার ধরেছে। কথা সে মিথ্যে বলে নি। যাত্রাদলের এই বাকসর্বস্ব, অন্য সকল কৃতিত্ব-সম্বলহীন মানুষগুলি স্বপ্ন ছাড়া বাস্তবের মধ্যে নিজের কাছেই নিজে ছোট হয়ে পড়ে। এবং স্বপ্ন দেখবার একটি মাত্র ওষুধ তারা জানে—সেটা নেশা। এর জন্য পৃথিবীর কারুর কাছেই এদের সঙ্কোচ নেই। নেশা না থাকলেই বরং সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। তা বলে নেশায় এরা সহজে মুখ থুবড়ে পড়ে না। বক্তৃতা আবৃত্তি শেষ করে গোরাবাবু বললে—মঞ্জরী! তুমি বল।

মঞ্জরী হেসেই বললে—আমাকে বলতে হবে তুমি বলবার পরও?

—তুমি মালিক!

—তুমি নও? তাহলে দল তুলে দাও।

—এই দেখ, তুমি চট করে রেগে যাও!

মঞ্জরী বললে—যাব না? কি করে বললে তুমি কথাটা?

রীতুবাবু বললে—আপনি মাপ চান স্যার। দোষ আপনার।

—আচ্ছা আচ্ছা—তাই। মাফ।

মঞ্জরী তার কথাটা ঢেকে দিয়ে বললে—খুব ভাল করে দল গড়। আমারও ওই কথা। যদি না পার দল তুলে দাও। ওই বোকা যখন বুঁচির সঙ্গে প্রেম করে প্রথম ঠোক্কর খায়, যাত্রার দল থেকে ফিরে দেখে বুঁচি অসুখে মরতে বসেছে, তখন আমি ডেকে টাকা দিয়েছিলাম চিকিৎসার। বুঁচি আমার পায়ে হাত দিয়ে বলেছিল—বোকা ভগবান সাক্ষী করে বলেছিল, তুমি ছাড়িয়ে দাও আলাদা কথা। কিন্তু আমরা কখনও ছেড়ে যাব না।

গোপাল বললে—তার জন্যে কি গেল এল মা মঞ্জরী! কি বলে, বোকার বদলে ভাল লোক নিয়ে আসব—

রীতু বললে—এবার একজন বুদ্ধিমান আন গোপাল। ভাবনা মেয়ের—

হঠাৎ ওঁ—ওঁ শব্দে সাইরেন বেজে উঠল। ১৯৪৪ সাল। এখনও মধ্যে মধ্যে সাইরেন বাজে। তবে মানুষে বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশের মত ভয় পায় না। তবু সকলে চকিত হয়ে উঠল।

গোপাল বললে—অসহ্য করে তুললে বাবা! যুদ্ধ থেমেও থামে না!

রীতুবাবু বললে—মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী!

মঞ্জরী বললে—নিচে চলুন।

গোরাবাবু বললে—নাঃ।

মিনিটখানেক চুপ করে থেকে বললে—গোপালবাবু, একখানা ভাল ঘর দেখুন চীৎপুরের উপর। আপিস একটা করতে হবে। ভাল দল করতে হলে আপিস চাই। বাড়িতে আপিস এ চলবে না। মাস্টার-মশাই, সাইরেন বাজল ভাল হল, এখানেই স্নান করুন, খান, ঘুমোন, বিকেলে একটা প্ল্যান করে কাজে নামা যাক।

মঞ্জরী বললে—কিন্তু দোহাই ধর্ম, মদটা কম খেয়ো।

* * *

সেই প্ল্যান অনুযায়ীই গ্রে স্ট্রীট আর চীৎপুর জংশনের এই সেরা ঘরখানা ভাড়া নেওয়া হয়েছে। আজ রথের দিন শুভ দিন, নতুন আপিস খোলা হচ্ছে। আজই নতুন লোক নেওয়া শুরু হবে। গোরাবাবু মঞ্জরী যাবে কালীঘাটে—পূজো দেবে। নাটকের 'সার্‌টে' অর্থাৎ পাণ্ডুলিপিতে সিঁদুরের ছাপ দিয়ে নিয়ে আসবে।

গোপাল ঘোষ উপরে উঠে এল। নিচেতলাটায় তখনও ১৯৪৪ সালে বেশ্যাদের বাস; নিচেতলার সঙ্গে যোগাযোগের দরজাটা কুলুপ এঁটে বন্ধ করা হয়েছে। ঘরখানাকে ঝেড়ে মুছে ধুয়ে পরিষ্কার করে একদিকে তক্তাপোশ পাতা হয়েছে, একদিকে একখানা টেবিল তার দুদিকে খানকয়েক ফোল্ডিং চেয়ার দিয়ে আপিস-আপিস চেহারা বানিয়ে তুলেছে। মাথার উপরে খানতিনেক ছবি—মা কালীর, সিদ্ধিদাতা গণেশের এবং রামকৃষ্ণদেবের। একখানা সুন্দরী একটি

মেয়ের ছবিওয়ালা ক্যালেণ্ডার, তারই পাশে ম্যাড়মেড়ে কাগজের বাংলা মাসের ক্যালেণ্ডার আর একখানা। একটা তাক, আলমারির নিচের তাকে একটা মস্তবড় মাটির কলসী। একটা কুঁজো, উপরের তাকে কলাই করা গ্লাস, গোটা দুই কাচের গ্লাস, গোটা ছয়েক কাপ ডিস সাজিয়ে রাখা হয়েছে। টেবিলের উপরে খেরো বাঁধা খাতা—তার উপর একটা খেরোর মলাট দেওয়া পঞ্জিকা। ঘরে ঢুকবার দরজায় একখানা ছোট সাইনবোর্ড—মঞ্জরী অপেরা, প্রোপ্রাইট্রেস মঞ্জরী দেবী। আলমারির সব উপর তাকে—দুটো বক্স হারমোনিয়ম, ঢোল, দুজোড়া বাঁয়া-তবলা, মন্দিরা, ঘুঙুর সাজানো, এবং বেশ পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

মোট কথা গোপাল ঘোষ যথাসাধ্য আপন রুচিমত আপিসটাকে সাজিয়ে তুলেছে সকাল থেকে। দলের চাকর বিপিন হাজরা রাস্তার ধারের বারান্দায় একটা টুল পেতে আপনার আসন তৈরী করে নিয়েছে।

গোপাল ঘরে ঢুকে দেখে খুশী হয়ে উঠল—বাঃ, বেশ হয়েছে। খাসা। টেবিলের সামনে চেয়ারটায় বসে একটা বিড়ি ধরিয়ে বিপিনকে ডাকলে—বাবাধনরে, বিপিন!

—কি—বল? বিপিন এসে দাঁড়াল।

—কি বলে কেমন হল বল তো?

—বঁড়িয়া হয়েছে। বহুত বঁড়িয়া। এইবারে ঢোল পেতে কুড়ুতাক কুড়ুতাক ভেঁপ্পো ভেঁপ্পো দাও লাগিয়ে। মোহন অপেরার চস্‌কু ঝলসে যাক।

—দেব। দেব, ভাবছ কেন? হুঁ-হুঁ। কি বলে এই তো সন্ধ্যে সবে কি বলে! কিন্তু পান-টানগুলোর অর্ডার দিয়েছ তো!

—সব কম্‌পিলিট! চায়ের দোকানে বলেছি।

ঠিক এই সময়েই সিঁড়িতে শব্দ উঠল পায়ের, তার সঙ্গে

নাড়ুবাবুর গলা শোনা গেল—এ মায়া প্রপঞ্চ মায়া—। কই গোপালবাবু, কোথায় ?—এঁরা কই ?

এঁরা মানে মঞ্জরী এবং গোরাবাবু। প্রোপ্রাইট্রেস আর হিরো ; মঞ্জরীর স্বামী। কালীঘাট যেতে হবে পুজো দিতে।

বলতে বলতেই ট্যাক্সির হর্ন শোনা গেল। ওরাও এসে গেছে।

দুই

একখানা ট্যাক্সিতে কুলোল না। দুখানা ট্যাক্সি লাগল। লোক পাঁচজন কিন্তু জিনিসপত্র অনেক। ডালায় করে পূজোর জিনিস সাজিয়ে নিয়েছে মঞ্জরী নিজে। ষোড়শোপচারে পূজো। টাকা ধরে দিলে পাণ্ডারা অর্ধেক জিনিস দিয়ে সারে। ফল-মূল, মিষ্টান্ন, জবার মালা, অপরাজিতার মালা, কুঁচো ফুল, বস্ত্র, শঙ্খ সব ফর্দ করে কেনা হয়েছে। ফর্দ করেছে গোরাবাবু নিজে। মঞ্জরী এবং শোভা শিউনন্দনকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে গিয়ে কিনেছে।

শোভার বেশ বয়স হয়েছে, পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি ; জীবনে সে গাইয়ে নাড়ুর সঙ্গে ঘর বেঁধেছিল, ওই ভালবাসাটিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য আশ্রয় নিয়েছিল মেয়ে যাত্রার দলে, সে প্রায় কুড়ি বছর আগে। নাড়ুবাবু তখন যাত্রার দলে বড় গাইয়ে। এবং রাধাবিনোদিনীর দল তখন বেশ নামডাক হাঁকিয়েই চলছে ; নাড়ু এসে ওই দলে ঢুকেছিল। শোভার দেহের কাঠামোখানা বেশ উঁচুপুরু ; সে আমলে লোকে বলত, দলমলে মেয়ে। রাধাবিনোদিনী নিজে ছিল দলের বড় হিরোইন, মহিষাসুর বধে দুর্গা ; রুক্মাঙ্গদের হরিবাসরে রাণী, রাবণ বধে মন্দোদরী এই সব পার্ট সে করত ; দরকার হলে শোভা একটিনি চালাত এই সব পার্টে। খুঁত হচ্ছে—গাইয়ে নয় শোভা। রাধাবিনোদিনী দল উঠে যাওয়ার পর অনেক দিন বসেছিল, নাড়ুবাবু অন্য দলে কাজ নিয়েছিল। কষ্ট হয়েছে তখন

কিন্তু শোভা তার ভালবাসার অপমান করে নি। পটলীচারু রীতু-বাবুর প্রণয়িনী ছিল শোভারই বোন। রীতুবাবু পটলীকে নিয়ে মঞ্জরী অপেরায় ঢুকবার সময় নাড়ুবাবু এবং শোভাকে দলে কাজ জুটিয়ে দিয়েছিল। নাড়ুবাবুর তখন হঠাৎ গলাটা কেমন ধরা ধরা হয়ে এসেছিল। শোভা দলে ঢুকে প্রতিষ্ঠা খ্যাতি পাক না-পাক, সকল লোকের মনে একটি প্রীতির আসন দখল করে বসেছিল। যার ফলে নাড়ুবাবুর গলাভাঙা সত্ত্বেও চাকরিটা মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ছিল। নাড়ুবাবু মারা গিয়েছে মফস্বলে, এই বছরই দল তখন আসামে গৌহাটিতে। শোভা বড় কাতর হয়ে পড়েছিল। তার সহোদরা পটলীচারু রীতুর প্রেমিকা, সে মারা গেলে শোভা এমন কাতর হয় নি। পটলীও মারা গিয়েছিল মফস্বলে। দল তখন পূর্ববঙ্গে খুলনায়, সে দু বছর আগে। পটলীর সামান্য জ্বর, সেই জ্বর নিয়েই সে পার্ট করেছিল, রীতুবাবুই তাকে ব্র্যাণ্ডি কুইনিন খাইয়ে তাজা করে নামিয়েছিল। পার্ট করে এসে শুয়েছিল পটলী, ভোররাত্রে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। ডাক্তার এসে দেখে বলেছিল, এ যে ডবল নিউমোনিয়া। ১৯৪২ সাল—তখন এম বি, পেনিসিলিন ওঠে নি ; তার উপর যুদ্ধের বাজার। টাকা থাকতেও মফস্বলে কালো বাজারের মোটা কালো পর্দাটা ঠেলে ঢুকবার কোন হদিস মেলে নি। দলকে সেই দিনই আসতে হবে দৌলতপুর। সন্ধ্যেতে সেখানে বায়না। রীতুবাবু থেকে গিয়েছিল—পটলীর মাথার শিয়রে বসে। শোভা গিয়ে রীতুবাবুকে বলেছিল, আমি থাকি কি বলেন ?

রীতুবাবু বলেছিল, না-না-না। আমি যাচ্ছি না, পটলী থাকছে না, তার উপর তুমি শুদ্ধ থাকবে না, পালা উঠবে কি করে ? তুমি যাও। প্রোপ্রাইট্রেস নিজের চাকর শিউনন্দনকে রেখে গেলেন। তার সঙ্গে থাকছে নবীন ঘোষ, লোকটা করিতকর্মা।

তাই গিয়েছিল শোভা। চারদিন পর পটলীর সৎকার সেরে রীতুবাবু দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল রানাঘাটে। শোভা রীতুবাবুর

কাছে এসে কেঁদেওছিল, তাকেও সান্ত্বনা দিয়েছিল, কিন্তু নাড়ুর মৃত্যুতে সে উপুড় হয়ে পড়ে ছিল তুদিন। তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিল মঞ্জরী। এবং বলেছিল—দল যতদিন থাকবে শোভাদি, যতদিন আমি থাকব, ততদিন তুমি থাকবে। সেই কথাটাই শুধু মঞ্জরী রাখে নি, তার থেকেও অনেক বেশী তাকে দিয়েছে। যে বাড়িতে মঞ্জরী থাকে, সে তার নিজের বাড়ি। তার একতলাটা করেছিল তার দিদিমা চল্লিশ বছর আগের বিখ্যাত কীর্তন গায়িকা রাধারাণী। একতলার উপর দোতলা হয়েছে তার মা তুলসীর দৌলতে। মঞ্জরীর বাপ, তার জন্মদাতা দোতলা তুলেছিল। সেই অবধি তারা থাকে উপরে, নীচের তলাটা ভাড়া দেওয়া আছে। তিনখানা ঘর, বারান্দা ঘিরে কাঠের রান্নাঘর, এতে তাদেরই সমশ্রেণীর তিনটি মেয়ে থাকে, কিন্তু তারা দেহব্যবসায়িনী হয়েও দেহব্যবসায়িনী নয়, প্রত্যেকেই এক একজনের রক্ষণাধীনে প্রণয়িনী হিসেবে বাস করে। তারই তুখানা ঘর বিয়াল্লিশ সালের ডিসেম্বরে হাতীবাগানে বোমা পড়তেই খালি হয়ে পড়ে ছিল। তুজনকে নিয়ে তাদের প্রণয়ীরা মফস্বলে চলে গিয়েছিল। তার একখানা ঘর এমনই ধরনের একটি মেয়ে এসে ভাড়া নিয়েছে। বাকী ঘরখানা মঞ্জরী শোভাদিকে ডেকে দিয়ে বলেছে—এখানেই থাক তুমি। ওখানে যা ভাড়া দাও তাই দিও আমাকে। ঘর তো আমার পড়েই আছে। তুমি তো জান, যাকে তাকে ঘরভাড়া তো দিই না আমরা।

অবাক হয়েছিল শোভা। চোখ থেকে তার জল গড়িয়ে পড়েছিল। বহু কষ্টেই বলেছিল—তোমার কর্তা—

মঞ্জরী বলেছিল—সেই-ই বললে দিদি। সে শুনেছে, নাড়ুবাবুর বিধবা মেয়েকে তুমি লিখেছ—তুমি যদি ঘেন্না না কর, যদি নাও তবে আমি তোমাকে মাসে মাসে দশ টাকা হিসেবে পাঠাব। সেই শুনে এসে বললে—জান, শোভাদিকে প্রণাম করলাম মনে মনে। তুমি ওকে এইখানে ওই ঘরখানা দিয়ে থাকতে বল।

শোভা এখন মঞ্জরীর সদাসর্বদার সঙ্গিনী, হাটে বাজারে যেখানে মঞ্জরী যায় সে সঙ্গে থাকে। মঞ্জরীর এটা ওটা বরাতও খাটে। শোভা আজকের পূজোর বাজার করতেও সঙ্গে গিয়েছিল এবং কালীঘাটে যাবার জন্য সঙ্গে এসেছে। শোভা স্নান করে ফিতে পাড় গরদের শাড়ি পরেছে। বয়েস হয়েও চুল একরাশ আছে শোভার, খুব ভিতরে ভিতরে দু-চারগাছি পেকে থাকলেও উপর থেকে কিছু বোঝা যায় না। মুখে একটু স্নো পাউডারের ছোপও রয়েছে। তবে কপালে সিঁদুরের টিপ সে আর পরে না। মঞ্জরীর বেশ পূজারিণীর বেশ। লাল চওড়া পাড় গরদের শাড়ি, কপালে সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতে সিঁদুর। মঞ্জরীর মুখখানিতে বিশেষত্ব আছে, টিকলো নাক, আয়ত চোখ, ছোট কপাল, নিটোল মুখ, যার মধ্যে খুঁত নেই, যে মুখ অল্প একটু ভাবনার ছায়া পড়লেই স্বর্গ-স্বপ্নাতুর অথবা ধ্যানমগ্ন বলে মনে হয়; মনে হয় এর মধ্যে চাপল্য নেই, চাঞ্চল্য নেই, বড় স্থির, বড় গভীর; সেই মুখে ওর অতি সহজেই পূজার্থিনীর সংকল্প ফুটে উঠেছে। শোভার ঠোঁটে পানের রস কিন্তু মঞ্জরীর ঠোঁট দুটি শুকনো। তাতেই ওই স্বর্গস্বপ্নাতুর শুচিতাটি আরও স্পষ্ট মনে হচ্ছে।

রীতুবাবু ফুটপাথে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কোনটায় উঠব?

শোভা একখানা ট্যাক্সিতে একলা রয়েছে পিছনের সিটে, তার পাশে সাজানো রয়েছে পূজার সামগ্রী। সামনে রয়েছে শিউনন্দন। অন্যখানায় প্রোপ্রাইট্রেস আর গোরাবাবু। মঞ্জরীর কোলে ডালাতেও কিছু জিনিস।

শোভা বললে—কোনটাতে কেন আবার? এইখানাতেই উঠতে আজ্ঞা হোক। পাশে বেমানান হব না। তা ছাড়া—

সে স্বর মৃদু করে একটি রসিকতাও করলে—যা ঠিক প্রকাশ্যে পরিবেশন বা হজম করা যায় না।

পটলীর দিদি হিসেবেই সে রীতুবাবুকে ঠাট্টা করে, নইলে সাধারণ অ্যাক্‌ট্রেসরা সম্ভ্রম করে, ভয় করে রীতুবাবুকে। অ্যাক্‌টররা

তাকে বলে মাস্টারমশাই আর বাবু, মেয়েরা বড় অ্যাক্‌টরদের বলে, বাবা আর মাস্টারমশাই। শোভা দলের মধ্যে প্রবীণা এবং নামকরা অভিনেত্রী, তার উপর মঞ্জরী ভালবাসে বলে সাধারণের উপরে। এ ছাড়াও শোভার আদিরসাত্মক রসিকতার জন্য খ্যাতি একটা আছে, সেটা সু-ই হোক আর কু-ই হোক। রীতুবাবু কিন্তু বেশ ঝাড়া গলায় সহাস্য মুখে উত্তর দিলে; বললে—শুধু তো বেমানানের ভয় য় শোভাদি, পথে যে কনেস্টবলে ধরবে। বলবে সরলা অবলা কুমারীটিকে নিয়ে বুড়ো তুই ভাগছিস কোথায়? নাতনী বললে তো ছাড়বে না!

শোভা বললে—মরণ! এমনি উত্তর শুনতেই সে চেয়েছিল।

গোরাবাবু বললে—এটায় আসুন মাষ্টারমশাই। গোপালবাবু উঠুন ওটায়। কথা আছে।

রীতুবাবু গোরাবাবুদের ট্যাক্সিতে উঠে বার তুই জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে বললে—আজ যেন ড্রাই মর্নিং মনে হচ্ছে স্যার?

—করব কি? মঞ্জরী দেখুন না, জল খায় নি, পান পর্যন্ত না! কিন্তু ধরেছেন ঠিক।

—এই দেখুন! বাঘের চোখ প্রখর, না নাক প্রখর দেবতা?

—হার মানলুম। নাকই প্রখর। ট্যাক্সিতে উঠে জোরে নিঃশ্বাস নিয়েছেন বটে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ দেবতা। নাকে ধরলুম। কারণ সকাল থেকে আমিও পান করি নি দ্রব্যটি।

ট্যাক্সিটা এসে চিৎপুর হ্যারিসন রোডের মোড়ে দাঁড়াল। ট্র্যাফিক বন্ধ। মঞ্জরী বললে—আপনি কদিন এমন ডুব মারলেন, একবার এলেন না। এদিকে উনি যা করছেন, তার কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। বই সুরু করেছেন, কমিক অ্যাক্‌টর ঠিক করেছেন, নতুন লোক, অ্যামেচার থিয়েটারে পার্ট করে। সিনেমাতেও ছোটখাট পার্ট করেছে। সে আবার খোঁজ দিয়েছে এক মেয়ের। সে আবার ভদ্রঘরের কুমারী

মেয়ে। নাচে গানে নাকি খুব নাম। আমি কি বলব, বলতে গেলেই রেগে যান। তার উপর যখন বই লেখেন তখন আবার আলাদা মানুষ। গোপাল মামাকে বলেছিলাম, উনি বিপিনকে আপনার ওখানে পাঠাবেন বলেছিলেন। সেও খোঁজ পায় নি।

রীতুবাবু হাসলে—একটু লজ্জিত ভাবেই হাসলে। বললে—হতচ্ছাড়া জীবনের হতচ্ছাড়া কাণ্ড তো! তা নইলে আর নিজেকে জন্তু বললুম কেন! গেলুম এক জায়গায়—ধরে নিয়ে গেল, পুরনো আমলের থিয়েটারের ভূতি ঘোষাল। বললে, রীতু, অনেক দিন আনন্দ করি নি রে, আনন্দ করা। সদ্য সদ্য তো ফিরেছিস, টাকা আছে তোর এখনও। খুব ভাল সন্ধান আছে আমার। খাতিরের লোক। বললুম, চলুন। গেলুম তো নাগাড় তিন দিন। তিন দিন পর ফিরে মন-মেজাজ খুব বিগড়ে গেল। নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, এ হচ্ছে কি? কখনও মনে হয় বেশ করেছি, কখনও মনে হয় ছি—ছি—ছি! দিন দুই ঘরে পড়ে রইলুম, তারপর বেরিয়ে পড়লুম। বীরভূম তারাপীঠে আগে আগে যেতাম, অবিশ্যি অনেক আগে। চলে গেলুম সেখানে। বড় পবিত্র স্থান, ভারী জমকালো শ্মশান, তার উপর যুদ্ধের মন্বন্তরে দেশ জুড়ে মড়ক, মাইল দেড় দুই লম্বা শ্মশানটায় শুধু মড়া—শুধু মড়া। তারই মধ্যে পেলুম এক পাগলা সাধুকে। মনে হল সিদ্ধপুরুষ। বসে গেলুম চেপে। বললুম, চরণ তোমার ছাড়ব না বাবা! সাধু বললে, থাক। থাকলুম সা—ত দিন। গাঁজা, মদ দেদার খায় সাধু। এতটা সইল না, আর কষ্টও অনেক—যাত্রাদলের ছোট আসামীদের থেকেও অনেক কষ্ট। শেষে উঠে পড়লুম। মনে পড়ল তিন দিন পর রথযাত্রা। মঞ্জরী অপেরার যাত্রা সুরু। পরশু এসে পৌঁছেছি। কাল ঘুমিয়েছি—ঘষেছি মেজেছি, সাবান স্নো মেখেছি। আজ গোল্ডেন মুন হয়ে উদয় হয়েছি।

মঞ্জরী বললে—সাধু কেমন দেখলেন বলুন?

গোরাবাবু হেসে উঠল—একেবারে সিদ্ধপুরুষ! চাল দিলে ভাত তো সাধারণ কাণ্ড, ভাত দিলে চাল হয়। যাবে নাকি?

মঞ্জরী ভুরু কুঁচকেই বললে—গেলে তোমায় সঙ্গে যেতে বলব না। সাধু কেমন মাস্টারমশাই!

রীতুবাবু বললে—ভাল লোক। তবে হ্যাঁ, সিদ্ধাটিদ্ধ কিছু নয়। সে বলেনও মুখে। তবে কথাবার্তা বলেন ভাল। মনটিও ভাল। আমি তো আমার সব বললাম। তো বললেন, ওরে বাবা, যাতে মন খারাপ হয়, দেহ খারাপ হয়, আর যাতে অন্যজনে দুঃখ পায়, তাই পাপ। তা ছাড়া পাপ নেই! আর যাতে পরম আনন্দ তাই পুণ্যি! ব্যস।

গোরাবাবু বললে—তা হলে বলব ভাল লোক। মানে নিরীহ সাধু!

মঞ্জরী বললে—সাধুর বাবার ভাগ্যি বলতে হবে!

গোরাবাবু বললে—সাধুদের বাবা থাকে না তা জান তো?

মঞ্জরী বললে—না। তারা আকাশ থেকে পড়ে!

—এই দেখ! নামধাম, ঘরসংসার, আত্মীয়স্বজন, একুল ওকুল, ইহলোক পরলোক, জাতধর্ম, পৈতেকণ্ঠী, সব হোমের আগুনে ছাই করতে হয় নয় তো গঙ্গার জলে টুপ করে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়। অনেকটা আমার মত—

—কি বললে?

—বলছি তুমিই আমার সন্ন্যাস গো!

—সন্ন্যাসেরও মরণ—আমারও মরণ। তা সন্ন্যাস তো ছাড়লেই পার!

গম্ভীর হয়ে গভীর কণ্ঠে গোরাবাবু বলে উঠল এবার—ছাড়বার জন্য নিই নি মঞ্জরী। যা পাবার তোমার মধ্যেই পাব।

একটি ক্ষীণ স্মিতহাসি ফুটে উঠল মঞ্জরীর মুখে। মাথার ঘোমটাটি অকারণেই একটু টেনে দিয়ে সে বললে—থাক ওকথা। এখন

মাস্টারমশাইকে বল তোমার কমিক অ্যাক্টরের কথা, কুমারী নায়িকার কথা।

ট্যাক্সি তখন ধর্মতলা পার হয়ে চৌরঙ্গী ঢুকেছে। রীতুবাবু উদাস দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু ঠোঁটে তার সূক্ষ্ম একটি হাস্যরেখা। মনে হচ্ছে এ দুটি প্রাণীর সুখী জীবনের কথা! আর মনে হচ্ছে গোরাবাবুর শেষ কথা—ছাড়বার জন্য নিই নি মঞ্জরী! যা পাবার তোমার মধ্যেই পাব! এই ধরনের কথা সেও বলত পটলীচারুকে। হাসিটুকু ফুটেছে সেই মনে পড়ে। বাঁদিকে টাইগার সিনেমার উত্তর পাশে বিলিতী মদের দোকান। পিচবোর্ড কাটা জনিওয়াকারের মস্ত ছবিটা সকৌতুক সমাদরে যেন ডাক দিচ্ছে। রীতুবাবুর ইচ্ছে হল এই মুহূর্তে নেমে গিয়ে কোনও বারে গিয়ে ঢুকে পড়ে।

গোরাবাবু তখন বলে চলেছে নতুন আবিষ্কারের কথা।

—ভাল ছোকরা আপনি দেখবেন মাস্টারমশাই। কথা বললেই বুঝতে পারবেন। ইয়ংম্যান ছাব্বিশ সাতাশ বয়েস। লেখাপড়া জানে। নাম ভবেন বোস—কিন্তু ডাকনামটাকেই নাম করেছে—বাবুল বোস বলেই পরিচয়। সিনেমাতে অল্প দিনেই নাম করেছে। আমার সঙ্গে আলাপ স্টুডিয়োতেই। মহাশক্তি ছবিতে আমাকে নিশুম্ভের পার্ট দিয়েছে। ওর একটা ছোট পার্ট ছিল। আলাপ হয়েছিল। কথায় কথায় বলেছিল, অ্যামেচারে কমিক পার্ট করে বেড়ায়। পাবলিক থিয়েটারে ঢোকার ইচ্ছে কিন্তু—সে হয় নি। আমার সঙ্গে প্রথম কথাই বলে নি। পাশাপাশি বসে অন্যের সঙ্গে কথা বলে, আমার সঙ্গে বলে না। সত্য সিংহী লক্ষ্য করে বললে, একি,আপনাদের আলাপ নেই? ইনি বিজয় চৌধুরী গোরাবাবু, যাত্রাদলের ভাল অ্যাক্টর, আর ইনি বাবুল বোস। ছোকরা নমস্কার করে বললে, যাত্রাদলের অ্যাক্টিং সেকেলে ব্যাপার—ভাল লাগে না আমার। সেই জন্যে আলাপ করি নি। আমি বললাম, আপনাদের অ্যাক্টি

আমার ভালই লাগে। ছোকরা বললে, লাগবেই, আমরা মডার্ন! বলে ঘুরে বসল। তারপর আমার শট হল দুটো। একটা শটে ছিল নিশুম্ভ মহামায়ার রূপ দেখে মোহিত হয়ে গেছে—একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে—কথা তিনটি—একি অপরূপ রূপ!—মহামায়া হেসে বলবে, এ রূপের অন্তরালে আর এক রূপ দেখতে পাচ্ছ না পশু? মৃত্যুরূপ? শট শেষ এইখানে। ছোকরা দেখে বলে উঠল, গুড—গুড—গুড! তারপর শটে মহামায়া সামনে নেই, তার বদলে এসে দাঁড়িয়েছে মৃত্যুরূপা কালরাত্রি! সে কালো বোরখার মত আলখাল্লা পরা মুখ ঘন চুল দিয়ে ঢাকা, কালরাত্রির মেকআপটা ভাল করেছিল, লাইটিংও খুব ভাল হয়েছিল। অন্ধকারের মধ্যে নীলচে ফ্ল্যাশে দেখা যাচ্ছে মূর্তিটা। দেখে নিশুম্ভ চমকে দু পা পিছিয়ে আসবে, তারপর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে দেখতে আরও প্রবল মোহ ফুটবে চোখে; কালরাত্রি খিল-খিল করে হাসবে; তখন নিশুম্ভ আত্মহারা হয় ছুটে যাবে—আর বলবে, ওগো বিচিত্ররূপিণী—এ যে আরও অপরূপ! এই কি অমৃতরূপ! আ-হা-হা! ওইখানেই শূল বিদ্ধ হয়ে পড়বে নিশুম্ভ। ভাল হল। সকলে তারিফ করলে। সকলের শেষে ও এল। মেকআপ তুলছে। এসে পাশে বসল, আমি কোন কথা বললাম না। ইচ্ছে করেই বললাম না। ছোকরা পকেট থেকে একখানা কাগজ বের করে খস খস করে কি সব লিখে আমার হাতে দিলে—নিন স্যার। দেখে কিছু বুঝতে পারলুম না। জিজ্ঞেস করলাম কি এসব। বলে একটা অঙ্ক। পড়ুন। আচ্ছা দিন আমি পড়ি। মারভেলাস প্লাস ওয়াণ্ডারফুল মানে আপনার আজকের পারফরম্যান্স প্লাস মাইনাস মাই ওল্ড ওপিনিয়ন—অর্থাৎ যা বলেছি তা উইদড্র করছি, ইজ ইকুয়াল টু আপনি বড় এবং সত্যি মডার্ন অ্যাক্টর প্লাস আই অ্যাম এ ফুল। বা আই অ্যাম ভেরী সরি। ব্যস, কাগজখানা দিয়েই রাইটঅ্যাবাউট টার্ন। আমি হাত ধরে বললাম, অঙ্ক ভুল। তখন ফিরে দাঁড়াল, বললে, নেভার। অঙ্কতে আমি ভারী স্ট্রং। আমি বললাম, দেখিয়ে

দিচ্ছি। কলমটা দিন। বলে আই অ্যাম এ ফুল কেটে লিখে দিলাম আই অ্যাম অলসো এ ভেরী গুড কমিক অ্যাক্টর। আই প্লেড দি পার্ট অফ এ ফুল। তখন হেসে বললে, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। ইয়েস, অঙ্ক আমার ভুল হয়েছিল। তবে আপনারও একটু ভুল আছে—আই প্লেড দি পার্ট অফ এ ফুলটা ঠিক নয় ওটা হবে মধ্যাহ্ন সূর্য অপেক্ষাও মধ্যাহ্নের বালুচর অধিক উত্তপ্ত যে নিয়মে সেই নিয়মে যৌবন অপেক্ষা যৌবনের অহঙ্কার অধিকতর ক্ষিপ্ত। ছোকরা ওয়াণ্ডারফুল রীতুবাবু!

মঞ্জরী হেসে বললে—নিশ্চয়; তোমাকে যখন এত ভাল কথা বলেছে।

গোরাবাবু বললে—চিমটি কাটা হল মেয়েদের স্বভাব। তোমাকে ওর সুশোভনের পার্ট দেখাই নি? ভাল বল নি তুমি?

—সে তো এখনও বলছি।

—সে আবার কোথায় দেখলেন?

—নিজেই নেমতন্ন করেছিল, একটা অ্যামেচারে প্লে করলে, রঙমহলে—আমাদের কার্ড পাঠিয়েছিল।

—নিয়ে নিন। ওর আর কথা নেই। নতুনের চটক আছে। বুঝেছেন। ধরে গেলে গণ্ডার মেরে বেরিয়ে যাবে। তবে আসবে তো যাত্রার দলে?

—আসবে। বলেছে আমাকে। আজ সন্ধ্যেবেলা আসবে দেখবেন।

—ভেরী গুড। কিন্তু মালটাল খায় তো?

মঞ্জরী বলে উঠল—আপনাদের ওই নইলে চলবে না বুঝি মাস্টার-মশাই?

—চলবে না কেন? তবে টেঁকবে না। দিন স্যার, একটা সিগারেট দিন। সকাল থেকে শুকনোর বাজার, তার উপর কথায় মশগুল হয়ে সিগারেট পর্যন্ত ভুল হয়ে গেছে।

মন্দির এসে গেল। হুঁশিয়ারি সে পাঁইজী, রথের মেলার ভিড়!

ছেলেপিলেগুলো লাট্টু মারবেলের মত ছুটোছুটি জুড়েছে। তারপরে গাছ আর ডিসপোজালের মালের মেলা। কালোবাজারের পয়সা। হুঁশিয়ারি সে!

গাড়িখানা উজ্জ্বলা পার হয়ে ডানদিকের রাস্তায় মোড় নিলে। দু পাশে বাজার বসে গেছে রথের মেলার। একে কালীঘাট—তাতে ১৯৪৪ সাল, ফ্যান আর এঁটোকাঁটার জন্যে যারা কলকাতায় এসেছিল দলে দলে তারা ফুটপাথে মরেছে সারিসারি কিন্তু তার অবশেষ যারা তারা আর ফিরে যায় নি। তাদের আড্ডার মধ্যে কালীঘাট একটা মস্ত আড়ৎ। দু খানা দু খানা ট্যাক্সি থেকে গোরাবাবু এবং মঞ্জরীর মত রূপ এবং শ্রীসম্পন্ন দম্পতি তার সঙ্গে রীতুবাবুর মত দশাসই চেহারার মানুষকে নামতে দেখে ছেঁকে এসে ধরলে—রাজাবাবু, রাণী মা—

গোরাবাবু চট করে আঙুল দেখিয়ে বললে—ওই বড়বাবু আমার দাদা—ওকে ওকে। ওর হুকুম হলে ওই ম্যানেজার—ওই যে মস্ত টাক!

গোপাল ঘোষের মস্ত টাকটা প্রথম প্রহরের আষাঢ়ে রৌদ্রে ঝক্‌ঝক্ করছিল।

মঞ্জরী বললে—দেব রে দেব, আগে পুজো দিয়ে আসি। দেব বইকি। শুভ কাজ হবে—তোরা খুশী না হলে মা তো খুশী হন না। দেব। গোপাল মামা, দশ বারো টাকার পয়সা করে নিতে হবে। এ সবে খুঁত রেখে পুজো হয় না।

খুঁত কিছুতেই হল না, ফেরবার পথে রীতুবাবুর জনিওয়াকারও কিনে নিলে শিউনন্দন।

তিন

বিকেল থেকে নতুন খাতা খুলে তার উপর সিঁদুরের স্বস্তিক এঁকে নিচে নাম লেখা হল—মঞ্জরী অপেরা। সন—ইং ১৯৪৪-৪৫ সাল, বাং ১৩৫১-৫১। শুভ মহরৎ রথযাত্রা দিবস—১২ই আষাঢ়। মালিক—শ্রীমতী মঞ্জরী দেবী ব্রাকেটে চৌধুরী। মুল ঠিকানা—নং ব্রজদাস লেন, আপিস—নং চিৎপুর রোড ব্রাকেটে চিৎপুর গ্রে স্ট্রীট জংসন।

ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বিজয় চৌধুরী, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, শ্রীগোপাল ঘোষ। তারপরই প্রথম পাতায় প্রথম নাম, শ্রীরীতেন বোস—রীতুবাবু, মাসিক বেতন—। গোপাল কলম থামিয়ে বললে—কত লিখবমাস্টার মশাই ? গতবার একশো পাঁচাত্তর ছিল—তাই রাখি ?

—রাখুন। বেশী দরকার হলে দাদন নিয়ে নেব। হাসলে রীতুবাবু।

—না। দুটো আঙুল তুলে দেখালে গোরাবাবু।

পাশের চেয়ারে বসে মঞ্জরী হাসিমুখে ঘাড় নেড়ে সায় দিলে—হ্যাঁ।

গোরাবাবু বললে—এবার—লেখ মঞ্জরী দেবী—

শোভা হেসে বললে—হ্যাঁ। তারপর গোরাবাবু শ্রীবিজয় চৌধুরী। লেখ।

—নিশ্চয়। তা নইলে তো হিসেব থাকবে না। যাত্রা দলে লাভ হল কত সেটা তো বুঝতে হবে। খাটনির দাম তো লাভ নয়। লেখ—লিখে যাও।

—শোভারাণী দাসী, গোপালীবালা দাসী—কই, নাটুবাবু কই ?

শোভার পাশেই বসেছিল গোপালী, গোপালী বললে—সে তো ফেরে নি এখনও দেশ থেকে !

গোরাবাবু বললে—ঠিক আছে, নাটুবাবু যথাসময়ে আসবেন—নাম লিখুন।

মঞ্জরী বললে—কি গোপালী? দেখ ভাই—

শোভা অঙ্গভঙ্গি করে বল উঠল—হ্যাঁ দেখ, দামড়া দড়ি ছিঁড়ল কিনা!

গোপালী হেসে উঠল, হাসি গোপালীর রোগ; দলের পুরুষেরা আড়ালে আবডালে ওকে বলে—দেখন-হাসি।

হেসে গোপালী বললে—দামড়া দড়ি ছিঁড়বে? কেন বল শোভাদি!

—ছেঁড়ে নি বুঁচির বেলা?

—সে দামড়া ছেঁড়ে নি শোভাদি, দড়ি নিজেই খুলে পড়েছিল।

—তা বটে।

রীতুবাবু কানে একটা পায়রার পালক চালাচ্ছিল, বললে—ঠিক আছে। গোপালীদের বেলা দামড়াও আছে দড়ির বাঁধনও আছে। তবে হয়েছে কি জান? গোপালী দড়িটি একটু লম্বা—তাই বাড়িতে গিয়ে দাসখতে নেমেছে নাটু দামড়া। সংসারী মানুষ নাটু, স্ত্রী পুত্রদের ভোলে নি। ঘরকন্না করছে। আসবে।

গোপাল বললে—চাষ। মাস্টারমশাই চাষ লেগেছে তার। অদ্ভুত মানুষ—কড়িটারও হিসেব রাখে। আপনি তো জানেন নাটুবাবু সিগারেট খায় না কিন্তু দু প্যাকেট সিগারেট ঠিক নেবে। জমাবে, আর যারা বেশী খায় তাদের কাছে বিক্রী করবে। যেখানে সিগারেট পাওয়া যায় সেখানে এক পয়সা কম দাম, যেখানে পাওয়া যায় না সেখানে দু পয়সা বেশী নেয় নাটুবাবু।

গোপালী বললে—তার আর করে কি বলুন। কাচ্চাবাচ্চা ঘরে। ছা-পোষা মানুষ।

গোরাবাবু বললে—লিখুন—নাম লিখুন। মাইনে নাটুবাবুর পাঁচ টাকা, গোপালীর চার টাকা বাড়ল। কি গোপালী?

—তাই লিখুন।

—তারপর বংশী আর আশা।

আবলুসের মত কালো লম্বা ছিপছিপে চেহারা বংশীর। লম্বা টেরি। সে টেরিতে অনেক কারিকুরি। বংশীবদন দাস, বিখ্যাত ড্যান্সিং মাস্টার। মাথায় বোতল রেখে, গেলাসে জল রেখে মাথায় নিয়ে নেচে প্রথম জীবনে নাম করেছিল। সঙ্গিনী এবং প্রণয়িনী আশাও তার যোগ্য জুটি। বংশীর প্রথম নাম ছিল হাবসী বংশী, সে তার ওই রঙের জন্য। জীবন সুরু করেছিল ভাড়াটে ড্যান্সিং ব্যাচের নাচিয়ে হিসেবে। কণ্ঠস্বর ছিল মেয়েদের মত। নিতান্তই পথের কুড়নো ছেলে। ওই ড্যান্সিং মাস্টার কুড়িয়ে তাকে মানুষ করেছিল। লোকে জন্ম জাত সম্পর্কে অনেক কথা বলে। ছেলেবেলা থেকেই শুনে শুনে সে সব তার সয়ে গেছে। লেখাপড়া ঠিক জানে না, বানান করে পড়ে, কোনরকমে সই করে। কিন্তু বড় সৌখীন লোক। জামা কাপড় জুতোতে ফিটফাট তার, সব থেকে বাহার তার টেরি। সব সময় পকেটে মদের শিশি তার বিড়ির মত প্রয়োজনীয়; রুমাল না থাকলে চলে বংশী মাস্টারের, পাঞ্জাবিতে কোঁচায় মুখ মোছে, (আজকাল আর কোঁচা নেই, পাজামা পরছে, কাপড় পরলে তা কোঁচাহীন আধুনিক আফগানী পাজামার ঢঙে পরে) কিন্তু ওই শিশিটি না থাকলে তার চলে না। আজও ওই নতুন আপিসে এসে অবধি বার দুই উঠে গিয়ে খেয়ে এসেছে। আশা তার যোগ্য সঙ্গিনী—রূপ আশার নেই, বয়সও হয়েছে, পঁয়ত্রিশের উপর হয়তো, কিন্তু ছিপছিপে শীর্ণ দেহখানি তার বয়স ধরতে দেয় না; রঙ মাখলে ষোল সতেরো বছরের তরুণী দেখায়। কবে কোন লগ্নে ওদের দুজনের দেখা হয়েছিল সে শুধু ওরাই জানে। লোকে নানান কথা বলে। একদল বলে, আশা থাকত বস্তীতে, তখন সে তরুণী, বংশীর সঙ্গে শুভলগ্নে দেখা হয়েছিল, তারপর বংশী অবসর পেলেই ছুটে যেত আশার ঘরে। কিন্তু সে ঘরে শুধু আশারই বাসা ছিল না, বস্তীর এক বাঘেরও আস্তানা ছিল। কথাটা হয়তো ঠিক হল না। বস্তীর এক বাঘ মধ্যে মধ্যে সে ঘরে এসে আস্তানা গাড়ত।

সে যখন আস্তানায় থাকত তখন একমাত্র বস্তীর সামনের পানবিড়ির দোকানের ছোঁড়া আর বাঘের শাগরেদ দু-একজন ছাড়া কেউ ঢুকতে পেত না ; পুলিস এলে বাইরে থেকে সিগন্যাল দিত পানের দোকানের ছোকরা, সেই সিগন্যালের ইশারায় বাঘ পালাত। পুলিস ছাড়া অন্য কোন লোক এলে দোকানের ছোকরা সাবধান করে দিত—না যানা বাবা। হুঁয়া বাঘ আছে। বংশীকেও সে সাবধান করে দিয়েছিল—নেহি যানা মাস্টর। বাঘ আছে। আজ সকালে এসেছে। এখুন দু-চারদিন ইধ্‌রে এসো না। কিন্তু বংশী তা শোনে নি। বাঘ ভালুক সাপ যাই থাক, আশার মুখ তাকে দেখতেই হবে। ঝগড়াঝাঁটি সে করবে না, সে হাত জোড় করে বলবে, বাঘ, তুমি দোস্ত আমার। তুমিও থাক, আমি এক পাশে বসে থাকি। গান শোনাব, নাচব—দেখ না কেমন জমিয়ে দিই। কিন্তু বাঘ—সে বাঘ। সে মানে নি, থাবা বসিয়ে দিয়েছিল। চড়-চাপড়েও যখন ভয় পায় নি বংশী, গালিগালাজেও রাগ করে নি তখন সে ছুরি মেরেছিল, এবং মুহূর্তে উধাও হয়েছিল সে আস্তানা থেকে। বংশী পড়ে গিয়েছিল, মরে যাওয়ারই কথা—কিন্তু আশা তাকে বাঁচিয়েছিল। স্থান ও পাত্রের বিচারে বস্তীবাসিনী আশার আহত বংশীকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করবার কথা। তা সে করে নি। বংশী পড়েছিল দরজার বাইরে গলিতে, সেখান থেকে ঘরে তুলে এনেছিল, ডাক্তার ডেকেছিল, ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করেছিল এবং নিজেই তার সেবা করেছিল অক্লান্ত ভাবে। পুলিস কেস একটা হয়েছিল, তাতে বংশী বলেছিল, ছুরি তাকে কে মেরেছে তাকে সে জানে না, চেনে না। সে আশার ঘর থেকে বের হয় নি, আসছিল ওপাশ থেকে। বাঘ ছিল ষাঁড়ের মত সবল মানুষ। বংশী বলেছিল, লোকটা রোগা-পটকা। হঠাৎ বললে, টাকা নিকালো। সে দেয় নি, তার বাঁ হাতটা চেপে ধরেছিল, সে খপ করে ডান হাতে ছুরি বের করে মেরে পালাল। গলিতে পড়ে সে চেঁচাচ্ছিল, সকলে ঘরের দরজা বন্ধ করেছিল, আশা তার ঘরের দরজা

খুলে তুলে নিয়ে বাঁচিয়েছে। কাজেই কেসটা পড়েছিল চাপা। তার পরদিনই বংশী তাকে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল নিজের আস্তানায়, সেটাও বস্তী, তবে একটু উঁচু স্তরের। তবে উত্তর থেকে একেবারে দক্ষিণে। সারকুলার রোডের ধারে তেল কল এলাকার বস্তী থেকে কালীঘাটের গঙ্গার ধারে ইট এবং সুরকী কলের এলাকায়। এলাকাটায় বংশী মাস্টারের নামডাক ছিল। গুণ্ডা হিসেবে নয়—মাস্টার হিসেবে। হাজরার মোড়ে মেথর পাড়ার ধারে পাকা বাড়ি থেকে সুরু করে পটোপাড়ার বস্তীতে বংশী মাস্টারের অনেক ছাত্রী ছিল—তারা নাচ গান শিখত তার কাছে। শুধু ওদের বাড়িতেই নয় কালীঘাটের তু-তিনটি অ্যামেচার যাত্রার দলেও বংশী মাস্টার মাস্টারী করেছে অবসর সময়ে। এখানেই ছিল তার বাসা। আশাকেও সে গান নাচ তুই শিখিয়েছিল। তখন সে শ্রীধর থিয়েট্রিকেল যাত্রাপার্টিতে ড্যান্সিং মাস্টার। সখীর দলের ছেলেদের তালিম দিত আর নিজে পালার মধ্যে মধ্যে কখনও ব্যাধ, কখনও লক্কা পিয়ারা, কখনও মাতাল সেজে এসে এক একটা নাচ দিয়ে যেত। কখনও সখীর দলের বড় এবং সব থেকে পাকা নাচিয়ে ছেলেটার সঙ্গে ডুয়েট নাচত। তখন আজকালকার মত টুকরো নৃত্য-নাট্যের চলন হয় নি। নাচের সঙ্গে গান থাকত। এ সবে বংশী মাস্টারের নাম ছিল খুব। রোজগারও ছিল ভাল। তখনকার দিনে মাইনে ছিল ষাট টাকা। এক বাক্স সিগারেট, এক বাণ্ডিল বিড়ি, একটা দেশলাই—রাত্রের খোরাকী আট আনা। চাকরিটা ছাড়তে পারে নি, আশাও ছাড়তে দেয় নি। চাকরি শুধু টাকার জন্যে নয়—সে কথা অন্যে না মানুক বংশী মানে আর তার অন্তর্যামী জানে আর আশাও জানে। যাত্রাদলের ড্যান্সিং মাস্টার—এর থেকে বড় খাতির সে কোথায় পাবে? কুড়নো ছেলে হলেও তার পরিচয় সবাই জানে। তার মা সুন্দরবন অঞ্চল থেকে ভিক্ষে করতে এসেছিল। অস্পৃশ্য—যাদের অন্ত্যজ জাত বলে তাঁদেরই যুবতী মেয়ে। তারপর এখানেই কোন পুলের তলায় জন্মেছিল। তার

গায়ের রঙ তার সাক্ষী। যাত্রার দলে ঢুকেও সে খাবার সময় একলা একপাশে বসে খায়; কিন্তু আসরে সে ড্যান্সিং মাস্টার বলে খাতির পায়, বসতে পায়। ছোট সখীর ব্যাচের ছেলেগুলো তাকে মাস্টারমশাই বলে। যারা তার জাতের কথা জানে না তারা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে আসে। তা ছাড়া পালাগানের রাত্রিগুলি আশ্চর্য স্বপ্নের রাত্রি। সে-স্বপ্ন এতদিনেও পুরনো হয় নি—দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয় না। এ কি ছাড়া যায়? আশাকে ওই ঘরে রেখে ছ-মাসের ঘর ভাড়া দিয়ে বলেছিল, যেন চলে যাস নি আশা। ঘর ভাড়া দিয়ে গেলুম। তোকে গান নাচ শিখিয়েছি, চেহারাতেও চটক আছে—দিন তোর সুখে না যাক দুঃখ হবে না। শুধু কারুর সঙ্গে বাঁধাবাঁধি করে চলে যাস নি। দল থেকে ফিরে এসে যেন পাই তোকে।

আশাও সে কথা রেখেছিল। সতীসাধ্বী সে নয়—সে দেহব্যবসায়িনী এবং বংশীর মতই তার জীবনের ইতিহাস। সেও ছোট জাতের মেয়ে তবে তার বাপ মায়ের একটা সংসার ছিল—সমাজ ছিল; পল্লীগ্রামের মেয়ে, বিয়ে হয়েছিল পল্লীগ্রামে, দেখতে চিরকালই সে কিশোরী মেয়ের মত—রংটা ফরসা, তার উপর ছিল একটা চটক। পল্লীগ্রাম থেকে গিয়েছিল স্বামীর সঙ্গে কলে খাটতে। সেখান থেকে স্বামী পালাল একজনকার স্ত্রী নিয়ে—অনাথা আশাকে সুখের প্রলোভন দেখিয়ে একজন নিয়ে এল কলকাতায় বাগবাজারের খালধারের বস্তীতে, সেখান থেকে তার চটকের জোরে সারকুলার রোডের বস্তীতে। সেখানে দেহের ব্যবসায়ে দিনরাত্রি ছিল না। কিন্তু সে তার সয়ে গিয়েছিল। এই পৃথিবীর এইটেই নিয়ম—এই ধারণাই হয়েছিল বদ্ধমূল। লাগতও বেশ। প্রেম ভালবাসা ঘরসংসার এ নিয়ে কোন কামনা বা কল্পনাও ছিল না, শুধু একটা কল্পনা ছিল—সে কল্পনা তার জীবনক্ষেত্রের অলকাপুরী নিয়ে; সোনাগাছিতে একখানি সাজানো গোছানো ঘরের সাধ তার ছিল। সোনাগাছি চিৎপুর সে বেড়াবার ছলে দেখে এসেছে; এক আশ্চর্য স্বপ্নপুরী মনে হয়েছে তার।

এ ছাড়া কোন সাধ তার ছিল না—আর কোন কিছু সাধের জিনিস থাকতে পারে এও তার ধারণা ছিল না। হঠাৎ জীবনে এল বংশী মাস্টার। আশ্চর্য বংশী মাস্টার—আবলুসের মত রঙ, ছিপছিপে পাতলা বংশী মাস্টার গান গাইলে, পকেট থেকে ছোট বাঁশের বাঁশী বের করে বাজিয়ে শোনালে—নিজে গান গেয়ে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নেচে তার ঝমঝমানো সেই বাড়ির ঘরেই তার স্বপ্নলোকের সুর ফুটিয়ে তুলে তাকে অভিভূত করে দিয়েছিল। অন্য ঘরের মেয়েরা অবাক হয়ে শুনেছিল। পরদিন ভালমন্দ নানান কথার মধ্যে আশা পুলকিত চিত্তে অনুভব করেছিল যে, তার কালকের রাত্রির ভাগ্যের জন্য হিংসে সবারই হয়েছে। সে পথ চেয়ে ছিল এই কালো মানুষটির। মানুষটি ঠিক এসেছিল সন্ধ্যেবেলা। এমনি করে দিনের পর দিন চলতে চলতে বাঘ এল একদিন, ঢুকল তার ঘরে। আশাই ওই পানের দোকানের ছোকরাকে বলেছিল, তুই বারণ করিস। বুঝিয়ে বলিস। কেমন? আট আনা পয়সাও দিয়েছিল তাকে। তবু সে এল। ছুরি খেলে। আশা সেবা করে ভাল করতে গিয়ে আরও ভালবাসলে বংশীকে।

এ ভালবাসার স্বাদ আলাদা, মানুষকে সেবা করে বাঁচালে তার উপর নিজের একান্ত আপন বলে একটা দাবী আসে, আবেগ আসে এর মধ্যে। তারপর বংশী তাকে নিয়ে কালীঘাটে এসে তার ঘরে সংসার পাতলে। তাকে নাচ শিখিয়ে গান শিখিয়ে নতুন জাত দিলে, নতুন চেহারা দিলে, আশা বিকিয়ে গেল। তাই বংশী যাত্রার দলের ড্যান্সিং মাস্টার হয়ে বাইরে গেলে দেহব্যবসায় করে জীবনধারণ করেও তার জন্যে পথ চেয়ে থাকত। একবার আশা বলেছিল, দেখ, ও-কাজ আর করব না। ভাবছি ভাল ঘর দেখে ঠিকের ঝিয়ের কাজ করব। বংশী বলেছিল, না—না—না। ঝি-গিরি করবি কি? না—না—না।

—তাতে আমার মান বাড়বে। মান খাটো হবে না।

—উঁহু, উঁহু। নাচ গান সব ভুলে বসে থাকবি। উঁহু। সে হবে না। সে সইবে না আমার।

এই সময়েই পাঁচ বছর আগে মঞ্জরী অপেরা মেয়ে-যাত্রা খুলছে—খবর পাওয়া মাত্র বংশী ছুটে গেল—এবং আশা সমেত দুজনের চাকরি নিয়ে ফিরে এল। আশাকে বললে, ব্যস—যা চাইছিলাম মনে মনে তাই পেয়েছি। চাকরি দুজনের একসঙ্গে। দুজনে মিলে নাচব। ড্যান্সিং পেয়ার।

বংশী ব্যাধ সাজে, আশা ব্যাধিনী। বংশী সাজে লক্কা পিয়ারা, আশা মেয়ে লক্কা পিয়ারু। বংশী সাজে বান্দা, আশা বাঁদী। বংশী গোয়ালা, আশা গোয়ালিনী। বংশীকেই এসব আবিষ্কার করতে হয়। যাত্রার পালার প্রথমেই সখীর ব্যাচের গান হয়। তারপর অঙ্কের বিরতিতে বিরতিতে কনসার্ট বাজনার পরেই এমনই এক একটা নৃত্যগীত। মঞ্জরী অপেরার প্রথম বছর বংশী মাস্টার আশাকে নিয়ে প্রথম নাচ দিয়েছিল—আলিবাবার বান্দা বাঁদীর নাচ ও গান।

আয় বাঁদী তুই বেগম হবি—আমি বাদশা বনেছি।
বাদশা বেগম ঝম্‌ঝমাঝম্ বাজিয়ে চলেছি।

সত্যি সত্যি ঘুঙুরের বাজনায় ঝম্‌ঝমাঝম্ তুলে দিয়েছিল ওরা, জমিদার বাড়ির পুরনো সতরঞ্চির ধুলো উড়ে গোটা আসরটার উপর হেজাক-বাতির সাদা উজ্জ্বল আলোয় একটা কুয়াশার মত আবরণে ঢেকে দিয়েছিল। এমন জোর পাক খেয়েছিল যে আসর থেকে বের হবার সময় অনভ্যস্ত আশা টলে পড়ে যাবার ভঙ্গী করেছিল ; পাকা নাচিয়ে বংশী তাকে ধরে না ফেললে পড়েই যেত। আসর থেকে বেরিয়ে এসে সাজঘরে ঢুকবামাত্র গোরাবাবু বলেছিল, বহুৎ আচ্ছা !

রীতুবাবুর সঙ্গে বংশীর পরিচয় অনেকদিন থেকে ; রীতুবাবু যখন যাত্রায় ঢোকে তখন বংশী কিশোর—তখনও মেয়ে সেজে নাচত ; রীতুবাবু বংশীকে তুই বলে। রীতুবাবু তাকে ডেকেছিল, বংশী, শোন্।

বংশী কাছে যেতেই গ্লাস হাতে দিয়ে বলেছিল, নে—খা।

বংশী লজ্জিত হয়েছিল। যাত্রার দলে মদ শতকরা নব্বুইজন খায়, বংশীর তো কথাই নেই। সে সুরু করে সকাল থেকে। যাত্রার দলের মধ্যেই হোক আর ছুটিতে ঘরেই হোক মদ সে সকালে উঠেই এক ডোজ খায়। তারপর তার ঝোঁকটা কমতে কমতে আবার এক ডোজ। স্নানের আগে এক ডোজ। খেয়েদেয়ে লম্বা ঘুম দিয়ে ফের এক ডোজ; সন্ধ্যের পর থেকে ডোজের পর ডোজ; যতক্ষণ না ঘুমোয়। পালা গাওনার সময় তো কথাই নেই, শেষ হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যায়। আশাকেও সে শিখিয়েছে খেতে। তবু রীতুবাবু যাত্রার জগতে মান্যের লোক, মাস্টারমশাই, বাপ-জেঠার থেকেও গুরুজন; সে সামনে পড়লে বোতল গেলাস ঢাকা দেয়, সেই রীতু মাস্টার-মশাই মদের গেলাস হাতে তুলে দিতে লজ্জা পেয়েছিল অনেক। কিন্তু এর থেকে বড় সম্মান আর হয় না। সে রীতুবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে একটু সরে যাবার উদ্যোগ করেছিল, কিন্তু রীতুবাবু বলেছিল, না রে ব্যাটা সামনে খা। আড়ালে তো নিজের বোতল থেকে খাচ্ছিসই। আমি দিলাম—সামনে খেতে। খা।

গেলাসটা উঁচু করে তুলে ধরে বংশী আলগোছে পানীয়টুকু মুখে ঢেলে দিয়েছিল। রীতুবাবু জাতে কায়স্থ, সে অন্ত্যজ। তাঁর গ্লাস কি সে এঁটো করতে পারে!

শুধু মদ নয়, মদ শেষ হতেই গোরাবাবু সিগারেট দিয়েছিল তাকে, নাও, খাও।

কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল বংশী। যাত্রাদল বিচিত্র ক্ষেত্র তখনও পর্যন্ত। একদিকে জগন্নাথ ক্ষেত্রও বটে—অন্যদিকে স্মৃতিতীর্থের টোলও বটে। যাত্রার গাওনার আসরে অজ্ঞাতজাতিকুল বংশী মান্যের লোক ড্যান্সিং মাস্টার, সাজঘরে তার সাজবার জায়গা বড় অ্যাক্টরদের পাশেই, কিন্তু খাবার জায়গায় গবেট বামুন অ্যাক্টর যার মাইনে তিরিশ টাকা, তার খাতির বেশী। সেখানে সে লোকটা মাছের খানা

পাবে, ভাল জায়গায় বসবে ; বংশী সেখানে একপাশে একলা বসে। মেয়েদের জায়গাতেও আশার ঠাঁই আলাদা। ও যে নিচু জাতের মেয়ে সেটা জানা হয়ে গেছে। যাত্রাদলের বাসাতেও একটু ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে থাকতে হয় বংশীকে। তাই রীতুবাবু নিজের হাতে নিজের গেলাসে মদ দেওয়াতে এবং খোদ গোরাবাবু নিজের প্যাকেট থেকে সিগারেট দেওয়াতে কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল। পরের দিন ম্যানেজার গোপালবাবু তাকে বলেছিল, কাল তোর নাম নোট হয়ে গিয়েছে বংশী।

তার অর্থ বংশী জানত। মাইনে বাড়া। যাত্রাদলের অধিকারী-(আগে প্রোপ্রাইটার প্রোপ্রাইট্রেস ছিল না।)মশায়ের নোটবই থাকে। তাতে যে লোকের নাম ওঠে তার মাইনে বাড়ে। আগে এক টাকা দু টাকা ছিল মাইনে বাড়ার রেট। বড় অ্যাক্টরের পাঁচ টাকা।

বংশী গোপাল ঘোষকে প্রণাম করে বলেছিল, কত্তা গিন্নীর ধনেপুতে লক্ষ্মীলাভ হোক, মঞ্জরী অপেরার জয়জয়কার হোক। কিছু হুকুম হয়েছে না কি ?

—হয় নি, হবে। তবে নোট হয়েছে। কাল নাচে খুব খুশী। রীতু মাস্টারমশাইকে পেণাম করিস—তিনি করিয়েছেন। তোর দু টাকা—আশার এক টাকা তো হবেই।

বংশী বলেছিল, মাইনে বাড়ুক আর না বাড়ুক বাবু, দল থাকুক, আর আমাদের চাকরিটা থাকুক। এইতেই খুশী ম্যানেজারবাবু। বোঝেন তো সব !

তা বোঝে গোপাল ম্যানেজার। গোপালের যাত্রাদলের চাকরি তখন পঁয়ত্রিশ বছর হয়ে গেছে। কত দলই না ঘুরল। তারও যাত্রার দলের জীবন—বংশীর মত। সে ঢুকেছিল নাচিয়ে ডালিমের টানে।

নাচিয়ে ডালিম !

সে সব কথা তার মনে পড়ে গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে।

হুগলী জেলা বাড়ি, কায়স্থ বংশের ছেলে। চেহারাখানি ভাল ছিল, যেমন তেমন ভাল নয়—সুপুরুষ। বুদ্ধিও ছিল, লেখাপড়ায় ছেলেবয়সে সুনাম পর্যন্ত ছিল; কিন্তু যে একটি ভূত বা প্রেত বা বাউণ্ডুলে বিবাগী এই সব মানুষের অন্তরে থাকে সে হঠাৎ জেগে বসে সংসারী সত্তাকে ঠেলে ফেলে জীবনের মসনদ দখল করে বসল একটি বাঁশের বাঁশী হাতে পেয়ে। গোপাল গান গাইতে পারত না কিন্তু তাল-মানটা বুঝত এবং যেখানে গান বাজনা হত সেখানেই গিয়ে জুটত। কোথাও বাইরে দাঁড়িয়ে শুনত—কোথাও বা মজলিসের এক পাশে ঠাঁই করে নিত। ছেলেবেলা থেকেই যাত্রার আসরের সামনে বসত সন্ধ্যেবেলা থেকে, এবং পান ছুঁড়ে দিয়ে সখীর দলের ছোকরাদের সঙ্গে ভাব করত। ছেলেবেলায় স্কুলের খাতাতে পশুপতি সরকার, বিভূতি কর্মকারের নাম কত বার যে লেখা আছে তার ঠিকানা নেই। স্কুলে যখন থার্ড ক্লাশে পড়ে তখন মহেশপুরের মেলায় গিয়ে কিনে এনেছিল এক বাঁশের বাঁশী। তারপর সেই বাঁশী তার জীবন জুড়ে বসল। পড়াশোনা সব গেল কিন্তু বাঁশীটা বাজাতে শিখল। তারই সঙ্গে সঙ্গে জাগল এক স্বপ্নলোকের নেশা। সেই নেশায় স্বপ্নলোকের সন্ধানে জ্যোৎস্নালোকিত মাঠে গিয়ে গভীর রাত্রে বাঁশী বাজাত। বাঁশী বাজানোটা শিখল—কিন্তু দুর্ভাগ্য গোপালের—স্বপ্নলোকের আবছা আভাস ছাড়া সঠিক ঠিকানা মিলল না। ওদিকে স্কুলের বাকী তিন বছরের পড়াটা পাঁচ বছরেও শেষ করতে না পেরে সেবার টেস্ট পরীক্ষায় ফেল করে পড়া ছেড়ে দিলে। তারপর স্বপ্নলোকের আভাসটুকুও কোথায় মিলিয়ে গেল। মনে হল—ঝপ করে কোথা থেকে একটা কালো পর্দা সামনে ঝুলে পড়ে সব ঢেকে দিল। বাড়ির অন্ন তিক্ত হল বাপমায়ের গঞ্জনায়। বেচারী গোপাল নিরুপায় হয়ে যে বিদ্যে আয়ত্ত করতে পারে নি সেই বিদ্যা নিয়ে দোকান খুললে—পাঠশালা খুলে বসল। সে

আমলে দুটো ব্যবসা ছিল—সস্তা ব্যবসা—গোপালদের মত ব্যক্তির পক্ষে। এক মাস্টারী বা পণ্ডিতী আর এক হোমিওপ্যাথিক বাক্স এবং কুইনিন ম্যাগসাকাফ ক্যাস্টর অয়েলের শিশি ও একটা স্টেথেসকোপ নিয়ে ডাক্তারী। গোপাল প্রথমটাই বেছে নিয়েছিল। গোটা বারো টাকা হত। আর কিছু সিধের চাল ডাল। বাপ মা বিয়ে দিতে চেয়েছিল—কিন্তু বিয়ে গোপাল করে নি। বাপ মাকে বলত, খাওয়াব কী? বন্ধুদের বলত, বিয়ে করব কাকে? ওই ভাবনা যেদিন ভাবতে বসত সেই দিন রাত্রে বাঁশী বাজাত এবং সেই দিন কালো পর্দাটা উঠে জেগে উঠত সেই স্বপ্নলোকের আভাসটি। এমন রাত্রে কত দিন স্বপ্ন দেখেছে ছেলেবেলায় যাত্রাদলের রাজা, রাজকন্যা এবং সখী—এরই মধ্যে হঠাৎ এক ক্রোশ দূরের বর্ধিষ্ণু গ্রামে এল মেয়েযাত্রার দল। তখন প্রোপ্রাইট্রেস নয়—মালিক অথবা স্বত্বাধিকারিণী—ত্রৈলোক্যতারিণী। সেই যাত্রা শুনতে গিয়ে গোপালের মনে হল—এই তো তার সেই স্বপ্নলোক! যে স্বপ্নলোকের আভাসই সে অনুভব করেছে কিন্তু ঠিকানা পায় নি! এই তো! তখনও হেজাকবাতি ওঠে নি, তখন কারবাইডের আমল; সেই কারবাইডের উজ্জ্বল ঝলমলে আলোয় সে যাত্রার আসর নয়—সে যেন একটা জগৎ। স্বপ্নজগৎ স্বর্গজগৎ যাই হোক। ওই আলো—তার সঙ্গে বাদ্য-যন্ত্রের সঙ্গীত; এরই মধ্যে ঝকমকে পোশাকে পেণ্টের রঙে আঁকা ভুরুতে চোখে, রাঙানো ঠোঁটে অপরূপ মানুষের মেলা, মেয়ে পুরুষ যেন অপ্সর-অপ্সরী কিন্নর-কিন্নরী—হাসে কাঁদে নাচে গায়। কি অপরূপ ভাষা! কি মনোরম ভঙ্গি! কি বিলোল চাহনি! কি আলাপ! কি প্রাণস্পর্শী বিলাপ! যন্ত্রসঙ্গীতের সুরে ঝঙ্কারে সুখদুঃখের কি অপরূপ প্রকাশ! এতকাল পর্যন্ত যে স্বপ্নলোকটির অস্তিত্ব এবং প্রকাশ ছিল আভাসে—সেদিন সেই কল্পলোকটির সামনের আবরণ উঠে গিয়ে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার সামনে। শুধু তাই নয়, পালা আরম্ভের প্রথমেই নাচিয়ে ডালিম নর্তকীর সাজে

সেজে এসে দাঁড়াল ; একটু হেলে দাঁড়াল ; মুখটি ঈষৎ বাঁকিয়ে—যেন দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে গাইলে—

ওই নীল উজল তারাটি !

কিবা অমিয় মাখানো হাসিটি—স্নিগ্ধ কিরণ ধারাটি—।

ওই ওতেই গোপাল হারিয়ে গেল। গোপালের মনে হল উল্টো। মনে হল এতদিন সে তার আপন ভুবন থেকেই হারিয়ে গিয়ে কোন অজানা অচেনা ভুবনে মনের কষ্টে কাল কাটাচ্ছিল, আজ হঠাৎ খুঁজে পেলে তার সেই আপনার চেনা জগৎ, চেনা মানুষ। তার মধ্যে ওই নাচলে যে মেয়েটি সেই মেয়েটিই তার চিরকালের আপন জন। বাপ মাকেও পর মনে হল। মনে হল ছেলেবয়সে হারিয়ে গিয়ে সে এই বামুন পাড়া কায়েত পাড়া বড়লোক গরীবলোক অভাব অনটন পাঠশালা ইস্কুল পরীক্ষা চাকরি-সর্বস্ব এই পৃথিবীর পথে সেই ঘুমপাড়ানী ছড়ার কথার মত পথের ধুলো গায়ে মেখে মা-মা বলে কাঁদছিল—এই মা তাকে কুড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আজ তার ভুল ভাঙল। ভুল যখন ভাঙল তখন গোপাল আর ভুলের পথে ফিরল না। দুদিন পর যাত্রার দল গাওনা সেরে স্টেশনে এসে গাড়িতে চড়ল, সঙ্গে সঙ্গে গোপালও গাড়িতে উঠল। পকেটে পাঠশালার পণ্ডিতীর উপার্জন কিছু ছিল আর ছিল বাঁশীটা। দিন সাতেকের মধ্যে দলের পাশে পাশে ঘুরতে ঘুরতেই ভিতরে ঢুকে গেল। এমন একটা রূপবান ছেলে দলের পাশে পাশে ঘুরছে সেটা মালিক ত্রৈলোক্যতারিণীর নজর এড়াল না। সে তাকে ডেকে বলেছিল, কি গো ছেলে ? কোথায় বাড়ি তোমার ? দেখছি তো আজ কদিন সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছ। কেন বল তো বাপু ?

গোপাল চুপ করে ছিল, উত্তর দিতে পারে নি।

ত্রৈলোক্য জিজ্ঞাসা করেছিল, কি নাম ? কি জাত ? কোথায় বাড়ি ?

গোপাল মাথা হেঁট করে বসে শুধুই মাটির উপর নখ দিয়ে দাগ

কেটেছিল। একটা কথারও জবাব দেয় নি। অনেকক্ষণ পর হঠাৎ একসময় গোপাল ভ্যাক করে কেঁদে ফেলে তার পায়ে ধরে বলেছিল, আমাকে আপনাদের দলে নিন। যা দেবেন আমাকে।

তারপর সব পরিচয় দিয়েছিল, ঠিকঠিকই দিয়েছিল—শুধু একটা মিথ্যে কথা বলেছিল, বলেছিল মা নেই। বাবা আবার বিয়ে করেছে, সৎমা বড় যন্ত্রণা দেয়। এই কথাটুকুতেই গলে গিয়েছিল ত্রৈলোক্যতারিণী। সৎমা কষ্ট দেয়! এটা সর্বকালে সর্বদেশে এমন নিষ্করুণ সত্য যে মমতায় বেশ একটু অভিভূত হয়েই ত্রৈলোক্য মা বলেছিল, তাহলে তুমি থাক বাবা। চেহারা ভাল—সুন্দর চেহারা। এর উপর বচন ভাল হলে হিরো হয়ে যাবে। বক্তৃতা আসে?

গোপাল আর মিথ্যে বলে নি—বলেছিল, কখনও তো করি নি বক্তৃতা। তা সবাই পারলে আমি পারব না কেন?

হেসে ত্রৈলোক্যতারিণী বলেছিল, তা পারে না বাবা। সবারই হয় না। গান—ওকি সবার হয়?

গোপাল বলেছিল, গান আমি বুঝি। গাইতে পারি না, বাঁশীতে বাজাতে পারি। বাঁশের বাঁশী ভাল বাজাতে পারি মা।

গোপালের চাকরি হয়ে গিয়েছিল। বক্তৃতা সে পারে নি, তবে চেহারা ভাল ছিল বলে উজ্জ্বল দৃশ্যে নারায়ণ কৃষ্ণ শিব সাজত। বাজাত বাঁশী। এরই মধ্যে গোপাল নাচিয়ে ডালিমকে জিতে নিয়েছিল। ডালিমের ভালবাসার মানুষ দল ছেড়ে চলে গেল। ডালিমের সঙ্গে ত্রৈলোক্যতারিণীর দলে তার চাকরি অক্ষয় হয়ে গেল। নিজেরও গুণ ছিল গোপালের—সেটা বাঁশী বাজানো নয়, দলের কাজকর্ম চালানো এবং দেখাশোনার ক্ষমতা। সেকালে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়া ছিল, পাঠশালায় পণ্ডিতীও করেছিল। দলের লেখাপড়ার কাজ, খাতা লেখা, পার্ট লেখা এগুলিই বেশ চমৎকার করত। তার উপর বাইরে ইস্টিশানে ট্রেনে পথেঘাটে কথাবার্তা বলা—সে অল্পস্বল্প ইংরিজী হলেও বেশ চালিয়ে দিত। একবার এক ফিরিঙ্গী গার্ড সাহেবের সঙ্গে ঘুষ

নিয়ে ইংরিজীতে এমন ঝগড়া করলে যে ঘুষ না দিয়েই কাজ উদ্ধার হয়ে গেল। তখন ত্রৈলোক্যতারিণী খুশী হয়ে বললে, গোপাল, তুই বাপু দলের ম্যানেজমেণ্টটা দেখ। বাঁশী বাজিয়ে তো অকালে বুক ঝাঁঝরা করবি—তার থেকে এই কর।

সেই অবধি গোপাল ম্যানেজারি করছে।

ত্রৈলোক্যতারিণীর দল আট বছর পর গাওনা করতে বেরিয়ে শাল নদীতে পুল ভেঙে ট্রেন পড়ে গিয়ে শেষ হয়েছিল। কিন্তু গোপালের ভাগ্য, ডালিমের হয়েছিল নিউমোনিয়া, সে থেকে গিয়েছিল শেষ গাওনার জায়গা বর্ধমানে। প্রাণে বেঁচে গোপাল ডালিমকে কলকাতায় নিয়ে ফিরেছিল এবং সাঁতরা কোম্পানীতে অ্যাসিস্টেণ্ট ম্যানেজারিও পেয়েছিল। কিন্তু মেয়েযাত্রার দলের অভাব মর্মে মর্মে অনুভব করেছিল। ডালিমকে কলকাতায় রেখে তাকে সাত আট মাস কাটাতে হত বাইরে-বাইরে।

ঘরে স্ত্রীপুত্র ফেলে চাকরির খাতিরে বাইরে থাকে চাক্‌রেরা সবাই ; মেয়েছেলে নিয়ে বাসা আর কজনে করতে পারে! কিন্তু সে থাকা আলাদা। স্ত্রী সেখানে থাকে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে। স্ত্রীর ধর্ম আলাদা। কিন্তু এ যে সম্পূর্ণ আলাদা। ডালিমের ধর্ম আলাদা, সমাজ আলাদা ; সেখানে তাকে ছেড়ে গিয়ে ফিরে এসে পাওয়া যায় না। কিন্তু ডালিমের জন্যে সে ঘর ছেড়েছে, মা বাপ ছেড়েছে ; সেই ডালিমকে হারাবার চিন্তায় প্রথম প্রথম তার মনের অস্বস্তির সীমা ছিল না। কিন্তু যাত্রার দলও সে ছাড়তে পারে নি। যাত্রার দলের হাজার কষ্ট হাজার অসম্মান সত্ত্বেও তারই মধ্যে সে কল্পলোকের স্বাদ পেত। কোনক্রমে সেটা সয়ে গিয়েছিল। যাত্রার দলের ঘোরার পালা শেষ করে এসে সে ডালিমের ঘরে মাস চার পাঁচের সংসার পাতত। সে সময়ের জীবনটা তার সত্যই স্বপ্নের জীবন। তার পর সাঁতরা কোম্পানী থেকে মথুরশা, সেখান থেকে সত্যম্বর অপেরা, গণেশ অপেরা—বলতে গেলে বড় বড় সব দলেই চাকরি সে করেছে। তারপর

ডালিম মরল। ডালিম মরবার সময় তাকে তার যা ছিল দিয়ে বলেছিল, দেখ, তুই যেন এ লাইনের কারুর সঙ্গে জুটিস নে। বরং বিয়ে করিস। আমার কখানা গয়না তোকে দিলাম, তাকে দিস। তুই দলের সঙ্গে বেরুতিস আমার যে কি কষ্ট হত তুই বুঝবি নে। সেজেগুজে বাইরে দাঁড়াতে কান্না পেত। বিয়ে করিস। যারা বিয়েলো বউ ধর্ম তাদের রক্ষা করে। আমাদের তো ধর্ম বাঁচায় না।

ডালিমের কথাই সে মেনেছিল, বিয়েও করেছিল। বউ নিয়ে বাসাও পেতেছিল কলকাতায়। যখন দলের সঙ্গে বের হত তখন বউকে রেখে আসত তার বাপের বাড়ি। কিন্তু সে সংসারও ভাঙল। তারপর তার নারীর নেশা ছুটে গেছে কিন্তু যাত্রার নেশা কাটে নি। সে নেশা কাটাবারও উপায় নেই। খাবে কি? বুড়ো বয়সে নেশার ঘোরে কষ্ট পায়, সহ্য হয় না, তবুও মেয়েযাত্রার দলের মধ্যে আনন্দ যেন সে বেশী পায়। প্রথম জীবনের কথা মনে পড়ে। তাই গোরাবাবু যখন মঞ্জরীকে নিয়ে মেয়েযাত্রার দল খুলবার কথা বলে তখন সে অনেক উৎসাহ দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, কম মাইনেতে দলের অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারি নিয়েছিল। দলটির প্রতি মমতার তার শেষ নেই। এর জন্যে দলের অ্যাক্টররা অনেকেই তার উপর বিরক্ত বিরূপ।

যাত্রাদলের ম্যানেজারদের ভাগ্যই এই। গাল খেতেই হবে। চোর বদনামও পেতে হবে। চুরি কিছু করে বইকি ম্যানেজারেরা। করে। শুধু নিজের জন্যে করে না—মালিকের জন্য করে, দলের জন্য করে। মধ্যে মধ্যে চুরি না করেও চোর বদনাম নিতে হয়। কোন আসরে গাওনার পর বিদায়ের সময় নায়ক পক্ষ হাজার ফ্যাঁকড়া তুলে পঞ্চাশ একশো কম দেয়। দলের লোককে বললে বিশ্বাস করে না। কোন কোন আসরে পুরো টাকা নিয়ে এসেও ম্যানেজার বলে পুরো টাকা দিলে না নায়ক পক্ষ। সে টাকাটা মালিক নেয়, সুযোগ পেলে ম্যানেজারও মারে। বারোয়ারি পুজার আসরে বারোয়ারি কর্তাদের একটা কৌশল হয়েছে আজকাল। গাওনার পর পুরো টাকা দিয়ে

তারপর বলে এইবার পূজোর কিছু প্রণামী বা চাঁদা যা বলেন দিন আপনারা। আমাদের তো চাঁদা করে পূজো। দিতে হয় পঞ্চাশ টাকা। দিলে পরের বছরের বায়নাটা হয়ে থাকে।

এ সবই তার সয়ে গেছে। কখনও মনেও হয় না যে যাত্রাদল ছেড়ে দিয়ে সে আর কিছু করবে। কি করবে? আর তো কিছুই তাকে দিয়ে হবে না। তা ছাড়া এই যাত্রাদলের বাইরে বিশাল কাজ-কারবারের হুনিয়া; সেখানকার জীব তো সে নয়। দল ছেড়ে সেখানে বাঁচতে, দম নিতেই সে পারবে না। সেখানকার বাতাসই যেন আলাদা।

সেদিন অর্থাৎ মঞ্জরী অপেরা যেবার প্রথম পত্তন হল সেবার প্রথম আসরে বংশীর মাইনে বাড়ার খবরটা দিতেই বংশী বলেছিল—মাইনে বাড়ুক না বাড়ুক দল বেঁচে থাকুক, দলের জয়জয়কার হোক।

মনে পড়েছিল গোপালের সাঁতরা কোম্পানীর কর্তার কথা। কর্তা বিষয়ী ঘরের ছেলে তবু ছিলেন তাদের জাতের জীব। শখ করে দল করেই শখ মিটেছিল তাঁর। দলের সঙ্গে ফিরতেন। খাওয়া শোওয়া একসঙ্গে। তিনি বলতেন, গোপাল চন্দর, জানিস বাবা, যাত্রাদলের আসামী আর পুকুরের মাছ এই হুই একজাতের জীব। যাত্রার দলটি পুকুর আর অ্যাক্টর বাজিয়ে গাইয়ে সব মাছ। জলের মধ্যে মাছের মত দলের মধ্যে এরা বেশ স্বচ্ছন্দ। ঘাই মারছে লাফ মারছে—মনের আনন্দে আছে। জল থেকে মাছ ডাঙায় উঠলে—ব্যস চারটে খাবি আর হু তিনটে আছাড় খেয়েই শেষ; আসামীও তাই দল ছেড়ে আর কিছু করতে গেলেই ওই হু-দশ দিন পরই না খেয়ে খতম। চুনোপুঁটি থেকে রুইকাতলা সব, কেউ বাঁচে না।

সঙ্গে সঙ্গে সেদিন বংশীর কথায় মনে হয়েছিল মাছের মধ্যে রুই-কাতলা ছাড়া মাগুর শোল মহাশোলও আছে। পাঁকাল মাছ। বড় মাছের ঘরসংসার পুকুরে হয় না, নদীতে হয়; সেখান থেকে ডিম পোনা এনে পুকুরে ছাড়ে। তারপর ছোট থেকে বড় পুকুরে ফেললে

বাড়ে—বড় হয়। পাঁকাল মাছের ঘরসংসার পাঁকে মজা গড়েতে। সেখানেই তাদের ঘরসংসার। তাদের তুলে বড় পুকুরে ফেললেই তারা পাঁকের অভাবে মরে। বংশী আশার মত যারা তারা পাঁকাল মাছ—মেয়েযাত্রা তাদের পাঁকাল পুকুর গড়ে। গোপাল তার প্রথম জীবনে ত্রৈলোক্যতারিণীর দলে ডালিমের সঙ্গে সংসার-জীবনের স্বাদ আজও ভুলতে পারে নি। কতকাল পর আবার মঞ্জরী অপেরায় এসেছে। ডালিম নেই, সংসার নেই—তবু খুব ভাল লাগে।

* * *

আজ ১৯৪৪ সালের রথযাত্রার দিন বংশী আশার নাম উল্লেখ করে কর্তা গোরাবাবু যখন প্রশ্ন করলে—'তারপর বংশী আশা।' তখন গোপাল জানত বংশী কি বলবে। বংশী বলবে, কি বলব আমরা, যা করবেন আপনি। এবং আশা একটু হাসবে। প্রসন্ন সম্মতির হাসি। গোপালের অনুমান মিথ্যে হল না। বংশী হাত জোড় করে বললে—আজ্ঞে না, আমি কিছু বলব না। দলের প্রথম গাওনার রাত্রে আপনি মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আপনার বিচার স্যর সূক্ষ্ম বিচার—হাইকোর্টের রায়।

রীতুবাবু বলে উঠল—তুমি ব্যাটা তো দেখছি পাকা উকীলের কান কাট। হ্যাঁ! যা একখানি মোক্ষম তোলান দিলে কর্তাকে!

রীতুবাবুর রসিকতায় কেউ কখনও অসুখী হয় না, ওর রসিকতার মধ্যে কোথায় থাকে একটি স্নেহরসের স্পর্শ—যাতে মনটি প্রসন্ন হয়ে ওঠে। সকলেই হেসে উঠেছিল কিন্তু তাতে বংশী অপ্রস্তুত হয় নি। সে আবার বেশী খুশী হতে পারে। অল্পে খুশী হতে পারার মতই মনের গড়ন তার। সে তার জাতজন্ম এবং শৈশব-বাল্যের অবস্থার জন্যও বটে; কিন্তু সবটা নয়, কিছুটা তার নিজের জন্যও বটে। আড়ালেও সে কখনও কাউকে অতিপ্রচলিত সম্পর্ক পাতিয়ে শালা বলে গাল দেয় না। কখনও কখনও গালাগাল খেয়েও একটু বিষণ্ণ হাসি মুখে ফুটে ওঠে তার। মানুষটার জাত যাই হোক ধাতুটির মধ্যে আশ্চর্য

মাধুর্য আছে। বংশী রীতুবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে বললে—মাস্টারমশাই তা হলে জুরী। শুনেছি নাকি জুরীর মত না নিলে জজ সাহেবের কলমের কোন ক্ষমতা নেই।

—সাবাস রে বংশী, সাবাস! বলে রীতুবাবুই পিঠ চাপড়ে দিলে বংশীর। খুব বলেছিস।

হা হা করে হেসে উঠল সে। সঙ্গে সঙ্গে হাসল সবাই। কিন্তু সে হাসি ঢাকা পড়ল নিচে রাস্তায় বাজনা বাদ্যি কাঁসর ঘণ্টার শব্দে। শব্দটা অনেকক্ষণ থেকেই উঠছে—এবার এই মুহূর্তে একেবারে কাছে এসে পড়েছে। রথযাত্রার দিন কোন বাড়ির রথ বের হয়েছে। সম্ভবত কোন গলি থেকে বেরিয়ে একেবারে গ্রে স্ট্রীট জংসনের মোড়ে। শোভা গোপালী আশা তিনজনে হুড়মুড় করে বারান্দায় বেরিয়ে গেল; ভারী শরীর শোভা সকলের পিছনে। সে যেতে যেতে বললে—খবরদার, বেটাছেলেরা বারান্দায় আসবে না।

পুরুষদের অধিকাংশই ছিল সিঁড়ির সামনে বড় ঘরটায়। তারা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল। শুধু যেতে পারলে না বংশী। কিন্তু সেও চঞ্চল হয়ে উঠল। নিচে যাবার জন্যে তার মনের ছটফটানি ঢাকতে পারছে না সে।

গোপাল ঘোষ, রীতুবাবু, মঞ্জরী, গোরাবাবু এরাও চঞ্চল হয়েছিল। বাজনাবাদ্যির ঘটার বেশ সমারোহ রয়েছে। ব্যাণ্ড ব্যাগপাইপ, গণ্ডাখানেক কাঁসর ঘণ্টা—মানুষের কলকল শব্দ বেশ জোর!

—ওঃ, এ যে বেশ ঘটার রথ মনে হচ্ছে! মঞ্জরীও উসখুস করে উঠল।

গোরাবাবু হেসে বললে—দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে না কি?

—তা হচ্ছে বইকি। প্রোপ্রাইট্রেস হয়ে তো মন কান চোখের মাথা খাই নি!

—তা যান না।—রীতুবাবু বললে—দেখে আসুন; ছেলে মানুষ, ইচ্ছে হবে বইকি। যান।

—আমাকে ছেড়ে দিন মাস্টারমশাই। বংশী অনুনয় করে উঠল।

মঞ্জরী বারান্দায় দরজা পর্যন্ত চলে গিয়েছিল, সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে—গোপালীদের পাঁচ টাকা বাড়ল, ওদের চার টাকা করে দিন। কি বংশী?

—তাই হল। তাই অনেক। আমি তো কিছু চাইই নি। তাই হল। আমি চলি তা হলে।

গোপাল ম্যানেজার ধমক দিয়ে বললে—একে বলে গিয়ে রথ পালায় নি। সই দে।

—এসে দোব। না হয় পরে দোব।

—না। আজ রথের দিন।

—তবে টিপছাপ। সই করতে আমার অনেকক্ষণ লাগবে।

ওদিকে রাস্তায় ক্ষণে ক্ষণে মানুষের উল্লাস কলরব করে ফেটে পড়ছে। বারান্দায় মেয়েরা হিহি করে হাসছে। যাত্রাওলা বংশীর অন্তরাত্মা সকালের আলোর ছটায় খাঁচার পাখীর মতই ছটফট করছে।

রীতুবাবু গোরাবাবু দুজনেই হাসলে। বংশী টিপ দিয়ে চলে গেলে রীতুবাবু বললে—চলুন, আমরাও যাই।

বলতে গিয়ে হেসে ফেললে সে।

বুড়ো গোপালও ছটফট করছিল, তবু কাজ ফেলে যেতে পারছে না বেচারা। রীতুবাবু গোরাবাবু গেলেও সে যেতে পাবে না। সে হাঁকলে—কে রয়েছে হে বাইরে? শুনছ? কিন্তু কোন সাড়া এল না। গোপাল আবার হাঁকলে—আরে, সব চলে গেলে না কি?

গোরাবাবু হঠাৎ আবৃত্তি করতে সুরু করলে—

> কে দিবে উত্তর? ডেকে ডেকে মিছে তুমি ভাঙ কণ্ঠস্বর।
> মরজগতের ছোট সুখে ছোট দুঃখে উৎফুল্ল কাতর—
> নহে এরা অমৃত পিয়াসী—নবীন সন্ন্যাসী!

তোমার অমৃতমন্ত্র, সে নহে ওদের লাগি !
অমৃতের অধিকারী তুমি যাও আপনার পথে।
ওরা সাড়া নাহি দিবে।

রীতুবাবু গোরাবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—দাঁড়ান, দাঁড়ান। এ পার্ট আমি করেছি মশায় !

গোরাবাবু বললে—কোথায় করলেন ? এ তো যাত্রাদলে হয় নি। পড়ন্ত স্টারে হয়েছিল, তাও আট-দশ রাত্রির বেশী চলে নি। 'মারে'র পার্ট। বুদ্ধদেবকে মার বলছে।

রীতুবাবু বললে—হ্যাঁ মশায়। মৃত্যুপথযাত্রী ওরা— তারপর মনে নেই। এক রাত্রি অ্যামেচারে করেছিলাম। ধরেছিল ছোকরারা। স্টারেও দেখেছি।

গোরাবাবু আবৃত্তি করলে—

মৃত্যুপথযাত্রী ওরা—মৃত্যুভয়ে সদাই কাতর—
তবুও মোহান্ধ জীব মৃত্যুর বিলাস নৃত্যে ;
মদির উল্লাসে মৃত্যু নেচে চলে নূপুর বাজায়ে—
রতিরাগে গান গায় ; হাতে তার সুরাপাত্র
সে ছুটেছে আপনার আঁধার আলয়ে।
এরা ছোটে পিছে পিছে—
বহ্নিশিখা প্রলুব্ধ পতঙ্গ সম—
উন্মত্ত অধীর।
ফিরে যাও হে সন্ন্যাসী ফিরে যাও।
তোমার আহ্বানে ওরা দিবে নাকো সাড়া।

আবৃত্তি শেষ করে গোরাবাবু বললে—এই বইয়ে অ্যামেচারে আমার হাতেখড়ি। বুদ্ধদেব সেজেছিলাম।

বলতে বলতে মন্থর পদক্ষেপে দুজনে বারান্দার দিকে এগুচ্ছিল। গোপাল ঘোষ ততক্ষণে বাক্স খাতা বন্ধ করে চাবিটা হাতে নিয়ে সিঁড়ির দরজার মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্বদিকের দোতলার বারান্দায়

মেয়েরা খিলখিল করে হেসে উঠল। শোভার হাসি সবার থেকে উঁচু পর্দায়। সে ঘাড় ফিরিয়ে ঘরের দিকে মুখ করে বললে—ও রীতুবাবু, হাতী সেজে নাচছে!

—একটা না দুটো?

—একটা।

—তা হলে পালিয়ে এস শীগগির। জুড়ির জন্যে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।

সকলে হেসে উঠল। প্রোপ্রাইট্রেস মঞ্জরী পর্যন্ত। গোপালী শোভাকে বললে—হল তো?

শোভা হারে না—অন্ততঃ সহজে হারে না। সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে—তার থেকে চল না দুজনে নেমে যাই; ধরাধরির হাঙ্গামাও হবে না—ওদেরও তিনটে হবে।

গোপালী খিল খিল করে হেসে উঠল। মঞ্জরী মুখে কাপড় চাপা দিয়ে মৃদুস্বরে বললে—বহুৎ আচ্ছা শোভাদি!

রীতুবাবু জবাব দিতে যাচ্ছিল কিন্তু দেওয়া হল না, সেই মুহূর্তটিতেই গোপাল ঘোষ সিঁড়ির মুখ থেকে ফিরে এসে ঘরে ঢুকল যাত্রাদলের প্রবীণ গাইয়ে যোগামাস্টার এবং আর একজন ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে। যোগামাস্টার কথা বলতে বলতে ঘরে ঢুকল—কই, মা কই? শুভ মহরতের দিনে যোগানন্দ—। এই যে কত্তা, যোগানন্দ বায়না নিয়ে এসেছে বাবু। এই যে রীতুবাবু মাস্টারমশাই। শোভাদিদি, প্রোপ্রাইট্রেস। সপ্তরথী হাজির। আমি বায়না এনেছি।

উল্লাসে আত্মগৌরবে যোগামাস্টারের বড় বড় কালো দাঁতগুলি বিচিত্র হাস্যশোভায় বেরিয়ে পড়ল।

উদ্যোগের প্রথম দিনেই বায়না সত্যই অপ্রত্যাশিত; খুশী হওয়ারই কথা। শুধু তাই নয় মানুষের মন এর মধ্যে শুভ লক্ষণ আবিষ্কার করে নেয়। সে গোরাবাবু থেকে বংশীমাস্টার—আশা পর্যন্ত। প্রায় সকলের হাতে বা গলায় গ্রহকবচ বা আঙুলে গ্রহের

আংটি আছেই। ঘর থেকে বাইরের বারান্দা পর্যন্ত সকলেই ঘরের দিকে মুখ ফেরালে। কথাবার্তা পর্যন্ত কয়েক মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। প্রসন্ন প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে এ ওর মুখের দিকে তাকালে। একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আভাসের ছটা যেন সকলের মুখের উপর পড়েছে।

গোপাল ভদ্রলোকটিকে বসিয়ে বললে—বায়না কোথায় কবে বলুন।

—ঝুলনে, ঝুলনে। লিখুন দু রাত্রি বায়না—

—তুমি থাম যোগামাস্টার। ওকে বলতে দাও।

—আমি থামব! উনি বলবেন?

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে যোগা গাইয়ে বললে—বেশ, তাই বলুন। উনিই বলুন। বলুন মশায়। ছোট ম্যানেজারের হুকুম।

ভদ্রলোকটি বাংলাদেশের জমিদারী সেরেস্তার কর্মচারী শ্রেণীর লোক, পোশাকে চেহারায় এদের যে ছাপটি পড়ে তার সঙ্গে যাত্রাদলের কর্তাদের অন্ততঃ বেশ পরিচয় আছে। ভদ্রলোকটি বললেন, রতনপুরে জমিদার বাড়িতে—

যোগামাস্টার কথাটা পুরণ করে দিলে—বর্ধমান জেলা—আমদপুর কাটোয়া লাইনে পাঁচুন্দি স্টেশনের সন্নিকটেই, বুয়েচেন এই মাইল দেড়েক পথ—হ্যাঁ দেড় মাইল। ওখানকার সরকারবাবুও জমিদার, বুয়েচেন প্রাচীন জমিদার; হালে আবার যুদ্ধের বাজারে প্রচুর কামিয়েছে ছেলেরা; সে বলব কি বুয়েচেন সে একেবারে টেণ্ডাই-মেণ্ডাই ব্যাপার—। কি রকম জমিদারী সেরেস্তার লোক মশাই আপনি! আমিই যদি সব বলব তবে আপনি কি বলবেন? বলুন ইদিকে তো সেখানে হাঁকডাকের সীমে নেই। বুয়েচেন—সে যত হাঁক তত ফর ফর করে খোলায় খই ফোটার মতন বাক্যি! ইদিকে গোপালবাবু বলছে—তুমি থাম। বলুন—

ভদ্রলোক হেসে বললেন—ওসব কথা অর্থাৎ বাবুদের অবস্থা টাকা

কত এসব কি আমি বললে ভাল হয়? আপনি বলছেন সেই তো ভাল লাগছে। আপনার বলা হলে বাকীটা আমি বলব।

রীতুবাবু পকেট থেকে সিগারেট বের করে যোগাবাবুকে দিয়ে বললে—নাও, ধরাও দিকি।

—সিগারেট! জয়জয়কার হবে আপনার! বুয়েচেন কিনা—

—সে পরে। এখন সিগারেট ধরিয়ে ওই বারান্দায় গিয়ে একটু কাশো দিকি। কথা বলবার অবকাশ পাবে না। যাও।

—বেশ তাই যাই।

যোগামাস্টার গাঁজা খায়, বিড়ি খায়; কিন্তু সিগারেট খেলেই কাশি ওঠে। তখন মনে হয় লোকটা বোধ হয় দম বন্ধ হয়েই মরবে। তবু সিগারেট কেউ দিলে সে না খেয়ে পারে না। কিন্তু আসরে নামবার তিন ঘণ্টা আগে থেকে যোগামাস্টার আলাদা যোগামাস্টার। আসরে নামবার আগে শুধু একবার গাঁজা খেয়ে—বাস—আর ধূমপানে নাই। মুখে সিগারেটটা ধরে যোগা বললে—ঘোড়ায় চাপালেন—তা চাবুক মেরে দেন। অর্থাৎ দেশলাই জ্বেলে দিতে বললে সে।

—চল, বারান্দায় চল।

—তার মানে বুয়েছি, বুয়েচেন কিনা—সরাচ্ছেন আমাকে। তা চলুন।

গোরাবাবু বললে—ঝুলন কোন তারিখ গোপালবাবু?

ভদ্রলোক বললেন—২৪শে শ্রাবণ। শুক্রবার। ইংরেজী ১০ই আগস্ট। দু-রাত্রি বায়না। যোগাবাবু ঠিক বলেছেন—বাবুর ছেলেরা যুদ্ধের বাজারে প্রচুর কামিয়েছেন—এবার পাকা নাটমন্দির করলেন। এখনও চুনকাম হচ্ছে। সেই নাটমন্দিরে ঝুলনে যাত্রার সংকল্প।

যোগাবাবুর রতনপুরে এক শ্বশুরবাড়ী—প্রথম বিয়ে ওখানে। এখনও মধ্যে মধ্যে যান। কর্তাবাবু নিজে বাজাতে পারেন ভাল, যোগাবাবু গাইয়ে—সেই সূত্রে ওর সঙ্গে জানাশোনা। আপনাদের

দলের নাম তো জানাই বটে। তার উপর যোগাবাবু খুব বলেছেন, এবার আপনারা খুব তোড়জোড় করে দল করছেন। এখন কী নেবেন বলুন।

গোপাল ঘোষ এবার কলমটা তুলে নিয়ে বললে—কোথা নামতে হবে? কত ভাড়া বলুন দিকি?

—ভাড়া! বড় রেলে বরাবর গেলে—গঙ্গাটিকুরীতে নামলে ভাড়া কম—দু টাকা তিন আনা। এদিকে রাস্তা একটু বেশী। তার উপর বর্ষার সময় তো। গঙ্গার ধার—

—হ্যাঁ, বৈষ্ণবের দেশ। ভক্তিমতী মাটি। হাসলেন গোরাবাবু।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। পাঁচুন্দি হয়ে পথ কমও বটে, রাস্তাটাও একটু ভাল। আমরা গাড়ীও দোব। সে কর্তা বলেছেন—মেয়ের দল বলে গাড়ী থাকবে। দু তরফাই গাড়ী পাবেন। তার উপর মাছ কাঠ হাঁড়ি যা বটে!

গোপাল কাগেজে অঙ্ক কষে বললে—ভাড়াতেই তো তিন শো টাকা। পঞ্চাশজন লোক দলে।

বারান্দায় যোগাবাবু কাশতে কাশতে কুঁজো হয়ে গেছে—তার মধ্যেও সে একটা হাতের পাঁচটা আঙুল দু বার দেখাতে চেষ্টা করতে লাগল। অর্থাৎ হাজার টাকা! হাজার টাকা!

দেওয়ালের ধারে বসা গোপাল ঘোষের নজর বারান্দার দিকেই ছিল। যোগাবাবুর ইসারাটা তার নজর এড়াল না। সে গোরাবাবু কিছু বলবার আগেই বললে—পাঁচ শো টাকা রাত্রি না হলে তো পোষাবে না! এবার দল আমাদের ভাল করেই করেছি। মাইনে সব বেশী বেশী। বুঝেছেন।

ভদ্রলোক বললেন—সে কথা যোগাবাবু বলে এসেছেন। তাই না হয় পাবেন। কিন্তু ঠাকুর প্রণামী কিছু দিতে হবে মশায়। সেটা এই পুরোহিত-পরিচারক-চাকর-বামুন-দেবোত্তরের কর্মচারীরা পাবে।

—সে পঁচিশ টাকা দেব আমরা।

—আজ্ঞে না। ঘাড় নাড়লেন ভদ্রলোক।—সে বেশ শক্ত ঘাড় নাড়া, শতকরা পাঁচ টাকা।

রীতুবাবু এগিয়ে এল—চল্লিশ টাকা—

—আজ্ঞে না। বারান্দার জানলায় দাঁড়িয়ে যোগামাস্টার কাশতে কাশতেই বললে—ওই পঁচিশ। ক্যানে খ্যাঁচ খ্যাঁচ করছ ঘোষাল? তুমি পাঁচ টাকা আপোসে লিয়ো। হ্যাঁ, যাও আর বেশী বকিয়ো না। বায়না যা দেবে তা থেকে সে পাঁচ টাকা আগাম বরং কেটে নাও।

কাশির মধ্যে এতগুলো কথা বলে যোগাবাবুর মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। ভদ্রলোক বোধ করি সেই কারণেই বললেন—বেশ, বেশ, তাই হল—আপনি থামুন মশাই! নিন লিখুন—বায়না—আড়াই শো।

নোটের বাণ্ডিল নামিয়ে দিয়ে বললেন—দুখানা একশো—বাকী দশ। আমাকে পাঁচটা টাকা দেন। আর আপনাদের ফর্ম দিন সই করে দি। রসিদ টিকিট দিয়ে সই করে দিন। জমিদারী সেরেস্তার ব্যাপার!

মঞ্জরী অপেরার প্রথম বায়না হয়ে গেল শুভ রথযাত্রার দিন; শুধু তাই নয় দলের মহরতের দিন। মঞ্জরী পুজোর টাকা তুলে রাখলে বায়নার টাকা থেকে। দলও মোটামুটি ওই দিনই গড়ে উঠল। গোপাল খাতায় সব নাম লিখলে।

প্রোপ্রাইট্রেস—শ্রীমতী মঞ্জরী দেবী

ম্যানেজার—পরিচালক—শ্রীবিজয় চক্রবর্তী

অ্যাঃ ম্যানেজার কার্যাধ্যক্ষ—শ্রীগোপাল ঘোষ

সঙ্গীত শিক্ষক—শ্রীযোগানন্দ ঘোষাল ও নৃত্য শিক্ষক ড্যান্সিং মাস্টার—বংশী দাস

যন্ত্রসঙ্গীত ও তবলা ইত্যাদি—ভূদেব ঘোষ ও হরিহর সাঁই।

ক্ল্যারিওনেট ও বাঁশের ফ্লুট—রমেশ বোস ও শিবপদ হাজরা

বেহালা—হরেন দাশ, হরু মাস্টার ও ভবেশ পাল

করতাল মন্দিরা—পিণ্টু ঘোষ ও মন্মথ সিং

বেশকারী—শিবু নিকারী ও রাধাচরণ সাঁতরা

প্রম্পটার—রণজিৎ পাল

আসরের যোগানদার—বিপিন হালদার

সাজঘরের ও বাসার চাকর—হরু মহাপাত্র

ঠাকুর—হরিদাস যদুনন্দন দাস

অভিনয়াংশে—শ্রীমতী মঞ্জরী দেবী, শোভা দেবী, গোপলীবালা, আশা—

গোরাবাবু বললে—কুমারী নায়িকার পার্টের মেয়েটির নাম অলকা দেবী। দেখা তো যাক এই আসরে—যদি সুবিধে না হয় ঝুলনে গাওনার পর বাদ দিয়ে দেওয়া যাবে। তবে নাচে ভাল, মডার্ন নাচ। আমি দেখি নি তবে শুনেছি। আর বাবুল বোস কমিক অ্যাক্‌টর—বাবুল বোসই লেখ।

যোগামাস্টার এবার সুযোগ পেয়ে বললে—বললে নয়, বলেই চলল—আমার মাইনে কিন্তু বাড়ার ওপরে বাড়বে কত্তা। বুয়েচেন, কথার খড়কাঠ অনেক পুড়িয়েছি। মায়ের বক্তৃতার কথা, গানের কথা সে আর ফুরোয় না। বুয়েচেন—তখন বলে—আচ্ছা হে আচ্ছা, এবারই দেখছি কেমন তোমার মঞ্জরী মা! এবারই এই ঝুলনে। বাস—হুকুম হয়ে গেল; বুয়েচেন—এক হাঁক! দেবোত্তরের নায়েব। শোন নায়েব, ঝুলনে মঞ্জরী অপেরার যাত্রা হোগা। নায়েব বলে, দাদাবাবুরা বলছিলেন বীণাপাণি কিংবা—। অমনি এক হুঙ্কার—বুয়েচেন তো তখন আমি বেশ তরিবৎ করে তিন কল্কে ফুঁকিয়েছি। সেই ঝোঁকে—হুঙ্কার। কভি নেহি—মঞ্জরী অপেরা। আমি বললাম, তাহলে কত্তা রথের দিনই লোক চলুক আমার সঙ্গে। ওই দিন বুয়েচেন—দলের মহরৎ। ও মশায় ওই দিনই বায়না হয়ে যাবে।

তো তাই হুকুম হল। বললে, এ দল নিশ্চয় ভাল দল। রথের দিন যাত্রা সুরু। খুব জমবে। জয়জয়কার হবে। বলে বললে, জান তো এই রথের দিন পৃথিবী সৃষ্টি হল। আমার ঠাকুরমা বলতেন, মিথ্যে হতে পারে না। নারায়ণ বললেন, রথে চড়বেন। বিশ্বকর্মা রথ বানাও কিন্তু রথ চলবে কোথা? বোলাও ব্রহ্মাকে। ব্রহ্মা, আমি রথ চড়ব, জায়গা চাই। তৈরি কর। ব্রহ্মা কি করবেন পৃথিবী তৈরি করে দিলেন। রথ চলল—পৃথিবীও চলতে লাগল। মঞ্জরী অপেরা চলবে—খুব চলবে। বুয়েচেন, আমিও বলছি চলবে। বুয়েচেন—আমার মশাই সাধক নীলকণ্ঠ মশায়ের কাছে যাত্রাদলের হাতেখড়ি! বারো বছর বয়সে রাখালবালক সাজতে ঢুকেছিলাম। মুকুজ্জে মশাই বলতেন—বুয়েচেন—কিনা যোগানন্দ—

রীতুবাবু বললে—তুমি এবার থাম যোগানন্দ। মাইনে তোমার চার টাকা বেড়েছে। হুকুম হয়ে গেছে। এবার নীলকণ্ঠ মশাই রাখ।

চার

রতনপুরের বুড়ো সরকার কত্তার কথা হয়তো সত্যি, রথের দিন অত্যন্ত শুভ যাত্রার পক্ষে, হয়তো এই দিনটিতেই এই পৃথিবী সৃষ্টি হয়ে চলতে সুরু করেছিল—নারায়ণ জগন্নাথ রূপ পরিগ্রহ করে মানুষে টানা রথও সেই প্রথম দিন থেকেই চলে আসছে। কিন্তু পৃথিবী যে কক্ষপথে চলে সে কক্ষপথে রতনপুর অঞ্চলের মত প্যাচপেচে কাদা নেই, মহাপ্রভুর রথের পথ পুরীতে সমুদ্রতটে বালির উপর—সেখানেও কাদা নেই। মঞ্জরী অপেরার লোকজন যাত্রার পালা শেষ করলে খুব উৎসাহের সঙ্গে, গাওনা খুব ভাল হয়েছে। ধন্য ধন্য পড়ে গেছে। কিন্তু পালা শেষ করে মুখের রঙ তুলে বাবুদের ঠাকুরের ঝুলনের প্রসাদ—লুচি বেগুনভাজা কুমড়োর

ছক্কা আর বোঁদের মিঠাই খেয়েই স্টেশনে ফেরার পালা আসতেই সব উত্তাপ হিম হয়ে গেল।

ভোর হয়ে এসেছে। কিন্তু আকাশে ঘন মেঘ। বাদলার হাওয়া বইছে রিমিঝিমি—বৃষ্টিও সুরু হয়ে গেছে। মেঘ কাল থেকেই আকাশে ঘুরছে কিন্তু বৃষ্টি হয় নি ভোর বেলা পর্যন্ত। গাওনা ভালোয় ভালোয় হয়ে গেছে সে বোধ হয় বাবুদের ঠাকুরের দয়ায় আর বাবুদের কপালে। এখন এ বাদলা বৃষ্টি যাত্রাদলের লোকেদের কপালের দোষ। বের হতে হবেই, ছটায় পাঁচুন্দিতে ট্রেন। সে ট্রেন ফেল হলে ট্রেন আবার নটায়। এ ট্রেনে গেলে কাটোয়ায় বদল করে একটার মধ্যে হাওড়া পৌঁছান যাবে। নটায় গেলে সন্ধ্যে হয়ে যাবে হাওড়া পৌঁছতে। ওঠো ওঠো সব—উঠে পড়। গোপাল ম্যানেজার হাঁকছিল। গরুর গাড়ি চারখানা এসেছে। আসবার সময় গাড়ি ছিল বারোখানা। তুখানায় মালপত্তর, বাকী দশখানায় চার পাঁচ জন ছ জন করে প্রায় সবই কুলিয়ে গিয়েছিল। ঠাকুর চাকর বেশকারীরা এসেছিল মালের গাড়িতেই মালের উপর চেপে। এও ওই বুড়ো কত্তার দয়া বল, মহানুভবতা বল—যাই বল তাই। নইলে সব লোকের জন্যে গাড়ি এ যাত্রার দলের ভাগ্যে বড় জোটে না। কিন্তু সৌভাগটা সে সময় না হয়ে এ সময় হলেই ভাল হত। সে ছিল সকাল বেলা, এ হল ভোর রাত্রি—শরীর ক্লান্ত হয়ে গেছে। তার উপর কাঁচা ঘুম থেকে উঠেছে সব। যাত্রার পালা আরম্ভ আজ দেরীতেই হয়েছিল, ঝুলন পার্বণ শেষ হওয়ার পর ভোগ শেষ হয়ে আসর বসেছিল এগারটায়। চার ঘণ্টা লেগেছে পালা শেষ হতে। তারপর ছিল প্রসাদ খাওয়ার পালা। বাবুরা বায়নার সর্তের বাইরে রাত্রে ঠাকুরের প্রসাদ লুচি মিষ্টির সঙ্গে বেগুন ভাজা আর কুমড়োর ছক্কা বানিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। না হলে সেই রাত্রে সব আবার 'ফিলিটে' 'ফিলিটে' রান্না চড়াত। যাত্রার দলের অধিকাংশ দলেই রাত্রে দল থেকে রান্না হয় না, প্রতি আসামী অর্থাৎ অ্যাক্টরকে খোরাকী দেওয়া হয়; সে খোরাকী আগে তু আনা

দশ পয়সা থেকে দশ আনা বারো আনা নেহাত ছ-চার জনের ষোল আনা অর্থাৎ একটাকা পর্যন্ত ছিল, এখন সেটা ক্রমে ক্রমে বাজারের সঙ্গে বেড়ে অবশেষে যুদ্ধের বাজারে ছ আনা থেকে দেড় টাকা পর্যন্ত হয়েছে। খেয়ে ভরাপেটে বা অ্যাক্‌টিং করতে করতে খেয়ে পরিশ্রম কেউ করে না। বারণ আছে। কে বারণ করেছে কেউ জানে না তবে খেয়ে অ্যাক্‌টিং যারাই করেছে তারাই অল্পদিনে অক্ষম হয়ে পড়েছে। অধিকাংশেরই না কি হাঁপানী হয়েছে; সে হাঁপানী হয় পেটের গণ্ডগোল থেকে। আর পালাগানের শেষে রান্নার হাঙ্গামা ও ঝঞ্ঝাট বেজায়।

প্রবীণ যারা তারা বলে নিশি ভোর! তখন যায় খেতে, রান্না যা হয় তাও পিণ্ডির সামিল। তাই খোরাকী ভাল। খোরাকী নিয়ে ছোট মাঝারি বড় অ্যাক্‌টর মিলে এক একটা ছোট দল বেঁধে স্টোভ জ্বেলে রান্না করে নেয়। যত অল্পে হয়। কাদেরও রুটি কাদেরও পরটা তার সঙ্গে ছুটো ভাজা একটু গুড় বা মিষ্টি—বাস্‌। কেউ কেউ মুড়ি চিঁড়েতেই সারে। এই দলগুলির নাম ফ্লিট বা ফিলিট; কে কবে সৃষ্টি করেছিল তার খোঁজ কেউ রাখে নি।

ইতিহাস ওদের নেই—কেউ লেখে নি, লিখবে না। সভ্য কলকাতায় ওদের খোঁজ কেউ করে না—ওরা সেখানে ব্রাত্য। ওদের আসর কলকাতার বাইরে—বর্ধিষ্ণু গ্রামে—ছোট শহরে। কলকাতা মহানগরীর বাইরে যে মানুষগুলির আসল তৃষ্ণার্ত আত্মা গঙ্গাহীন দেশের গঙ্গাজল প্রত্যাশী শিবের মত রুক্ষ ধূসর জটা ও দেহ নিয়ে পাঁচালীতে বর্ণনা করা শিবের মত খালে বিলে খ্যাপার মত কাদা ঘেঁটে বেড়ায়, তারই মাথায় গঙ্গাজল ঢালবার জন্য এই ব্রাত্য মজুরের দল কাঁধে ভার নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। শুধু গঙ্গাজল ঢেলে মানুষের তৃষিত আত্মাকে শীতল করে বিদায় নিয়ে ওরা চলে যায়, সম্বন্ধ শেষ—কে ওদের খোঁজ রাখে। সুতরাং ফিলিট নাম সৃষ্টির খবরও কেউ রাখে না। ওরাও রাখে না। ওরা নিজেরা আবার আরও বিচিত্র। অনেকে অনেক

সময় মনিঅর্ডার ফর্ম লিখতে বসে ভাবে স্ত্রী বিভার পুরো নামটা বিভাবতী না বিভারাণী? ছেলে ঘঁটের ভাল নামটা কি দেওয়া হয়েছিল যেন? তবে ঝুলনের রাত্রে ফিলিটের রান্নার হাঙ্গামা থেকে পরিত্রাণ পেয়ে খুশী মনেই খেতে বসে কারুর কারুর হাত দু-এক মুহূর্তের জন্য থেমে গিয়েছিল বইকি! যোগাবাবুর একটা কথা মনে পড়েছিল—সে তখন কণ্ঠমশাইয়ের দলে। সদ্য যুবা বয়সে জুড়ি সাজছে। বাসাটা ছেড়েছে। প্রথম বিয়ে আগেই হয়েছিল, তখন সদ্য দ্বিতীয় বিয়ে করেছে। বউকে ঘরে রেখেই গান করতে এসেছিল মানকরে। সেবার মানকরে মেয়েরা কণ্ঠমশাইকে টিট্‌কিরি দিয়েছিল। কণ্ঠমশাই আসরে নেমে কৃষ্ণকে সামনে দাঁড় করিয়ে গান ধরেছিল—

পুরুষ কোথায় মান করে?
মেয়েই দেখি মান করে।

আসরেই গান বেঁধে সুর দিয়ে গাইতে পারতেন তিনি। এই গান শুনে মানকরের পুরুষেরা মেয়েরা লজ্জা পেয়েছিল আর খাতির করেছিল খুব। রাত্রে সে দিন তারা লুচি কদমা—মানকরের কদমা, মিষ্টি খাইয়েছিল। মানকরের বিখ্যাত কদমা গোটাকয়েক যোগানন্দ পকেটে পুরে এনেছিল বউয়ের জন্য। আজও খেতে বসে সে দিনের কদমা পকেটে পোরার কথা মনে পড়েছিল। নাটুবাবুরও মনে পড়েছিল বাচ্চা ছেলেগুলোর কথা। সে মনে-পড়া দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গেই উড়ে গিয়েছে। না গিয়ে উপায় কি? খেয়েদেয়েই যাবার পালা যে! দুঃখ উঁকি মেরেই ভয়ে পালিয়েছে। লজ্জাও পেয়ে গেছে। যার মনে দুঃখ উঁকি মেরেছে, সে নিজেই ঝাঁটা মেরে তাড়িয়েছে।

যোগাবাবুই বলেছে খাওয়ার সময়—লে রে বাবা, খেয়ে লে গবগবিয়ে। কাঁচা না পাকা গরম না ঠাণ্ডা দেখতে হবে না। বলে এই রাত তিনটে—এস্টোভ নিয়ে খচোখচো করতে হল না—পয়সা খরচ নেই—খেয়ে লে। নিয়ে সেজেগুজে যে যেথা পারিস দেয়ালে-মেয়ালে ঠেসান দিয়ে আধ ঘণ্টার চটকা মেরে লে। হ্যাঁ!

কে যেন একজন বলেছিল—লুচিগুলো একেবারে কাঁচা।

বড় বড় রথীদের খাবার জায়গায় অবশ্য বুড়োবাবুর লোক হাজির ছিল। সেখানে পাকা লুচিই পড়েছে। তা ছাড়া সবই ওদের মদের মুখ।

খাওয়া সেরে ঘণ্টাখানেক পর থেকেই গোপালের হাঁক উঠেছে—ওঠো ওঠো। সব উঠে পড়। গাড়ী এসে গেছে। বিপিন, শিবু, রাধাচরণ, ঠাকুর, হরু, রাতু মাস্টারমশাই, নাটুবাবু, যোগা-মাস্টার, শিউনন্দন, ওরে—

কর্তা অর্থাৎ গোরাবাবুকে ডাকতে গোপাল ম্যানেজারের ঠিক সাহস হচ্ছে না। গোরাবাবু ট্রেন থেকেই কেমন চুপচাপ গম্ভীর হয়ে আছে। সে শিউনন্দনকে ডাকলে।

* * *

শোয় নি কেউই। শ্রাবণ মাস, বর্ষার গুমোট, দেওয়ালে বিছানায় ঠেস দিয়েই শোওয়ার কাজটা সেরে নিচ্ছিল। একটু বিশ্রাম। কিন্তু এই অবস্থাতেই নাক ডাকছিল অনেকের। কলকাতার বড় যাত্রার দলের একটা মৌখিক সর্ত থাকে—অন্ততঃ তুখানা ঘর দিতে হয়। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণদের মত বড় অ্যাক্টরদের জন্য আলাদা ঘর এবং বাকী সকলের জন্যে একখানা বড় ঘর দিতে হয়। মেয়েযাত্রার দলের জন্য তিনখানা লাগে—একখানা মেয়েদের জন্য। রতনপুরের কত্তাঠাকুর বাড়ীর লাগোয়া মস্ত একখানা খড়ো বাংলা বাড়ী ছেড়ে দিয়েছিলেন। পাঁচখানা ঘর—তু-পাশে তুটো বারান্দা। ঘরগুলোও ভাল, পাকা মেঝে, মাটির দেওয়াল হলেও চুনকাম করা পাকা বাড়ীর মত। বাড়ীখানা নতুন তৈরি উচ্চপ্রাইমারী মেয়ে ইস্কুল। সচ্ছল জায়গার জন্যে সকলে বেশ ছড়িয়ে থাকতে পেয়েছিল। মঞ্জরী এবং গোরাবাবু একঘরে, রীতুবাবু নাটুবাবু মণিবাবু আর নতুন কমিক পার্টের অ্যাকৃটর বাবুল বোস এক ঘরে। শোভা আশা গোপালী আর নতুন মেয়ে—অলি দাশ এক ঘরে।

বাকী দুখানা ঘরের একখানা হল এবং আর একখানা ছোট ঘরে বাকী সব লোক—সে প্রায় পঁয়ত্রিশ চল্লিশ। কিন্তু ওতে তাদের কোন অসুবিধে হয় নি—গোয়াল ঘরের মত ঘরেও গাদাগাদি করে রাত কাটাতে হয়। কত রাত্রি রেল স্টেশনে, মুসাফের খানায়, শীতের রাত্রিতে র্যাপার কি কম্বল মুড়ি দিয়ে প্রায় গাদি মেরে পড়ে থাকে। অসুবিধা যা হবার হয়েছে বাবুল বোস, আর অলি দাশের। ওরা নতুন। এর আগে যাত্রাদলে কখনও বায়না গাইতে বের হয় নি। লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়ে যারা একালে কলকাতায় অ্যামেচার থিয়েটারে পার্ট করে—সিনেমাওয়ালাদের কাছে ঘুরে বেড়ায় এরা তাদের দলে। অলি দাশ সকালে উঠেই মুখ ধুয়ে চুলে বুরুশ বুলিয়ে মুখে পাউডারের ছোপ আর ঠোঁটে লিপস্টিক না মেখে বাইরে বের হয় না। বেচারা বিছানায় ঠেস দিয়ে দু হাতের বাঁধনের মধ্যে হাঁটু গুঁজে রেখে আধ-শোয়া হয়ে বসে আছে—পাছে ঘুমিয়ে পড়ে।

শোভা গোপালী আশা বাঁধা বিছানার উপর দিব্যি শুয়ে ঘুমুচ্ছে। মাথা ঝিম ঝিম করছে অলি দাশের। মনের মধ্যে অস্বস্তি এবং বিরক্তিরও সীমা নেই। ওঘরে বাবুল বোসেরও অবস্থা অলকা বা অলি দাশের মতই। তারও যাত্রার দলে মফস্বলে নতুন। দু চারটে কলকাতার আসরে সে পার্ট করেছে যাত্রার দলে। কিন্তু মফস্বলে যাত্রার দলের অবস্থা ঠিক সে ধারণা করতে পারে নি। আই-এ পর্যন্ত পড়েছে; পড়তে পড়তেই নবনাট্য আন্দোলনের টানে এসে পড়েছিল এবং নামও করেছিল অল্পদিনের মধ্যে। তারপর পরীক্ষায় ফেল করে ভাইদের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে একেবারেই ভেসে পড়ল এতে।

বাবুল নিজেই সেদিন রীতুবাবুকে বলেছিল—বুঝলেন স্যার, বেড়িয়ে পড়েছিলাম বেদব্যাসের মত বিপুল তেজে। ব্যাসদেব কাশীর গঙ্গাপার এ পারে এসে নতুন কাশী স্থাপন করবেন বলে

তপস্যা করতে বসেছিলেন জানেন তো! তা ব্যাসের তপস্যা নিষ্ফল তো হতে পারে না। কিন্তু ছলনাময়ীর ছলনা—। ব্যাস কাশী হল ঠিক—কিন্তু ছলনাময়ীর ছলনায় ব্যাস কাশীতে মরলে অ্যাস হওয়াই স্থির করে দিলেন ব্যাস নিজেই। অ্যাস আর ব্যাস মিল আছে কিন্তু মানের তফাত বুঝুন। অ্যাস মানে গাধা—ব্যাস মানে মহাকবি—নাকি স্বয়ং ভগবান। ভেবেছিলাম থিয়েটার মাতিয়ে দেব হোল ক্যালক্যাটা, ফিল্মের মধ্যে দিয়ে হোল বেঙ্গল। তা ছাড়া ডাবল এইচ, হাউস হর্স, মানে বাড়ি গাড়ি! বাট্—ওই অ্যাস। অ্যাস মানে যে বেলুন তা জানতাম না। মাই খোদা; সব ফট ফট করে ফেটে গেল!

রীতুবাবু হেসে বলেছিল—বাহাবা ব্রাদার! বেশ কথা বলেন আপনি। কিন্তু ঘাবড়াবেন না। দুনিয়ার কারখানায় একদিকে গাধা পিটে ঘোড়া হয়, আবার অন্যদিকে ঘোড়াকে বোঝা বইয়ে পিটে পিটে গাধা বানায়। ভাবছেন কেন? অহীন্দ্র চৌধুরী মশায় যাত্রায় হাতেখড়ি নিয়েছিলেন। ছবি বিশ্বাস যাত্রায় পার্ট করেছেন। অবশ্য পেশাদারী নয়। কপাল আপনারও খুলতে পারে। আর না খোলে, আমাকে দেখুন। অসুখী মনে হয়? যদি হয় তবে বলব, আপনার ভুল। আমি সুখী।

বাবুল বলেছিল—ওয়াণ্ডারফুল! প্রথম দিনই আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়ে নি। আপনাদের দলের নিয়ম মাস্টারমশাই। আমি বলব, বিগ ব্রাদার। চেহারাতেও বিগ, সম্মানেও বিগ, বয়সেও বিগ—মানে অনেক বড়। দেখি একটু ফুটডাস্ট, দেখি!

রীতুবাবু বলেছিল, ওঁর সঙ্গে কি সম্বন্ধ পাতিয়েছ? ওঁর সঙ্গে তো আগে থেকেই আলাপ।

—ওঁর সঙ্গে সম্বন্ধ আমার পাতানো আছে। ওঁকে আমি মাই লর্ড বলি।

গোরাবাবুর বাড়িতে বসেই এসব কথা হয়েছিল—ওই রথের দিন।

অ্যাপয়েন্টমেণ্ট অনুযায়ী বাবুল অলকাকে নিয়ে এসেছিল গোরাবাবুর বাড়ি।

হেসে গোরাবাবু বলেছিল—ওকে আমি বলি দিলদার। কপালে হাত ঠেকিয়ে গোরাবাবু আবার বলেছিল—ডি. এল. রায়ের অমর চরিত্র। কিন্তু অলকা, তোমার কেমন লাগছে ?

অলকা চুপচাপ বসেছিল। কণ্ট্রাক্টে সই করে সে যাবার সময় বলেছিল—ভালই লাগছে আমার।

গোপাল ঘোষের ডাক শুনে বাবুল এতক্ষণে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে উঠে বসল। রীতুবাবুকে ডাকলে—শুনছেন স্যার। বিগ ব্রাদার !

রীতুবাবু চোখ বুজেই হেসে বললে—হুঁ। গোপাল ডাকছে বুঝি ! জয়তারা ! বলে উঠে বসল রীতুবাবু। একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে—তোমার ঘুম হয় নি বুঝি ?

—মাই ঈশ্বর ! এই অবস্থায় ঘুম ? এই বিছানায় ঠেস দিয়ে অ্যাণ্ড ফর্টি ফাইভ মিনিটের ঘুম !

সিগারেটে বেশ জোরে এক টান দিয়ে রীতুবাবু বললে—হবে, অভ্যেস হয়ে যাবে। তারপর থুত্‌নি চুলকাতে চুলকাতে বললে—ওঃ এই এক রোগ, এই দাড়ি ! দশঘণ্টা না যেতেই করকরে হয়ে উঠবে আর চুলকোবে।

তারপর আবার বললে—আমরা এতেই ঘুমুতে পারি। শরীর একটু ঝরঝরে হয়ে যায়। কই, বোতলটা কই ? এখন একটু খেলেই ফের চাঙ্গা। এবং ঘুম এসে যাবে। নাক ডাকবে।

বাবুল বললে—ওঃ, এর মধ্যে নাক ডাকিয়ে ঘুম ! যেন মাস্টার্ড অয়েল দিয়ে ঘুম ! মাই খোদা !

ওদিকে নাটুবাবু মনিবাবু রমণী নাগ একে একে উঠে বসে আড়ামোড়া ছাড়তে শুরু করে দিলে। বাবুল বললে—আমার যা

'কোরোধ' হচ্ছিল না বিগ ব্রাদার ; ইচ্ছে হচ্ছিল, র-নস্যি খানিকটা নাকে ঢেলে দি !

খি—খি শব্দে হেসে সারা হয়ে গেল রীতুবাবু।

—নিন, বোতল নিন। খুঁজছিলেন।

গোরাবাবু এসে ঢুকল—উঠেছেন ? ক্লান্ত গম্ভীর গোরাবাবু।

—নিশ্চয়। এ কথা কেউ না বলতে প্যারে না। মুচকে হাসলে রীতুবাবু। তারপর বললে—ঠিক উত্তরটি দিতে হবে।

গোরাবাবু ক্লান্তির মধ্যেই হেসে বললে—আমি বলতে পারি। না হলে—একটু থেমে বললেন—কি বলব এবার ? এটা চিতোরের প্রান্তভাগও নয়, তিনজন তুর্কী সেপাইও আড়ালে উদ্যানে প্রবেশ করে নি।

—ফুল মার্ক পেলেন দেবতা। সেই কোন্ কালে অ্যামেচারে পদ্মিনী হয়েছিল, আমি গোরা করেছিলাম। আপনিও পদ্মিনীতে পার্ট করেছেন নাকি ? মনে তো আছে ঠিক ! কিন্তু স্যার, আপনার শরীর কেমন বলুন দেখি ?

বাবুল বোস অবাক হয়ে শুনছিল এদের কথা। গোপাল ঘোষ এসে ভগ্নদূতের মত দাঁড়াল—চারখানার বেশী গাড়ি আসে নি বাবু। তাও দুখানাতে টাপর, বাকী খোলা। আকাশে মেঘ। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। পথ যেতে হবে দেড় মাইল।

বাবুল এবার বলে উঠল—উইদাউট গাড়ি পাদমেকং ন গচ্ছামি। বলে দিন আমরা যাব না। লোকজনকে শুয়ে পড়তে বলুন। য—তো সব—

গোরাবাবু রীতুবাবুকে বললে, আসুন মাস্টারমশাই, দেখি।

চলুন।

দুজনে চলে গেল। বাবুল বোস বললে, মাই খোদা ! এরা যে বিনা বাক্যব্যয়ে দেখি বলে চলে গেল ! ব্যাপার কি ? হেঁটে যেতে হবে না কি ? আমি যাব না।

মণিবাবু রমণী নাগ এতক্ষণ ধরে নিরাসক্তের মত সিগারেট টানছিল। নাটুবাবু আপন মনে নিজের স্যুটকেস খুলে সিগারেটের ছুটো প্যাকেট অন্ততঃ দশবার ঢুকিয়ে বের করে, বের করে ঢুকিয়ে এটা ওটা নেড়েচেড়ে গোছাবার কাজেই মগ্ন ছিল, যেন এসব কথায় তার কিছু যায় আসে না। এবার বাবুল বোসের কথার উত্তরে বললে—ভাববেন না, আপনার গতি একটা হবে। নতুন লোক, লেখাপড়া জানা লোক—দলে এ কেলাস—

—রাবিশ। আমি যেন শুধু নিজের জন্যেই ভাবছি! মেয়েরা, বাচ্চা ছেলেগুলো—! গাড়ি না এলে আমরা কেউ যাব না। রমণী নাগ হেসে বললে—সকালে বাবুদের দারোয়ান এসে বলবে, যাও নিকালো।

—যাও? নিকালো? বললেই হল? ট্রেন নেই যাব কোথায়?

—যে দিকে ছু চক্ষু যায়!

—বটে? খাব কি?

—মাঠে চরে খাও গে। অনবুঝের মত কথা বলছেন যে! ওদের সঙ্গে ছুদিনের বায়না—সে হয়ে গেছে। আর থাকতেই বা দেবে কেন? খেতেই বা দেবে কেন?

—মাই খোদা! ঈশ্বরো আল্লা তেরে নাম, এই বিচার?

—যে বিয়ের যে মন্ত্র মশাই; যাত্রার দলের এই বটে!

ওদিক থেকে যোগাবাবুর ক্রুদ্ধ চীৎকারে সব কথায় ছেদ পড়ে গেল। যোগামাস্টার চেঁচাচ্ছে—আজ্ঞে না না—আমি যাব না, আপনি কার্যাধ্যক্ষ আপনি যান। ওঃ, ভারী গরজ আপনার! এ ভোর রাত্রে সব শুয়েছে—আমি গাড়ি গাড়ি করে ঘুম ভাঙাতে গিয়ে পেহার খাই! গরজের পা মাথার ওপর, তুমি যাও যোগামাস্টার!

একটু ওদিক থেকে বোধ হয় মঞ্জরী গোরাবাবু যে-ঘরে ছিল, সেই ঘর থেকে গোরাবাবু ডাকলে শোনা গেল—ঝগড়া করবেন না গোপাল মামা। ওতেই হয়ে যাবে।

গোরাবাবুর কণ্ঠস্বর সর্বময় কর্তৃত্বের ওজনে ভারী—উঠে পড়তে বল সব। চাকরদের বল মাল গাড়িতে তুলুক। কি করবে, উপায় কি!

* * *

চারখানা গাড়িতেই রওনা হল দল। নইলে উপায় কি? একখানা টাপরওয়ালা গাড়িতে মেয়েরা পাঁচজন, অন্য টাপরওয়ালা গাড়িতে পোশাকের বাক্স—তার উপর বাবুল বোস বসেছে। বৃষ্টি পড়ছে, হঠাৎ বৃষ্টি প্রবল হলে পোশাক ভিজে নষ্ট হবে। বাবুলের পাশে ঢুকেছে নাটু আর দুটো ছোট বাচ্চা। একখানা খোলা গাড়িতে রাশিকৃত ছোটবড় মাল তার সঙ্গে দলের বাসন-কোসন, তীরধনুক, তলোয়ার ঢালের বাণ্ডিল বাক্স। তারই মধ্যে ঠাঁই করে বসেছে গোরাবাবু আর রীতুবাবু। অন্যটায় বাকী ছেলেগুলো আর গোপাল। বাকীরা সেই মেঘলা ভোরের আলোর মধ্যে হেঁটে চলেছে। যোগা-মাস্টারও হাঁটছে। যোগামাস্টারকে গোপাল গাড়িতে উঠতে দেয় নি। যোগানন্দ বলেছে, কুছ পরোটা নাই বাবা। যোগামাস্টার এটুকু পথ গণ্ডুষে মেরে দেবে। ব্রাহ্মণ সন্তান—পুজো করার আগে চা ছাড়া কিছু খায় না—জল পর্যন্ত না। অগস্ত্য মুনির বংশ—বিন্ধ্য পর্বত হেঁটে মেরে দিই আমরা।

আপন মনেই বকে চলেছে যোগাবাবু। অন্য সকলে প্রায় চুপচাপ। এই ভোরবেলা ঘুনি ঘুনি বৃষ্টির মধ্যে, সারারাত্রি পরিশ্রমের পর চলেছে সব একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে। আকাশের মেঘ ঘুনি ঘুনি বৃষ্টির স্পর্শ দু-পাশে রোয়া জমির ধানের উপর বাতাস বওয়ার শিরশির শব্দ কিছুর সঙ্গেই ঠিক তাদের যোগ নেই। তাদের অনেকের কানের পাশে এখনও সঙ্গতের সুর বাজছে। কারও বা নাটকের কোন বিশেষ অংশ ভাসছে মনের মধ্যে। সুরেন গরাঞী দূত অনুচর ইত্যাদির পার্ট করে—সে হাঁটছিল একেবারে পথের ধার ঘেঁষে, হঠাৎ একটা কাদাভরা গর্তে পা ঢুকে একেবারে নির্ঘাত আছাড় খেয়ে পড়ল।

দলের লোকেরা হৈ-হৈ করলে না। শুধু বললে—পড়লি? ওঠ্।
কয়েকজন দাঁড়াল। বাকী সব চলতেই লাগল। সুরেন খুব অন্যমনস্ক ছিল, বেচারা দূতের পার্ট করছে অন্ততঃ দশ বছর, তবু মধ্যে মধ্যে পার্ট ভুল করে গাঁজায় বেশী দম দিয়ে। গতকাল রীতুবাবু রাজা ছিল, তার সামনে এসে তার বলবার ছিল—এই পুষ্পমাল্য আর এই তরবারি। কি লইতে চান?

রীতুবাবু তরবারি নিয়েছিল নাটকের নির্দেশ মত। মালাখানা ফেলে দিয়েছিল। সুরেনের মালাটা উঠিয়ে নিয়ে চলে আসবার কথা, কিন্তু কি ভুল হয়ে গেল তার মালাটা তুলে নিয়ে নিজের গলায় পরে চলে এসেছে। রীতুবাবু সামলে নিয়ে বলেছিল—ঠিক করেছিস। ও মাল্য শৃঙ্খল—প্রভুর প্রতিভূরূপে পরিলি গলায়। যা যা—দূর হয়ে যা। আসরে কেউ ধরতে পারে নি কিন্তু সাজঘরে রীতুবাবু ডেকে বলেছে—ওটা কি হল? অ্যাঁ? ক টান গাঁজা খেয়েছিস? আচ্ছা যা, কলকাতায় ফিরে হবে।

সেই কথাই ভাবছিল সে। চাকরিটা গেলে কি করবে সে!

যোগাবাবু দাঁড়িয়েছিল, যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের সঙ্গে। সুরেন উঠতেই বললে—আক্কেল কি কোন কালে হবে না? পথের ধার দিয়ে হাঁটছ? হুঁঃ!

বলেই ঘুরে পিছন ফিরে বললে—বুয়েচ হে, ফকীর অধিকারী মশায়ের দলে ঢুকেছি তখন কণ্ঠ মশায়ের দল ছেড়ে এসে। বুয়েচ কিনা, পথ হাঁটতে গিয়ে হুঁচোট খেয়েছিলাম। ওই একপাশ দিয়ে হাঁটছিলাম—তা তিনি বলেছিলেন, যোগানন্দ একটা কথা শিখে রাখ, বুয়েচ কিনা।···কি কথা কর্তা? না শোন। "দলের মাঝে মাঝে যাবা। বোঁচকা বালিশ বগল দাবা। হিসেব করে করবে নেশা। তবে নেবে যাত্রাওলা পেশা।" মাঝে মাঝে মাঝখান বরাবর যাবে, কেন? না, পড়লে ধরবার লোক থাকবে। মাঝবরাবর পথটাই

ভাল থাকে। পিছনে পড়লে কেউ দাঁড়াবে না। আগে তো যেতেই নেই, পথে সাপখোপ যা থাকবে তাকেই ডংশাবে কামড়াবে। আর বোঁচকা বালিশ সঙ্গে রেখো—গোলমাল হবে না। তা ছাড়া বাসাতে উঠেই মনের মত ঠাঁইটি দখল করতে পারবে।

দল নিঃশব্দে হাঁটছে। বংশী সকলের পিছনে, তার পিছনেই আসছে গাড়ি চারখানা। প্রথমেই আছে মেয়েদের গাড়ি। বংশী মধ্যে মধ্যে ফিরে তাকাচ্ছে গাড়ির দিকে। সামনেই বসে আছে মঞ্জরী। তারপর অলকা। তারপর শোভা। তারপর গোপালী এবং আশা। সকলেই ওরা ঢুলছে। নইলে বংশী তাকাতে সাহস করত না, চোখোচোখি হত মঞ্জরীর সঙ্গে। বংশী দেখছে অলকাকে। মেয়েটা ভাল নাচে। নেচে ও তারিফ পেয়েছে। দোষ মেয়েটা মাথায় খাটো আর গানের গলা ভাল নয়। আশা গোপালী নাম দিয়েছে 'খাপচোমুখী', কে বলছিল বাংলা পাঁচমুখী; হ্যাঁ মেয়েটার কপালের নিচেই নাকের গোড়া থেকে চোখের কোণ পর্যন্ত একটা খাঁজ আছে, তার জন্যে নাকটা ডগার দিকে একটু উঁচুও বটে কিন্তু বংশীর মনে হয় মেয়েটার যা চটক বা বাহার তা ওইখানে। আশা তার লম্বা গড়নে পায়ের কাজে মেরে দেয়। এ মেয়েটার সারা দেহ নাচে। তালে খামতি আছে, সে শুধরে যাবে। তবে বড় দেমাক। কাল বংশী ওকে বলেছিল খাসা নেচেছেন। মেয়েটা শুধু 'ধন্যবাদ' বলে সাজঘরে গিয়ে ঢুকেছিল। অবাক হয়েছে বংশী। শুধু একটি কথা বলে কথা শেষ করে দেওয়ার কায়দাখানা বটে। থাকো থাকো—নাচের পার্ট করবে—বংশীবদন ড্যান্সিং মাস্টারকে ডিঙিয়ে যাবে কোথা? ঢুলছে মেয়েটি। শুধু ও মেয়েটি কেন—সব ঢুলছে।

একটু পাশ কেটে সরে দাঁড়াল বংশী। পকেট থেকে শিশি বের করে দু ঢোক খেয়ে নেবে!

ওদের গাড়ির পিছনে সাজের বাক্সের টাপর দেওয়া গাড়িতে বাবুল বোস নাটুবাবু মণি রমণী নাগ ঢুলছে। ঢুলছে নয় ঘুমুচ্ছে। বংশী

জানে ওই ঢুলুনির মত ভঙ্গিটা ঢুলুনি নয়, গরুর গাড়ির চাকার পাকের ঝাঁকিতে ঢুলুনি। বাবুল বোসের কথা জানে না, নতুন এসেছে। কিন্তু নাটুবাবুরা নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। হাসি এল, বাবুল বোস টাপরের একখানা বাখারি চেপে ধরেছে। পড়ে যাবার ভয়ে। ওদের পিছনে গোপাল ঘোষ বাচ্চা কটাকে নিয়ে চেপেছে। ব্যাটা বুড়ো ; মরণও নেই—নিতু বলে ওই একটা ছেলেটাকে নিয়ে ছি-ছি-ছি। নিজের কোলে মাথা রাখিয়ে শুইয়েছে! নিজের মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে। ওর পরেই খোলা গাড়িতে বাকী চারটে ছেলের সঙ্গে রীতু মাস্টার-মশাই আর খোদ কর্তা। ওঃ, এঁরা জেগে আছেন মনে হচ্ছে! হ্যাঁ, রীতুবাবু কিছু বলছেন—কর্তার মুখের সিগারেটের আগুন চমকে চমকে উঠছে। রাস্তার ধারে বসে পড়ল বংশী। নইলে, কর্তা বলবেন না কিছু কিন্তু রীতু মাস্টারমশাই গলা ঝাড়া দিয়ে রসালো খোঁচা দিয়ে বলবেন, হুঁ-হুঁ-হুঁ—শ্রীমান বংশীবদন বুঝি? পিছু হাঁটছিস কেন রে! তার থেকে বসে পড়াই ভাল। কোন কথা কেউ জিজ্ঞাসা করবে না। গাড়িটা পাশ দিয়ে যাচ্ছে, একবার মুখ ফিরিয়ে চট করে এক নজর দেখে নিলে। কথা কানে আসছে। কর্তারা কথায় খুব মশগুল। কয়েকটা কথা তার কানে এল। পুব দিক থেকে পশ্চিমে হাওয়া বইছে, গাঁয়ের বাসিন্দে যাত্রার আসামীরা (লোকেরা) বলছে বাজনার বাতাস। বংশী রাস্তার পশ্চিম ধারে বসেছিল, হাওয়াতে কথাগুলো স্পষ্ট ভেসে আসছে। কর্তার গলা। কান খাড়া করলে বংশী। কি? কর্তা কি বলছেন? হ্যাঁ—শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, বলছেন—কি বলব?

রীতু মাস্টারমশায় ভারী গলায় বললে—কি হয়েছে? শুনতে পাচ্ছি।

—কি হবে?

—সে জানলে জিজ্ঞাসা করব কেন? সেই তো জিজ্ঞাসা করছি। মানে, কেমন যেন—

কর্তা বলছেন, কিন্তু শোনা গেল না কথা; গাড়িটা পাশ দিয়ে পার হয়ে বেশ খানিকটা চলে গেছে।

আর শুনতে পেলে না। একবার ইচ্ছে হল, উঠে পড়ে সে চলতে সুরু করে কথাগুলো শোনবার জন্যে। কিন্তু তার থেকেও পকেটের শিশির দ্রব্যের আকর্ষণ বেশী। শরীরটা ভারী মনে হচ্ছে। পৃথিবী যেন ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে পড়েছে। শিশির দ্রব্যটুকু মুখে ঢেলে দিয়ে গলাধঃকরণ করে মুখটা একটু বিকৃত করলে বংশী—তারপর একটি সিগারেট। দেশলাইটি জ্বেলেছে, এমন সময় পোঁ শব্দে বাঁশী বাজল ট্রেনের। ওরে বাবা! ট্রেন আসছে! অনেকটা দূরে অবশ্য—কিন্তু ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছে। বর্ষার দিনের বাদলা ভিজে বাতাসের চাপে ধোঁয়াটা কুণ্ডলী পাকিয়ে আশেপাশে পাক খেয়ে ফিরছে। দে ছুট্—দে ছুট্।

পাঁচ

কাটোয়া স্টেশনে ট্রেন বদল। ছোট লাইন থেকে বড় লাইন। ঘণ্টা দুই বসে থেকে কলকাতার গাড়ি। পথের মধ্যে আসামী অর্থাৎ যাত্রাদলের লোকেদের খাওয়া-দাওয়ার দায়-দায়িত্ব দলের নয়। খোরাকী দিয়ে খালাস। সেই খোরাকী থেকে যার যা খুশি কিনে খাও। 'ফিলিট' ব্যবস্থাও পথে চলে না। কে কোথায় রান্না করে! কোথায় জায়গা—কোথায় জল—কোথ‌‌ ক! বাসন উনোন—সব বোঁচকায় বাঁধা।

যোগাবাবু বলে—আমাদের পলাশবুনির বাবু ছিল, তার বাড়িতে লোক এলে ফেরবার হুকুম ছিল না। তবে বাঁধা ভাতটাত নেহি দেঙ্গা। বলত—চাউল লেও ডাউল লেও বার্তাকু লেও নিমক লেও। যাও—হুই বটতলামে রেঁধে খাও। তা কাঁহা বটতলা—কাঁহা বাজার? এ বাবা নগদানগদি পয়সা লেও, যা খুশি কিনকে খাও।

খাও তো খাও না খাও তো না খাও। না খাও তো পয়সা বাঁচা লেও, গাঁঠমে বাঁধো। দলকা দোষ নেহি।

সোজা বাংলায় বলে—বাবা চিঁড়ে রাখিস, মুড়ি নয়। চিঁড়ে গুড় ব্যস্। গামছায় বেঁধে জলে পুকুরঘাটে চুবিয়ে নিয়ে বসে যা। পাতাও লাগবে না। খেয়েদেয়ে আঁজলা ভরে জল খেয়ে নে এক পেট—একবেলার উপর নিশ্চিন্তি। দম কত চিঁড়ের!

যোগাবাবু কাটোয়া স্টেশনের ওপাশেই যে কূয়োটা সেই কূয়োটার পাড়ে গিয়েও ফিরল। উঁহু, গঙ্গাতীরে এসে কূয়োতলায় যায়? চল্ বাবা গঙ্গার ঘাটে। এক্কেরে চান সেরে চিঁড়ে খেয়ে চলে আসব। ঘাটে কলাও মিলবে। গঙ্গা-যমুনা নিরমল পানি—চল্।

যোগাবাবুর সঙ্গী জুটতে দেরী হয় না। ছোকরা অনেকগুলো জুটে গেল। বয়স্কদের মধ্যেও বেশ কয়েকজন মেতে উঠল। বংশী তাদের মধ্যে অগ্রণী। বংশী একখানা সাইকেল রিক্সা ভাড়া করে আশাকে ডাকলে। চল গঙ্গাচান করে আসি। সঙ্গে সঙ্গে শোভাদি উঠল—ও গোপালী, যাবি নে? কাটোয়ার ঘাটে চানে অনেক পুণ্যি।

দেখতে দেখতে প্রায় গোটা দল। ম্যানেজার গোপাল ঘোষ স্টেশনের উত্তর দিকে যে বাজারটা বসেছে সেই বাজারে একটা চায়ের দোকানে গোরাবাবু, রীতুবাবু, বাবুল বোসদের জন্যে ডিম ভাজাচ্ছিল, গোরাবাবু চা এবং মামলেট আনতে বলেছে। প্ল্যাটফর্মে সাজের বাক্সগুলো পেতে ওদের একটা আড্ডা বসেছে। ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাস ওয়েটিংরুমের বারান্দার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বুজে বসে আছে গোরাবাবু। রীতুবাবু বাবুল কথা বলে যাচ্ছে, সিগারেট খাচ্ছে; গোরাবাবু মধ্যে মধ্যে এক একটা কথার জবাব দিচ্ছে যাতে বোঝা যায় সে ঘুমোয় নি। হয় ক্লান্তিতে এমন চোখ বুজে বসে আছে কিংবা কিছু ভাবছে বা মনটা কোন আঘাত খেয়েছে, অভিভূত হয়ে রয়েছে। মঞ্জরী ওয়েটিংরুমের স্নানঘরে ঢুকেছে স্নান করতে।

অলকা বসে আছে, সে মুখ হাত ধুয়ে ওয়েটিংরুমের ভিতরে একখানা চেয়ারে ঘুমিয়েছে।

গোপাল ঘোষ ছুটে এল গোরাবাবুর কাছে—দল বেঁধে সব ছুটছে বাবু গঙ্গার ঘাটে। যোগাবাবু হুজুগ তুলে দিয়েছে। এর পর আর ট্রেন ধরা যাবে না। তার ওপর কে কোন দিকে যাবে নিপাত্তা হয়ে, খুঁজতে জান নিক্‌লে যাবে। আপনি বারণ করুন।

নিমীলিত চোখেই গোরাবাবুর ভুরু কুঁচকে উঠল। বললে—কি বিপদ!

রীতুবাবু বললে—ভাববেন না স্যার, দু ঘণ্টা সময় কম নয়। দিব্যি ফিরে আসতে পারবে।

গোপাল ঘোষ বললে—মাস্টারমশাই, শুধু গঙ্গাচান করে ফিরবে ভাবছেন?

রীতুবাবু বললে—না, তা ভাবছি না ম্যানেজার সাহেব। আমি ভাবছি অনেক দূর। শহর দেখা থেকে বাজার করা—এমন কি পাঁচআইন পর্যন্ত। কিন্তু বাঁধ ভেঙে জল বেরুতে শুরু করলে সে কি আর রোখা যায়? ও যাবে না!

বাবুল বোস দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমন্ত ব্যক্তির মতই নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল, হাতের আঙুলে ধরা সিগারেটটা ধোঁয়ার শিখা তুলে পুড়েই যাচ্ছিল। অকস্মাৎ সে সোজা হয়ে বসে বললে—আই প্রটেস্ট—আই অপোস! এবং সিগারেটটা আছড়ে ফেলে দিয়ে বললে—ডিসিপ্লিন গন্‌ তো এভরিথিং গন্‌। গোরাবাবু, রীতুবাবু, সব চলে যাবে স্যার। যোগামাস্টারটার জট ধরে ঘোরাব আমি। চলুন গোপালবাবু। গঙ্গাস্নানে যাবে! চালাকি পেয়েছে!

উঠে পড়ল বাবুল বোস।

গোরাবাবু এবার চোখ মেলে ক্লান্তকণ্ঠে বললে—দু ঘণ্টা পরে আর একটা ট্রেন আছে। সেইটেতেই না হয় যাওয়া যাবে বাবুলবাবু। ওরা যখন বেরিয়ে পড়েছে যাক।

তাঁর কণ্ঠস্বরে বাবুল, রীতুবাবু, গোপাল সকলে এক মুহূর্তে কেমন হয়ে গেল। এমন কণ্ঠস্বর গোপাল বা রীতুবাবু কখনও শোনে নি। বাবুলের সঙ্গে পরিচয় অল্প হলেও তারও মনে হল—এ কণ্ঠস্বর গোরাবাবুর হতে পারে না। উগ্র গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় গোরাবাবু, পিঙ্গল তীক্ষ্ণ নেত্র গোরাবাবু—যার দীর্ঘ পদক্ষেপের শব্দে এবং মাপে একটা গম্ভীর বড়মানুষীপনা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, যার ভরাট কণ্ঠস্বরের হাসিতে, কথা এবং বাচনভঙ্গীতে সাধারণ মানুষ একটা সম্ভ্রমবোধ না করে পারে না, সেই কণ্ঠস্বর এই হতে পারে না। এ তো ক্লান্তির অবসন্নতায় দুর্বল নয়, এ যেন কেমন ভেঙে-পড়া মানুষের কাঙালপনায় অসহায় এবং বিষণ্ণ।

রীতুবাবু বাবুলকে বললে—থাক ভাই বোস, থাক। বসো।

গোরাবাবু আবার চোখ বন্ধ করে বললে—আপনি বরং সঙ্গে যান ওদের গোপালবাবু। চলুন—আমিও যাচ্ছি। বিপিনকে বলুন একখানা রিক্সা ডেকে রাখুক। আপনি চলে যান। বলবেন গঙ্গার ঘাট থেকে সকলকে একসঙ্গে ফিরতে হবে।

এ কথায় কারুর সন্তুষ্ট হবার কথা নয়, অনেক প্রশ্ন এবং প্রতিবাদ উঠবার কথা কিন্তু কেবল গোরাবাবুর ওই কণ্ঠস্বরের বিষণ্ণতার জন্যই কেউ কোন কথা বলতে পারলে না। চুপ করেই রইল। গোপাল নিঃশব্দে চলে গেল ; রীতুবাবু অকারণে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, বাবুল বোসের মত প্রগল্‌ভ মানুষও অসহায়ের মত দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বুজলে।

কয়েক মিনিট পর বিপিন চাকর এসে দাঁড়াল—বাবু! রিক্সা এসেছে।

গোরাবাবু চোখ মেললে—এসেছে ? শিউনন্দন !

শিউনন্দন ওয়েটিং রুমের দরজায় মঞ্জরী এবং গোরাবাবুর বিছানা স্যুটকেস বাস্কেট পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে এসে দাঁড়াল। গোরাবাবু বললে—ওঁর হয়েছে ? দেখ্। হয়ে থাকলে বল—আমি

ডাকছি। আর আমার কাপড় গামছা একখানা তোয়ালেতে জড়িয়ে দে।

শিউনন্দন বললে—হামি পানিওয়ালাকে বলিয়েসি পানি দিয়ে দিবে। এখুনি দিবে?

—না, আমি গঙ্গাস্নানে যাব।

—গঙ্গাকে পানি বর্ষাকে টায়েম—উ তো বহুত সা ঘোলা হোবে।

—তা হোক। তুই ওকে ডেকে দে।

বাবুল আর সামলাতে পারলে না। বলে উঠল—রাবিশ! কি হল আপনার স্যার? সেই কাল রাত্রি থেকে কি হয়ে গেছেন?

গোরাবাবু উত্তর হয়তো দিত না। কিন্তু দিত কি দিত না—সে কথার মীমাংসা হবার আগেই মঞ্জরী এসে দাঁড়ল। সেও সবিস্ময়ে বললে—তুমি গঙ্গাস্নানে যাবে?

গোরাবাবু তার কণ্ঠস্বর শুনে চোখ মেলে বললে—এই যে! একটা কথা বলছিলাম।

—বল। কিন্তু—

—আগে শোন। উঠে দাঁড়াল, বললে—শোন। একটু দূরে গিয়ে মঞ্জরীকে কি বলতে লাগল। বাবুল বোস স্বাভাবিক কৌতূহল বশেই ওদের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। রীতুবাবু কিন্তু চোখ বুজে দেয়ালে হেলান দিলে। মিনিট কয়েক ঘুম—ঘুম না হোক চোখ বুজলেই মিনিট কয়েক বিশ্রামই লাভ। বললে বলে—ভায়া, সংসারে একটা কথা আছে চোরের ঘুম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। চুরি করতে গিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুম। তু মিনিট একদিন যোগ দিয়ে ঘণ্টা পুরিয়ে নেওয়া। আমাদের এও তাই। তিন মিনিট চোখ বুজে এক মিনিট ঘুম। অভ্যেস হয়ে গেলে তিন মিনিট চোখ বুজলে তু মিনিট শিশুর ঘুম। বার ত্রিশেক চোখ বুজলেই এক ঘণ্টা। বলতে বলতেই চোখ বন্ধ করলে, স্তব্ধ হল।

বাবুল ঠেলা দিয়ে ডাকলে—রীতুবাবু!

—কি ?

—ঝগড়া লেগেছে।

—লাগুক, মিটে যাবে। চোখ ফিরিয়ে নাও। দেখতে নেই।

—ডাকছে। আপনাকে।

—আমাকে ? চোখ মেললে রীতুবাবু। দেখলে সত্যিই মঞ্জরী তার দিকেই তাকিয়ে আছে। তার দৃষ্টিতে আহ্বান রয়েছে। রীতুবাবু উঠে গেল। বিপিন চাকরের পিছন পিছন চায়ের দোকানের ছোকরা তুজন কেৎলী করে চা, চারটে প্লেটে ডিমের ওমলেট, সিঙাড়া নিয়ে এসে দাঁড়াল। বাবুল বোস নিজের প্লেটটা টেনে নিয়ে খেতে সুরু করে দিলে। ক্ষিদে পেয়েছে। দলের লোকেরা ছোট চাকুরের দল দিব্যি মুড়ি, চিঁড়ে নিয়ে কূয়োর ধারে বসে যাওয়ার সময় থেকে ক্ষিদেটা চাগিয়ে উঠেছে তার। অপেক্ষা সইল না আর। আর অপেক্ষাই বা কিসের ? নিজের নিজের পয়সায় খাওয়া। কেউ কারুর অতিথি নয়, কেউ গৃহস্থ নয়। দাম দিয়ে খাওয়া—তাও খেয়ে গরম গরম। প্লেটটা ঠেনে নিয়ে বিপিনকে বললে—দেখ তো অলির চানটান হল কি না। সে আবার কি খাবেটাবে জিজ্ঞাসা কর। আর এনে দে। মেয়েটা নতুন। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ? অ্যাঁ ?

বিপিন হেসে ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ। ঠিক তখনই ফিরে এল রীতুবাবু, ওদিকে গোরাবাবু আর মঞ্জরী তুজনে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে চলে গেল। বাবুল বোস মুখে খানিকটা মামলেট পুরে চিবুতে চিবুতে বললে—কি ব্যাপার বিগ ব্রাদার ? কর্তা সত্যিই গঙ্গাচানে গেলেন পশ্চাৎ পশ্চাৎ গডেস লক্ষ্মীর মত গিন্নী ?

—ওঁরা গঙ্গাস্নানে গেলেন তুজনেই। দে বাবা, প্লেট দে। একটা মামলেট তিন ভাগ কর। এক ভাগ এঁকে—এক ভাগ আমাকে, আমারটার সঙ্গে আর একটায় একটা আর এক ভাগ।

বাবুল বোস বললে—মানে ?

—মানে ওঁরা খাবেন না। গিন্নীর খাবার চা অলিকে দিতে বললেন, কত্তারটা তিন ভাগ করে তুমি আমি অলি তিনজনে।

—কিন্তু তার তো একটা মানে আছে!

—আছে। কিন্তু—

—নো কিন্তু স্যার অ্যাণ্ড নো কিন্তু! স্ট্রেট সিম্পল সোজা সরল ভাষায় বলুন সেটা কি?

—কত্তার অশৌচ হয়েছে। অশৌচ বোঝ তো?

—ইয়েস, ইয়েস। নো তেল নো শেভিং, আগে তো নো ফিস, ইভেন নো পেঁয়াজ। আবার বাবা মা মরলে নো শু। নো জামা। গলায় কাছা। হাতে কম্বলের আসন নিয়ে ঘোরা।

—হ্যাঁ তাই।

—তা মরলটা কে? ওর আবার আছে কে?

—নাও ঠ্যালা। ওঁর কেউ থাকতে নেই নাকি? আছে বা ছিল, নিশ্চয় ছিল। কেউ মরেছে নইলে অশৌচ হবে কেন? এবং অশৌচ যখন হয়েছে তখন কেউ না মরলেই বা চলবে কেন এবং যে মরেছে সে নিশ্চয়ই গোরাবাবুর খুব আপনার কেউ ছিল।

—মাই খোদা—বাই পরমেশ্বর—ইউ আর এ প্রফেসর বিগ ব্রাদার!

—নাও, এখন খেয়ে ফেল। চা জুড়িয়ে যাচ্ছে। মামলেট শক্ত হলে রস মিলবে না। এই যে অলকা এসেছে। নাও এগুলো তোমার জন্যে। খেয়ে ফেল।

অলকা এসে দাঁড়াল। সদ্য স্নান করে তাকে বেশ সজীব দেখাচ্ছে। ভদ্র ঘরের শিক্ষিতা এবং ফ্যাশনদুরস্ত মেয়ে সে—হাজার ক্লান্তি বা কষ্টের মধ্যে তার ফ্যাশন এবং স্টাইলের এদিক ওদিক হয় না। বিশেষ করে অভিনয়ের পেশা যখন গ্রহণ করে সে মেয়ে বা পুরুষ যেই হোক তখন তার দৃষ্টি এদিকে প্রখর চেতনায় জাগ্রত থাকে। কোন নাটকে যেন আছে না খেয়ে মর খেদ করো না কিন্তু বাওয়া, মরবার আগে যেন টেরী ঠিক থাকে এটা দেখো। নইলে গো

টু হেল। অর্থাৎ ফল নরকে পতন। টেরী ঠিক থাকলে স্বর্গে যাও বা না যাও গন্ধর্ব বা কিন্নর লোক বাস রোখে কে! সে অভিনেতা যারা তাদের ছোট থেকে বড় পর্যন্ত; চর অনুচর থেকে খোদ ইন্দ্র পর্যন্ত। সারাটা জীবনই তাই। তবে বুড়ো বয়সে পড়তি খ্যাতির আমলে ব্যতিক্রম অবশ্যই হয়। অলকার উঠতি বয়স। নবীন জীবন। সাজসজ্জা মেক-আপে লিপস্টিক থেকে বেশভূষা কেশবিন্যাসে এতটুকু খুঁত সে রাখে নি। যেটুকু এলোমেলো ভাব আছে সেটাও ফ্যাশন—যাকে বলে যত্নসহকারে অযত্নপনা বা অমনোযোগিতার ভান। সেটা একটা সুচতুর এবং কলাসম্মত ব্যাপার।

অলকা ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললে—আমার জন্যে? আমি তো আজকের খোরাকী নেব বলেছি। আমি তো বরাত দিই নি!

রীতুবাবুই বললে—হায় ভগবান! সংসারে কি শুধুই ইট কাঠ পাথর অলকা। সবুজ ঘাসের নরম মাটি কি নেই?

বাবুল বললে—ব্রিলিয়াণ্ট বিগ ব্রাদার! বলেই বললে—আমারও যে বয়ে বয়ে বানুপ্রাস হয়ে গেল। এ হল কি?

রীতুবাবু বললে—লিখতে লিখতেই সরে বাবুল। অভিনয় করতে করতে নাট্যকার হয়ে উঠবে তার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। কিন্তু খাবার ঠাণ্ডা হচ্ছে অলকা, তুমি খেয়ে নাও।

অলকা ভদ্র ঘরের কন্যা এবং খানিকটা লেখাপড়া শিখে অভিনয়ের আসরে নেমেছে। অপ্রগল্‌ভা সে নয় তবে রীতুবাবুর কাছে প্রগল্‌ভতায় তার ভয়ও আছে এবং কিছুটা ঘৃণাও আছে। সে কথা বাড়ালে না, খাবারটা টেনে নিলে। একটুকরো ডিমের মামলেট মুখে পুরে বললে—বাবুলদা, তোমার বুঝি মাইনে বাড়ল?

বাবুল বললে—হোয়াই দিস কোশ্চেন?

অলকা বোধ করি সঙ্গগুণ-দোষেই বলে ফেললে—তোমার হৃদয়ে সবুজ ঘাস গজিয়েছে!

বাবুল বলে উঠল—গড সেভ বাবুল বোস! গড ইস গুড অ্যাণ্ড

কাইণ্ড টু অল। বি কাইণ্ডার টু বাবুল বোস। মাইনে তার বাড়ুক কিন্তু হৃদয়ে সবুজ ঘাস যেন না জন্মায়। তাহলে তো গো-ওয়েন্ট-গন্। মদ্য খাই তার উপর পদ্য লিখতে ধরব তা হলে। মাইনে আমার বাড়ে নি অলকা এবং সবুজ ঘাস আমার হৃদয়ে মাইনে বাড়লেও গজাবে না, এটা তুমি জেনে রেখো। ভবিষ্যতে ভাল হবে। কয়েক মুহূর্তের জন্য স্নো পাউডার এবং লিপস্টিক মাখা অলকার মুখখানি যেন বিবর্ণতায় বিশ্রী দেখালো। কিন্তু তারপরই রাগে অর্থাৎ ক্রোধে স্বাভাবিকের চেয়েও রক্তাভা তার মুখে সঞ্চারিত হল। সে বললে—থ্যাঙ্ক য়ু বাবুলদা।

কিন্তু এর বেশী কথা সে বলতে পারলে না বা খুঁজে পেলে না।

বাবুল বোস গ্রাহ্যই করলে না, সে পেঁচার মত নির্বিকারভাবে রাত্রির অন্ধকারে ধরা শিকারের মাংস ছিঁড়ে খাওয়ার মতই মামলেট সিঙাড়া খেয়েই গেল।

রীতুবাবু বললে—যাত্রার দলে কিংবা থিয়েটারে এসে বিশেষ জনের হৃদয়ের সবুজ ঘাস খোঁজ কর না অলকা। যার হৃদয়ে ও ঘাস দেখবে সুযোগ পেলেই বসে একটু আরাম করে নিয়ো, তাতেই লাভ। একটু হেসে বললে—ধর ঘাসটুকু আমার এই বুড়ো হৃদয়েই গজিয়েছে।

অলকা বললে—তা হলে কিন্তু আপনি আমার আজ থেকে দাদু। কেমন?

—এগ্রিড। কিন্তু ওমলেট সিঙাড়া চা আমার পয়সায় নয় ভাই। ঠকাতে পারব না। ওগুলো আমাদের যাত্রাদলের মালিক-মালিকানির। মানে গোরাবাবু এবং প্রোপ্রাইট্রেস মঞ্জরীর।

চকিত হয়ে উঠল অলকা। এতক্ষণে তার খেয়াল হল—এখানে তারা তিনজন ভিন্ন গোটা দলের আর প্রায় কেউ নেই বিপিন চাকর এবং চুলওয়ালাদের মধ্যে একজন মুসলমান এবং আর জন চারেক পাকা গাঁজা আফিংখোর ছাড়া আশেপাশে যাত্রাদলের

আর কেউ নেই। এতক্ষণে তার মধ্যে আবার সব থেকে পাকা গাঁজাখোর যোগাবাবুই নেই। অলকা এতক্ষণে মঞ্জরী গোরাবাবুর অনুপস্থিতি অনুভব করলে এবং প্রশ্ন করলে—তাই তো, ওঁরা গেলেন কোথায়? এসব না খেয়ে? আমাকেই বা—

বাবুলের মামলেট শেষ হয়েছিল সে এবার বললে—মাদার গ্যাঞ্জেসে স্নান করতে!

—গঙ্গাস্নান?

—ইয়েস।

অলকা সবিস্ময়ে বললে—গোরাবাবু গঙ্গাস্নানে গেলেন?

বাবুল বললে—বিগ ব্রাদার বলছেন গোরাবাবুর অশৌচ হয়েছে। মানে ফাদার মাদার আঙ্কল ব্রাদার কেউ মরেছে।

—বাবা, মা, কাকা, ভাই?

রীতুবাবু বললে—যাত্রাওলাদেরও ওসব থাকে অলকা। তোমার বাবুলেরও আছে আমারও ছিল। ওরও নিশ্চয় ছিল।

অলকা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর খেতে শুরু করলে। রীতুবাবু দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বুজলে। বাবুল সিগারেট টানতে লাগল। একটুক্ষণ স্তব্ধতার পর অলকা মামলেট সিঙাড়া চা খেয়ে শেষ করে অকস্মাৎ বললে—বাবুলদা!

—কি?

—মঞ্জরী দেবী মানে প্রোপ্রাইট্রেসও স্নান করতে গেলেন নাকি?

—মোস্ট প্রবাব্লি। মানে খুব সম্ভব।

—উনি তো স্নান করেছেন।

—আস্ক ইওর দাদু।

দাদুকে জিজ্ঞাসা করতে হল না, রীতুবাবু চোখ বুজেই উত্তর দিলে—উনি আবার স্নান করবেন। মানে নিয়ম হল—স্নানের পর হলেও শোকের সংবাদ শুনবামাত্র অশৌচ হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে স্নান করতে হয়। তারপর কারুর দশ দিন কারুর পনের দিন কারুর

এক মাস অশৌচ পালন চলে। সে সময় পার হয়ে শুনলে স্নানে শুদ্ধ হয়।

অলকা বললে—কিন্তু উনি তো—

বাবুল বললে—ডোণ্ট মেক বড়্ বড়্ অলকা, কি দরকার ওসব কিন্তু ফিন্তুতে! যত্ত সব—হুঃ।

রীতুবাবু হেসে বললে—তুমি বড় খেঁকী হয়ে উঠেছ লিটিল ব্রাদার!

—হই সাধে? ও কি জিজ্ঞাসা করছে বুঝছেন না?

—বুঝেছি। মঞ্জরী বেশ্যার মেয়ে। ওর অশৌচ কিসের? কিন্তু—

একটু চুপ করে থেকে বললে—ওরা শাস্ত্রমতে বিয়ে করেছে। আর কি জান স্ত্রী হওয়াটা হতে পারার ওপর নির্ভর করে। গোরাবাবু একবার একটা নাটক সুরু করেছিলেন, উর্বশী পুরুরবাকে নিয়ে। তার মধ্যে লিখেছিলেন—নারী মাতা, নারী ভগ্নী, নারী পত্নী, নারী কন্যা—সেই নারী হয় বারাঙ্গনা। বারাঙ্গনা কালিমা কলুষ—তপস্যার গঙ্গাস্রোতে ধুয়ে মুছে লাজাঞ্জলি হোম বহ্নি আতপ্ত রক্তিম তনু লয়ে হে উর্বশী পুরুবংশে পত্নীরূপে করহ প্রবেশ, মোর বংশধরে তুমি করিবে ধারণ।

বাবুল বলে উঠল—বিউটিফুল। মাই লর্ডের এ কোয়ালিফিকেশন তো জানতাম না।

অলকা বললে—সে নাটক প্লে হয়েছে?

—না। নাটকটা কয়েকটা সিন লিখে ছেড়ে দিয়েছেন।

—কেন?

—বলেন, ও যাত্রাতে ঠিক জমবে না।

ঠিক এই মুহূর্তেই গোরাবাবু এবং মঞ্জরী এসে স্টেশনে ঢুকল। তাদের পিছনে শোভাদি, গোপালী, আশা। গোরাবাবুর খালি পা, গায়ে উড়ানী চাদর জড়ানো, পরনে নতুন থান ধুতি। মঞ্জরীর পরনে লালপেড়ে নতুন শাড়ি। গোপালী হাসছে না—আশা শোভা গম্ভীর।

গোরাবাবু স্টেশন প্ল্যাটফর্মের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা সকলে রিক্সাতে এসেছে। লোকজনেরা পিছনে হেঁটে আসছে। তাদের সঙ্গে গোপাল আছে, নাটুবাবু মণিবাবুও আছে। তবু গোরাবাবু দাঁড়িয়ে রইল। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারা কাছে আসতেই হেঁকে বললে—সব স্টেশনে এসে বস। এর পর কেউ বাইরে গেলে ভাল হবে না। আর গোপালবাবু, যারা এখান থেকে বাড়ি চলে যেতে চায় বলে দিন যেতে পারে। দলের নতুন বই আখড়ায় পড়বে পনের দিন পর। সে চিঠি দিয়ে জানাব। মাইনেটা, যারা যারা বাড়ি যাবে, দিয়ে দিন।

গোরাবাবু এসে একটা সাজের বাক্সের উপর একখানা নতুন কম্বলের আসন পেতে বসল। উদাসীনতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে ভদ্রলোক।

একটু দূরে বসেছে মেয়েরা। চুপচাপ বসে আছে। শুধু অলকা এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। ওরা সকলেই ব্যাপারটা জেনে গেছে। শুধু ওরই জানা নেই। বাবুলও চঞ্চল হয়েছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারছে না।

আশা উঠে গিয়ে প্ল্যাটফর্মের ওদিকের লোহার রেলিংয়ের গায়ে গিয়ে দাঁড়াল। বংশী দলের সঙ্গে আসে নি। হঠাৎ গঙ্গার ঘাটে কর্তা গিন্নী গিয়ে স্নান করে নতুন কাপড় পরে উঠল—গোরাবাবু পুরুত ডেকে তর্পণ করলে—সঙ্গে সঙ্গে দলের সব উল্লাস উচ্ছ্বাস যেন মেঘলা সকালের মত ম্লান হয়ে গিয়েছিল। যে যা একটু আধটু হৈচৈ করেছে তা সরে সরে দূরে দূরে। গোপাল ঘোষ আপনা থেকেই কর্তা গিন্নীকে দেখে ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল এবং ওদের এই স্নান ও তর্পণকৃত্যের ব্যবস্থা সেই-ই সব করেছে। সেই-ই মধ্যে মধ্যে এদিকে ওদিকে সকলের কাছে গিয়ে বলে এসেছে—চুপ চুপ, সব চুপ। চুপচাপের মধ্যেই গঙ্গাস্নান এবং সেখানে কিনেকেটে কিছু খেয়ে নিয়েছে তারা। আসবার সময়ও গোপাল ঘোষ শোক

শোভাযাত্রার একটি আবহাওয়া তৈরী করে নিয়ে সকলকে গুটিয়ে বিনা হাঙ্গামায় চলে এসেছে। কেউ পাঁচআইনে পড়ে নি, কেউ ইয়ার্কি দিল্লগী করে নি, এমন কি দোকানে দরদস্তুর নিয়েও চেঁচামেচি করে নি। আসবার সময় মঞ্জরীই বলেছিল—মেয়েদের সব রিক্সা করে দিন গোপালমামা। সব একসঙ্গে চলুক। তাই হয়েছে। এরই ফাঁকে বংশী খসে পড়েছে। আশা জানে সে মদের সন্ধানে গেছে। গোরাবাবু বলেছে—তার জন্যে ভেবো না, সে ঠিক যাবে। আর ট্রেন ফেল হলেও ভাবনা নেই—পরের ট্রেনে চলে আসবে। আশাও যে খুব চিন্তিত তা নয়, বংশীকে সে জানে। তবুও এখানে এসে বারবার মনে হচ্ছে মানুষটা গেল—তা বলে তো যেতে হয়! কি মানুষ! গেলই বা কোথায়? বংশী ঝগড়াটে মানুষ নয়, বেহুঁশও হয় না, তবুও বিদেশ তো! এত দেরী!

অলকা এসে আশার কাছে দাঁড়াল। মাত্র ক'দিন তার এদের সঙ্গে পরিচয়। এরই মধ্যে আশা সম্পর্কে একটা ঘেন্না জন্মে গেছে তার। যে ঘেন্না উঁচু জাতের নিচু জাতের উপর জন্মায় এ সেই ঘেন্না। এবং দলেও সেটা যেন মোটামুটি স্বীকৃত সত্য। আশা নিজেই স্বীকার করে সেটা। এই দুদিনের গাওনাই অলকার এদের সঙ্গে—প্রথম গাওনা এবং পুরোপুরি মেশা। প্রথম দিন দুপুরবেলাতে খাওয়ার জায়গায় আশা এবং বংশীকে একেবারে একপ্রান্তে খেতে বসতে দেখে বিস্মিত হয়েছিল। চর অনুচরের পার্ট করে, মাইনে কম পায় এমন কজন বসেছিল সব থেকে ভাল জায়গায়। সে বসেছিল শোভার কাছে—ব্যাপারটা দেখে সবিস্ময়ে সে শোভাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—আশা ওখানে বসল কেন?

শোভা তার দিকে বিরক্তিভরে তাকিয়ে বলেছিল—কোথায় বসবে তা হলে?

—কেন? আমাদের পাশে!

—মরণ! না, ও ওইখানেই বসবে। তোমার ইচ্ছে হয় যাও না ওর পাশে গিয়ে বস।

কারণটা পরে জেনেছে। যাত্রাদলে খাওয়ার জায়গায় জাতের কড়াকড়ি আছে। বড় পার্ট করে, বড় গাইয়ে—সে জাতে নিচু হলে বসবে আলাদা এবং একটেরে। আশা বংশী তাই। এবং জেনে প্রথমটা ক্ষুব্ধ হলেও পরে মেনে নিয়েছে। অন্ততঃ আশা বংশী সম্পর্কে। জাতের জন্য তত নয়, তবে এত মদ খায় ওরা! এত খারাপ কথা বলে! সব থেকে খারাপ লেগেছিল পরের দিন সকালে আশার কুৎসিত দাঁত মাজা দেখে। আঙুলে গামছা জড়িয়ে সেই দিয়ে সে দাঁত ঘষছিল।

তবে দুজনেই ওরা মানুষ হিসেবে নিরীহ। ঘেন্নার সঙ্গে করুণাও হয়। আশাকে উঠে গিয়ে একলা রেলিংয়ের পাশে দাঁড়াতে দেখে অলকা তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সরাসরি জিজ্ঞাসা করলে-তুমি জান?

—কি?

—কে মরেছে? অশৌচ বলছে না?

—মঞ্জরীদির শ্বশুরবাড়ির কে।

—কে?

—তা জানি নে। তারপরই আশা বললে—কাঁদছেন দেখছ না! চোখ থেকে জল পড়ছে বাবুর! বাবু মানে গোরাবাবু।

ওরা দুজনে সামনাসামনি দাঁড়িয়েছিল—তাতে আশাই দেখতে পাচ্ছিল গোরাবাবুদের। অলকা ওদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল। আশার কথায় ঘুরে সে দেখলে—সত্যিই গোরাবাবুর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। সে কথা বলছে। সে কৌতূহলভরেই এসে ওদের কাছে দাঁড়াল।

গোরাবাবু বলছিল—জানেন মাস্টারমশাই, ক্ষীরোদবাবুর বাদশাজাদী বলে একখানি নাটক আছে—তাতে বাগদাদি খালিফের খুড়ো

নিরুদ্দেশ হয়ে অন্য রাজ্যে গিয়ে দীনদরিদ্র হয়েই বাস করত। কিন্তু হতে পারেন দীন, কিন্তু হীন তিনি নন-। তাঁকেই খুঁজতে বেরিয়েছিল খালিফ। দেখেছেন। কিন্তু খুড়ো বলে চিনতে তখনও পারেন নি। কিন্তু তাঁকে দেখে বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে বলছেন—এ যে আকাশস্পর্শী মিনারের ভূকম্প-ভগ্ন মহিমান্বিত নিদর্শন। ভূমিকম্পে ভেঙে গেছে কিন্তু সেই আকাশস্পর্শী মহিমা—তা যায় নি। আমার দাদু ছিলেন তাই। গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যান—। সর্বস্বান্ত হয়ে গিছলেন। সংসারেও কেউ ছিল না—তবু মাথা নোয়ান নি। আমি যখন মঞ্জরীকে বিয়ে করি তিনি আমাকে ধর্ম অনুসারে আইন অনুসারে ত্যাগ করেছিলেন। আমিও তাঁকে ত্যাগ করেছিলাম। হ্যাঁ—আমি তাঁরই নাতি। কিন্তু হি ওয়াস্ গ্রেট। সে অস্বীকার করতে পারব না। মৃত্যুকালে, তিন দিন আগে তিনি মারা গেছেন। আমার খুড়োরা আমি ত্যাজ্য নাতি বলে খবর দেন নি। তাঁদেরও তিনি কিছু বলে যান নি। কিন্তু গ্রামের কবিরাজ, ডাক্তারি ওষুধ তিনি খেতেন না। গুরুগিরি ব্যবসা ছিল। ওই কবিরাজকে বলে গেছেন—কবিরাজ আমার বাবার বন্ধু ছিলেন, তাঁকেই বলে গেছেন—গোরাকে বলো সে যেন আমাকে ক্ষমা করে। কাল রতনপুরের আসরে নামব—সেজেছি, কবিরাজমশাই এসে আমার সঙ্গে দেখা করে ওই কথাটি বলে গেলেন। কাল থেকেই ভাবছিলাম কি করব। আজ স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে বসে চা-মামলেটের বরাত দিয়ে চোখ বুজে বসে আছি—এদের গঙ্গাস্নানে যাবার কথা বললে গোপালবাবু। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যেন এটা ডাক এল আমাকে। আমার কর্তব্য স্থির হয়ে গেল। হ্যাঁ, আমি আমার কাজ করব। গঙ্গাস্নান করে তর্পণ করে থান পড়লাম, দশদিনে কাজ করব। মাথা কামাব। পিণ্ড দেব। তাতে যা হয় তাই হবে। খুড়োরা দুজন আছে, তারাও পিণ্ডি দেবে। আমিও দেব। মন্ত্রের সঙ্গে পিণ্ডির সঙ্গে বলব—দাদু, তোমাকে ক্ষমা করার কথা ওঠে না। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

রীতুবাবু বললে—পরে হবে স্যার। মানে—

গোরাবাবুর এতক্ষণে খেয়াল হল, তার চারদিকে ছোট একটি জনতা জমেছে। তার মধ্যে দলের লোক বেশী হলেও বাইরের লোকও রয়েছে। চুপ করে আবার চোখ বুজলে এবং অন্যমনস্ক ভাবে জামার পকেট খুঁজলে। রীতুবাবু বললে—সিগারেট—এই নিন।

—দিন। হাত বাড়ালে।

ওদিকে প্ল্যাটফর্মে সোরগোল উঠল। ট্রেন আসছে। গোপাল এসে বললে—আপনার আর গিন্নীর টিকিট সেকেন ক্লাসের কেটেছি। মাস্টারমশাই আপনারও তাই।

বাবুল বললে—আমার ইণ্টার ক্লাসের টিকিট তো। দিন। আমিও ওঁদের সঙ্গে যাব। একসেস ফেয়ার আমি দেব :

ট্রেনে চড়বার সময় নিজের স্যুটকেসটা হাতে করে অলকাও চড়ে বসল।

বাবুল বললে—তুমিও ?

অলি বললে—হ্যাঁ।

বংশী ছুটতে ছুটতে আসছে স্টেশনের বাইরের রাস্তা ধরে। রীতুবাবু হেসে বললে—এ বেটা পংক্ষীরাজ, ঠিক এসেছে ! ওঃ, লম্বা লম্বা পায়ে ছুটছে, না উড়ছে !

অলি খিলখিল করে হেসে উঠল—ওঃ, আশার যা ভাবনা। বেচারা রেলিংয়ের ধারে পথ চেয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ও-গাড়ি থেকে শোভা জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে হাঁকছে—এখানে—এখানে—এখানে।

বংশী গাড়িতে উঠে ধপ করে বসে পড়ে বললে—বাবাঃ, যা ছুটেছি !

আশা বংশী খাবার জায়গায় একপ্রান্তে বসে, কিন্তু ট্রেনে ইণ্টারের ভাড়া পায়। ছোট একখানা ইণ্টারক্লাস ওরা খালি পেয়েছে। শোভা, গোপালী, আশা, নাটুবাবু, রমণী নাগ, মণিবাবু, বংশী আর গোপাল ঘোষ। গোপাল ঘোষ নিজের পয়সায় ওর আদরের বাচ্চা ছেলেটাকে

সঙ্গে নেয়। গাড়িতে ওরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। শোভা স্বচ্ছন্দে প্রায় মনের সুখে খারাপ রসিকতায় ফোয়ারার মুখ খুলে দিলে।

আরম্ভ বংশীকে এবং আশাকে নিয়ে। তারপর গিয়ে পড়ল সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রীদের উপর। প্রধান লক্ষ্য রীতুবাবু। বললে—বলতো নাটু, বংশী বঁড়শীর টানের মাছের মত কাটোয়ার ঘাট থেকে আশার পায়ে ট্রেনে আছড়ে পড়ল তার মানে আছে। তুমি আছ, গোপালী আছে, মানে আছে। ও গাড়িতে মঞ্জরী আছে, গোরাবাবু আছে, বাবুল আছে, ওই ছুঁড়িটা—কুসুমকলি অলি-অলি আছে বুঝলাম। ওই ঢ্যাপসা মিন্‌সে ওখানে ঢুকল কি বলে? তোমাদের রীতুমাস্টার গো! মরণ! আমার গায়ে গন্ধ লাগল মিন্‌সের! জান, ও নিশ্চয় ওই অলিতে মজেছে! মাইরী বলছি! কিন্তু আমার বুক যে ধড়ফড় করছে গো! আমার বুকের দেওয়ালে লাগানো গোবরের তাল ঢপাস করে পরবুকে লাগল! ও নাটু, একটা উপায় কর। না কর তো, আমাকে ভাই শুতে জায়গা দাও। আমি বসে থাকতে পারব না।

বলে সে একটা বেঞ্চিতে শুয়ে পড়ল।

হাসছিল সকলেই। মনে কৌতুক ওদের জেগেই থাকে। ওইটুকুই ওদের এই জীবনের মূলধন বোধ হয়। এর ঠিক পরের গাড়িটাই একটা মস্ত থার্ড ক্লাস। সেখানে যোগাবাবু বোধ হয় গাঁজা খাচ্ছে। গন্ধ আসছে। কে যেন কে আবার দলের বাঁশী বাজিয়ে—শিবে হাজরা তাতে কোন ভুল নেই। পালার গানই বাজাচ্ছে। নাচের গানটা—

নন্দন বনে চন্দন বাস চন্দ্রিকা ঝলমল
মন কারে চায় থাকে সে কোথায় বল সখি বল বল
মন চঞ্চল খসে অঞ্চল সারা যৌবন কেন বিহ্বল হল সই?
কেন অতন্দ্র চন্দ্রের পানে অনিমেষে চেয়ে রই?—
চাঁদের আড়ালে কোন স্বপ্নের কার মুখ ঢল ঢল?
বল সখি বল বল!

বংশীর পা নাচছে, আশা জানলা দিয়ে বাইরের পানে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে অতি মৃদু গুঞ্জনে গানখানা গেয়ে যাচ্ছে। গাড়ি চলছে। দু পাশে বর্ষার মাঠ। এবার বৃষ্টি নেমেছে ভাল। ধান রোয়ার কাজ অনেক এগিয়ে গেছে। আকাশ কাল রাত্রি থেকেই মেঘাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। গরম নেই, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। রাত্রি জাগরণের পর গঙ্গাস্নানে বেশ আরাম হয়েছে সকলের, তার উপর ঠাণ্ডা হাওয়ায় সবার চোখেই ঘুম আছে। বংশী তার উপর সকালেই মদ খেয়েছে। তার নাক ডাকতে লাগল কিছুক্ষণের মধ্যে।

সেকেণ্ড ক্লাসের দলটিও শুয়ে পড়েছে। দুটো বাঙ্ক নিয়ে পাঁচখানা বেঞ্চ। একটা বাঙ্কে উঠেছে বাবুল, বাকী তিনটে নিচের বেঞ্চে রীতুবাবু, গোরাবাবু, মঞ্জরী এবং অলকা চারজন। গোরাবাবু এবং মঞ্জরী এক বেঞ্চে। মঞ্জরী শোয় নি, গাড়ির কোণে ঠেস দিয়ে ঘুমুচ্ছে। তার একখানা হাত গোরাবাবুর মাথায়। চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কোণে ঠেস দিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। ওদের দুজনের এক বেঞ্চে বসবার এবং শোবার কারণ কম্বল। ওদের সঙ্গে বিছানায় একখানা মাত্র রাগ কম্বল ছিল, সেইখানা পেতে শুয়েছে গোরাবাবু, অশৌচে কম্বল ছাড়া শোয়া-বসার জন্য অন্য কিছু ব্যবহারের নিয়ম নেই। মঞ্জরী বলেছে—তা হলে আমিও ওতেই কোণে হেলান দিয়ে বসে যাব। তোমাকে শুতে না থাকলে আমাকে থাকবে কেন? গোরাবাবু সর্বসমক্ষেই তার মাথায় হাত দিয়ে সস্নেহে বলেছিল—আমি ভুল করি নি। আমার দাদু স্বর্গে থেকে দেখে খুশী হচ্ছেন।

মঞ্জরী সলজ্জ হেসে বলেছিল—বেশ, একটু ঘুমোও এখন। কাল সন্ধ্যে থেকে মানুষটা কেমন হয়ে গেল, কিছু বুঝতে পারলাম না। বলো তো কথাটা!

গোরাবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিল, কিছুক্ষণ পর বলেছিল—কি বলব? অপরাধ যে আমার অনেক!

মঞ্জরী বলে উঠেছিল—আমাকে বিয়ে করা তোমার অপরাধ যদি

হয় আর তা যদি অনেক হয় তো তুমি জান। তুমি বলতে পার। তা ছাড়া কোন অপরাধ তুমি কর নি। আমি জানি।

—না, জান না। এখানকার বায়না নেওয়াটাই আমার অপরাধ হয়েছে, সে অপরাধ অনেক অপরাধ। তুমি বারণ করেছিলে, আমি শুনি নি। তুমি নবগ্রাম এসেছিলে ওদিকের কথাটাই ভেবেছিলে। শিবহাটীর নাম জানতে—কিন্তু শিবহাটী যে এখানে তা জানতে না। শিবহাটী গঙ্গার ওপারেই বটে কিন্তু গঙ্গা রতনপুর থেকে তিন মাইল পথ। আর একটা ঘটনা তুমিও জানতে না, আমিও জানতাম না। আমার জন্মের আগের ঘটনা। ছেলেবেলায় শুনেছি বলেও মনে পড়ছে না। আমার দাত্থ খুব বড় ভাগবত কথক ছিলেন কিন্তু ঠিক যাকে পেশাদার বলে তা ছিলেন না। আর খুব গোঁড়া ছিলেন। রতনপুরের এরা আগের কালের জাত বিচারে ভাল নয়। তুর্নামও আছে। কোম্পানীর আমলে নাকি এদের পূর্বপুরুষ কুঠীয়াল সায়েবদের খানসামা ছিল, কেউ বলে সরকার। এবং তা থেকেই সরকার খেতাব। মীরকাসেমের সঙ্গে ইংরেজদের কাটোয়াতে যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে কোম্পানীর ফৌজকে মাংসটাংস এবং অন্য রসদ সাপ্লাই করেছেন। আর নাকি গুপ্ত খবরটবর দিয়েছিল, তা থেকেই ওদের অর্থ সম্পদ জমিদারী।

তারপর অবশ্য ওরা অনেক কীর্তি-টীর্তি করেছে। সে আমলের কীর্তি। বাড়িতে ওই বিগ্রহ স্থাপন করেছে। পুকুর কাটিয়েছে। সে আমলে ছাত্রবৃত্তি ইস্কুলও করেছিল। টোল করতে চেষ্টা করেছিল, তা সে আমলে তো ভাল পণ্ডিত কেউ আসেন নি। বছর কয়েক পর উঠে গিয়েছিল। সেও আমার দাত্থর বাবার আমলে। তারপর দাত্থর আমলে ঘটল কাণ্ড। আমার দাত্থ গাইয়ে লোক ছিলেন। শাস্ত্রর চেয়ে গান জানতেন ভাল। তাঁরই আমলে আমাদের টোল ছিল—উঠে যায়। উনি ভাগবত কথকতা করতেন, তারই মধ্যে গান ছিল প্রাণ। মনে হয় অভিনয়ও ভাল করতেন। শুনেছি লোকে

কাঁদত ভাগবত শুনে। এদের তখন টালমাটাল অবস্থা। যত অবস্থা তত মত্ততা। বাড়িতে পাল-পার্বণে খেমটা নাচের ঢেউ বইত। বৈষ্ণব বংশ, কিন্তু মদ চলত পিপে দরুনে। কিছু পরিচয় তো দেখে এলেন। সেই সময় যে কর্তাকে দেখে এলেন, এরই মা স্বপ্ন দেখেছিলেন ওদের ঠাকুরবাড়িতে দাদু ভাগবত পাঠ করছেন। ছেলেকে বলতে ছেলে মানে ইনি দাদুর কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন ভাগবত গান করতে হবে। দাদু কথা দিয়েছিলেন, পাঠের জন্যে এসেও ছিলেন। সেটা ছিল দোলপূর্ণিমা। এসে ;—এখান থেকে আমাদের গ্রাম শিবহাটী বেশী দূর নয়, চার মাইল পথ—বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যেবেলা পৌঁছে দেখেন বাড়িতে খুব ধুমধাম, চারিদিকে লোকেরা ব্যস্ত ; কলকাতা থেকে খেমটার দল এসেছে। তাঁকে কেউ দেখলে না, তাঁর কথকতা কোথায় হবে তারও ঠিক নেই। অনেকক্ষণ পর শুনলেন, সন্ধ্যেতে তাঁকে ঘণ্টাখানেক পাঠ করে সারতে হবে ; কারণ তারপরেই বসবে নাচের আসর। নাচের পালা তিন রাত্রি। তিন রাত্রির পর তখন এক মাস তাঁর আসর বসবে। কর্তার সঙ্গে দেখাই হল না। দাদু পুঁথি বগলে করে যেমন গিয়েছিল তেমনি ধুলো-পায়েই ফিরে এসেছিলেন বাড়ি। পরদিন ওঁর কাছে লোক এলে বলেছিলেন, মদো-মাতালের ঠাকুরের কাছে আমি ভাগবত পাঠ করি নে বলো। অনেক কালের কথা। আমার বাবা তখন ছেলেমানুষ। কবরেজমশাই এসে কথাগুলো বলে বললেন, জ্যাঠামশাই,—দাদুকে কবরেজমশাই জ্যাঠামশাই বলতেন ;—জ্যাঠামশাই বললেন, গোরেকে বলো, আমি তাকে সত্যি সত্যি আশীর্বাদ করছি, আমার সেদিন অপরাধ হয়েছিল, গোবিন্দ যিনি ভগবান, তিনি ব্রাহ্মণের ঘরেও ভগবান, গোবিন্দ, অন্ত্যজের ঘরেও ভগবান গোবিন্দ। সরকারদের গোবিন্দ মেছুনীর ডালার শালগ্রাম ভগবান, আমার গান শুনতে চেয়েছিলেন, আমি না গেয়ে চলে এসেছিলাম। গোরে এসেছে—গান গেয়ে শুনিয়ে আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেছে—এতেই আমি খুব খুশী। তাকে

আশীর্বাদ করছি। তবে বলো, সে যেন এই ধরেই বড় হয়। বড় হওয়া আর ঈশ্বরের কাছাকাছি যাওয়া তাঁর দয়া পাওয়া এক কথা। এর পর কিছু তত্ত্বকথা বলেছেন।

হাসলে গোরাবাবু। এবং চুপ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। গাড়ির মধ্যে পাঁচটি প্রাণীই স্তব্ধ হয়ে রইল। গাড়িটা ঝক্ ঝং ঝক্ ঝং মত একটা একঘেয়ে শব্দ তুলে ছুটছিল। বাইরের জানালা দিয়ে কাছের গাছপালাগুলো পিছনের দিকে ছুটছে, দূরের দিগন্ত সমীপবর্তী গাছপালা মাঠ যেন চক্রাকারে ঘুরছে। মানুষদের দেহ দুলছে। তার মধ্যেই রাত্রি জাগরণ ক্লান্ত দেহ এই গল্পভারাক্রান্ত উদাস মন কখন যে ঘুমের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে গেল ওরা নিজেরাই কেউ জানতে পারে নি।

হঠাৎ ঘুম ভাঙল গোরাবাবুর। সে চোখ মেলতেই গাড়ীর ছাদের দিকটায় দৃষ্টি পড়ল—অনেক কারুকার্য ছাদে। ইলেকট্রিক পাখা দুটো বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরছে। কপালে গরম বাতাস লাগছে কিসের? ও, মঞ্জরীর নিঃশ্বাস পড়ছে। মাথার পিছনের দিকে দৃষ্টি চালিয়ে দেখল, মঞ্জরী ঝুঁকে প্রায় তার মাথার উপর পড়বার উপক্রম করেছে। মাথার চুলগুলি দুপাশে ঝুলছে। বড় বড় চোখ দুটি মঞ্জরীর ঘুমুলেও কিছুটা খুলে থাকে। মঞ্জরীর ঠোঁটে কাল রাত্রে লাগানো রঙ উঠেও কিছুটা যেন আভাস রয়ে গেছে। ঈষৎ সামান্য লালচে আভা। একটি স্নেহের আবেগ জাগল তাঁর মনে। বেচারী! বড় ভাল মেয়ে। জীবন তার ভরিয়ে দেবার চেষ্টার আর অন্ত নেই। এবার ও একটু ঘুমুক। সে হাত তুলে ওর কপালে স্পর্শ করে ডাকতে গিয়ে হঠাৎ দেখতে পেলে—পাশের বেঞ্চে অলকাও জেগেছে। তার গায়ে রোদ পড়েছে কামরাখানার জানলা দিয়ে। বাইরে কখন রোদ উঠেছে। অলকার মুখ তাদের দিকেই, তাকিয়েও আছে স্বাভাবিক ভাবে তাদের দিকেই। গোরাবাবুও একটু লজ্জিত হল। অলকাও লজ্জা পেলে—তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললে—উঃ, রোদ্দুর কি চড়া!

গোরাবাবু লজ্জার ঝোঁকটা সামলে নিয়ে উদ্যত হাতখানা মঞ্জরীর চিবুকে রেখেই নাড়া দিলে—শুনছ ? মঞ্জরী !

মঞ্জরী জেগে উঠল—অ্যাঁ ?

—একেবারে আমার কপালে তোমার কপালে ঠোকাঠুকি হবে যে ! শেষে শিঙ বেরুবে ?

মঞ্জরী একটু অপ্রতিভ হাসি হেসে সোজা হয়ে বসে দেওয়ালে ঠেস দিলে। গোরাবাবু উঠে বসে বললে—আমি অনেক ঘুমিয়েছি। তুমি শোও দেখি একটু।

—না, আমি বেশ ঘুমুচ্ছি।

—না, বেশ ঘুমুচ্ছ না। যা বলি তাই শোন। শুয়ে পড়। আমি সিগারেট খাই। একটু ভাবি।

মঞ্জরী শুতে গিয়ে আর শুলে না, উঠে বসল। বললে—না। তবে আমিও বসে থাকি।

গোরাবাবু হেসে বললে—অনুতাপ আমি করি না মঞ্জরী। দুঃখ কত সয়েছি তা তো জান।

মঞ্জরী বললে—জানি না ! সেই ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে রুখু চুল নিয়ে আমার বাড়ি এলে—পাঁচটা লোক পাঠিয়ে তবে আনতে পেরেছিলাম—সেদিনকার কথা আমার মনে আছে। ভুলি নি।

—সে কি অনুতাপ ?

—জানি না।

—ভয় তুমি করো না। সেদিন বাড়িঘর ছেড়ে যে কারণে এসেছিলাম—তা তো ঘটে নি। তা ঘটে থাকলে তোমার সঙ্গে একসঙ্গে অশৌচ স্নান করে দাদুর তর্পণ-টর্পণ তো করতাম না !

রীতুবাবু জেগে উঠেছিল। সে শেষ কথাগুলো শুনেছিল। উঠে বসে সে হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বললে—তারা—তারা। তারপর বললে—আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি জেগে রইলাম।

এবার মঞ্জরী শুয়ে পড়ল। ওপাশে জানলার কাঠের পাল্লা বন্ধ

করে অলকাও আবার শুয়ে পড়ল। এবার সে পিছন ফিরে শুলো। সম্ভবত দুজন পুরুষের চোখ তার মুখের উপর পড়বে এই ভেবেই পিছন ফিরলে। তার আর ঘুম ঠিক আসছে না।

রীতুবাবু ব্যাগ খুলে বোতল বের করে কাপে ঢালল। বললে—অশৌচে—

—দিন। ও বর্জন করলে অশৌচ রাখতে পারব না। ওই রতনপুরের বৃদ্ধ সরকারকে দেখলেন তো! এখন মালা জপেন। প্রায় আমার দাত্বর বয়সী। আট দশ বছরের ছোট। ওঁরই গল্প শুনেছি। তখন প্রচুর মদ খেতেন, বাড়িতে রক্ষিতা ছিল, ওঁর মা যখন মারা যান তখন মাকে বলেছিলেন, মা বলে যাও, আমি মদ খাব, আর মাথা ন্যাড়া করব না। নইলে শ্রাদ্ধই হবে না। তবে আমাদের আলাদা কথা। তান্ত্রিক বংশ। ঠাকুরদার বাবা কারণে তর্পণ করতেন। দাত্ব বৈষ্ণব হয়েছিলেন, তবু তামার পাত্রে নারকেলের জল দিয়ে কারণ করে নিতেন। আমি তো বীরাচারী বামাচারী যা বলেন!

কিন্তু গ্লাসটা হাতে নিয়েও কয়েক মুহূর্ত ধরে থেকে ফিরে দিলেন—নাঃ, থাক।

রীতুবাবু গোরাবাবুকে দিয়ে আর একটা কাপে নিজের জন্য ঢেলে বাঙ্কের ধারটা ধরে ডাকলে—লিটিল ব্রাদার! বোস?

—ঘুমুচ্ছে অঘোরে।

রীতুবাবু নিজেই সেটা শেষ করে আবার ঢাললে।

গোরাবাবু চুপচাপ সিগারেটই টানছিল। হঠাৎ বললে—জানেন, দাত্বর কাছেই আমার অ্যাক্‌টিংয়ে হাতেখড়ি। আমাদের শিবহাটীর দু মাইল দূরে নবগ্রাম। ওখানকার বাবুদেরই তখন ওদিকে খুব বাড়বাড়ন্ত। কয়লা লোহা কনট্রাকটারিতে সে রমরমে ব্যাপার!

মৃদুস্বরে রীতুবাবু বললে—আপনার শ্বশুরকুল—

—ভুলে যান। বলেই আবৃত্তি করে গেল—

মাটির গর্ভের মাঝে যে মৃত নিহিত
সেও মৃত নয়। স্মৃতির মন্দির মাঝে
প্রেমের আরতি দীপে নিত্য চলে আরতি
তাহার। কিন্তু হায় কালের গহ্বর মাঝে
বিস্মৃতির মৃত্তিকার স্তূপে প্রোথিত যে জন
সেই মৃত—তাই মৃত !

তারপর হেসে বললে—সে সব মাটি চাপা পড়ে গেছে। আমি মৃত তাদের কাছে, তারা মৃত আমার কাছে। জানেন, এ কথাটা বলি নি। দাত্বর সম্পত্তি বলতে বিশেষ কিছু নেই। সে সবই কাকারা নিয়েছে। আর আছে বংশের শালগ্রাম শিলা। আমার পূর্বতন পত্নী পাল্কী করে দাত্বর মৃত্যুর পূর্বে এসে আমার পুত্রের নামে ওই দেবসেবার অংশটি লিখিয়ে নিয়ে গেছেন।

—ওসব কথাই এখন থাক গোরাবাবু। না হলে প্রোপ্রাইট্রেসকে ডাকতে হয়।

—না। গোরাবাবু মঞ্জরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—ও আমার জীবনের যে কি তা বলতে পারব না।

গাড়ি এসে ঢুকল ব্যাণ্ডেল স্টেশন। বেলা দেড়টা বাজছে। গোপাল ঘোষ এসে দরজা খুলে ঢুকল ভেতরে, সঙ্গে সঙ্গে শিউনন্দন।

—কি খাবেন ? মাস্টারমশাই ? বাবুলবাবু ? মঞ্জরী মা, কি আনব ? অলকা ? পুরী তরকারী, না মিষ্টি ?

বাবুল ঝপ করে বাঙ্ক থেকে নেমে বললে—দেখছি আমি।— রাইস চাই বাবা। কাল রাত্রি থেকে লোচন চলছে।

মঞ্জরী বললে—আপনি মাস্টারমশাইয়ের ব্যবস্থা করুন। শিউনন্দন তুই দেখ ফল কি মেলে—আর কাঁচা মিষ্টি।

গোরাবাবু বললে—কাগজ একখানা দেখিস রে। আজ তিন দিন কাগজ দেখি নি।

রীতুবাবু বললে—কি দেখবেন স্যার ! যুদ্ধ চলছে আর চলছে।

ওদিকে প্রায় গোটা দলটাই স্টেশনে নেমেছে। কেউ কলের গোড়ায় চলেছে চিঁড়ে ভিজুতে। কেউ খুঁজছে যদি দই মেলে। বাকী সব চানাচুর থেকে তেলেভাজা মিষ্টি কিনছে।

বংশী বললে—কি খাবি আশা?

—আলুর দম দেখ না। গোটা চারেক আলু হলেই চলে যাবে। আর ডিম থাকে তো দেখ না।

বংশী নেমে পড়ল।

নাটুবাবু জানালা থেকেই হাঁকছে—এই—এই শুনো! কেয়া হ্যায়? অঁ্যা!

গোপালী বললে—নামই না ছাই। গাড়ি থেকে কি সব মেলে? দেখ না যদি ডিম মেলে।

নাটুবাবু বললে—না—না। কবেকার ডিম, বাসী সেদ্ধ, না হয় পচা—ডিম খায় না।

শোভা অকস্মাৎ জানালা থেকে ঝুঁকে ডাকলে—ও বংশী! বং—শী! আমার জন্যে একটা ডিম আর একটু আলুর দম আনিস ভাই। একটা ডিম। হ্যাঁ, আর আলুর দম। তারপর আপন মনেই বললে—বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নেই।

বাবুল হন হন করে এসে ঘরে ঢুকে বললে—আমি নামছি স্যার। রাইস কারির বরাত দিয়েছি—খেয়ে লোকালে গোয়িং। পেট বাপ বাপ করছে। ফিরে দেখা করব। হ্যাঁ, অলি? ইউ? উইথ মি—অর উইথ দেম্? দেখ তখন ডোণ্ট সে—হাফওয়েতে ভাগ অ্যাওয়ে করেছি ফেলে!

অলকা উঠে পড়ল—আমি তোমার সঙ্গেই যাব। আমাদের ওদিকে তো তুমি ছাড়া কেউ যাবে না!

রীতুবাবু হাসলে। অলকা স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে শিউনন্দকে বললে—আমার বেডিংটা নামিয়ে দাও না শিউনন্দন। আসি মঞ্জরীদি,

আসি কেমন ? কপালে হাত তুলে নমস্কার করলে। তারপর হঠাৎ গোরাবাবুকে বললে—আপনি ব্রাহ্মণ—প্রণাম করি আপনাকে।

নেমে গেলে রীতুবাবু বললে—মেয়েটা কম্বল স্যার। বাবুলকে ও ছাড়ছে না।

মঞ্জরী ফল ছাড়াচ্ছিল। সে হেসে ফেললে।

রীতুবাবু বললে—হাসছেন ! দেখবেন আমি বলে রাখছি।

মঞ্জরী ও কথার জবাব না দিয়ে বললে—আপনাকে কিছু ফল দিই ?

—না—না। ফল এ সময়ে এ মুখে ভাল লাগবে না। ওই গোপাল কি সব আনছে। বলে বোতলটা ফের বের করলেন। কাপে না ঢেলে বোতলেই মুখ লাগিয়ে খেয়ে একটু দম নিয়ে বললে—ফল খায় সন্ন্যাসীতে।

মঞ্জরী হেসে বললে—কিন্তু ফল খেলেই সন্ন্যাসী হয় না। তা হলে সব বানরই সন্ন্যাসী হত। বেশ লিখেছে বইখানা।

গোপাল গরম ভাজা পুরী তরকারী এবং একটা ডিম এনে ধরে দিল রীতুবাবুর সামনে। বললে—এক টাকা ছ আনা হয়ে গেল।

—হোক। বেড়ে গরম আছে। নাও, ব্যাগ থেকে দামটা নিয়ে নাও। মাথার বালিশের তলা থেকে ব্যাগটা বের করে গোপালকে দিলে।

গোরাবাবু বললে—চা দেখুন তো। চা। ভাঁড়ের চাই আনুন না। চারটে ভাঁড়।

—ফলের সঙ্গে চা খাবে ?

—চা বিবেচনা করুন, যেমন ডাল-ভাত নয়, তেমনি বিষও নয়। আনুন গোপালবাবু, চা আনুন।

কাচের গ্লাসে গোপাল চা নিয়ে এল। গোপালবাবু চুমুক দিতে দিতে বললে—চা জীবনে দুবার খেয়েছি, একবার—

বলতে গিয়ে হেসে ফেললে।

রীতুবাবু বললে—লিখুন না স্যার এমনি একখানা—হোক না সামাজিক—আমরা লাগাই।

গোরাবাবু চা শেষ করে বললে—তাই ছকছি মাস্টারমশাই। শুয়েছিলাম, ঘুম আমার ভাল আসে নি। হঠাৎ মাথার মধ্যে এল। এলোমেলো। কিন্তু মন্দ হয় না। ফার্স্ট সিনটা ধরুন—বাপ আর বেটার মধ্যে কথা হচ্ছে। ধরুন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশ, বাপ প্রবীণ ভক্তমানুষ—জ্ঞান থেকে ভক্তি বড়। গাইতে পারেন। ধরুন ভাগবত পাঠ করছে—মনে মনে অবশ্য—হঠাৎ ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে গান ধরলেন। গানের মধ্যে ছেলে এসে দাঁড়াল। গান শেষ হলে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে দাঁড়াল। বাপ চোখ তুলে ছেলেকে দেখে বললে, কি, কোথাও যাচ্ছ নাকি? প্রণাম করলে। কাপড়-চোপড় পড়েছ?

ছেলে বললে, হ্যাঁ। ধরুন নবগ্রাম, না—নবীনহাট। হ্যাঁ নবীনহাটই ভাল। ছেলে বললে, হ্যাঁ নবীনহাট যাচ্ছি। ওদের ইস্কুলের চাকরীটা নেওয়াই আমি ঠিক করেছি। আপনাকে বলতে এলাম।

—ঠিক করে ফেলে বলতে এসেছ! তা—তাহলে বেশ! এর বেশী কি বলব? ঠিক করে ফেলেছ যখন। হ্যাঁ, তখন আর কি বলা যেতে পারে?

—আপনি আশীর্বাদ করুন, সন্তুষ্ট মনে বলুন।

—সন্তুষ্ট মনে? একটু থেমে বললে, তা কি করে বলব বল? আমাদের বংশ প্রাচীন গুরুবংশ। শাস্ত্র চর্চা এবং শিক্ষা বা দীক্ষা দেওয়া, এই ছিল আমাদের কর্ম। পেশা নয়। বাবার আমল থেকে টোল উঠল। ছেলে আসা বন্ধ হল। সবাই ইংরেজী শিখতে ছুটল। তার ওপর অকালে মারা গেলেন। আমি ছেলেমানুষ। আমার নিজের শাস্ত্র পাঠ হল না। সংসারের ভার। অল্প শিখে প্রথমে পুরুতের কাজ করেছি তারপর ভাল গলা ছিল, গানে জন্মদখল ছিল,

ভাগবত পাঠ করে কোন রকমে ভক্তিযোগে বংশমর্যাদা খুঁটির ঠেকোয় ঠেকা দেওয়া ঘরের মত খাড়া রেখেছি। তোমাকে বাল্যকাল থেকে শাস্ত্রচর্চা করালাম, কাশীতে বেদান্ত পড়িয়ে আনলাম, তুমি গুরুগিরির পাঠ আবার গড়ে তুলবে। শাস্ত্র চর্চা, ভগবৎ চর্চা একসঙ্গে হবে। কিন্তু তুমি বলছ ইস্কুলে হেড পণ্ডিতি চাকরী নেবে, বেতন মাসিক পঁয়তাল্লিশ টাকা। দশটা চারটে চাকরী, নরঃ নরৌ নরাঃ শেখাবে ছেলেদের। সায়েব সুবো এলে সার্ না কি বলে যেন, বলে খাড়া হয়ে দাঁড়াবে। বাবুদের দেখলে আগে নমস্কার করে চাকরী বাঁচাবে। আমাদের বংশের কত্তারা পথ দিয়ে যেতেন, লোকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করত। কারও বাড়ি গেলে বাড়ি পবিত্র হত। তারা জলের ঘটি নিয়ে ছুটে আসত পা ধোওয়াতে। তুমি পণ্ডিতমশাই হবে বাবা, তোমাকে লোকে দেখে বলবে নমস্কার পণ্ডিতমশাই। কেমন আছেন গো! বাড়ি গেলে বলবে, আসুন—বসুন—ওই যে মোড়া—বসুন। পায়ে ধুলো দেখলে খিড়কীর ঘাট দেখিয়ে বলবে, ওই যে ঘাট, পা ধুয়ে আসুন। বাবা, এসব তো বাইরের কথা। ধর এদিক-ওদিক কাজে সকালে দেরী হয়েছে একটু—দশটা বাজে বাজে। তখন ঈষ্ট স্মরণ, পূজা, খাওয়া, ইস্কুলের চাকরীর কোনটা ছাঁটবে বল তো? ওই ঈষ্ট পূজা ছাঁটাই হয়ে ঈষ্টস্মরণে দাঁড়াবে—তাও হয়তো মাথায় জল ঢালতে ঢালতেই চলবে, নয়তো খাবার আসনে বসে দুবার কেরে-রে-রে করে আঙুলের পর্বে পর্বে বুড়ো আঙুল ছুটবে মাথায় ঘা-ওলা কুকুরের মত। আমি কি করে সন্তুষ্ট চিত্তে হ্যাঁ বলি তুমিই বল!

রীতুবাবু খেতে খেতেই শুনছিল। তার খাওয়া কয়েক মুহূর্ত আগে থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মুগ্ধ হয়ে সে গোরাবাবুর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। গোরাবাবু থামতেই বললে, গ্র্যারাণ্ড—গ্র্যা-রা-ণ্ড স্যার গ্র্যা-রাণ্ড। ওই বুড়োর পার্ট কিন্তু আমার। ছেলে আপনি।

—উঁহু। বুড়ো আপনিই। তবে ছেলে আমি নই। আমি

নাতি। আমি আসব সেকেণ্ড অ্যাক্টে। এ অ্যাক্টে নাতি ছেলেমানুষ। একটা ভাল বাচ্চা চাই। রঙটা ফরসা হতে হবে। নাম হবে জয়ধর। বুড়োর ছেলে ফার্স্ট অ্যাক্টেই মারা গেল আর কি। বাপের সঙ্গে একমত হল না। অগ্রাহ্যও করলে না বাপকে। তবে চাকরী সে নিলে। সে বিনয়ের সঙ্গেই বেশ শক্ত হয়ে বললে, আপনি পিতা, মহাগুরু, ভাগবতে আপনার আশ্চর্য স্ফুরণ। সে ব্যাকরণ কাব্য শাস্ত্র চর্চার সুযোগ যত কমই হয়ে থাক না ও সম্পদ বিধাতা আপনাকে দিয়ে পাঠিয়েছেন। ভক্তিযোগ লোকে বলে জ্ঞানের অভাবে অন্ধের আলোর আকূতির মত জন্মায়। কিন্তু না, ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগেরও পরের কথা। ও দুর্লভ। সংসারে কোন কালেই সুলভ নয়। তার উপর এই কাল, কলিকাল, বিদেশী রাজা। সংস্কৃত ভাষার সমাদর কমেছে। ঈশ্বরে বিশ্বাস গেছে। শালগ্রাম নুড়ি হয়েছে, বিগ্রহ পাথরের পুতুল হয়েছে। লোকে ঘর সাজাচ্ছে কুড়িয়ে এনে। মিউজিয়ম দেখেছি, সেখানে ওর মূল্য শিল্পের আর একটা কালের নিদর্শনের। সঙ্গে সঙ্গে আমরা যারা শাস্ত্র চর্চা করি, পূজা করি, তারা লোকের কাছে সমাজের কাছে পরিগণিত হয়েছে লোভী বলে ভীরু বলে, অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীব বলে। আপনি সম্মানের কথা বললেন। বাবা, পিতৃশ্রাদ্ধে মাতৃশ্রাদ্ধে বিবাহে অন্নপ্রাশনে আমাদের ডাকে অনুগৃহীতের মত। ফর্দ দিলে বাজারের ফড়ের সঙ্গে যেমন দর-দস্তুর করে তাই করে। বলে একটা রফা করুন। আমরাও উদরান্নের জন্যে তাই করি। ক্রিয়া বাড়িতে ক্রিয়া শেষ হলে আর কেউ খোঁজ করে না। পণ্ডিতকে তবু মোড়া দেয়, পুরুতকে গুরুকে কম্বলের আসন দেয় সব থেকে অন্ধকার ওঁচা ঘরে। আমরা অবজ্ঞাত লাঞ্ছিত, পদে-পদে অবমানিত। না বাবা, গোটা বংশটা এর পর ভিখিরী না হয় ভণ্ড না হয় রাঁধুনী বামুনে পরিণত হবে এ পথে। নূতন কালের জ্ঞানের পথ আমাদের ধরতেই হবে বাবা। ওই জয়ধরকে ইংরিজী শিখিয়ে হয় আমি বিজ্ঞানী করব কিংবা

দার্শনিক কাব্যকার লেখক করব। সঙ্গে অন্য ভাইদের ছেলেদেরও। আপনি বাধা দেবেন না।

—বাঃ! তারপর? বুড়ো কি বললে? রুদ্র তেজ?

—না। বৃদ্ধ ধরুন উত্তর খুঁজে পেলে না।

—তা হলে তো হেরে গেল।

—হার জিত বুঝি না। বাস্তবকে বড় করুন। সামাজিক নাটক।

রীতুবাবু বললে—হুঁ, সামাজিক নাটক! তবে একটা ক্ল্যাশ—দম করে এইখানে হলে না—গোড়াতেই দাউ দাউ!

না।

রীতুবাবু এবার অনেকক্ষণ পর খেতে লাগল। মঞ্জরী থালা সাজিয়ে চুপ করে বসে শুনছে।

গোরাবাবু বললে—বাপ চুপ করে বসে আছে। একটু থেমে ভেবে নিয়ে বললে ধরুন বাপ এখানে চীৎকার করেই উঠলেন না না না। ওরে তার থেকে মৃত্যু ভাল, ধ্বংস ভাল, নির্বংশ । বুঝলেন মাস্টারমশাই, ঠিক এই মুহূর্তটিতেই ওই নাতি বাইরে থেকে—দাদু বলে উচ্চকণ্ঠে ডেকে এসে ঢুকল—দাদু! বৃদ্ধ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কেমন? পোশাক পরিচ্ছদ অবশ্যই সামান্য।

গুড! গুড! গুড! ভেরি গুড!

গোরাবাবু মঞ্জরীর দিকে তাকিয়ে বললে—কি? তোমার অভিমত? বল?

সলজ্জভাবে মাথার ঘোমটা একটু টেনে দিয়ে মঞ্জরী বললে—ভাল! খুব ভাল! কিন্তু নাতি কিছু বলুক।

—কি বলবে? বল না তুমি! হ্যাঁ, একটা কিছু বলা চাই।

—বলুক না, দাদু, ওই বাবুদের ছেলেরা কি সুন্দর কপিং পেন্সিল কিনেছে, নিবের কলম কিনেছে, আমাকে কিনে দাও। দাদুর গলা জড়িয়ে ধরুক। দাদু চুপ করে থেকে বলুন, কত দাম রে? দুটোতে আট আনা। দাদু বলুন, চল দেখি, কাল কারা এসে গোবিন্দ প্রণাম

করে একটা টাকা দিয়ে গেছে প্রণামী। রেখেছিলাম। তা নে, আট আনা তুই নে। নাতির হাত ধরে বেড়িয়ে যাবার সময় ছেলেকে বললেন, তাই নাও তুমি চাকরী, চণ্ডীচরণ। আমি অনুমতি দিলাম।

গোরাবাবু বললে—তোমার তো ঠিক মনে আছে। একটু হাসলে।

মঞ্জরী বললে—হ্যাণ্ডেলটা আমাকে যে দিয়েছিলে রাখতে!

গাড়ি এসে শ্যাওড়াফুলিতে দাঁড়াল। কামরাটায় জন তিনেক ডেলি প্যাসেঞ্জার উঠে বসল।

রীতুবাবু খাওয়া শেষ করে হাত ধুয়ে সিগারেট ধরালে। গোপাল নেমে গিয়ে জানালার ধারে একটু দাঁড়িয়ে থেকে ও গাড়িতে চলে গেল। ও ভাবছিল, ওর ওই প্রিয় ছেলেটিকে এই বাচ্চাটির পার্টটা যদি দেওয়া হয়! মঞ্জরী গোরাবাবুর সামনে কাচের ডিসের উপর একখানি পাতা বিছিয়ে তার উপর খাবার সাজিয়ে নামিয়ে দিলে, খেয়ে নাও।

—তুমি খাও।

—খাচ্ছি। সে বেঞ্চে পিছন ফিরে বসল।

প্যাসেঞ্জার তিনজন অলকার খালি বেঞ্চে বসলেন। একজন প্রৌঢ়, দুজন কমবয়সী ছোকরা, তারা পরস্পরের সঙ্গী। একজন অন্যজনের গা টিপে বললে—আরে, এ যে যাত্রার দলের অ্যাকট্রেস মঞ্জরী আর গোরাবাবু, মানে মঞ্জরী অপেরা অ্যাণ্ড মঞ্জরী দু বোথের মালিক। আমি চিনি। ওদিকে রীতুবাবু!

ওদের দিকে ভাল করে তাকিয়ে শ্রোতা বললে—খুব চালুস তো! সেকেণ্ড ক্লাস মারিয়েছে! শালা যুদ্ধের বাজার যে!

—চুপ।

রীতু অকস্মাৎ খাড়া হয়ে উঠে বসে মোটা গলায় একটা গলা খাঁকারি দিলে। তারপর বললে—খুব promise আছে বিজয়বাবু। ভাল হবে। কাগজ কলমে করে ফেলুন। আর একটা বেশ চ্যাংড়া

চরিত্র আনবেন। বোস্ খুব ভাল করবে। একটা সিন আমার সঙ্গে দেবেন আমি ঠ্যাঙাচ্ছি বেধরক। অ্যাঁ? ছত্রিশ ইঞ্চি ছাতিখানা রীতুবাবু প্রায় চল্লিশের কাছে ফুলিয়ে দিলে। প্রৌঢ় হয়ে এসেছে রীতুবাবু তবু যাত্রাদলের হাওয়ায় ছেলেমানুষীটুকু এখনও রেখেছে। বোধ হয় থাকে। ওই দশ বছর বয়সের খোকা থেকে ষাট পঁয়ষট্টীর বুড়ো এবং যুবক যুবতীর দল এই কল্পনাকে বাস্তব করে তোলার খেলা বা খেলায় মেতে আছে এর মধ্যে ছেলেরা বুড়ো হয়, বুড়োরা ছেলে হয়, হয়তো বা দু-পক্ষই যৌবনের টানেই বাঁধা থাকে। অর্থাৎ ছেলেরাও বৌবন পাকড়াতে চায়। বুড়োরাও যৌবন আঁকড়ে ধরে থাকে।

ছয়

ভাদ্র মাস পড়বার আগে থেকেই মঞ্জরী অপেরার রিহারস্যাল শুরু হল। রীতুবাবুই চালাচ্ছে রিহারস্যাল। গোরাবাবু মঞ্জরী আসছে না। অশৌচান্ত না হলে আসবে না।

খুব এমন কিছু জমাট ব্যাপার নয়। ওই আপিস ঘরটাতেই সে বসে চেয়ারে, আর সকলে বসে তক্তাপোশে। বই ধরে যার যার পার্ট বলে যায় সে শোনে, মধ্যে মধ্যে বলে, উঁহু, এটা এই রকম করো। বলো।

মধ্যে মধ্যে চা আসে। নিচের একটা দোকানের ছোকরা আসে, আর দিয়ে যায়। কারুর নগদ কারুর ধার। ধারের ব্যাপারে মঞ্জরী অপেরার গোপাল ঘোষ আধা জামিন থাকে।

পাশের ঘরটায় গাঁয়ের বা কলকাতার বাইরের লোকেদের মধ্যে যাদের কোন আস্তানা নেই তারা কজন থাকে। তা জন দশেক। হোটেলে খায়। তার মধ্যে যোগানন্দ একজন।

নটার মধ্যেই রিহারস্যাল ভাঙে। ব্ল্যাকআউটের রাত। যে যার

চলে যায়। অধিকাংশই পায়ে হেঁটে। কিছু ট্রামে বা বাসে। বাবুল অলকা সব থেকে আগে চলে যায়। ওদের যেতে হয় টালিগঞ্জ।

শোভা বলে—খেপেছিস! ওরা যাবে চৌরিঙ্গীতে গিয়ে ঘুরবে। সেই বারোটা একটায় বাড়ি ফিরবে। আমি কঙ্কের ছাপ নেব যদি মিথ্যে হয়। আমাদের এখানকার ছুঁড়িদের কাছে সব শুনেছি। একছার নাকি ভদ্দরঘরের মেয়ে আসে। বাপ মেয়ে নিয়ে আসে। ভাই বোন আসে। আর গুপ্ত প্রেমিক প্রেমিকার তো হিসেব নেই। কোম্পানী খুলেছে। ওদের কোম্পানীর নাম বাবুলালি কোম্পানী।

অবশ্য প্রকাশ্যে ঠিক বলে না। কারণ অলকাকে না করলেও, বাবুলকে ভয় করে শোভা। লোকটার সবই গোয়াতু´মি মাখানো-মেশানো। আচম্‌কা এমন হোয়াট বলে ওঠে যে চমকে ওঠে মানুষ। বাবুলবাবু! না হোয়াট? একেবারে মারমুখো হোয়াট! রীতুবাবুর পার্ট দেখে খুশী হয়ে তাকে বলে, ইচ্ছে করছে পেটে একটি ফুলওয়েট ঘুষি বসিয়ে দি। আর ইংরেজীর তো ছড়াছড়ি। শুধু তাই নয়, লোকটার কথায় বিশ্রী জ্বালাধরা ধার আছে। যোগাবাবু একদিন বলেছিল, বাবুলবাবু স্যার! বাবুল ঘুরে ঘাড় বেঁকিয়ে শুধু তাকিয়েছিল, কথা বলে নি। যোগাবাবু দমে নি, বলেছিল—কবে আমরা মিষ্টি খাব স্যার! অলির সঙ্গে বিয়েটা কবে হচ্ছে? বাবুল বলেছিল—তোমার মত ঘৃণ্য জীবের সঙ্গে আমি কথা বলি না। এমন করে বলেছিল যে যোগাবাবু যে গাঁজাল গোঁয়ার সেও যেন বেলুনের মত ফুটে চুপসে গিয়েছিল।

বংশী ছুটো বারো তেরো বছরের মেয়ে এনেছে। নাচের দলের সামনে রাখবে। ওই সব খোলার ঘরের ছানাপোনা। বংশী আশাকে নিয়ে মেয়েছুটোকে সঙ্গে করে বাড়ী ফেরে হেঁটে। গোপালী নাটুও হাঁটে। নাটু পয়সা খরচের লোক নয়। শোভা আশায় থাকে রীতুবাবুর। ও রিক্সায় ফিরে, বাবু লোক তো! যে দিন গোরাবাবু মঞ্জরীর বাড়ি যায় সে দিন আশাকেও সঙ্গে নেয়। অবশ্য আলাদা

রিক্সা করে দেয়। এক রিক্সায় তুজনের কুলোয় না। কুলোয় না, আবার কুলোয় ঠিক, কিন্তু রীতুর তা পোষায় না। তবে বেশীর ভাগই এখানে আসবার আগে ওখান হয়ে আসছে। এখন যে ওখানে রাত্রের রস-মদ নেই। গোরাবাবুর বাহাতুরি আছে, মদ ছুঁচ্ছে না এ কদিন। বসে বসে বই লিখছে। নতুন বই। চা খাচ্ছে হরদম— বিশ ত্রিশ কাপ, আর সিগারেট। মঞ্জরী গজগজ করছে। মদের সঙ্গে খাবার খায়। সে দিকে খুব নজর। সে তবিরৎ শোভা দেখেছে। এক বাড়িতে থাকে, কতদিন করেও দিয়েছে। প্রথমেই চাই বেশ এতটা মাখন, নোনতা মাখন। সেটা গোড়াতেই খেয়ে নেবে। ওতে নাকি পেটের ভেতরটা বেশ তেলা হয়ে যায়; তারপর যা যায় মানে মদ সেটা পেটে বেশীক্ষণ থাকে না, পেটের ক্ষতিও করে না, নিচে নেমে যায়। তারপর চপ কাটলেট ছোলা মটর ভিজে, কাঁচা মটরের সময় মটর সেদ্ধ, স্যালাড। সে এই এত। কিন্তু চায়ের সঙ্গে কিছু নয়। মঞ্জরীর গজগজানি সেই জন্যে।

চা ছাড়া অশৌচের নিয়মও মেনে চলছে ওরা তুজনেই। মেয়েরা সব পারে। সে বেশ্যাই হোক আর গেরস্তই হোক। ধর্ম-কর্ম করা অভ্যাস থাকে। নেহাৎ উচ্ছন্নে-নরকে পতন না হলে ওটা যায় না। মঞ্জরী অবশ্য আলাদা বটে। ওর মা দিদিমা এর মধ্যেও বামুন বোষ্টমের রীতিনীতি মেনে গেছে। মঞ্জরী যাত্রার দল না করলে গরস্তই হয়ে যেত। বাহাতুরি গোরাবাবুর। বলতে গেলে তো কালাপাহাড়। সোনার সিংহাসন ছেড়ে মঞ্জরীকে বিয়ে করে যাত্রাওলা হয়েছে। বড়লোকের ছেলে অনেক ফতুর হয়, হয়েছে তাদের ভজে। এই তো থিয়েটারে কত বড়লোকের পো শেষ হল। তবে এদের ঢঙটা আলাদা।

শোভা চিৎপুরের দিকের বারান্দায় এসে লুকিয়ে একটা সিগারেট খাচ্ছিল। সিগারেট সে খায় কিন্তু সবার সামনে খায় না। সকলে দলে একটু সম্ভ্রম করে বলেই খায় না। আজ কেমন যেন

সিগারেটের তেষ্টা পেলে। রীতুবাবুর কাছ থেকেই চুপি চুপি চেয়ে নিয়ে এসে খাচ্ছে। বারান্দায় এসে দরজাটা শেকল তুলে বন্ধ করে দিয়েছে। নিশ্চিন্তি।

ও কি! কে যেন ভেতরে হাঁউমাউ করে কাঁদছে! ও গো বাবু গো!—কে? কার কি হল? কান পেতে শুনে মনে হচ্ছে বঙ্কিম সাধুর গলা। মাঝারি পার্টটার্ট করে। সেনাপতি সামন্তরাণা কিংবা বেশী কথাওয়ালা দূতের পার্ট। বঙ্কিম থাকে সিঁথীতে। এবার কই রথের দিন আসে নি। কে যেন বলেছিল কোন নতুন দলে বড় পার্ট নিয়ে নামবে। লোকটার চেহারা ভাল। সেই বলেই তো মনে হচ্ছে। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে শোভা দরজা খুলে দাঁড়াল।

হ্যাঁ বঙ্কিমঃ বটে! বঙ্কিম রীতুবাবুর হাত ধরে হাউ হাউ করে কাঁদছে—আপনি বলে দিন মাস্টারমশাই আপনি বলে দিন। আমার ছেলে মাস্টারমশাই, ষোল বছরের ছেলে।

গোটা ঘরখানার লোক বোবা হয়ে গেছে। চোখে কারুর পলক পড়ছে না। হয়তো দমও বন্ধ করে আছে। কি হয়েছে বঙ্কিমের ষোল বছরের ছেলের—জিজ্ঞাসাও করতে পারছে না শোভা। রীতুবাবু বললে—তুমি যে আড়াইশো টাকা চাচ্ছ বঙ্কিম! বিশ পঁচিশ হলে না হয় আমি দিতে পারতাম। তুমিই বুঝে দেখ।

—আজ একশো দিন, কাল বাবুকে প্রোপ্রাইট্রেসকে বলে বাকীটা দেবেন। বাবু, ডাক্তারের বাকী, ওষুধের দোকানে বাকী। বাইশ দিনে সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছি। ডাক্তার টাকা বাকীতে দেখেছে। তিন চার দিন কথার খেলাপ হয়েছে। আজ সকাল থেকে ক্রাইসিস চলছে। ডাক্তার দুপুরে বলে গেছে টাকা না হলে আর আসবে না। বাবু, মাস্টারমশাই, ডাক্তারের কি দোষ দেব, রক্তটক্ত পরীক্ষার টাকা সব ধারে সে করে দিয়েছে।

শোভ জিজ্ঞাসা করলে—কি হয়েছে ছেলের? কি অসুখ বঙ্কিম?

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল বঙ্কিম, কান্না জড়িয়ে কোন রকমে

বললে—টাইফয়েড। আজ নাকি বলছে, ম্যানেনজাইটিসের সিম্‌টম্‌ দেখা দিয়েছে।

শোভা বললে—আহা রে! তারপরই বললে—চল, তুমি আমার সঙ্গে, কত্তা গিন্নীর কাছে নিয়ে যাই, ওঁরা নিশ্চয় দেবেন।

—আমার দেরীর সময় নেই শোভাদি। সেখান থেকে আবার এখানে পাঠাবেন।

রীতুবাবু বললে—গোপালবাবু, আপনি একশো টাকা সঙ্গে নিয়ে ওর সঙ্গে যান। গিয়ে ডাক্তারকে কিছু, ডাক্তারখানায় কিছু দিয়ে ওদের বাকীটা দিয়ে বলে আসুন আরও দেড়শো টাকার জন্যে দায়ী আমরা থাকব। বুঝলেন? সঙ্গে যান। পান তো ট্যাক্সি করে চলে যান। ওরও তাড়াতাড়ি হবে, আপনারও ফিরতে রাত হবে না। যান। কত্তা গিন্নীকে যা বলবার আমি বলব। ট্যাক্সিতে ফিরবেন। আমি ওখানেই থাকব, দেখা হবে। যাও বঙ্কিম।

গোপাল ঘোষ ও-ঘরে গিয়ে বোধ হয় টাকা নিয়ে এল, তারপর বললে—চল বঙ্কিম।

বঙ্কিমের ঠোঁট দুটি কাঁপছে, তাতে একটু হাসি কিন্তু চোখ থেকে জল গড়াচ্ছে এখনও। বলতে সে কিছু পারলে না। শুধু রীতুবাবুর পায়ের ধুলো নিলে। রীতুবাবু বললে—ভাল হয়ে যাবে। দেখো তুমি। মা ঠিক ভালো করে দেবেন।

রীতুবাবু বললে—এমন করে মাঝখান থেকে কথা বলো না শোভা, বলতে নেই। টাকা ওকে দিতাম আমি। ভাবছিলাম একটু যাচাই করার কথা। কেন জান, জাতটি তো আমরা ভাল নই। আমরা আসরেও ওই ভাবেই কাঁদি, কাঁদতে পারি। আসল নকল—

শোভা ফোঁস করে উঠল—তুমি ওই কান্না নকল বলছ? ওঃ, তোমরা বড়রা এমনই বটে।

রীতুবাবু হেসে বললে—তুমিও তো ছোট নও শোভা, আর খুকীও নও। এমন মিথ্যে করে টাকা যাত্রার দলে নিই না কেউ?

—নিই। তা বলে এমনি করে ছেলের নাম করে হাউ হাউ করে কেঁদে? অবিশ্যি পরের দলের লোক যদি বল তো কথাই বলব না।

—শোন তা হলে। আমি তখন যাত্রার দলে প্রথম ঢুকেছি। মিউনিসিপ্যালিটির চাকরীই আসল চাকরী, এটা ফাউ। মাত্র রাত্রিতে মানে য রাত্রি নামি আট টাকা করে পাই। দলটা বড়, বাকী থাকে, কিছু জমলে নিয়ে যাই। সেবার চৌষট্টি টাকা পাওনা নিতে এসেছি তুপুর বেলা আপিস পালিয়ে হাওড়া থেকে। গরমের সময়, চৈত্র মাস। আপিসে এসে টাকা নিচ্ছি এমন সময় বড় নামজাদা অ্যাক্টর তখনকার, সিঁড়ি থেকে ওঃ-ওঃ-ওঃ বলে চীৎকার করতে করতে ঘরে ঢুকলেন। মদে চুর। ঘরে ঢুকেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন—ওরে আমার শিবু নেই। হা-হা-হা করে মাথার চুল ছিঁড়ে মাথা চাপড়ালেন। ম্যানেজার ঘনশ্যাম গোঁসাই—সে চমকে উঠে বললে—সে কি? এই তো সাতদিন আগে আপিসে এসেছিল আপনার খোঁজ পায় নি বলে, আপনি টাকা পাঠান নি বলে। উনি একখানা পোস্টকার্ড বুকপকেট থেকে বের করে ফেলে দিলেন এই দেখ্। ঘনশ্যাম পড়লে। কিন্তু খুব বিচলিত হল না। চিঠিখানা টেবিলে রেখে দিলে। আমি পড়লাম। চিঠির গোড়ায় লিখছে, অনেক দিন আপনার খবর পাই নি। আমারও পত্র দেওয়া হয় নি। বাধ্য হয়ে আজ আপনাকে তুঃখের সঙ্গেই লিখছি কাল আপনার বড় ছেলে মারা চলিয়া গেল। সামান্য অসুখ। কিন্তু না থাকিলে জোর করিয়া কি করিয়া রাখিব। জ্ঞাতার্থে নিবেদন। ঘনশ্যামকে উনি বললেন, একশো টাকা আমাকে দে ঘনশ্যাম, আমি বাড়ি যাই, তার কাজ করে আসি। তারপর আঃ-আঃ-আঃ। বুক চাপড়ানো এই সব। ঘনশ্যাম কিন্তু বললে, টাকা তো আমি দিতে পারব না মাস্টারমশাই, আমার ওপর কড়া হুকুম কর্তার সই ছাড়া টাকা দেবে না। ভদ্রলোক উঠে রুদ্রমূর্তিতে শাপশাপান্ত করে বেরিয়ে গেলেন। আমি

ঘনশ্যামকে কিছু বললাম না, টাকাটা নিয়ে একরকম ছুটে এসেই ওঁকে ধরে প্রণাম করে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে বললাম, আমার কাছে আর নেই মাস্টারমশাই। থাকলে দিতাম। ভদ্রলোক খানিকটা মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কেঁদে আমাকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন। বললেন, পরে আমি ঠিক তোমাকে দেব। উনি চলে গেলেন, আমি ট্রামে উঠব, ঘনশ্যাম আমার ঘাড়ে হাত রাখলে, বললে, টাকাটা দিলেন তো! বললাম, দিলাম বইকি। আমার ওপর তো মালিকের না-দেবার হুকুম নেই নয়। আপনারা বড় হৃদয়-হীন। ঘনশ্যাম হেসে বললেন, ওর সব মিছে কথা মশাই। 'মারা' কথাটা 'ভারা', বাঁক্ড়োর ভারা গাঁয়ে ওর বাড়ি। চাকরীস্থলে ছেলেটা, অসুখ হয়েছিল অজুহাত করে ভারা চলে গেছে। মানে বাড়ি চলে গেছে। নইলে মারা গেলে—মারা চলিয়া গিয়াছে হয়? লিখত মারা গিয়াছে। আরও কিছু দুঃখ থাকত। উনি চিঠিখানা পেয়ে ভারাকে মারা করে টাকার তালে এসেছিলেন। ওর দাদন শোধ তো দূরের কথা, মাসে মাসে বাড়ছে। তা ঐ টাকা দিলেন? সব? বললাম, পঞ্চাশ দিয়েছি, চোদ্দ আছে। সে বললে, ভাগ্যিবান, চোদ্দ আনার জায়গায় চোদ্দ টাকা বেঁচেছে। পরে নিজেই তিনি স্বীকার করে উপদেশ দিয়েছিলেন, ভায়া, টাকা আমাকে সহজে দিয়ো না। এই উপদেশের দাম ওই পঞ্চাশ টাকা। তোমার পাওনার সঙ্গে শোধবোধ কি বল?

গল্প শেষ হ.তে হাসির গুঞ্জন উঠল। যোগাবাবু বলে উঠল, বুয়েচেন কণ্ঠ মশায়ের দলে—

রীতুবাবু বললে—মাস্টার, কণ্ঠমশায়ের দলের কথা থাক।

—আজ্ঞে না, দলের কথা নয়, খোদ কণ্ঠমশায়ের কথা, উপদেশ। আর বিনা মূল্যে। হ্যাঁ।

—বলে ফেল। রিহারস্যাল বন্ধ। নটা বেজে গেছে।

দলের লোকেরা এতক্ষণ চিনির উপর পিঁপড়ের জটলার মত স্থির

হয়ে বসেছিল, এখন ওই কথাটির ঢেলার ঘায়ে নড়েচড়ে চঞ্চল হয়ে উঠল। ছড়িয়ে পড়বে। যোগা বললে, শোন শোন। 'কাটা রধা নামা। .উলটে পড় জামা।' মানে—উলটালে হবে টাকা ধার মানা, সে দেওয়াও বটে নেওয়াও বটে। বুঝলে!

কে বললে—দূর।

রীতুবাবু বললে—মিছে কথা যোগামাস্টার। কথাটি কণ্ঠ-মশায়ের কখনও নয়।

—আজ্ঞে, মাইরী—

—ফের মিথ্যে কথা বলছ? দিব্যি করছ?

যোগামাস্টার বিচিত্র, অপ্রতিভ হওয়া দূরে থাক, হেসে ফেললে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। কিন্তু কি করে ধরলেন?

দু হাত কপালে ঠেকিয়ে রীতু বললে—কণ্ঠমশায় সাধক ব্যক্তি, সিদ্ধ পুরুষ হে। তাঁদের কথার একটা আলাদা জাত আছে, স্বাদ আছে।

—তা বটে!

কে পিছন থেকে বলে উঠল—এক নম্বরের মিথ্যেবাদী।

যোগাবাবু সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল—খবরদার! আমি মিথ্যেবাদী? সে উনি বলতে পারেন। রসিকতা করে বলেছি, তাতে আমি মিথ্যেবাদী!

রীতু মাস্টার একটা বিড়ি তাকে দিয়ে বললে—খাও। চীৎকার করো না। যাও যাও, যে যার চলে যাও। শোভা, আমি কর্তার ওখানে যাব। আমার সঙ্গে যেতে পার। কই শোভা!

আশা বললে—শোভাদি বোধ হয় চলে গেছে! বোধ হয় গোপালী দিদির সঙ্গে গেছে।

একটু হাসি ফুটে উঠল রীতুবাবুর মুখে। সকলের সামনে শোভাকে ঘুরিয়ে একটু তিরস্কারই করেছে সে। সেই জন্য চলে গেছে। রীতুবাবু বিপিনকে বললে—একখান রিক্‌শা ডাক বিপিন।

* * *

মঞ্জরীর বাড়ি এসে রীতুবাবু সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় শোভাকে ডেকে বললে—কি শোভা, না বলেই চলে এলে যে!

শোভার ঘরে দরজা বন্ধ। ঘরের ভিতর থেকে নীরস কণ্ঠে উত্তর দিলে—কি করব? ভাল লাগছিল না।

মঞ্জরী সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছিল এসে, সে বললে—আসুন, কাণ্ড দেখুন।

—কি?

—যা লিখেছিল সব ছিঁড়ে দিয়েছে।

—ছিঁড়ে দিয়েছেন? সে কি?

—হ্যাঁ। বলছেন—ও চলবে না।

রীতুবাবু সিঁড়ি শেষ করে উপরের বারান্দায় পা দিয়েছিল। সেখান থেকেই বললে—কি সার্? কি হল? প্রোপ্রাইট্রেস বলছেন—ছিঁড়ে ফেলেছেন সব?

গোরাবাবু গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে ভিতরে শুয়েছিল। ভাবছিল। বেরিয়ে এসে সেই চিন্তাকুলতার মধ্যেও ঠোঁটে একটু হাসির রেখা টেনে বলল—আসুন। হ্যাঁ, ছিঁড়েই ফেলেছি। জিনিসটা তো খারাপ হয় নি; কখন উইকনেস বশে ধরে ফেলি—তাই শেষ করেই দিয়েছি।

—ভাল যখন হচ্ছিল তখন ধরে ফেলায় দোষটা কি হত?

—হত। চলত না। দাঁড়িয়ে মার খেতে হত।

—এ কথা বলছেন কেন?

মঞ্জরী বললে—আমি বললাম, যাত্রায় না চলে থিয়েটারে দাও।

—সেও চলত না। এ কঠিন সত্য নাটকে চলবে না মাস্টারমশাই। থিয়েটারেও না। অন্ততঃ সামাজিক চেহারায় চলবে না। বসুন, বলছি। শিউনন্দন, মাস্টারমশাইকে ওঁর খাবার দে। আমি আপনার কাছে লোক পাঠাতাম। ছিঁড়ে অবধি না বলে স্বস্তি পাচ্ছি নে। তা দূত এসে খবর দিয়ে গেল আপনি আসবেন।

—কে ? গোপালচন্দ্র ?

—আবার কে ! আমি আরও দেড়শো দিয়েই পাঠাতাম। ফিরে এসে খবর দেবে। বসুন। তুমিও বস। কাজটা কি তোমার এখন ?

মঞ্জরীও বসল। তবে বললে—কি করব বসে ? কথা তো তুমি শুনবে না কারুর।

—কি মাস্টারমশাই, কথা শুনি না আমি ?

হাসলে রীতুবাবু। শিউনন্দন তার গ্লাস ভর্তি করে দিল। গোরাবাবু বললে—আমায় চা দে। তারপর বললে—নতুন করে লিখব ঠিক করেছি। আমাদের যাত্রাদলের পুরনো ইতিহাস মিশিয়ে রোমান্টিক ব্যাকগ্রাউণ্ড।

—কেন ? সঙ্গে সঙ্গেই রীতু আবার বললে—আচ্ছা বলুন শুনি।

গোরাবাবু বললে—আরও একটা অসুবিধা হচ্ছিল। সেটা হল, আমার নায়কের জন্যে ঠিক জায়গা হচ্ছিল না নাটকে। একটা অঙ্ক বাদ চলে যাচ্ছিল, কারণ প্রথম অঙ্ক শেষ হচ্ছিল নায়কের বাপ মানে বৃদ্ধের পুত্রের মৃত্যুতে।

—হ্যাঁ।

মঞ্জরী বললে—কেন, বাচ্চা ছেলে হিসেবে নাতি তো রয়েছে প্রথম অঙ্কে। প্রথম দৃশ্যেই রয়েছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে ছিল না। সেখানে বাবুদের বাড়ি। তারপর সেই চ্যাংড়াটার পার্ট। তারপর আবার বাচ্চা নাতি। নাতিকে বাবুরা থিয়েটারে বিল্বমঙ্গলে রাখাল বালকের পার্ট দিয়েছে। ঠাকুরদা তাকে শেখাচ্ছে—ভাই সুর করে বল। জান, বক্তৃতাতেও ছন্দ সুর আছে। ওরও তাল মান আছে। গানের থেকেও শক্ত। বুঝেছ ? সেটা তো বেশ সিন ! তারপর বাপের মৃত্যু হল হঠাৎ। সে সিনেও বাপ বলছে, আমি হেরে গেলাম জয়ধর, তুই যেন হারিস নে ! ছেলে স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল। কাঁদল না।

গোরাবাবু বললে—ঠিক। কিন্তু এর পরই হচ্ছে আট দশ বছরের

মত ফাঁক একটা। নায়ক যুবক। জয়ধরের সত্যিকারের গড়ন এই সময়েই মঞ্জরী। বাবা মারা গেলেন, বয়স তখন এগারো। মায়ের সঙ্গে তার কাকাদের কাকীমাদের বনল না। দাদুর বয়স তখন ষাট। অশক্ত হয়েছেন। গলা ভেঙে গেছে। ভাগবত করতে পারেন না। ছেলেদের পোষ্য। কাউকেই বলতে কিছু পারলেন না। না ছেলেদের না পুত্রবধূকে। পুত্রবধূর বাপের অবস্থা খুব সচ্ছল না হলেও খারাপ ছিল না, বাপ তখনও বেঁচে, মেয়ে দৌহিত্রকে নিয়ে গেলেন নিজের কাছে। মধ্যে মধ্যে যাওয়া আসা ছিল। শিবহাটী অগ্রদ্বীপ বেশী দূর নয়। পিতামহও আসতেন মধ্যে মধ্যে দেখতে। একদিন অগ্রদ্বীপের বাবুদের বাড়ি থিয়েটারের রিহারস্যাল হচ্ছে, ঘরের মধ্যে ছোট ছেলেরা ভিড় করেছে জানালার ধারে। বিশেষ আগ্রহ তাদের গ্রামেরই একটি ছোটঘরের ছেলেকে এনে রাখালবালকের পার্ট বলাচ্ছে। সেটি জয়ধর নয়। জয়ধর অন্য ছেলেদের সঙ্গে দেখছে এবং দুঃসাহসী বলে সকলের আগে জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়েছে। ঘরের ভিতর থেকে পার্টির লোকেরা মধ্যে মধ্যে ধমক দিচ্ছে। ওরা পালাচ্ছে আবার আসছে। একবার কড়া ধমক দিতেই জয়ধরের অভিমানে লাগল। সে বললে, দূর—দূর—ওর চেয়ে আমি ভাল পারি। ওই আবার বক্তৃতা নাকি? রিহারস্যাল রুমে বাবুরা বসেছিলেন, বললেন, কে হে ছেলেটি? ডাক তো—ডাক তো। ওরা ডেকে নিয়ে এল জয়ধরকে, জয়ধরের চেহারা দেখে খুব খুশী হলেন ওঁরা। বললেন, বক্তৃতা পার বলছিলে, কই বল তো। জয়ধর বললে, বলুন বলছি। অনেকক্ষণ শুনেছিল, ব্যাপারটাও বুঝেছিল, বললে, ভালই বললে। বাবুরা খোঁজ করে জয়ধরের মাতামহের কাছে এলেন। বললেন, ওকে রাখালবালক সাজাতে চাই। দেবেন? আমরা ইস্কুলে ফ্রি করে দেব। ভাল করে যাতে পড়া-শোনা হয় দেখব। থিয়েটারে নিয়ে ওর ভবিষ্যৎ খারাপ করব না। নেহাৎ এমনি বাচ্চার পার্ট থাকলে নেব। জয়ধরের মাতামহ বললেন,

ভেবে দেখি। মা বললেন, আমি দেব। জয়ধরের দাত্নর সঙ্গে ঘটনাটা ওই বক্তৃতার সুর ছন্দ শেখা এর পর। দাত্ন আসতেই জয়ধর খবরটি না দিয়ে পারলে না। দাত্ন বললেন, কি সাজবি ভাই? জয়ধর বললে, রাখালবালক ছদ্মবেশী কৃষ্ণ। দাত্ন খুশী হয়ে বললেন, বল তো কেমন করে বলবি? তারপর সুর ছন্দ—গদ্য বক্তৃতার পয়ার বক্তৃতার তাল মান শেখালেন। তারপর প্রফুল্লতে যাদব, চাঁদবিবিতে বাহাত্নরের পার্ট করলে জয়ধর। পড়াশোনাতেও ভাল ছিল। মাইনরে স্কলারশিপ পেলে। ওখান থেকে কাটোয়া স্কুলে ভর্তি হল। নতুন জীবন। ভাল লাগল খুব। কিন্তু ওই নেশা কাটল না। তবু সুযোগের অভাবে আর নামে নি থিয়েটারে। ম্যাট্রিকেও দশ টাকা স্কলারশিপ পেলে। ভর্তি হল গিয়ে বহরমপুর কলেজে। স্কলারশিপ পাওয়া ছেলে, তার উপর ভাল চেহারা, এবং অগ্রদ্বীপের বাবুরাও সাহায্য করলেন চিঠিপত্র দিয়ে। বহরমপুরে কলেজে ফ্রি হোস্টেলে ফ্রি হয়ে গেল। নাম হতেও দেরী হল না। কুমার হোস্টেলের কমনরুম তার কবিতা আবৃত্তি নাটকের বক্তৃতায় জমে উঠল। কলেজ-ম্যাগাজিনে লিখতে লাগল। প্রথমেই লিখলে সে নাটক। রবীন্দ্রনাথের কচ দেবযানীর অনুকরণ অনুসরণ। জয়ধরের জীবনের ত্নটি বীজ—কিংবা একটি বীজের ত্নটি দল। একটি হল অভিনয়ের বীজ—ওটা এসেছে দাত্নর কাছ থেকে, অন্যটা উচ্চাশা—ওটা ছিল তার বাপের। আরও একটা আছে, সেটা, মাস্টারমশাই, অপরিতৃপ্তি। ওটা বোধ করি সবারই আছে। কিন্তু শক্তি সাহসের অভাবে আপোস করে নেয় মানুষ। জয়ধরের ওই সাহস ত্নঃসাহস আর শক্তি এই তিনে মিলিয়ে একটা যেটা সেটাই তার নিজস্ব।

—এটা কি আপনার নাটক হচ্ছে, না নিজের কথা হচ্ছে?

—নিজের কথাই বললাম বোধ হয়। কিন্তু ভাল লাগছে না মাস্টারমশাই। আর নাটকের দিকে এগচ্ছি না।

—এগচ্ছেন কি না বুঝতে পারছি না। তবে ভাল লাগছে।

বলুন। প্রোপ্রাইট্রেসের কাছে পুরনো হয়ে গেছে তো! হাসলে রীতুবাবু। বোতলটা টেনে নিয়ে ঢালতে ঢালতে বললে, দেখছেন না, এমন বস্তু এর মধ্যে আর ঢালি নি!

—তা হলে ফুলমার্ক আমার। নাটকেও এগচ্ছি, বুঝতে পারবেন। জয়ধর সেকেণ্ড ইয়ারে উঠবার সময় ভাল রেজাল্ট করলে না। তখন সে নাটক লিখতে সুরু করেছে। নাটক শেষ করে সে গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি এসে নাটক নিয়ে গেল নবগ্রামের বাবুদের বাড়ি। অগ্রদ্বীপের বাবুদের থিয়েটার তখন বন্ধ। নবগ্রামের বড়বাবু তখন কলকাতা থেকে ফিরে দেশে বসেছেন। থিয়েটার খুলেছেন। ওদের তখন বিপুল অবস্থা। ছোটবাবুর ঝোঁকে থিয়েটার। বড়বাবুর ঝোঁক তার সঙ্গে যোগ হয়ে সে সমারোহ ব্যাপার। জয়ধর নাটক বগলে ছোট বাবুকে দেখাতে গেল। ছোটবাবু তো ছেলেটির চেহারা দেখেই খুব মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ওদের গুষ্টিটাই কালোর গুষ্টি। কালো দশাসই চেহারা। থিয়েটারে পার্ট করতেন ভাল। বড়কর্তাও করতেন কিন্তু থিয়েটার করলে লোকজনের সঙ্গে মিশতে হয়, ভয় ভেঙে যায় বলে পার্ট করতেন না। বাড়িতে তিন তিনটে গাইয়ে সুন্দর চেহারার ছোকরা থাকত, মেয়ের পার্ট করত। যাই হোক ছোটকর্তা কথাবার্তা বলে খুব খুশী হলেন। নাটক গান তিনি নিজে লিখতেন। লোক হিসেবে বেশ ভাল হাসিখুশীর মানুষ ছিলেন। বললেন, কাল এসো, আমি নিজে দেখে রাখব, তবে তুমি পড়বে আমি শুনব। কেমন! ভারী ভাল লাগল হে। আমাদের এখানকার বড় পণ্ডিত বংশের ছেলে, এমন খাপখোলা তলোয়ারের মত চেহারা, লেখাপড়ায় বৃত্তি পাওয়া ছেলে, সুন্দর কথাবার্তা, ভারী ভাল লাগল। ভাল করে পড়, ফার্স্ট হয়ে বি-এ, এম-এ পাশ কর বাপু, স্কলারশিপ নিয়ে বিলেত যাও। আই-সি-এস হয়ে এস বুঝলে। হ্যাঁ, কাল নিশ্চয় এস। ঠিক এই চারটে পাঁচটার সময় আসবে। বই শুনব। কেমন হয়েছে বলব। ভাল হলে প্লে করব হে আমরা। ওঃ, তুমি তো পার্ট করতেও পার ভাল। অগ্রদ্বীপে

রাখালবালক, যাদব, বাহাত্নর করেছিলে, খুব প্রশংসা হয়েছিল। তা এখনও পার্ট কর নাকি? জয়ধর বললে, না। পরের দিন জয়ধর গেল। নাটক পড়লে। খানিকটা পড়েছে, বড়বাবু এসে ঢুকলেন—ছোট রয়েছিস রে? অ্যাঁ! এটি কে?

পরিচয় করে দিলেন ছোটবাবু, জয়ধর উঠে প্রণাম করলে। বড়বাবু বললেন বাঃ, খাসা চেহারা তো তোমার! হ্যাঁ, তোমার দাত্নর চেহারা, তোমার বাবার চেহারাও ভাল ছিল। তবে এমন ছিল না। তবে তারা তো ভটচাজ পণ্ডিত ছিলেন। তুমি তো দেখছি মডার্ন ছোকরা। বৃত্তি পেয়েছ। বাঃ!

ছোট বললে নাটক লিখেছে। তাই শুনছিলাম।

—অ্যাঁ, লিখতেও পার? তাই তো! তা পড় তো শুনি খানিকটা।

জয়ধর পড়ে গেল। কর্তা মধ্যে মধ্যে বাঃ বাঃ বলে শুনে গেলেন, সে শেষ পর্যন্ত। মধ্যে মধ্যে লোক এল, কাছারী আপিসে কাজ আছে। লোক এসেছে। কর্তা বললেন—বসতে বল যাচ্ছি।

শেষ হলে বললেন, মন্দ লেখ নি তো। কিন্তু ভাষা যে বড় সাধারণ মেঠো মনে হচ্ছে। তা তোমাদের তো এ কালে সব রবিঠাকুরি ছাঁদ। ভাষা শুদ্ধ করা চাই বাপু। অনেক প্রশংসা করে তিনি উঠে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, রাত্রি তো আটটা বাজে রে ছোট। ওকে না খাইয়ে পাঠাবি? না না—খাইয়ে সঙ্গে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দে।

যেতে যেতে আবার ফিরে বললেন, আমরা বরং তিনজনেই একসঙ্গে খাব রে। বড় গিন্নীকে খবর পাঠিয়ে দে, বুঝলি। পুকুরে জাল ফেলতে বল। একটা বড় মাছ ধরা।

চলে গেলেন বড়কর্তা।

জয়ধর বলতে গিয়েও বলতে পারলে না—না। সেই সঙ্গেই আরও একটা কথা বলা হল না সে নিরামিষাশী। মাছ মাংস খায় না।

সংসারে এক একটা মানুষ এক এক রকম মাস্টারমশাই ; জয়ধর সেই ধরনের মানুষ – যাদের শক্তি এবং সাহস শুধু প্রবলই নয়, আবেগও প্রচণ্ড। কোনটা বেশী তা জয়ধরও জানে না। কথাটা বুঝুন। সব তেলই জ্বলে মাস্টারমশাই, কিন্তু কেরোসিন, পেট্রোল যেমন সহজে জ্বলে তেমনি সহজে অন্য তেল জ্বলে না। একে আগুনের হাত থেকে বাঁচানো কিংবা এর জ্বলাটা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে সর্বনাশ ঘটিয়ে শেষ হয়। জয়ধরের শক্তি সাহসের কথা বলেছি, তার সঙ্গ তার আবেগের কথা বলা উচিত ছিল, সেটা বলি নি। নায়কের চরিত্রের উপাদান মনে না থাকলে আঁকবার হয়তো অসঙ্গতি হবে। সেটা ধরিয়ে দেবেন। মানে নাটক পুরনো কালের পটভূমিতে আরম্ভ করব তো। থাক, তার আগে বলে নি ; জয়ধর তখন নিরিমিষ খায়, গান্ধীর অহিংসা তার ভাল লেগেছে। বড়লোকের উপর খুশী নয়, বিশেষ করে নবগ্রামের বড় কর্তার উপর। এই বড় কর্তাই তখন ও অঞ্চলের বাঘ। রতনপুরের যে বুড়োকে দেখে এলেন, ও তখন গলিত নখদন্ত। অগ্রদ্বীপের এঁরা দেশে থাকেন না, কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দে। তাদের উপর জয়ধরের কৃতজ্ঞতা ছিল এ কথা সত্য, তবুও সত্য বিচারেও এরা মানুষ ভাল। নবগ্রামের বড় কর্তাই দোর্দণ্ডপ্রতাপ ; এবং দোর্দণ্ডপ্রতাপের মত শক্তিমানও বটেন। কলকাতা যে কলকাতা সেখানেও নাকি কর্তা 'মামীমার খেল্' খেলে এসেছেন।

হেসে ফেললে মঞ্জরী, বললে—মামীমার খেলটা কি ?

—ওটা যে কি তা জানি নে। তবে কথাটার চল আছে। প্রতাপাদিত্য নাটকে ভবানন্দের মুখে কথাটা আছে। তা থেকে শিখেছি। সম্ভবত বৃন্দাবনীকাণ্ডের মত কাণ্ড। লোকপ্রবাদ—রাধা নাকি সম্পর্কে কৃষ্ণের মামী হতেন।

রীতুবাবু হাসলে, বললে—তাই।

গোরাবাবু বললে—মোট কথা কলকাতার বাজার তোলপাড়

করেছিলেন বড় বর্তা। সে বড়বাজারে লোহা পট্টি, ক্লাইভ রোয়ে কয়লা পট্টি থেকে সিধে চিৎপুর ধরে সোনাগাছি পর্যন্ত। লোহার বাজার কয়লার বাজারের দালান থেকে শেষের পাড়াটার বাড়িউলি থেকে গুণ্ডারা পর্যন্ত সেলাম বাজাতো বড় কর্তাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিঠে ছুরি খেয়ে মাস দুয়েক বাড়িকেই হাসপাতাল বানিয়ে বেঁচে উঠে কলকাতাকে সেলাম করে দেশে ফিরে এসেছেন। ছোট ভাই ছিল সহকারী ; টুর করতেন, তাঁকে নিজের আসনে বসিয়ে দিলেন। মেজ ভাইয়ের ছেলে ফার্স্ট ক্লাসে পড়ছিল, তাকে পড়া ছাড়িয়ে কলকাতার আপিস ম্যানেজার করে দিয়ে বাড়ি এলেন। দীক্ষা নিলেন। সোনাগাছির ছোঁয়াচ গঙ্গাজলে স্নান করে ধুয়ে ফেলে ও-দিক থেকে একেবারে পাল্টে গেলেন বটে, কিন্তু বিষয়-পিপাসা আর দোর্দণ্ডপ্রতাপপনা একেবারে বিন্ধ্য পর্বতের মত মাথা ঠেলে আকাশ ছুঁয়ে ফেলল। গলায় তুলসীকাঠের মালা, কপালে চন্দনের তিলক নিয়ে ভোরবেলা স্নান পূজা সেরে এসে আসনে বসতেন। চোখের দৃষ্টিতে লোকে ভস্ম না হোক ধপ করে বসে পড়ত। এই বড় কর্তা। সেই বড় কর্তা সেদিন জয়ধরকে এমন স্নেহ করে খাতির করে কথা বলে প্রশংসা করে রাত্রে খোদ বড় গিন্নীর ঘরে নিজের সঙ্গে বসে খাবার নিমন্ত্রণ করতে জয়ধর শুধু অভিভূতই হল না একেবারে বিগলিত মুগ্ধ হয়ে গেল। তার ধারণাই সব বদলে গেল। রাত্রে খেতে বসে সে যখন আবার মাছ খেলে না তখন আবার বড়বাবু হতবাক হয়ে গেলেন। হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। বললেন—বল কি? মাছ খাও না? অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে শুধু তাকিয়েই রইলেন। শুধু তিনি নন, ছোট কর্তা, মেজবাবুর ছোট ছেলে, খোদ বড়গিন্নী এবং তাঁদের সামনে মাছের পাত্র এবং পিতলের হাতা হাতে বড়কর্তার কুমারী মেয়ে সেও বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল জয়ধরের দিকে।

নাটক আমার এইখান থেকে আরম্ভ হবে। এই কথাগুলো ডায়লগের মধ্য দিয়ে খুলতে হবে। ধরুন—

ধরুন—এক রাজা। পুরাণের কালে যাওয়াই ভাল। ধরুন দ্বাপর কি ত্রেতা, না হয় সত্যযুগ। সত্যযুগ ভাল। রামায়ণ মহাভারত ভাগবত তিন পুরাণের কোনটিতেই এ যুগটার পূর্ণ কাহিনী নেই। ধরুন, সত্যযুগে ব্রহ্মার এক মানসপুত্রের বংশ দেববংশের তুল্য ; নাম ধরুন ব্রহ্মমিত্র, তাঁর দুই ভাই বসুমিত্র, দেবমিত্র। হিমালয় অঞ্চলে রাজ্য দেবদ্বার, রাজধানী জয়ন্তীপুর।

হেসে রীতুবাবু বললে—এ যে ইতিহাস ভূগোলের মত মুখস্থ বলে যাচ্ছেন দেবতা! তা হলে তো ছকে ফেলেছেন ফের মনে হচ্ছে!

গোরাবাবু কিছু বলবার আগেই নিচে দরজায় গোপাল ঘোষের সাড়া পাওয়া গেল। সে সিঁথী থেকে ফিরে এসেছে, ডাকছে—নন্দন। শিউনন্দন!

মঞ্জরীর মায়ের মা বাচ্চা শিউনন্দনকে ডাকতেন নন্দন বলে। পুরনো লোকেরা অনেকেই আজও 'নন্দন' বলে। গোপালও মধ্যে মধ্যে বলে। কিন্তু সহজে বলে না। একটু আধটু প্রমত্ততা গোপালের আছে। মধ্যে মাঝে। সেই সময় শিউনন্দনকে বলে 'নন্দন', যোগানন্দকে বলে যোগেশ্বর। বংশীকে বলে বাঁশরীওলা, অর্থাৎ হৃদয়ের আবেগ একটু উথলিত হয়ে ওঠে।

বংশী দরজা খুলে দিতেই সে উপরে উঠে এল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে বললে—দিয়ে এলাম বাবু। ছেলেটার কণ্ডিশন খারাপই বটে।

রীতুবাবু বললে—তা এ কার্যটি কোথা হল ?

কার্যটি অর্থাৎ মদ্যপান।

গোপাল একটু হেসে বললে—কি বলে—কাশীপুরের শ্মশানের পাশে একজন সাধু এসেছেন। সেই বাবার কাছে।

গোরাবাবু বললে—এর মধ্যে সেখানেও গিছলেন না কি ?

গোপাল বললে—হ্যাঁ। কি বলে—বঙ্কিমের বাড়ি গিয়ে দেখলাম ছেলেটি একটু ভাল ; মানে বঙ্কিম যে ক্রাইসিস দেখে কি বলে, ছুটে এসেছিল—সেটা সামলেছে। সে ওই সাধুর কৃপায়। ডাক্তার টাকা নইলে আসবে না, বঙ্কিম টাকার জন্যে কি বলে, এখানে এসেছে—ওদিকে খুব বাড়াবাড়ি, তখন কি বলে, বঙ্কিমের পরিবার পাগলের মত ছুটে যায় ওই বাবার কাছে। বাবার পায়ে আছড়ে পড়ে। বাবা কি বলে, একটু ধুনীর ছাই তুলে হাতে দিয়ে বলেন—যা এই নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দে। বাঁচে তো এতেই বাঁচবে। আশ্চর্য মাস্টার-মশাই, কি বলে, বঙ্কিমের বউ বাড়ি এসে যখন পৌঁছুল তখন একটু সামলেছে ছেলে। তারপর ভস্ম খাইয়ে দেয়। এ দিকে যে ডাক্তার দেখেছিল—টাকা বাকীর জন্য আসে নি, সেও এসে হাজির হয়। বলে, অনেকই তো গেছে, না হয় আর খানিকটাও যাবে। মানে সবই বাবার খেলা রীতুবাবু!

রীতুবাবু মদের নেশায় লাল চোখ দুটো বিস্ফারিত করে শুনছিল। মঞ্জরীর মুখও বিস্ময়ে থম্‌থম্ করছে।

গোরাবাবু একটু হেসে বললে—হুঁ। তা ডাক্তার দেখছে তো? না শেষ ওই ভস্মসারের উপরই রইল ছেলেটা?

—আজ্ঞে না। ডাক্তার ইনজেকসন দিয়েছে তারপর। আমরা কি বলে, যখন গেলাম তখন ডাক্তার ইনজেকশন দিয়ে বেরিয়েছেন, রিক্সাতে উঠবে। আমি তাঁকে নামিয়ে টাকা মিটিয়ে দিয়ে রসিদ নিয়ে বললাম—কি বলে ডাক্তারবাবু—গরীবকে দয়া করে দেখে যাবেন। তা ডাক্তারটি লোক ভাল। কি বলে, একশো টাকার ওপর বাকী। তার উপর কি বলে, বুঝলেন—বাঁচবে নাই ধরে নিয়েছিলেন। তাই আসেন নি। বলেছিলেন টাকা নইলে যাব না। তা পরে কি বলে, বাবার দয়া—বুঝেছেন না, বাবার দয়া, ফিরিয়ে দিয়ে মনে হয়েছে এতদিন দেখে শেষ সময়টা আর না যাওয়াটা কি বলে—ভাল হবে? নিজেই এসেছেন। এসে কি বলে, নিজেও অবাক, বিনা ওষুধেই ছেলের

অবস্থা ভাল। তখন কি বলে, ইনজেকসন দিয়েছেন, প্রেসক্রপসন লিখে ডাক্তারখানায় ওষুধ দিতে লিখে দিয়েছেন। ও ছেলে, কি বলে, বেঁচে যাবে। বাবা, কি বলে, আমাকেও বললেন। কি বলে, এই কাণ্ড দেখে, কি বলে, আমি টাকাকড়ি দিয়ে, কি বলে, একটা বোতল নিয়ে, কি বলে, গেলাম তখুনি। তা কি বলে, দেখলাম, দারুণ সাধু একখানা! কি বলে, হাসি কি—হা-হা-হা-হা—একেবারে কি বলে, গঙ্গাতীর একেবারে যেন খল্‌খল্‌ করে উঠল! বললেন, তুই বেটা তো ভাল লোক রে। বোতল এনেছিস। তা নে, প্রসাদ নে।

গোপাল ঘোষ পার্টের সময় ইমোশন আনতে পারত না বলে ওর ত্রৈলোক্য মা ওকে বলেছিল, গোপাল, তুই ম্যানেজমেণ্টো ভাল পারিস তাই কর। ও অ্যাক্টো করা তোর হবে না। দূত প্রহরী সেজে মরবি। বাঁশী বাজালে বুক যাবে। কথাটা সত্যি। মধ্যে মাঝে লোকের অভাবে গোপাল দু একবার বছরে নামে এবং প্রতিবারই মিনমিন করে অ্যাক্‌টিং কোন রকমে সেরে এসে পোশাক খুলতে খুলতে বলে—বাবা, যার কম্ম তারে সাজে। নে রে শিবু, (বেশকারী শিবু) তোর পোশাক নে। ওরে রাধাচরণ, তেল দে বাবা, তুলে ফেলি কলঙ্ক কালী! কিন্তু আজ এতক্ষণ যে বক্তৃতাটি করলে সে তাতে রাত্রির এই আসরটি জমজমাট হয়ে উঠেছিল। বলার মধ্যে যত আবেগ বলার ভঙ্গির মধ্যেও তেমনি একটানা প্রগল্‌ভতা!

গোরাবাবু হেসে ফেললে—সুরেলা গলা কাপানো বক্তৃতায় যাদের হাসি পায় মনটা তার তাদের মত—সে বললে—এই তো গোপালবাবু, আপনার বক্তৃতা তো বেড়ে আসে। কিন্তু একটা কথা তো বললেন সাংঘাতিক—দারুণ সাধু! সেটা কি রকম বলুন তো!

রীতুবাবু উঠে দাঁড়াল। বললে—কাশীপুর শ্মশানের কোন দিকটায় বলুন তো?

গোপাল ঘোষ বললে—উত্তর দিকে। বাবুদের বাড়ির ধারে বটগাছটা আছে—

গোরাবাবু চমকে উঠে গোপালের কথার মাঝখানেই বললে—সেখানে যাবেন না কি এই রাত্রে?

হাসলে রীতুবাবু—কি করব! দেখে আসি। এই রাত্রে যাব হাওড়া। বাসী নোংরা বিছানা—পলেস্তারা খসা ছাদের টালি—আলকাত্তরা মাখানো পুরনো কড়ি বর্গা; কিংবা পথে যেতে একটা কসবী পাড়া পড়ে, সেখানে যদি কেউ নয়ন নাচায় তবে "ভেবে দেখ মন কত তোরে নাচায় নয়ন" বলতে বলতে ঢুকে পড়ব। হয়তো কালও পড়ে থাকব। তার থেকে যাই না শ্মশানে গঙ্গার ধারে, দেখে আসি গোপালমহারাজের সাধুজীকে। ঘুম পেলে শোবার একটা কম্বল কিংবা চাটাই চাই। তা দে তো শিবনন্দন একটা কম্বল। রঙিটাগ নয়, খাঁটি কম্বল। দে তো বাবা, ভাদ্র মাস, ভিজে মাটি—ওটা না হলে কষ্ট হবে।

মঞ্জরী শুধু একবার বললে—মাস্টারমশাই—

রীতুবাবু বললে—কিছু ভাববেন না প্রোপ্রাইট্রেস, কাল ঠিক এসে হাজরে দেব।

—খেয়ে যান।

—উঁহু। সেও সেইখানে। বরং একটা বোতল আমাকে দিতে হুকুম করুন শিউনন্দনকে। এত রাত্রে দোকান বন্ধ। কোথাও বে-আইনী আড্ডায় গেলে ভয় আছে, যাত্রা ভঙ্গ করে জমে যাব সেইখানেই।

সাত

এ মায়াপ্রপঞ্চ মায়া ভবের রঙ্গমঞ্চ মাঝে—
রঙ্গের নটবর হরি যারে যা সাজান সেই তা সাজে।

ফুটপাথের উপর থেকেই মোটা গলায় গান ধরে চীৎপুর রোডের

আপিসের বাড়ি ঢুকল রীতুবাবু। সেই সেদিন রাত্রে বেরিয়েছিল, ফিরছে আজ চোদ্দদিন পর। ফিরেছে কিন্তু ঠিক দিনটিতে। আজ মঞ্জরী অপেরার নতুন নাটক পড়া হবে, পার্ট ডিষ্ট্রিবিউশন হবে। এর মধ্যে চিঠি একখানা দিয়েছিল রীতুবাবু। বীরভূম জেলার বক্রেশ্বর থেকে। একখানা পোস্টকার্ড। পেন্সিলে লেখা। "সাধু-বাবার সঙ্গে বক্রেশ্বর আসিয়াছি। তারকেশ্বর হইয়া এখান—এখান হইতে সম্ভবত তারাপীঠ। সাধুকে ভাল করিয়া কষট্ করিয়া না দেখিয়া ফিরিব না। বারো দিনের কড়ার আছে। আপনার দাতুর শ্রাদ্ধে থাকিতে পারিলাম না, তাহাতে লজ্জা হইতেছে। কিন্তু উপায় নাই। মোট কথা তের চোদ্দ দিন হইবে। শ্রাদ্ধের কাজে গোপাল আছে, ভাবনা নাই। ইতিমধ্যে বই শেষ করুন। বই আপনি ফের শুরু করিয়াছেন তাহা সেই দিনই বুঝিয়াছি। আমি ঠিক পঁহুছিব। ইতি রীতু বোস।"

এমন কাজ রীতুবাবুই পারে। গোরাবাবু হেসেছিল। মঞ্জরী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল, বলেছিল—সংসারে উনি বেশীদিন থাকবেন না দেখো।

গোপাল ঘোষ ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল—তা উনি পারেন। কথাটা ঠিক বলেছ মা।

গোরাবাবু বলেছিল—ঠিক ফিরবেন উনি।

মঞ্জরী বলেছিল—তা কি করে বলছ?

বাবুল বোসও সেদিন উপস্থিত ছিল, অলকাও ছিল। রীতুবাবুর অনুপস্থিতিতে বাবুলই সন্ধ্যেতে চীৎপুরের আপিসে রীতুবাবুর কাজ করছিল; ওখানে যাবার আগে গোরাবাবু মঞ্জরীর সঙ্গে দেখা করে তবে যেত। সেদিনই চিঠিখানা বিকেলের ডাকে ওদের সামনেই এসেছিল। মঞ্জরীর কথাটায় বাবুল বলে উঠেছিল—কি করে বলছেন? উনি অঙ্ক কষে বলছেন। আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড। সিগারেট প্লাস মদ ইজ ইকোয়াল টু অ্যাটলিস্ট ওয়ান রুপী টুয়েল্‌ভ্‌ অ্যানাস। প্লাস—দু বেলা

রাইস কারি। অ্যাণ্ড তার উপর কণ্ট্রোলের বাজার। ডেলি বেগিংএ কত? যতই হোক একটা তার পরেরটা প্লাস হবে না মাইনাস। সো, বিগ ব্রাদারকে ফিরতেই হবে।

গোপাল বললে—আপনি জানেন না বোসবাবু। কি বলে, বৈরাগ্য হলে না—

গোরাবাবু হেসে বলেছিল—তা ঠিক, বৈরাগ্য হলে সিগারেট মদ ছাড়াও যায়। আবার সিগারেট মদ গাঁজা, খাওয়াদাওয়া কিছুরই অভাবও হয় না। মঠ বনে যায় বনের মধ্যে শ্মশানের পাশে? কিন্তু কি জানেন গোপালবাবু, অ্যাক্‌টিং করে হাততালি পাওয়া যায় না, রঙচঙ মেখে সাজপোশাক করে দেবদৈত্য ব্রহ্মাবিষ্ণু নাদির শা আলমগীর সাজা যায় না। ও যে একবার এতে মজেছে না—সে ঈশ্বর এলে বলবে, প্রভু, সাজঘরে গিয়ে রঙ মেখে সেজে গান গাইতে গাইতে এস। এমনি জমবে না। রঙ না মাখলে ও মুখ চোখ ধরবে না।

হেসে উঠেছিল বাবুল। গোপালও হেসেছিল। মঞ্জরীও স্বীকার করেছিল—তা বলেছ ঠিক।

অলকা সেদিন মুগ্ধ হয়েছিল গোরাবাবুর কথা শুনে। বলেছিল—ভারী সুন্দর বলেছেন।

গোরাবাবু লিখতে লিখতেই কথা বলছিল, এর পর আবার লেখায় মন দিয়েছিল। বলেছিল—যাও, তাঁর জন্যে ভেবো না—সে হবে। রীতুবাবু না আসেন অন্য লোক নেওয়া যাবে। ওঁকে ব্রহ্মমিত্র দেব ভেবেছি, যদি ওটাই বড় হয়, কেটে খাটানো না যায়, তখন ওটা আমি করব। তরুণ নায়ক জয়ন্তের পার্টে অন্য লোক নেব। নতুন ভাল ছেলে অনেক পাব।

বাবুল বলেছিল—আমি এনে দেব। পছন্দ না হলে মূল্য ফেরত। গ্যারান্টি রইল। রাণু লাহিড়ী বলে এক ছোকরা আছে, ওয়াণ্ডারফুল!

—সে হবে। এখন গিয়ে আসর বসাও। অলকা, তুমি জনাতে

মোহিনীমায়ার নাচটা ঠিক করে নিয়ো। রিহারস্যাল দিয়ো। ওটা আমাদের স্টক প্লে, আর সতীতুলসীতে শ্রীকৃষ্ণ। বুঝেছ।

গোপাল বলেছিল—বইটার নাম পেলে ভাল হত। ওরা সব হ্যাণ্ডবিল বের করছে। রয়েল বীণাপাণি খুব বাহারের হ্যাণ্ডবিল বার করেছে—বিদ্যাবিনোদের উত্তরা খুলছে ওরা।

গোরাবাবু মুখ তুলে একটু ভেবে নিয়ে বলেছিল—আমাদের নতুন বই 'গন্ধর্ব কন্যা'।

রীতুবাবু এসে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে সেই সহাস্য মুখে বললে—যথাসময়ে প্রবেশ করেছি স্যার।

গোরাবাবু হেসে বললে—আসুন। আমি জানতাম আপনি যথাসময়ে আসবেন।

রীতুবাবু বললে—সাধে কি আপনাকে দেবতা বলি স্যার।

বাবুল বললে—আমিও বলেছিলাম, কি মাই লর্ড, বলি নি?

—বলেছিলে। কিন্তু সেটা বলেছিলে, সিগারেট আর পানীয়ের জন্যে।

রীতুবাবু বললে—দূর দূর। আজ সাধুর পাল্লায় পড়ে আট দিন স্রেফ বিড়ি আর ছোট কল্কের উপর চালিয়ে এসেছি। পকেট ফাঁক, পাব কোথায়? শেষে হাতের আংটি বেচে রামপুরহাটে শা কোম্পানীর দোকানে এক পাঁট রাম কিনে বাকিটায় টিকিট কেটে ফিরেছি।

বাবুল বললে—তা হলেও হাফউইথড্র বলেছি স্যার। দেন (Then) দেবতা না হতে পেরে থাকি উপদেবতা নিশ্চয় হয়েছি। কি বিগ ব্রাদার?

—নিশ্চয়। 'সন্দেহ নাহিক ইথে আর।' কিন্তু বইখানার নাম তো বড় ভাল দিয়েছেন। 'গন্ধর্ব কন্যা'। খাসা নাম হয়েছে।

—এর মধ্যে দেখলেন কোথায়?

সিঁড়ির মুখে দরজার পাশে হ্যাণ্ডবিল সেঁটেছে গোপাল। পড়ে উঠেছি। ভাল নাম। তা নমো রামকৃষ্ণায় বলে সুরু করে দিন। বিলম্ব কিসের ?

—অলকার জন্যে অপেক্ষা করছি।

রীতুবাবু চারিদিক তাকিয়ে দেখে বললে—কই, যোগা মাস্টার কই ? সে কোথায় ?

গোরাবাবু বললে, তাকে আমি বাদ দিয়েছি।

—কি ব্যাপার ?

গোরাবাবুর কণ্ঠস্বরে এবার মালিক সাড়া দিলে, বললে— কারণটা আমি বলতে চাই নে মাস্টারমশাই !

মঞ্জরী নত দৃষ্টিতে মেঝের দিকে তাকিয়ে বললে—ও আলোচনাটা থাক।

আসরটা কেমন যেন থমথমে গম্ভীর হয়ে উঠল। শোভা ওপাশে বসে এতক্ষণ ধরে কথা বলবার সুযোগ খুঁজছিল, অলকার কথা উঠবার সময়টিতেই সে এক ঢিলে দু পাখী মারবার মত একটি কথাও ঠোঁটের ডগায় এসেওছিল তার ; অপেক্ষা করছিল রীতুবাবু বলবে—কেন, তার হল কি ? কিংবা 'তার দেরী কেন ?' সঙ্গে সঙ্গে সে বলবে ভেবেছিল 'সে তোমার বিরহে গড়ের মাঠে গাছতলা সার করেছে।' শোভা কদিন আগে নাটু আর গোপালীর সঙ্গে চিড়িয়াখানা গিয়েছিল দশটার সময়। যাবার পথে সে অলকাকে এসপ্লানেডের পার্কে একটা গাছতলায় একটি ভদ্রবেশী লোকের সঙ্গে কথা কইতে দেখেছে। কথাটা গজ্‌গজ্‌ করছে তার পেটে। বলেছেও কজনকে। কিন্তু এমন আসরে অলকার অনুপস্থিতির সুযোগে একসঙ্গে রীতু এবং তাকে জড়িয়ে কথাটা বলবার জন্য তার প্রাণটা যেন হাঁসফাঁস করে উঠেছিল। কিন্তু রীতুবাবু অলকার কথাটা একবারেই চাপা দিয়ে যোগাবুড়োর কথা পেড়ে বসল। এবং সঙ্গে সঙ্গে কর্তাগিন্নীর কথার সুরে ঢঙে থমথমে হয়ে উঠল।

গোরাবাবুই নিস্তব্ধ আসরটিকে কথা বলে চালু করে দিলে—কই গোপালবাবু, চা-টা কই আপনার ? মাস্টারমশাই এলেন—

—এই আনছে। সিঁড়িতে উঠছে চা নিয়ে।

—নিন, ততক্ষণ সিগারেট সুরু করুন। নাও দিলদার।

দিলদার হল বাবুল বোস।

একই সঙ্গে চা-ওলা এবং অলকা ঘরে ঢুকল। অলকার পরনে আজ একখানা ঘোর লাল রঙের রেশমী শাড়ি, ঘরটা ঝিকমিক করে উঠল। বললে—আমার দেরী হয়ে গেছে। বিকেলবেলা যা ভিড় !

বাবুল বললে—রাবিশ। তুমি ঘর থেকেই বের হও নি। আমি চারটে পর্যন্ত তোমার জন্যে ওয়েট করেছি।

শোভা বলে উঠল—না না বাবুলবাবু। এসপ্লেনেডে—গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। যা ভিড়। ট্রামের পর ট্রাম চলে যায় ; তবু ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

গোরাবাবু বললে—আর না। চুপ সব। চা দাও হে। আমি আরম্ভ করছি।

রাঁতুবাবু বললে—জয় কালী ! জয় রামকৃষ্ণ !

গোরাবাবু কপালে হাত ঠেকিয়ে খাতাটা টেনে নিলে। বললে—'গন্ধর্ব কন্যা'।

* *

—পাত্রপাত্রী হল— ; না, তার আগে স্থান কালটা বলে নি। কাল সত্যযুগ। স্থান হল হিমাচল ভূমিতে দেবদ্বার ; রাজধানী জয়ন্তীপুর। এরপর পাত্রপাত্রী।

ব্রহ্মমিত্র—দেবদ্বারের অধিপতি—ব্রহ্মার মানসপুত্র বংশোদ্ভব।

বসুমিত্র—ব্রহ্মমিত্রের কনিষ্ঠ।

ভরদ্বাজ—ব্রহ্মমিত্রের মন্ত্রী।

জয়ন্ত—বৃহস্পতির বংশোদ্ভূত পিতৃমাতৃহীন যুবক।

কামন্দক—রাজসভায় বয়স্য (তরুণ)।

সঙ্গে সঙ্গে সকলের দৃষ্টি পড়ল বাবুলের উপর। এ পার্ট বাবুলের।

বাবুল বললে—হোয়াই তরুণ স্যার, মেক মি ওল্ড।

গোরাবাবু বললে—উঁহু, কামন্দক রাজার রাজত্রাতার এমন কি রাজজামাতা জয়ন্তেরও বয়স্য।

—দেন (Then) বুড়ো করুন, বুড়ো করুন। নাতি ঠাকুরদার মত রসিকতার রসের মিছরী বানিয়ে দেব।

গোরাবাবু বললে—পরে সে সব হবে বাবুলবাবু। মাঝ জায়গায় এ ধারার আলোচনা করার নিয়ম নেই আমাদের।

—ও-কে। এখন থেকে আমি বোবা—মানে ডাম্ব।

গোরাবাবু হেসে বললে—থ্যাঙ্ক য়ু।

তারপর সকলের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে বললে—মোটামুটি কাকে কোন্ পার্ট দেব আমার একটা ঠিক আছে। রিহারস্যালে হয়তো বদল হতে পারে। সে সবই মাস্টারমশাই প্রোপ্রাইট্রেস এঁদের পরামর্শ মতই হবে। আবার পার্টেও কিছু বদল করতে হতে পারে। তখন বয়স্য যদি বুড়ো হলে ভাল হয়, তাই হবে।

—থ্যাঙ্ক য়ু। বাবুল বোস কথাটা বলে উঠল, ঠিক যে ভাবে ঘড়ি বড় কাঁটাটা বারোটায় ঠেকলেই সঙ্গে সঙ্গে বেজে ওঠে সেই ভাবে। বলেই কিন্তু বললে—আমার কিন্তু দোষ নেই স্যার!

রীতুবাবু বললে—ও-কে লিটল ব্রাদার। রঙ্গের নটবরের ওটা কৌতুক। যিনি নটবর তিনিই মাধব।

—"মূকং করোতি বাচালং"—মাধবের সেটা দয়া। কিন্তু মাধব যখন নটবর হন তখন কৌতুক করে করেন। নিন স্যার, আরম্ভ করুন।

গোরাবাবু বললে—পশ্চিমের জানলাটা কে খুললে? অ। কিন্তু আলোটা আসছে ভাল। তবে—। অলকা, তুমি একটু সরে বস। তোমার সিল্কের শাড়ির লাল রঙের উপর রোদ পড়ে ছটাটা আমার চশমায় লাগছে।

কথাটা সত্যি। গোরাবাবুর চশমায় তো লাগছেই, তা ছাড়াও গোটা ঘরটায় লালচে আভা ছড়িয়ে পড়েছে। কম আর বেশী।

শোভা মৃদুস্বরে বললে—একটু সরলেই হবে, ছটাটা বাবুল আর মোট্‌কা মিনসের মুখে ঝলবে। বলেই সে গোপালীর হাতের আঙুলে চিমটি কাটলে। গোপালী প্রথমটায় বললে—উঃ। কিন্তু তারপরই হাসতে লাগল।

মঞ্জরী তার দিকে বিরক্তিভরে তাকালে। গোরাবাবু বলে উঠল—এই ঠিক হয়েছে। হ্যাঁ, তারপর পাত্রদের মধ্যে আছে ইন্দ্র, ব্রহ্মা, শাপভ্রষ্ট বৃহস্পতি জয়ন্তকুমারের পিতামহ।

রীতুবাবু অতি মৃদুস্বরে বললে—হুঁ। সেই মনুষ্যটি!

গোরাবাবু বলেই গেল—দেববৃন্দ, সেনাপতি, দূত ইত্যাদি। এইবার নারী চরিত্র হল—

সর্বাণী—রাজা ব্রহ্মমিত্রের মহিষী। দেবকন্যা।

শুচি—ঐ কন্যা, দেব অংশভূতা। পরে জয়ন্তের পত্নী।

কুসুমিকা—শাপগ্রস্ত গন্ধর্ব বংশীয়া গায়িকা।

মালবিকা—কুসুমিকার কন্যা।

এ ছাড়া সখী, পরিচারিকা, গন্ধর্ব কুমারীগণ।

গোরাবাবু খাতা থেকে মুখ তুলে একটা সিগারেট ধরালে। রীতুবাবু হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা আকর্ষণ করলে। সন্ন্যাসী সঙ্গ ফেরত রীতুবাবুর পকেটে আজ সিগারেট নেই। টাকাপয়সাও তাই। গোরাবাবু একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে দেখলে—দরজার মুখে দাঁড়িয়ে গোপাল।

সুযোগ বুঝে গোপাল গলা ঝেড়ে ইঙ্গিত দিলে—কথা আছে।

গোরাবাবু বললে—কি?

গোপাল ঘোষ বললে—ইউসুফ চুলওয়ালা এসেছে। বসতে বলব আজ? দিন তো আর নেই।

—বসতে বলবেন?

শোভা ফাঁক পেয়ে গোপালীর কানে কানে বললে—হ্যাঁলা, ছুঁড়ির লিপষ্টিকের ছটা লাগছে না ওদের চোখে?

গোপালী মুখে কাপড় চাপা দিলে।

—দেখ দেখ, মোট্‌কা মিনসে ছুঁড়িটাকে যেন গিলছে লো!

গোপালী এবার কাপড় মুখের ভেতর গুঁজলে।

গোপালবাবু বললে—আজ থাক, কাল আসতে বলুন। কি গো?

মঞ্জরী পানের বাটা খুলেছিল, সে বললে—সেই ভাল। বরং কাল সকালের দিকে আসতে বল।

—তাই।

—হ্যাঁ। প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য। জয়ন্তীপুরের প্রাসাদ প্রাঙ্গণ। পুরমহিলা একদল পূর্ণকলসী নিয়ে গান গেয়ে চলে গেল। পিছনে প্রবেশ করলে ভরদ্বাজ—ব্রহ্মমিত্রের মন্ত্রী—তার সঙ্গে একদল লোক, তাদের হাতে ধ্বজাপতাকা—তারা সব নাগরিক, তারা তুই পাশে পতাকা ধরে দাঁড়াল।

মন্ত্রী বললে—

—দেবদ্বার রাজ্যে আজ শুভদিন। জয়ন্তীপুরের
প্রাসাদের বিষণ্ণ অন্ধকার অবসান এতদিনে।
পরাও আলোর মালা—উড়াও পতাকা—
প্রোষিতভর্তৃকা জয়ন্তীপুরের পতি দীর্ঘদিন
পর গৃহে ফিরেছেন। আর নাই
অসুর বা দৈত্যদল অভিযান ভয়—
প্রত্যাগত ব্রহ্মমিত্র অমিত বিক্রম।—নাচ গাও—
আলোয় আনন্দে জয়ন্তীপুরের মুখ
উঠুক প্রদীপ্ত হয়ে সীমন্তিনী সম! বল সমস্বরে—
দেবদ্বার জয়ন্তীনগর জয় জয় জয়—
জয় মহারাজ অধিরাজ ব্রহ্মমিত্র জয়!

সাড়া উঠল কিন্তু ক্ষীণ স্বরে।

মন্ত্রী বললে—এ কি ? এর নাম জয়ধ্বনি ? প্রাণহীন,
বিষণ্ণ নিস্পৃহ কণ্ঠে একি জয়ধ্বনি ?

একজন এবার বললে—ক্ষমা করবেন মহামাত্য। মহারাজ সত্যই কি ফিরেছেন ?

—অবিশ্বাসের হেতু শ্রেষ্ঠীবর ?

—তাও কি আপনাকে বলতে হবে মহামন্ত্রী ? আজ দীর্ঘ দশ বৎসর মহারাজ ব্রহ্মমিত্র অমরাবতীবাসী। রাজ্য শৃঙ্খলা হারাল, অসুরকুল দৈত্যকুল সুযোগ বুঝে আজ দশ বৎসর সীমান্ত জনপদগুলি বিধ্বস্ত করলে, লুণ্ঠন করলে। দেবলোকে সংবাদ গেল, মহারাজ এলেন, দৈত্য অসুরেরা অপরাজেয়, দেবপ্রসাদধন্য ব্রহ্মমিত্রের আগমন জেনে আপন আপন রাজ্যে গিয়ে লুকোল। মহারাজ হেসে দেবদ্বারের অধিবাসীদের ব্যঙ্গ করে আবার কয়েকদিন পর দেবলোকে চলে গেলেন। অমরাবতীর ঐশ্বর্যবিলাস, সেখানকার দেবপ্রসাদ, সেখানকার—

—ভয় কিসের ? থামলেন কেন ? পুণ্যভূমি সামন্তরাজ, আজ ভয়ের কথা নয়। স্পষ্ট করে বলুন, সেখানে নৃত্যগীত গন্ধর্বলোকের বিলাসব্যসনে তপস্যাধন্য ব্রহ্মাবংশধর ব্রহ্মমিত্র আবার ভুলে গেলেন দেবদ্বারের প্রজাদের। শুধু প্রজা কেন, তাঁর মহিষী, তিনি দেবকন্যা দেবী সর্বাণী একমাত্র কন্যাকে বুকে চেপে ধরে নিজের অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিলেন। বিষ্ণুপাদপদ্মে তাঁর অশ্রুধারায় নূতন গঙ্গার সৃষ্টি করলে, তবু মহারাজের মোহমুক্তি হল না। অসুরদের সঙ্গে সংগ্রামে তাঁর মধ্যম ভ্রাতা শিবমিত্র প্রাণত্যাগ করলেন। মহারাজ এলেন, প্রচণ্ডবিক্রমে সংগ্রাম করে অসুররাজকে নিহত করে শোধ নিয়ে, দেবদ্বারের মানুষদের কাপুরুষ আখ্যা দিয়ে, ধিক্কার দিয়ে আবার চলে গেলেন বিজয়দৃপ্ত পদক্ষেপে, পশ্চাতে রেখে গেলেন অবজ্ঞার দৃষ্টি। তাঁর কন্যা, দেবী-অংশ-সমুদ্ভূতা দেবী শুচি বালিকা, তার কচি দুখানি হাত দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিল, শুনেছি তিনি নিজেই তার হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন।

মহামন্ত্রী ভরদ্বাজ বললেন—

সত্য—সব সত্য নগরের শ্রেষ্ঠ নাগরিক—
বিজ্ঞবর দ্বিজকুলোত্তম—সব সত্য। তারপর
এই এতকাল পাঁচটি বৎসর বসুমিত্র
কনিষ্ঠ কুমারে লয়ে দেবদ্বার প্রজাবৃন্দ—
অসুর দৈত্যের সাথে হীন সর্তে সন্ধি করি—
বৎসর বৎসর নিজেদের অন্নবস্ত্র ক্ষয় করি
দিয়েছি সম্মান পণ। সব সত্য। কিন্তু আজ
তারও চেয়ে সত্য আমি অকম্পিত কণ্ঠে
করিনু ঘোষণা। মহারাজ ব্রহ্মমিত্র এসেছেন
ফিরে। অমরাবতীর মোহ বিলাসবাসনা
সব ধুয়ে মুছে মন্দাকিনীনীরে ফিরেছেন
দেবদ্বারে। পণ তাঁর, মৃত্যুকাল পর্যন্ত কখনও
দেবদ্বার পরিত্যাগ নাহি করিবেন।
দেবদ্বার প্রজার কল্যাণ দেবদ্বার মৃত্তিকার
সেবা—আজই হতে তপস্যা তাঁহার।
আরও সত্য কহি, রক্ত ঢেলে দিয়ে—
মহারাজ ব্রহ্মমিত্র মোহমুক্ত আজি।

সামন্ত : সত্য সত্য? সত্য মহামন্ত্রী?

মন্ত্রী : ঈশ্বরের নাম নিয়ে ত্রিসত্য করিয়া কহি—
অবশ্য আমার বিশ্বাস মত আমার বিচার মত—
ইহা সত্য ইহা সত্য—ইহা সত্য।

শ্রেষ্ঠী বললেন—

রক্ত ঢেলে মুছেছেন বিলাস বিভ্রম মোহ—
এর অর্থ জিজ্ঞাসা কি অপরাধ হবে?
—অপরাধ নয়। তবে অনুরোধ করি—
এর অর্থ করো না জিজ্ঞাসা। শুধু

আমারে বিশ্বাস করো। সমাদর
করি সোল্লাসে বরণ করো। যেন
মহারাজ স্বচ্ছন্দে সবার মাঝে
সিংহাসনে বসি, অতীত কর্মের লাগি
কোন গ্লানি অনুভব না করেন মনে।
তা হলে দেখিবে শ্রেষ্ঠী, মহারাজ
ব্রহ্মমিত্র সেকালের ব্রহ্মমিত্র হতে
গরীয়ান শতগুণে। ন্যায়ে ধর্মে প্রজার কল্যাণে
দেবদ্বার স্বর্গরাজ্য হতে শতগুণে
হবে গরীয়সী।—ব্রহ্মমিত্র ফিরেছেন
স্বর্গ হতে পূর্ণতর হয়ে।

সামন্তপতি বললেন—

তবে বলো সবে—জয় দেবদ্বার—
জয় জয়ন্তীনগরী। জয় জয় মহারাজ
ব্রহ্মমিত্র জয়।

সকলে প্রতিধ্বনি করলেন সমস্বরে।

শ্রেষ্ঠী বললেন—

জ্বালাও আলোকমালা নগরের প্রতি গৃহমাঝে—
গৃহশীর্ষে তুলে দাও দেবদ্বার ধ্বজা—
উচ্চকণ্ঠে তোল জয়ধ্বনি।
নৃত্য গীতে উৎসব মুখর কর
জয়ন্তীনগরী! গাও, গাও নর্তকীগণ।
গাও, নৃত্য কর। নৃত্যগীতে, নাট্যশাস্ত্রে
সুপণ্ডিত ব্রহ্মমিত্র দেবতা পূজিত
তাঁহার তৃষিত চিত্ত তৃপ্ত করো সবে।

পতাকা উড়িয়ে জয়ধ্বনি দিলে সকলে—তারই মধ্যে প্রবেশ করলে একদল নর্তকী। তারা গাইলে নাচলে—

সজল নয়ন মুছে ফেলে সই কাজলের রেখা টানো—
বিরস অধর সরস করিয়া রঙীন মাধুরী আনো—
টানো টানো, আনো আনো ; বিরহের অবসানো !
সে যে ফিরেছে, সে যে ফিরেছে সে কথা কি নাহি জানো ?
সাজো সাজো লাজ রাখো—
কুসুম পরাগ চয়ন করিয়া বয়ানে যতনে মাখো—
যতন করিয়া চাঁদের মতন সিন্দূর টিপ আঁকো—

বংশী ঝুঁকে পড়ে গানের কথাগুলো শুনছে। তার চোখ দুটি বড় হয়ে উঠেছে। ওর দৃষ্টিতে সুরের ভাবনা ভেসে উঠেছে। ডান পাখানা হাঁটুর ভাঁজে নাচছে। আশা ঘাড় নাড়ছে। শুধু ওরা দুজনেই নয়, আরও অনেকেই গানের ছন্দের ও মিলের সঙ্গে তাল রেখে দুলছে, নড়ছে, ঘাড় নাড়ছে। অলকার চোখেও একটা ঘোর নেমেছে যেন। রীতুবাবুও ছন্দের ঝোঁকে ঝোঁকে হুঁ-হুঁ করে

গোরাবাবু পড়লে—এলানো অলক ভুবন ভোলানো, তাই রাখো, কথা মানো— ।

থেমে গেল সে।

রীতুবাবু বললে—ওয়াণ্ডারফুল, কিন্তু শেষ হল না তো দেবতা !

গোরাবাবু সিগারেট ধরালে। বললে—হবে আর কটা লাইন। মনের মত হয় নি বলে এতে লিখি নি। ফাঁক রেখেছি।

বাবুল বলে উঠল—লে হালুয়া। এলানো অলক ভুবন ভোলানো, কিন্তু কাল যে বব ছাঁটার মাই লর্ড। ওতে শাম্পু করাটা লাগিয়ে দিন মাই লর্ড ! লাগেও বেশ।

অলকা একটু নড়েচড়ে বসল। সে অস্বস্তি বোধ করছে। সে চুল শাম্পু করে। মঞ্জরী মাথার ঘোমটা একটু টেনে দিলে—তার চুল আজ এলানো আছে।

রীতুবাবু হেঁকে উঠল—অর্ডার! অর্ডার!

গোরাবাবু পড়তে সুরু করলে—

"বন্ধ করো বিলাস বিভ্রমভরা নৃত্যগীত—
ত্যাগ করো বিলাসিনী বেশ—নয়নে
কটাক্ষ মুছে ফেল ; ও নহে আমার তরে আর।
ব্রহ্মমিত্র নৃত্যগীত বিলাস বিভ্রম রূপসীর রূপ মোহ
সবকিছু ত্যাগ করিয়াছে। এ আমার নবজন্ম।"

গোরাবাবু বললে—মহারাজ ব্রহ্মমিত্র প্রবেশ করলেন। সঙ্গীত নৃত্য সব স্তব্ধ হল। উপস্থিত সকলে এ ওর মুখের দিকে চাইলে। মহারাজের অঙ্গে রাজবেশ, কিন্তু তাঁর মণিমুক্তার মালার মধ্যে রুদ্রাক্ষের মালা রয়েছে। রাজার চেয়েও তপস্বীর রূপ বড় হয়ে উঠেছে। মহারাজ এই স্তব্ধতার মধ্যে বললেন, মহামাত্য, আমি তো আপনাকে জানিয়েছিলাম যেন উৎসব কিছু না হয়। দেবদ্বারে আমি রাজত্ব করতে ফিরি নি—অমরাবতী থেকে আমি ফিরেছি—প্রায়শ্চিত্ত করতে। তপশ্চর্যা করতে। জানাই নি?

মন্ত্রী ভরদ্বাজ মাথা নত করে বললেন, স্বীকার করছি মহারাজ! আপনার সে আদেশ আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু মহারাণী আমাকে বলেছিলেন, মহামাত্য—মহামাত্যের কথা ঢেকে দিয়ে শঙ্খধ্বনি এবং হুলুধ্বনি ধ্বনিত হয়ে উঠল। সকলে দেখতে পেলে অন্তঃপুর প্রবেশ-পথ মুখে স্বয়ং মহারাণী দেবী সর্বাণী প্রবেশ করছেন, তাঁর সঙ্গে অন্তঃপুরচারিণী—তাদের হাতে বরণডালা। হাতে শাঁখ। একজনের হাতে ভৃঙ্গার। মহারাণী বললেন, আমি বলেছি মহারাজ—বলেছি, সুদীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির পর যে দিন মেঘ এসে উদয় হয় সেদিন জীবকুলে তৃণগুল্মলতা উদ্ভিদকুলে যে সহজ আনন্দ উৎসবের মত উৎসারিত হয়, সে আনন্দপ্রকাশে নিষেধাজ্ঞা সে কি মেঘেরই দেবার অধিকার আছে

মহারাজ বললেন—

দেবি, বলিবার কিছু নাহি মোর, দেবকুল কন্যা
তুমি ; এ কথা তোমার মুখে সাজে। তুমি
পার হাসিমুখে অনুতপ্ত জনে—অপরাধ
ভুলি ক্ষমা করিবারে। মানুষ পারে না।
মহাশক্তি আদ্যাশক্তি যিনি—তিনিই তো
ভ্রান্তিরূপা ; মানুষেরে ভ্রান্তিতে ভুলায়ে—
কৌতুক অপার তাঁর। এই দেখ দেবি—
পৃষ্ঠে মোর কি গভীর ক্ষত চিহ্ন !
এই ক্ষত মুখে সেই ভ্রান্তি দেবতার
পূজা দিয়ে—পেয়েছি পরম সত্যে !

মহারাণী শিউরে উঠে বললেন—

এ কি মহারাজ ! কি গভীর ক্ষতচিহ্ন !—
হায় প্রভু—পেয়েছ কি কঠিন যন্ত্রণা !

মহারাজ বললেন—

তার চেয়ে পেয়েছি হে দেবী কঠিন কঠোরতর
মানস-যন্ত্রণা ! দেহের যন্ত্রণা হতে
কঠিন সহস্র গুণে ! শুন দেবি—শুন সবে
অমাত্য তোমরা। সত্য কথা বলিবার আছে
প্রয়োজন। দেবলোকে অবস্থানকালে
বিদ্রোহী অসুরকুল দমনের পুরস্কার
ব্রহ্মমিত্র লভেছিল দেবরাজ প্রীতি—
সুপ্রচুর অনুগ্রহ। দেবতাকুমারগণ সাথে
সম অধিকার। সেই অধিকারে—
আর নৃত্যগীত-শাস্ত্রে অধিকার হেতু
অপ্সর গন্ধর্বলোকে ব্রহ্মমিত্র
হয়েছিল দেবতা সমান। বিলাস বিভ্রম
নৃত্যগীত সুধাপানে প্রলাপ প্রমোদ আর

প্রমোদ লীলায় দিন কেটে যেত। একদিন
এরই মাঝে গন্ধর্বলোকের প্রান্তে
বিষ্ণুর মন্দির অঙ্গনে দেখিলাম
অপরূপা এক কন্যা—বিষ্ণু নামগান
গাহি করে পূজা নিবেদন। জিজ্ঞাসিনু
পরিচয়। জানিলাম—অভিশপ্তা
গন্ধর্ব তনয়া, নাম তার কুসুমিকা।
দেবলোকে অভিশপ্তা—হেতু তার
দেব মনোরঞ্জনে সে করিয়াছে
অস্বীকার, দেবতা প্রসাদ—মণি রত্নমালা
ফিরায়ে দিয়েছে সবিনয়ে। ভ্রান্ত আমি
তার কাছে করিলাম মুগ্ধ হয়ে প্রণয় জ্ঞাপন।
নাম তার কুসুমিকা। মোর পরিচয় শুনি—
সাগ্রহে আমার প্রেম করিল গ্রহণ।
সেইখানে—আজ দীর্ঘ ষোড়শ বৎসর
কেটেছে আমার। দেবকুল কন্যা মহিষী আমার
দেব-অংশোদ্ভূতা কন্যা—লক্ষ্মীরূপা শুচি,
রাজ্য দেবদ্বার, বংশের গরিমা, সব তুচ্ছ
করি গন্ধর্বলোকের প্রান্তে উদ্যান রচিয়া
বসবাস করিয়াছি। ইহলোক পরলোক সব
তুচ্ছ হয়েছিল। সহসা ভাঙিল ভ্রম।
একদিন দেবরাজ কুমার জয়ন্ত—
নিমন্ত্রিলা অন্য এক অপ্সরা আলয়ে—
গীতবাদ্যে সুকঠিন রাগের আলাপ হেতু।
গিয়েছিনু আমি। রাত্রিশেষে ফিরিবার পথে
পৃষ্ঠে হল ছুরিকা আঘাত। আততায়ী
পলাইল—কিন্তু পরিচয় তার

রহিল না অজ্ঞাত আমার। আততায়ী—
হিংসাতুরা কুসুমিকা নিযুক্ত সে জন।
পত্নী মোর দেবকন্যা সয়েছে আমার ক্রটি,
আমার অমার্জনীয় পাপ। কিন্তু হায়,
দেহ-ব্যবসায় বৃত্তি যার—সে সহিল না।
আমার ঘুচিল ভ্রম। পণ করিলাম
প্রায়শ্চিত্ত তপস্যায় দেবদ্বার কল্যাণ সাধনে—
অবশিষ্ট কাল আমি করিব যাপন।
নৃত্যগীত নয়—আলোক উৎসব নয়—
শান্ত-নম্র অনুতপ্ত জনে—
বিনা আড়ম্বরে মোরে করহ গ্রহণ—
ধন্য হব আমি।

দ্বিজবর বললেন—

ধন্য ধন্য তুমি মহারাজ—সত্যবাদী ব্রহ্মমিত্র
সত্যে তুমি রেখেছ মাথায়। ভ্রান্তিরূপা
মহামায়া কঠিনা নিষ্ঠুরা—
তার ভ্রান্তিরূপে, ভুলে যেই তার পিছু ধায়—
লয়ে যায় তারে মৃত্যুপুরদ্বারে—তারপর
অকস্মাৎ ঘুরিয়া দাঁড়ায় কালরাত্রি
মহাতামসিনী রূপে। শুধু তুমি সত্যের নিষ্ঠায়
তারে করিয়াছ প্রীত। তারই বরে হবে তব সার্থক
জীবন। মহারাণী—জননী মোদের—
করহ বরণ মহারাজে। বন্ধ কর নৃত্যগীত।
বন্ধ কর বিলাসবিভ্রম। মহারাজ সাথে
দেবদ্বারে মানুষের আরম্ভ হউক—
সুকঠিন চরিত্র তপস্যা নবজীবনের।
আশীর্বাদ করি—অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।

মহারাণী নতজানু হয়ে বসে প্রণাম করলেন। কপালে ফোঁটা দিলেন। শঙ্খ বাজল। বললেন, আসুন মহারাজ, পুরঃপ্রবেশ করুন।

মহারাজ বললেন, কিন্তু মহারাণী—

—কি মহারাজ?

—মনে আমার কঠিন প্রশ্ন জেগেছে—আমার পা উঠছে না।

—কি মহারাজ?

—সত্য বল, যাদের রেখে গিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে শিবমিত্র যুদ্ধে হত আমি জানি। বাকী সব? তাদের সকলকে পাব তো আমি?

—হ্যাঁ মহারাজ সবার মঙ্গল।

—কই, বসুমিত্র কই? প্রিয়তম কনিষ্ঠ অনুজ!

মন্ত্রী বললেন, কুমার বসুমিত্র সীমান্ত থেকে রওনা হয়েছেন। তিনি সীমান্তে ছিলেন। কোন অনিবার্য কারণে হয়তো ঠিক সময় মত এসে পৌঁছতে পারেন নি। এসে পৌঁছলেন বলে।

—মহারাণী! বলেই প্রায় চীৎকার করে উঠলেন—শুচি, শুচি কই! লক্ষ্মী-অংশভূতা কন্যা মোর! কই, সে কই?

রাণী ঃ দেবতা মন্দিরে শুচি, দেবসেবা রত।

ব্রহ্মমিত্র ঃ চল, যাব দেবতা মন্দিরে। ওঃ, কত কাল—কতকাল—

নয়ন আনন্দ মোর ননীর পুতলী শুচি
দেখি নাই তারে। আজি মনে পড়ে কত কথা।
সন্তানের তরে তপস্যা করিয়াছিনু,
কঠোর তপস্যা। লক্ষ্মী নারায়ণ দোঁহে
আসিলেন বর দিতে। কহিলেন সন্তান
তোমার নাই অদৃষ্ট বিধানে। তবু তব
তপস্যায় প্রীত হয়ে একটি সন্তান দিতে
পারি। যদি পুত্র চাও—মোর অংশে
জন্ম হবে তার। যদি কন্যা চাও—তবে

দেবী লক্ষ্মী অংশ হতে এক কন্যা হবে তব।

ও—কে? ও—কে? মহারাণী! আজি পুনরায়

মহালক্ষ্মী আবির্ভূতা কেন আমার সম্মুখে!

সেই—সেই রূপ! মা—মা—মা!

শুচি এসে প্রবেশ করলে। তার পূজারিণীর বেশ।

মহারাণী বললেন, ওই—ওই তব শুচি মহারাজ।

শুচি পিতার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মহারাজ ব্রহ্মমিত্র আবেগ ভরে বললে—

—এই শুচি। তুই মোর সেই ছোট শুচি। কচি কচি

দুহাতে বেড়িয়া কণ্ঠ মোর আধো আধো ভাষে

গাহিতিস জয় জগদীশ হরে—

নারায়ণ দশ অবতার স্তবগান! অনুভব

করিতাম—জননী লক্ষ্মীর স্পর্শ অমৃত মধুর!

আয়—আয়—জননী আমার—আয়

কাছে আয়—

শুচি এবার যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে—

পরম আরাধ্য তুমি—তুমি পিতা—এ দেহ তোমার দান—

এ ভুবনে সাক্ষাৎ ঈশ্বর। লহ পিতা প্রণতি আমার।

দ্রুত অগ্রসর হয়ে গেলেন মহারাজ ব্রহ্মমিত্র এবং প্রণতা শুচিকে হাত ধরে তুলতে গেলেন—

—না—না—না। মাগো—প্রণাম নয়, আয়

আয়, আমার বুকে আয়।

শুচি উঠে নতজানু হয়েই হাত বাড়িয়ে নিবারণ করে বললে—

না না, না পিতা না। স্পর্শ মোরে করিয়ো না। না।

মহারাজ থমকে গেলেন। সকলে চমকে গেলেন। মহারাণী তিরস্কার ভরা কণ্ঠে বললেন, শুচি!

শুচি বললে, দেবকার্যে রত আছি আমি।

মহারাজ বলে উঠলেন—

ধন্য ধন্য তুমি জননী আমার। মায়াবশে
প্রাণের আবেগে তুমি দেবকর্ম কর্তব্য তোমার
ভোলো নাই। মহারাণী, কর মোর স্নান আয়োজন,
স্নান অন্তে বিষ্ণুরে প্রণাম করি, জননীরে
বক্ষে লব। মহামাত্য—অন্য সব কার্য, সব সমারোহ
আপাতত রহিল স্থগিত।

মহামাত্য বললেন—

তাই হবে মহারাজ। অবিলম্বে তাই আমি
করিব ঘোষণা। অপরাহ্নে মহারাজ প্রজাবৃন্দে
দিবেন দর্শন।

তিনি চলে গেলেন। ওদিক থেকে শুচি তাঁর কথা শেষ হতেই বলে উঠল—

—পিতা!

—বল মা আমার!

—আরও কিছু আছে মোর নিবেদন তব পাশে।
বল পিতা অপরাধ লবে না আমার?

—তোর অপরাধ? ওরে কন্যা মোর, তুই কি জানিস মাগো কি আমার তুই? তুই কে?—

—বল পিতা, কেবা আমি?

—তুই মোর কন্যা বটে, দেহ তোর পেয়েছিস
আমা হতে। কিন্তু জন্ম তোর লক্ষ্মী অংশে!

—সত্য কথা পিতা?

—সত্য—সত্য—সত্য! তপস্যা করিয়াছিনু
সন্তানের তরে—

—সে কাহিনী জানি আমি, শুনিয়াছি সব।

তবু প্রশ্ন মোর—তোমার মনের সেই
বিশ্বাস জানিতে। শোন পিতা, সত্য
যদি করহ বিশ্বাস, জন্ম মোর লক্ষ্মী অংশে
সেই হেতু নাম মোর শুচি তবে। প্রশ্ন আমি
করিব তোমায়, দীর্ঘ ষোড়শ বৎসর
অমরাবতীতে পতিতা গন্ধর্ব নারী সনে
বাস করি, তব দেহে তব মনে, সেই অশুচিতা
যে পাপ হয়েছে সঞ্চারিত, সেই পাপ
সেই অশুচিতা যতকাল পূর্ণরূপে নাহি দূর হয়—
ততকাল মোরে তুমি স্পর্শ করো নাকো।

রাণী ঃ শুচি, শুচি, ওরে সর্বনাশী !

শুচি ঃ স্তব্ধ হও মাতা। দেবকন্যা তুমি—দেবেন্দ্রাণী
শচী দেবী মাতৃষ্বসা তব। মাতা, দেবেন্দ্রাণী
শচী তার ব্যভিচারী স্বামী সহস্রাক্ষ ইন্দ্র সনে
সিংহাসনে বসি কোনদিন একবিন্দু গ্লানি
করে নিকো অনুভব। তারই ভাগিনেয়ী তুমি,
তুমি বুঝিবে না লক্ষ্মীর মানস, তার পবিত্রতা,
জীবনধাতুর মর্ম। এ জীবনধাতু অশুচিতা
স্পর্শ মাত্রে স্বর্ণ হতে লৌহ পিণ্ডে হবে পরিণত।

মহারাণী স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

ব্রহ্মমিত্র বললেন—

তাই হবে—তাই হবে মাতা।
শুধু অনুরোধ—যদি এ জীবনে
সে তপস্যা নাহি সিদ্ধ হয়—তবে
মোর মৃত্যুকালে অন্তিম মুহূর্তে
তোমার শীতল করতলখানি
রেখো মোর উত্তপ্ত ললাটে ক্ষণেকের তরে।

ঠিক এই মুহূর্তে দূত এসে প্রবেশ করে অভিবাদন করে বললে-

—মহারাজ! দুঃসংবাদ আনিয়াছি!

—দুঃসংবাদ?

—পূজ্যপাদ কুমার, কনিষ্ঠ তোমার, দেব বসুমিত্র
বন্দী আজি অসুরের হাতে।

—বন্দী অসুরের হাতে?

—দেব বসুমিত্র আপনার আগমনবার্তা শুনে
সীমান্ত হইতে রাজধানী মুখে স্বল্প কিছু সৈন্য লয়ে
যাত্রা করেছিল। অসুরেরা শঙ্কিত হয়েছে মনে
আপনার প্রত্যাবর্তন সংবাদে। তারা মধ্যপথে
অরণ্যের মাঝে দেব বসুমিত্রে আক্রমণ করি
বন্দী করিয়াছে। সীমান্তের রাজধানী শ্রীপুর নগরী
অবরোধ করি অগ্নিকাণ্ডে অত্যাচারে
ছারখার করে চারিধার। মহারাজ ঊর্ধ্বশ্বাসে
আসিতেছি। শীঘ্র যদি সৈন্যদল
না হয় প্রেরিত—তবে সীমান্ত প্রদেশ
হস্তচ্যুত হবে!

ব্রহ্মমিত্র: প্রায়শ্চিত্ত! প্রায়শ্চিত্ত বুঝি নিজে হতে
এসেছে সম্মুখে। বিদায় মহারাণী—
বিদায় মা লক্ষ্মীরূপা জননী আমার।

প্রস্থান করতে করতে ফিরে বললেন—

—মা শুচি!

—পিতা!

—উত্তর আমার তুমি দাও নাই।
বল মাতা, কি উত্তর তব!

—তাই হবে পিতা! আমি জানি প্রায়শ্চিত্ত শেষ করি
অরাতি দমন করে ফিরিবে বিজয়ী হয়ে।

তবু—তবু পিতা যদি তুমি নাই ফের
প্রাণময় দেহ লয়ে, তবে—শুচি তব মৃত্যুহিম
ললাটের পরে রাখিয়া ললাটখানি তার—
অশ্রুজলে ধুয়ে দেবে সব গ্লানি তব।

বাইরে রণবাদ্য বেজে উঠল।

শেষ হল প্রথম দৃশ্য। গোরাবাবু খাতাখানি রেখে সিগারেট ধরিয়ে বললে—চা চাই।

* * *

বংশী পাশের বারান্দায় এসে পকেট থেকে শিশি বের করে খানিকটা খেয়ে বিড়ি ধরিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ধরতাটা—তৃতীয় লাইন, টানো টানো, আনো আনো, কাজলের রেখা, রঙীন মাধুরী, টানো আনো, করে করলে কি হয়? থেমে থেমে ভেঙে ভেঙে। টানো টানো, কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত একটি হিল্লোল বেয়ে গেল, আবার আনো আনো আর একটি—তারপর আর একটি। তারপর কাজলের রেখা—ডানহাতে চোখে কাজল পরাবার টান, তারপর রঙীন মাধুরী, ঠোঁটের উপর হাতের টান। তারপর টানো আনো। তারপর 'বিরহের অবসানো'। এর পর জলদ ধরতাই সজল নয়ন মুছে। আর মনে নেই বংশীর। পিছন ফিরে সে তাকালে। ঘরের মধ্যে চা চলছে। আশা বসেই আছে। হাঁ করে তাকিয়ে আছে অলকার দিকে। প্রোপ্রাইট্রেস মঞ্জরী দেবীও তাকিয়ে আছে অলকার দিকে।

অলকা মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে। এবার তার নিজের মুখে পড়েছে তার নিজের কাপড়ের লালচে আভা। ছাদের কড়ি থেকে ঝোলানো ইলেকটি.ক আলোটার ছাপ পড়েছে তার কাপড়ে। অন্য সকলে ফিসফাস করছে। হঠাৎ গোরাবাবুর কথা তার কানে এল।

—ভাল মেকআপে ওটা অবিশ্যি শোধরাতে পারে। আর অলকা

মাথায় একটু খাটো এই দেখেই নেওয়া হয়েছে। সুতরাং—। না কি বল তুমি মঞ্জরী?

মঞ্জরী বললে—পার্টের কথা এখন থাক না। সে পরে হবে।

শোভা বললে—গোপালী অলকার চেয়ে লম্বা।

বাবুল শোভার কথাটা বোধ হয় শুনলেই না, বললে—মাই লর্ড, ও লম্বা হলে কি আর যাত্রার দলে আসতো! ফিলিমে স্যুট করে বেরিয়ে যেত।

গোরাবাবু ভাবছিল, হঠাৎ বলে উঠল—হয়ে যাবে। ঠিক হয়ে যাবে। অন্তত তিন ইঞ্চি লম্বা দেখাবার মত ট্রিক আমি করে দেব।

মঞ্জরী বললে—বলছি তো ও-কথা এখন থাক। বই পড়া শেষ হোক।

তার কণ্ঠস্বরে মুখে চোখে বেশ স্পষ্ট ভাবেই একটি কাঠিন্য ফুটে উঠল। গোরাবাবু তার দিকে একবার তাকিয়ে বললে—শুচি যে তুমি ছাড়া হতে পারে না।

—তা হলে আমিই শুচি করব। তুমি এখন পড়।

বাঁ হাতের উপর ভর দিয়ে রীতুবাবু পিছনের দিকে একটু হেলে ছাদের দিকে মুখ করে সিগারেটের ধোঁয়া ছুঁড়ছিল। একটি কৃত্রিম নিস্পৃহতা তৈরী করে নিয়ে চুপ করে সে শুনেই যাচ্ছিল। এবার সে বললে—প্রোপ্রাইট্রেস যা বলছেন স্যার তাই ভাল। বই পড়া শেষ করুন। প্রথম সিনেই জমিয়েছেন। কিন্তু রাত্রি ক্রমবর্ধমান।

গোরাবাবু আরম্ভ করলে—দ্বিতীয় দৃশ্য। দেবদ্বারের সীমান্ত প্রদেশে একখানি গ্রাম। আহত বসুমিত্রকে ধরে প্রবেশ করলে জয়ন্তকুমার আর কামন্দক। জয়ন্তকুমার তরুণ রূপবান ব্রাহ্মণকুমার। সে শাপভ্রষ্ট বৃহস্পতি, শান্তপ-নামক ব্রাহ্মণের পৌত্র। কামন্দক বসুমিত্রের বয়স্য, সে দেবদ্বারের রাজসভার বয়স্যও বটে।

থামল এক মুহূর্তের জন্য। তারপর বললে—আচ্ছা, কামন্দক তরুণও নয় বৃদ্ধও নয়, প্রৌঢ় করা গেল।

—ভেরি গুড মাই লর্ড। অ্যাণ্ড আই শ্যাল মেক এ নেয়াপাতি ভুঁড়ি। ভুঁড়ি বানানো ইজি থিং। টঙটঙে চান—বাজিয়ে নেবেন। ঢ্যাপঢেপে নরম চান—তাই হবে। সে আমি বানিয়ে নেব। এমন কি ফতুয়ার বোতাম খুলে খানিকটা বেরিয়ে থাকবে। পাঁচ নম্বর ফুটবলের ব্লাডার একখানি। বাস্। আস্ক অলকা—সে ট্রিক আমি জানি। দেখবেন কি করি আমি।

গোরাবাবু বললে—নাউ, সাইলেন্স। তিন জনে প্রবেশ করলে, এখানে আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ কুমার বসুমিত্রদেব। নিশ্চিন্তে অবস্থান করুন। আমি যাই, আমাদের গ্রামবাসীরা অসুর দুর্বৃত্তদের সঙ্গে যুদ্ধে তাদের সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করতে পারলে কি না!

বসুমিত্র বললেন—

ব্রাহ্মণকুমার, আজীবন ঋণপাশে আবদ্ধ করিলে
অসুরের বন্দীত্ব হইতে যুদ্ধ করি মুক্ত করিয়াছ,
রক্ষা করিয়াছ তুমি দেবদ্বার রাজ্যের সম্মান।

জয়ন্ত: সময় নাহিক দেব, নেতৃহীন সঙ্গীদল মোর।
যুদ্ধ করে অসুরকুলের সাথে। ফিরে আসি,
আগে ফিরে আসি।

কামন্দক: পিতা পিতরৌ পিতরঃ পিতা পিতরৌ পিতরঃ
ও বাবা, বাবারে, বাবারে!
ভো ভো, ব্রাহ্মণকুমার, নাহি গচ্ছ, নাহি গচ্ছ
ভয়াৎ অহং মরিষ্যামি। ভয়ে মরে যাব।

জয়ন্ত: ভয় নাই দেব। কোন ভয় নাই।

কামন্দক: ভয়ং নাস্তি? কথিতং সত্যং? সত্য বলছ?
কিন্তু কহ মহাভাগঃ, এ বনে কুত্র ভরসা?
দোহাই তব, ভো ভো বিপ্রবর
মা কুরু পলায়নং এই অটালে পরিত্যাগং করি।

বসুমিত্র ক্রুদ্ধস্বরে বললেন—

কামন্দক, এই কঠিন মুহূর্তে তুমি প্রগল্‌ভতা ত্যাগ কর,
বীর ব্রাহ্মণকুমারকে যেতে দাও।

(ঠিক এই মুহূর্তে জয়ন্তের সঙ্গীরা প্রবেশ করলে জয়ধ্বনি দিয়ে)

জয় জগদীশ হরে! আমরা জয়ী হয়েছি প্রিয়বর। অসুরেরা পাঁচজন নিহত হয়েছে। একজন বন্দী। বাকী সব পলাতক।

জয়ন্তকুমার ঃ জয় জগদীশ হরে! আমাদের মধ্যে হতাহত কি বন্ধু?

সঙ্গী ঃ একজন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে চারজন। আমাদের গোপন অবস্থানভূমিতে থেকে যুদ্ধ করলে একজনও হত হত না। কিন্তু শিবদাস উত্তেজনাবশে লাফ দিয়ে পড়ল পলায়নপর অসুরদের সম্মুখ-পথে। তারা ভল্ল দিয়ে বিদ্ধ করলে তাকে। কিন্তু সান্ত্বনা, আমি শিবদাসের পিছনেই ছিলাম গিরিপথের পাশে আমাদের অবস্থানভূমিতে। আমি তাকে নিহত করেছি খড়্গাঘাতে।

বসুমিত্র ঃ হে আশ্চর্য ব্রাহ্মণকুমার! তুমি কে?

জয়ন্ত ঃ জয়ন্তকুমার নাম। পিতৃমাতৃহীন ব্রাহ্মণকুমার। দেবদ্বার প্রজা। এই গ্রামের অধিবাসী।

বসুমিত্র প্রশ্ন করেন—এই যুদ্ধবিদ্যা কি করে শিখলে তুমি ব্রাহ্মণকুমার! যেমন কৌশল তেমনি ক্ষিপ্রতা; তেমনি অস্ত্রনৈপুণ্য; আর তেমনি সাহস! অকস্মাৎ বনভূমিতে বৃক্ষান্তরাল থেকে যেন মাটির বুক বিদীর্ণ করে তোমরা উঠে দাঁড়ালে। বেষ্টন করলে অসুরদের। সর্বাগ্রে বিচ্ছিন্ন করে নিলে বন্দী আমাকে। আশ্চর্য! কে তোমাদের এই আশ্চর্য রণনৈপুণ্যে শিক্ষা দিয়েছে!

বংশী সেই থেকে এখনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে সুর ভাবছে—ভাঁজছে। গানের কথাগুলো এরই মধ্যে প্রায় সব ভুলে গেছে। কিন্তু তাতে আটকায় নি। কারণ গানটার গাঁথুনির ছাঁদ এবং ছক্‌টা তার মনে

গাঁথা হয়ে গেছে। মনে আছে, টানো-টানো আনো-আনো। আর মনে আছে শেষ লাইনটা। খাসা লেগেছে তার। বড় সমঝদার রসিকের কথা। 'এলানো অলক ভুবন ভোলানো'—বহুৎ আচ্ছা কথা। তাই বটে। অলক মানে চুল সেকথা নিরক্ষর হয়েও বংশী জানে। ড্যান্সিং মাস্টার বংশী কেউ বই পড়ে গেলে বেশ বুঝতে পারে। নিজের পড়তে অন্তত শক্ত বানান পড়ে উচ্চারণ করতে কষ্ট হয়। কিন্তু ওই কলিটা বহুৎ বঁঢ়িয়া কলি। 'এলানো অলক ভুবন ভোলানো'। বহুৎ আচ্ছা। কর্তা একজন আমীর লোক রইস লোক, কি বলে প্রেমিক লোক। তাই বটে! একপিঠ এলোচুল, সে যে কি নেশা জাগায়! বংশীর তো ভারী নেশা লাগে। আজ বুঝতে পারছে, প্রোপ্রাইট্রেস তার চুল এমন করে অধিকাংশ সময় এলো রাখে কেন? বাঁধে না কেন? ওই কলিটা ভাঁজতে ভাঁজতে তার আপসোস হচ্ছে, সখীর দলে সখীগুলো প্রায় সবগুলোই ছোঁড়া। সেই পেটেণ্ট জরির ফিতে জড়ানো বেণীওয়ালা পরচুলো পরে নামবে। এক আশার চুল আছে প্রচুর। এবার আর দুটো বারো তেরো বছরের মেয়েকে নিয়েছে, কিন্তু তাদের চুল লম্বায় আধহাতের বেশী পিঠে ঝোলে না। ওদের বয়স হলে ওই চুলে 'ঝারি' জুড়ে চুল বড় করা চলত। আর ওই কলিটায় এসেই এ ওর খোঁপা খুলে দিয়ে চুলগুলো এলিয়ে দিত। তারপরই স্রেফ একটি বোঁ পাক্।

—বংশী, না, কে? বংশী!

কে ডাকছে বংশীকে বিডন পার্কের ফুটপাথ থেকে। চেনা গলা।

কে? কোথায়?

—বংশী!

লোকটা, এ তো যোগামাস্টারের গলা! হ্যাঁ, ওই লাইট-পোস্টটার নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। ব্ল্যাক-আউটের ঠুঙি পরানো আলোটা পুরো মাথায় পড়েছে।

বংশী রেলিংয়ে বুক দিয়ে ঝুঁকে বললে—মাস্টারজী!

—কি হচ্ছে তোদের? নতুন বই পড়া? যোগাবাবু একেবারে বারান্দার নিচে এসে দাঁড়াল।

—হ্যাঁ। আপনি কোন্ দলে?

—সব শা বেইমান রে! বলে বুড়ো হয়েছি! বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। তা মন টিকল না।

—এখানে কোথা এসেছিলেন?

—সেই সন্ধ্যে থেকে ওই পার্কে বসে আছি। তিন ছিলম ফুঁকে দিলাম। কিন্তু ঢুকি-ঢুকি করেও পারছি না। কত্তার ওই হাঁসা হাঁসা চোখ দেখে আমার কি রকম হয়। জিভ শুকিয়ে যায়। আমার যে ভারী চুক হয়ে গিয়েছে রে!

—কি চুক!

—উঁহু। সি আর বলা হবে না মাইরী। যাত্রার দলের আসামীর পেটে কথা থাকে না। তারপর হয় মদ, নয় গাঁজার নেশায় জিভ আলগা!

—তা হলে?

—তা হলে আর কি? যাই এখন। নইলে শোবার জায়গা পাব না।

—রয়েছ কোথায়?

—পথে পথে ঘুরি। রামবাগানে সত্যিনারাণ গণেশ পুজো করি। খাই যা হোক। শুই গিয়ে ওই ইয়ে বাবুদের ঠাকুরবাড়িতে। অনেক লোক শোয়। দেরী হলে ধারে শুতে হয়, রাতে বিষ্টি হলে ছাঁট লাগে।

বংশী চুপ করে রইল। কি বলবে সে? যোগাবাবুর হয়ে মালিকের কাছে বলবার সাহস নেই; ওদের বাড়িতে আশ্রয় দেবারও সাহস নেই। যোগামাস্টার বামুন। সে, আশা যাত্রাদলে যাই হোক বামুনকে ডাকতে পারবে না। যোগামাস্টার গাইয়ে মানুষ। গাঁজা খায় বলে রাগী মেজাজ। আর একটু গরুজে মানুষ।

—বংশী, যোগামাস্টার ফিরে এসেছে।

—অ্যাঁ? কিছু বলছেন?

যা বলছে তা জানে বংশী। টাকা পয়সা ধার চাইছে। নিজেই সেদিন বলেছিল কাটা রথা নামা উল্টে পর জামা। তা চাইলে কিছু দিতে হবে বইকি। ভেবেই সে বললে—দাঁড়ান, যাই।

—আসতে হবে না। রীতুমাস্টার এসেছে?

—এসেছে। আজ সন্ধ্যেবেলা ঠিক সময়ে হাজির হয়েছে।

—তবে পার্কে বসে আর এক ছিলম খাই। ওকে ধরতে হবে একবার। বুঝলি, চাকরিটা গেলে হাড়ির হাল হবে রে। বাড়িতে ছটো পরিবার, তিনটে আইবুড়ো মেয়ে আর একটা কড়ে রাঁড়ি।

যোগামাস্টার রাস্তা পার হয়ে ওদিকে পার্কের দরজার দিকে চলে গেল।

বংশী ঘুরে দাঁড়াল। রীতুবাবুকে কোন রকমে বলা যায় কি না, তার পাশে একটু জায়গা মেলে কি না দেখতে লাগল। রীতুমাস্টার সেই ছাদের দিকে তাকিয়ে সিগারেট ফুঁকছে আর বই শুনছে। বই খুব জমেছে মনে হল বংশীর। সব শুনছে চুপ করে।

বংশীর অনুমান ভুল নয়। নাটক বেশ জমেছে। গোরাবাবু পড়ছেও বেশ আবেগ দিয়ে। দ্বিতীয় দৃশ্যে তখন বসুমিত্রকে নিজে পরিচয় দিয়েছে জয়ন্তকুমার। পিতৃমাতৃহীন ব্রাহ্মণকুমার, আছেন শুধু পিতামহ। কেউ তাঁকে বলে পাগল। কেউ বলে শাপভ্রষ্ট কোন জন—, মধ্যে মধ্যে পূর্ব কথা মনে পড়ে, তখন নানান কথা বলেন। জয়ন্ত নিজে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছে। কিন্তু দেবদ্বারের এই তুর্বল অবস্থায় অসুরদের অত্যাচার রোধের জন্য গ্রাম্য যুবকদের নিয়ে দল গঠন করেছে, শাস্ত্রবিদ্যা পাঠ করে অনুশীলন করেছে, অনেক অস্ত্রেই তারা পারঙ্গম। তবে শৃঙ্খলাই তাদের সব। এখানকার অরণ্য, এখানকার গিরিপথ, এখানকার সব তাদের পরিচিত। তারা পালা

করে বৃক্ষশীর্ষে বসে দূরদূরান্তর পর্যন্ত দেখে। কিছু দেখতে পেলেই সংকেত ধ্বনি করে। সেই ধ্বনিতে সমবেত হয়ে তারা তাদের সযত্নে তৈরী-করা গোপন ঘাঁটিগুলিতে অস্ত্র উদ্যত করে বসে থাকে। তারা পার্বত্য অসুর দৈত্যদের সংকেতগুলি জানে, সেই সঙ্কেতে তাদের নিজেদের পরিবেষ্টনীর মধ্যে এনে তাদের অনায়াসে পরাভূত করে।

বিস্মিত হয়ে বসুমিত্র প্রশ্ন করেছিলেন—ব্রাহ্মণকুমার, তুমি তো রাজ্যসংস্থাপন করতে পার?

জয়ন্তকুমার বলেছে—হয়তো পারি কুমার, কিন্তু রাজ্যে কিবা হবে? কি হবে রাজা হয়ে?

—বল কি! তুমি রাজা হতে চাও না?

—না, সে কল্পনায় তো আনন্দ পাই না।

—তবে? জীবনের কি কল্পনা তোমার বলতে কি বাধা আছে?

বিচিত্র যুবক চিত্ত তব উদাসীন বৈরাগীর মতো।

তাই জাগে কৌতূহল!

জয়ন্তকুমার কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে—

নাহি জানি। এই মুহূর্তটিতে ওই দূর পর্বত শিখরে
চিত্ত মোর ছুটে যেতে চায়, ইচ্ছা হয়
জীবনের বাকী সব দিনগুলি ওইখানে ছোট এক
কুটীর বাঁধিয়া কাটাইয়া দিই। উর্ধ্বে অনন্ত আকাশ
নিম্ন লোকে শ্যামা সম ভূমি। নিশ্চিন্ত জীবন।
আর আমি কিছু নাহি চাই।

বসুমিত্র: বুঝিয়াছি পূর্ব জন্মে অসমাপ্ত ঈশ্বর তপস্যা
তোমারে টানিছে পূর্ণ সিদ্ধি পথে—

জয়ন্ত: না কুমার, ঈশ্বরে আগ্রহ নাহি মোর—
কি হবে ঈশ্বরে লয়ে? না—

কামন্দক ঃ কথিতং পরমং সত্যং ইহাতে সন্দেহং নাস্তি
ঈশ্বর ঝঞ্ঝাট শ্রেষ্ঠ—দূরে তা বর্জনং শ্রেয়
ভল্লুক কম্বলরূপী ধরিলে চাপিয়া ধরে,
ছাড়িলে ছাড়ে না সে যে শেষেতে মরণং ধ্রুব।

জয়ন্ত ঃ কতবার গিয়েছি ওই শিখরে। কিন্তু গিয়ে আর ভাল লাগে নি। সমতল ডেকেছে হাতছানি দিয়ে। ফিরে এসেছি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে। এখানেই আনন্দ। শাস্ত্রচর্চায় ডুবে থেকেছি কয়েক-দিন। একদিন সে চর্চায় বিরক্তি এসেছে। শাস্ত্রচর্চা ত্যাগ করে বন্ধুদের নিয়ে শস্ত্রচর্চা করেছি। সঙ্গীত আনন্দে মেতেছি। কয়েকদিন পরই সেও ম্লান হয়ে গেছে। নির্জন নদীতটে কিংবা প্রান্তরে গিয়ে চিৎকার করে বলেছি, কে বলে দেবে আমি কি চাই? সময়ে সময়ে মনে হয় আমি সব চাই। যাহা কিছু এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তার সব চাই আমি। কখনও মনে হয়—না না না, কিছুই চাহি না আমি। আমি শুধু দিতে চাই—আমারে নিঃশেষ করি দিতে চাই। কিন্তু নাহি জানি কার কাছে!

অবাক হয়ে গেলেন বসুমিত্র। কামন্দক কাছে এসে বললে—
সাবধানে স্থানত্যাগং ক্রিয়তাম দ্রুতপদক্ষেপে—
নিশ্চয় বদ্ধ উন্মাদ—দংশনং ন অসম্ভবং।

পালান। বদ্ধ উন্মাদ। মন এখনই ছোটে পাহাড়ে তখন ছোটে মাঠে। কে জানে মন এখনই আমাদের নাকে কামড়াবার জন্য উসখুস করে উঠবে না! পালান। মম ঈশ্বর! মাম রক্ষ!

রীতুবাবু অকস্মাৎ ফু-ফু শব্দে হেসে উঠে বিষম খেল। ছাদের দিকে দৃষ্টি রেখে বই শুনছিল, হঠাৎ বার দুই ফু-ফু করে উঠল অর্থাৎ মুখ টিপে বন্ধকরা হাসি জোর করে বেরিয়ে এল। তারপরই হাসি চাপবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে সে সশব্দে হেসে উঠল। বাবুল মেঝেতে একটা চড় মেরে বললে—আচ্ছাং আচ্ছাং, বহুতং আচ্ছাং, লঙ লিভং গোরাবাবু।

প্রথমে কারণটা সঠিক কেউ বোঝে নি। এত হাসির মত কিছু তো তারা খুঁজে পায় নি। সেটা পরিষ্কার করে দিলে রীতুবাবু নিজেই। বললে—বাবুল ব্রাদারের ইংরিজী ফোড়ং-এর অভ্যেসটাকে তো আচ্ছা কাজে লাগিয়েছেন দেবতা! ওর হাত দিয়েই ওকে মারলেন। এবং আরও পরিষ্কার করে দিলে বাবুল নিজে ওই মেঝেতে চাপড় মেরে।

গোটা আসরটা এবার সশব্দে হেসে উঠল।

গোরাবাবু বললে—সাইলেন্স। আবার আরম্ভ করলে—এবার সসৈন্যে প্রবেশ করলেন ব্রহ্মমিত্র!

আট

বই যখন পড়া শেষ হল তখন রাত্রি সাড়ে দশটা।

গোটা আসরটা স্তব্ধ। ভালই লেগেছে সকলের। গোরাবাবু বই বন্ধ করে বললে—বলুন মাস্টারমশাই কেমন লাগল?

কিন্তু—

চুপ করে গেল রীতুবাবু।

গোরাবাবু বললে—বলুন কিন্তুটা কি?

—একটু উঁচু ধরনের হয় নি? মানে যুদ্ধবিগ্রহ তো নয়। তত্ত্বটা জটিল—

—জটিল বলছেন?

—আচ্ছা, পড়ুন না ওইখানটা, শুচি আর জয়ন্তকুমারের দৃশ্যটা।

বাবুল বলে উঠল—বটে, রাত্রি প্রায় হাফাহাপি; ট্রাম বাস বন্ধ হল-হল। আমাদের আবার ডাইরেক্ট সাউথ। রাইটে কেওড়াতলা, লেফ্‌টে লেকপার হয়ে সাউথ।

শোভা গোপালীকে বললে—শুনছিস, আমি নয়, আমরা।

—শুনেছি।

—বেশ, তোমরা দুজনে যাও। তবে তোমার কামন্দকের পার্ট কেমন লাগল বল ?

—চমৎকার।

—তোমার ? অলকা ? মাধবিকা যদি দেওয়া হয় তোমাকে ?

—খুব ভাল লেগেছে আমার। আমি প্রাণপণে ভাল করবার চেষ্টা করব।

—আচ্ছা, তোমরা এস।

বাবুল এবং অলকা উঠে পড়ল। রাস্তায় ফুটপাতের উপর দাঁড়াল। ট্রাম-স্টপ পূব দিকে। বাস-স্টপও। রাত্রি সাড়ে দশটা হয়ে গেছে, রাস্তা প্রায় ফাঁকা। দোকানদানির আলোও নিভে আসছে। ব্ল্যাক-আউটের ঠুঙি-পরানো স্ট্রীট-লাইটের আলো এমনই অপর্যাপ্ত যে, উপরের আলোকিত ঘর থেকে নেমে এসে এই স্বল্প আলোকে ভুতুড়ে আলো মনে হচ্ছে। ওই একখানা ট্রাম আসছে দক্ষিণ দিক থেকে। দুজনে রাস্তা পার হয়ে এ পাশে এসে ট্রাম-স্টপের দিকে এগুতে লাগল।

হঠাৎ অলকা বললে—বই কেমন লাগল বাবুলদা ?

—ভেরি গুড। হোক সত্যযুগ। বাট ভেরি মডার্ণ।

—মাধবিকার উপর কিন্তু অবিচার হয়েছে। জোর করে শুচিকে বড় করেছেন।

—ইয়েস। কিন্তু তার আর উপায়ং কোথা ? কঠিনং স্থানং। ও পার্ট যে প্রোপ্রাইট্রেসের। হুঁ-হুঁ !

খিল খিল করে হেসে উঠল অলকা, বললে—এর মধ্যে যে পার্ট রিহারস্যাল দিতে সুরু করলে।

—বেড়ে হয়েছে পার্টটা।

—কিন্তু তোমাকে তো ভাঁড় বানিয়ে দিয়েছে।

—বাবুল বোস ইজ এ স্পোর্ট। তা না হলে—

—কি ? থামলে কেন ?

—তোমার সঙ্গে প্রেমে মজে বসে থাকতাম এতদিন।

—দেখলে না কেন চেষ্টা করে? অলকা সে মেয়েই নয়।

—হ্যাট আই নো।

—মা বাবা দুজনেই বিয়ে দিতে চাচ্ছে এইবার। বলছে এখন বিয়ে না হলে এরপর আর হবে না। আমি বলেছি, না হোক। মনে রেখো আমি এই করে উপার্জন করে আনি তবে খাও। চুপ করে গেছে।

—হুঁ। আজ আসতে দেরী করেছ। লাল টক্‌টকে শাড়ী পড়েছ, কোথায় গিছলে বল তো? হোয়াটস দি আইডিয়া?

—একটা ছবিতে নাচের পার্টের জন্য ডেকেছিল।

চুপ করে গেল বাবুল। সচরাচর অলকা এসব কথা আগেই বাবুলকে বলে। বাবুল খোঁজখবরটা নিয়ে দেয়।

অলকা হঠাৎ বললে—এই যাঃ!

—কি হল?

—চটির স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে গেল।

—লে ফাদার! থমকে দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখলে সে কোথাও যদি একটা জুতো-সেলাই থাকে। কিন্তু নেই। বললে—হাতে নাও। এসপ্ল্যানেডে দেখা যাবে।

অলকা চটি জোড়াটা হাতে নিয়ে বললে—কি ঝঞ্ঝাট বল তো!

বাবুল বললে—গোরাবাবু ইজ গ্রেট! লিখেছে যাকে বলে নাইস। ঝঞ্ঝাটং ঝঞ্ঝাটং সত্যং ঝঞ্ঝাটং জগতংময়ং—লে হালুয়া, আর মনে নেই।

অলকা বললে—ওগুলো খুব ভাল হয় নি সে যাই বল তুমি। তবে হ্যাঁ, বাজে লোকে হাসবে খুব।—সে হেঁট হয়ে চটি জোড়াটা কুড়িয়ে নিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কে যেন সামনে দাঁড়াল।

নমস্কার!

অলকা চমকে উঠল—মাগো!

বাবুলও চমকেছিল। যুদ্ধের বাজার, ব্ল্যাক-আউটের রাত্রি, সাড়ে দশটা বেজে গেছে, চীৎপুর রোড রামবাগানের ধার, সঙ্গে অলকা রয়েছে। সে বেশ জোরেই বলে উঠল—কে?

—ভয় নেই স্যার, আমি, বাবুলবাবু, যোগামাস্টার।

—যোগাবাবু! হ্যাঁ যোগাবাবুই তো বটে।

পার্ক থেকে বেরিয়ে এসেছে যোগাবাবু ওদের দুজনকে দেখে। যোগাবাবু বললে—বই পড়া হয়ে গেল বাবু? আসর ভাঙল?

একটু বিস্মিতভাবে বাবুল বললে—ভেঙেছে। বই পড়াও হয়ে গেছে। আমরা চলে এলাম। অনেক দূর যেতে হবে তো। তা আপনি? এখানে এত রাত্রে?

করুণ কণ্ঠে যোগাবাবু বললে—রীতুবাবুর জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি—?

—এখনও বেরুন নি। আলোচনা চলছে।

—অ।

—দরকার আছে বুঝি?

—হ্যাঁ। আমার জবাব হয়েছে জানেন তো?

—শুনেছি।

—হ্যাঁ। তাই ওঁকে একবার ধরব। উনি যদি—

—হ্যাঁ, ওঁর কথা শোনেন ওঁরা।

অলকা চুপ করেই দাঁড়িয়ে ছিল, সে হঠাৎ প্রশ্ন করলে—আপনি তো কণ্ট্রাক্ট করেছিলেন?

—তা তো, হ্যাঁ তা কণ্ট্রাক্ট বইকি!

—তবে? তবে হঠাৎ ছাড়িয়ে দেবেন কেন?

যোগাবাবু হেসে বললে—সে তো মা কদলীপত্র—কলার পাতা। যতক্ষণ চাকরি ততক্ষণ দাম। কলার পাতা—যতক্ষণ ভাত খাবে ততক্ষণই ভাল। ভাত ফুরুলেই দে আঁস্তাকুড়ে ফেলে। তবে দোষ একটা হয়েছে আমার। তা হয়েছে।

বাবুল বলে উঠল—ট্রাম আসছে।

উত্তর দিকে যেখানটায় যাত্রাদলের আপিসের প্রায় আড্ং—সোনাগাছির দক্ষিণ—সেইখানটায় ট্রামের মাথার আলোর আভাস দেখা যাচ্ছিল। ব্ল্যাক-আউটের তাড়ায় মাথার আলো পর্যন্ত স্তিমিত। ট্রাম আসছে, শব্দও উঠছে। বাবুল সতর্ক করে দিলে অলকাকে। অলকা কিন্তু তখনও ছাড়ে নি। বলছিল—এমন কি দোষ করেছেন?

বাবুল বললে—করেছেন, করেছেন। এমন ঝঞ্ঝাট বাধাও তুমি! তৈরী হও। ও আপনি Right man select করেছেন, পারলে ওই Big brotherই পারবে।

—বাবুলদা!

—কি?

—খালি পায়ে উঠব কি করে ট্রামে?

—মাই খোদা! তবে কি হেঁটে যাবে নাকি?

দেখতে দেখতে ট্রাম এসে পড়ল। বাবুল অলকাকে এক রকম টেনে নিয়ে উঠল ট্রামে। প্রায় জনহীন ট্রাম। একটা বেঞ্চে বসে পাশের জায়গাটা দেখিয়ে বললে—সিট ডাউন।

অলকা বললে—কি বিপদ বল দেখি! চটি হাতে করে—

—ভ্যানিটি ব্যাগে পুরে ফেল।

—যাঃ। যত রাজ্যের নোংরা—

—দেন, থ্রো ইট অ্যাওয়ে। না পার আমাকে দাও।

—না। একমাস হয় নি শখ করে কিনেছি। থ্রো ইট অ্যাওয়ে! তার থেকে তোমার রুমালখানা দাও না। মুড়ে নি।

—নাও। অলরেডি ডার্টি হয়ে গেছে। রুমালখানা কিন্তু পরে ফেরত দিয়ো।

কণ্ডাক্টার এসে দাঁড়াল কাছে—টিকিট!

চীৎপুর রোড, ব্ল্যাক-আউটের রাত্রি, কিন্তু যুদ্ধের বাজার।

দোকানগুলি প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে, শুধু পানের দোকান খোলা। আর দোকানগুলির পাশে—ভিতর-বাড়ির দরজার মুখে আবছা আলোয় দেহব্যবসায়িনীদের ভিড়। দোতলার বারান্দায় ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে গলিতে রিক্সা ট্যাক্সি ঢুকছে। মধ্যে মধ্যে ছোকরাদের জটলা। একটা দরজার মুখে মেয়েগুলি খুব হাসছে। সে যেন ঢলে পড়ছে। অলকা বললে—মা গো!

বাবুল বলে—হোয়াই ?

—হাসছে দেখ না!

—লুক—দেয়ার।

—কি ?

—দেয়ার।

অলকা দেখলে দুজন সাদা সোলজার পানের দোকানে দাঁড়িয়ে পান কিনে খাচ্ছে। আরও কিছুদূর এসে এ পালা শেষ হল। এ দিকটা এখন নির্জন হয়ে পড়েছে প্রায়। হ্যারিসন রোড পার হয়ে নাখোদা মসজিদের এলাকাও প্রায় নির্জন। শুধু একটা আতরের দোকান খোলা রয়েছে। একটা তামাকের দোকান। দু-চারজন ঢাউস পাগড়ী-পরা পেশোয়ারী পোশাকী দাঁড়িয়েছিল জ্যাকারিয়া স্ট্রীটের মোড়ে। দুজন উঠে বসল ট্রামে। বাবুলের গা ঘেঁষে সরে এল অলকা। বাবুল বললে—উঁ-হুঁ।

অলকা শুনলে না, বললে—দেখছ না ?

বাবুল চুপ করে বসে রইল। এসপ্ল্যানেডে এসে ট্রাম থেকে নেমে বললে—দেখ জুত্তি সিলাই এখনও আছে কি না!

একটা ছোঁড়াকে মিলল; সে তখনও একটা পোষ্টে ঠেস দিয়ে ঘুমুচ্ছিল। ও পাশ থেকে ফিটনওয়ালারা ডাকছে—ফিটিন্ চাই বাবু? ফিটিন্!

উত্তর দিল না বাবুল। একটা ফিটনওয়ালা কাছে এসে বললে—

ময়দান ঘুমিয়ে দিবো বাবু। বিষ্টি নেই—আকাশ কিলিয়ার। চাঁদ ভি আছে খুব ভাল।

—মাই গড। এ যে মুন শোয়িং রে ফাদার!

—বাবু—

—দিক্ মাত্ করো। যাও।

বাবুল জুতো-সেলাইকে বললে—জলদি কর রে বাবা।

অলকা আকাশের দিকে তাকিয়েছে। জুতো-সেলাই চটিটা ফেলে দিলে—দু আনা বাবু।

লেড ল বাড়ির মাথার ঘড়িটার আলো নিভে গেছে। মেট্রোর সামনে পোর্টিকার তলায় লোক নেই। ব্রিস্টল হোটেলের সামনে দু-চারজন লোক। বাবুলের হাতঘড়িতে এগারটা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি দু-আনি একটা ফেলে দিয়ে বাবুল বললে—এস। টানলে সে চৌরঙ্গী রোডের দিকে পূর্ব মুখে।

অলকা বললে—কোথায়? ওদিকে?

—ট্রাম কখন আসবে ঠিক নেই। এগারটা বেজে গেছে। ট্যাক্সিতে—

ব্রিস্টলের সামনে চৌরঙ্গী রোডের পশ্চিম দিকে সারিবন্দী ট্যাক্সি তখন। কলকাতার কাজের তাড়ায় ট্যাক্সিগুলোর ছোটা থেকে ছুটি মিলেছে। বনেট খুলে দিয়েছে। ওখানকার কজন ট্যাক্সি-মুছিয়ে আছে—তারা ঝাড়ছে মুছছে। একটাতে চেপে বসে বাবুল বললে—টালিগঞ্জ।

অলকা বললে—ময়দানে একটা পাক দিয়ে সর্দারজী।

সর্দারজী বললে—ঠিক হ্যায়। একপাক দোপাক চারপাক—যো কহিয়ে গা।

বাবুল বললে—নেহি নেহি।

অলকা বাধা দিয়ে বললে—চুপ।

বাবুলের হাত চেপে ধরলে। বাবুল ভুরু কুঁচকে ওর দিকে

তাকালে। অলকা চোখ মুদে পিছনে হেলান দিয়েছে। মনে হল ভারী তৃপ্তি পেয়েছে মনে মনে। কি বলতে গিয়েও বললে না। কিন্তু চুপ করে বাবুল থাকতে পারে না। আরম্ভ করলে—

ঝঞ্ঝাটং ঝঞ্ঝাটং সত্যং ঝঞ্ঝাটং জগতংময়ং—

হাটং মাঠং ঘাটং গৃহং ঝঞ্ঝাটং নাস্তি কুত্রো বা।

মাই লর্ড লিখেছে গ্র্যাণ্ড! ঝঞ্ঝাটং দিবসে রাত্রে ঝঞ্ঝাটং চ পদে পদে। গ্র্যাণ্ড!

ট্যাক্সিখানা ময়দানে তখন রেড রোডে দক্ষিণ দিকে মোড় নিয়েছে। অলকা বললে—গঙ্গা কিনার চলিয়ে পাঁইজী।

—বহুৎ আচ্ছা।

পাঁইজী স্টীয়ারিং পাক দিয়ে বোঁ করে ঘুরে গেল।

বাবুল বললে—রোমান্সটা জোর লেগেছে তোমার!

—চুপ কর। পার্টটা আমার খুব ভাল লেগেছে। দেখ আমি কেমন গন্ধর্বকন্যা করি। শুচিকে আমি মেরে বেরিয়ে যাব দেখ।

—চাকরিটি যাবে।

—যাক্ গে।

গঙ্গার ধারে অন্ধকারের মধ্যে জাহাজগুলো দাঁড়িয়ে আছে। জ্যোৎস্নায় অদ্ভুত রকম দেখাচ্ছে। অলকা সেই বাবুলের হাত ধরে চুপ করে ঠেস দিয়ে রয়েছে। বাবুল হঠাৎ প্রশ্ন করলে—এ রকম ঘোরা তোমার রপ্ত আছে মনে হচ্ছে। না?

—তাতে তোমার ক্ষতিটা কি?

—নাথিং। স্রেফ জানার জন্যে। জ্ঞানলাভ। মাইলেজটা জানতে চাচ্ছি। কতটা এগিয়েছ?

—তুমি যে বেশ জাঁকিয়ে মদ ধরেছ?

—তা ধরেছি। তুমি?

—তোমার কাছে ঘ্রাণে অর্ধভোজন এবং কখন সখনও এক সিপ. দু সিপ.!

—আই সি। অ্যাণ্ড—এই প্রমোদ ভ্রমণে—যাকে জয় রাইড না কি বলে!

—স্টেজে অভিনয়ের ভালবাসা যতখানি, তার বেশী না।

—হুঁ।

অলকা বললে—এবার সিধা চলিয়ে টালিগঞ্জ সর্দারজী। সিধা।

টালিগঞ্জ রেললাইনের ব্রিজের তলা পার হয়ে এসে অলকা বললে—থাম সর্দারজী। এইখানে নামব।

বাবুল বললে—কেন, হোল জিঞ্জারটা খেয়ে গাঁটটা বাকী রেখে ফল কি? বারোটা বাজে। চল বাড়িতে।

—না, রোখনা সর্দারজী।

ড্রাইভার রুখে দিলে গাড়ি। অলকা নামল। বললে—কত হয়েছে সর্দারজী?

বাবুল একখানা দশ টাকার নোট বের করে সর্দারজীর হাতে দিয়ে বললে—থাক। দিচ্ছি আমি। দাঁড়াও, আমি তোমাকে পোঁছে দেব।

—দাঁড়াল অলকা। চেঞ্জ নিয়ে বাবুল পা বাড়াল—চল।

—আমি দিব্যি যেতে পারতাম বাবুলদা।

—না।

অলকা খানিকটা গিয়ে থমকে দাঁড়াল—না। তুমি যাও।

—কেন?

ভুরু কুঁচকে অলকা বললে—বাড়ি ঢুকলেই— তুমি যাও বাবুলদা। না, তুমি যাও। বাবা চেঁচাবে।

—চেঁচাবে?

অলকা যেন হঠাৎ বললে—আমাকে একটা ঘর দেখে দিতে পার?

—ঘর?

—হ্যাঁ। যেখানে আমি স্বাধীনভাবে থাকতে পারি। কিংবা—

—কি?

—নাঃ ! সে তুমি পারবে না। তা ছাড়া কি হবে তাতে! দুজনেই ডুবব।

—মানে?

অত্যন্ত সহজকণ্ঠে বললে অলকা—বিয়ের কথা বলছিলাম। কালিঘাটে মালা বদল করে সিঁদুর দিয়ে। বাড়ীতে আর আমি পারছি না টেকতে। অত্যন্ত বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে।

বাবুল হতবাক হয়ে গেল। সে নিজে এ কথা কোনদিন ভাবে নি। বিয়ের কথাটাই মনে হয় নি তার। অন্ততঃ অলকার মত মেয়েকে। অলকা কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা করলে না—চলি। কেমন? বলে পিছন ফিরলে।

অলকা চলে গেল। ছোট রাস্তাটার খানিকটা দূরেই ওর বাড়ি। সে ওই চলেছে। ওই বাড়ির দোরে পোঁছল। ওই বারান্দায় উঠল। আলো জ্বলল। ফিরল এবার সে। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর রাত্রি। কলকাতার অসংখ্য মানুষও ঘুমিয়েছে। গোটা রাস্তাটা যতদূর দেখা যায় খাঁ খাঁ করছে। রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যেই একটা কথা ভেসে এল—এত রাত্রি? তারপরই পুরুষ কণ্ঠের শব্দ—আঃ, চীৎকার কর কেন?

অলকার বাবা।

দাঁড়াল বাবুল।

—তোর ছবির কণ্ট্রাক্ট হল?

অলকা কি বললে শুনতে পেলে না বাবুল।

—তবে? তবে এত রাত্রি পর্যন্ত কোথায় ছিলি?

দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বাবুল ফিরল। অলকাকে বিয়ে? হে ঈশ্বর! নাঃ, সে হয় না।

* * * *

অলকার জন্ম ভাল ঘরেই। শৈশব বাল্য কৈশোর তার সমাদরেই কেটেছে। তার বাপ যোগেন দাশ—সৌখীন লোক। তিরিশ বত্রিশ সালে বিদগ্ধ লোকেদের আসরে ঘোরাফেরা ছিল। সরকারী চাকরে

ছিল। চুরুট খেত, মদ খেত, পা-জামা পরত, কাপড় পরলে কাঁচি ধুতি পরত—তাও হয় নিজে হাতে কুঁচিয়ে নয় কোঁচা ফুলিয়ে রেখে। স্ত্রীকে নিয়ে নানান আসরে যেত। থিয়েটারে অভিনয়ে নাচে খুব বাতিক ছিল, কিন্তু পাবলিক থিয়েটারে এক শিশিরবাবুর থিয়েটার ছাড়া যেত না। বেশী যেত খুব মডার্ন অ্যামেচার থিয়েটারে। দু-চারটে এমন সংঘের সঙ্গে যুক্তও ছিল। তার থেকেও ঝোঁক ছিল ড্যান্স-ড্রামায়। উদয়শঙ্কর, কথাকলি, ভরতনাট্টমের সমঝদার লোক হিসেবে নামও ছিল। সন্তান ওই একমাত্র অলকা। তাকে ছেলে-বেলা থেকে নাচ রেসিটেশন শিখিয়েছিল। পড়তেও দিয়েছিল প্রথম মিশনারী স্কুলে প্রাইমারী পর্যন্ত, তারপর লরেটো জাতীয় একটা স্কুলে। ১৯৩৮।৩৯ সন থেকে যোগেন দাশের ভাগ্যের দোর অকস্মাৎ সিংহদ্বার হয়ে খুলে গেল। P. W. D.র ওভারসিয়ার ছিল, তা থেকে সায়েবের নজরে পড়ে হয়ে গেল সুপারভাইজার। সায়েব ছিল ভারতীয় নাচের ভক্ত। সেই সূত্রেই সায়েব তাকে পাকড়াতে গিয়ে নিজে পাকড়ে গেলেন। অলকার নাচ দেখে শুরু। তারপর কোথায় কোন নাচের আসর তার খোঁজ রেখে যোগেন দাশ তার কার্ড যোগাড় করে সায়েবকে নিয়ে যেতে শুরু করলে। তারপর সায়েব মাঝখানে, দুদিকে মিস্টার দাশ আর মিসেস দাশ। পনের বছরে তখন অলকা পা দিয়েছে। কিছুদিন পর দলে সেও ভিড়ল। মধ্যে মধ্যে সায়েব তাদের বাড়িও যেত। অবশ্য তার জন্য বাড়িতে একটা সাইনবোর্ড ঝুলিয়েছিল দাশ সাহেব। তাতে লেখা ছিল—'প্রাচ্য নৃত্যকলা সংঘ'। দেখতে দেখতে এল যুদ্ধ। দাশ সাহেব ধাঁ করে টালিগঞ্জে জমি কিনে বাড়ি ফাঁদলে। অলকা ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ভর্তি হল। বছরখানেক দাশ সাহেবের জীবন হেজাকবাতির মত চারিদিকে আলো ছড়িয়ে জ্বলে উঠল। কিন্তু চল্লিশ সালের গোড়াতেই সে আলো নিভে গেল দপ করে। কণ্ট্রাক্টের ব্যাপারে ধরা পড়ে গেল ঘুষ নিতে গিয়ে। ঘুষটা কিন্তু সেবার বেশী ছিল না,

হাজার দেড়েক। কিন্তু ধরা পড়ে জেল থেকে বাঁচতে খরচ হয়ে গেল যা কিছু ছিল। এমন কি যে বাড়িখানা ফেঁদেছিলেন তাও বিক্রী করে সর্বস্বান্ত হয়ে বাঁচলেন—কিন্তু চাকরীটা গেল; থাকবার মধ্যে থাকল বাঙুর কলোনীতে স্ত্রীর নামে কিছুটা জমি। তার উপর কৃতী যোগেন দাশ চৌধুরী ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কাছে জমি এবং ভাবী বাড়ি বন্ধক রেখে বাড়ি তুলে বললে—কুছ পরোয়া নেহি। আমি আজও ইয়ংম্যান। বলে ফের শুরু করলে। তখন যুদ্ধ লেগেছে। বিয়াল্লিশ সাল। নতুন করে জীবন পত্তনের চেষ্টা আরম্ভ করলে যোগেন দাশ; যুদ্ধের কন্ট্রাক্ট এবং তার সঙ্গে প্রচণ্ডবিক্রমে ইংরেজ বিরোধিতা। কন্ট্রাক্টে সুবিধে হল না, কিন্তু ঘোরতর ইংরেজবিদ্বেষী হয়ে যোগেন দাশ চৌধুরী আরও প্রোগ্রেসিভ হয়ে উঠল। নৃত্যনাট্য এবং প্রগ্রেসিভ কালচারের সঙ্গে যোগেন দাশের সম্পর্ক অনেক দিনের, এবার সরকারী চাকরি ছেড়ে তারও পাণ্ডা হয়ে উঠল সে। কিন্তু এটা ওটা পাঁচটা যা সংসার চালাবার জন্য করছিল তার সবগুলোই আয় ব্যয়ের ভারসাম্য হারিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল। যোগেন দাশের একমাত্র খুঁটি হল—ওই প্রগ্রেসিভ কালচার। তখন অলকার পাড়ায় এবং বেপাড়ায়—এখানে ওখানে নাচের জন্যে নাম হয়েছে। এবং তেতাল্লিশ সালে কলকাতা শহরে আই. পি. টি.এর পত্তন হয়ে দেখতে দেখতে চারিদিকে কালচারাল সংঘে ছেয়ে গেল প্রায়। এই অল্প বছর দুয়েকের মধ্যেই যোগেন দাশ এমন ভেঙে পড়ল যে ঠেকা দিয়েও আর সোজা করা গেল না। প্রগ্রেসিভ যোগেন দাশ চৌধুরী বরাবরই খেত—এবার মাতাল হল; ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সুদ মাসের পর মাস বাকী পড়ে মোটা হল, নালিশের নোটিশ এল। অলকার কলেজের মাইনে ছ মাস সাত মাস বাকী পড়ে নাম কাটা গেল। ওদিকে তার নিজের উৎসাহও খুব বেশী ছিল না; মনে মনে সিনেমা-স্টার হবার আকাঙ্ক্ষাও উঁকি মারতে শুরু করেছে। সদ্য সদ্য দুটো তিনটে ছবিতে বেশ নাম-করা ঘরের মেয়েরা সিনেমায় নেমেছে। এবং

রাতারাতি স্টারও হয়ে গেছে। তার উপর বাপ মাইনে না দিতে পেরে কলেজের উপর মর্মান্তিক আক্রোশে ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিল—যেতে হবে না কলেজে। যত সব ফাঁকিবাজ প্রফেসর, অধিকাংশই তো নোট পড়ে পড়ায়। যত রি-অ্যাকশানারির দল। আমি তোকে পড়াব।

মা বলেছিল—তুমি পড়াবে? তবেই হয়েছে!

দাশ চৌধুরী বলেছিল—দেখবে তুমি। আমি ওকে কি করে তুলি দেখো।

অলকা খুশী হয়েছিল। বাপ মাসখানেক পড়িয়েওছিল। কিন্তু তারপর আর না। অভাবপীড়িত বিক্ষুব্ধ-চিত্ত দাশ হয়তো মনে মনে মেয়ের পড়ার দায় থেকে অব্যাহতিই চাচ্ছিল। তবে মেয়েকে নিয়ে কালচারাল শো বা সভা-সমিতিতে যাওয়া বন্ধ করে নি। তার নিজের ডাক তখন বন্ধ হয়েছে কিন্তু অলকার ডাক আসতে শুরু হয়েছে।

এরই মধ্যে দাশের হল স্ট্রোক। সামলে উঠল কিন্তু খানিকটা প্যারালিটিক হয়ে গেল। মাস তিনেক তাকে বিছানায় থাকতে হয়েছিল—এরই মধ্যে অলকা নিজের পথ নিজে বেছে নিলে।

দাশের চিকিৎসায় খরচ বেশী হয়েছিল এমন নয়। তবু কিছু হয়েছিল। আসলে বেঁচেছিল সে নিজের গায়ের বা আয়ুর জোরে। কিন্তু মা মেয়ের অন্নসমস্যা তো পর এসে মিটিয়ে দেয় নি—মেটাতে হয়েছিল নিজেদেরই। সাহায্য করেছিল তাতে এই বাবুল বোস।

* * *

বাবুল বোস এ-পাড়াতেই থাকে। বাপ পেনসনার—বাড়ি করেছিল একখানা। তিন ভাই ওরা। কাবুল ডাবলু বাবুল। বড় দু ভাই মোটামুটি গৃহস্থ, চাকরি করে। লেখাপড়াও শিখেছিল। দুজনেই গ্র্যাজুয়েট, কিন্তু বাবুল ম্যাট্রিক ফেল মুখে বললেও আসলে টেস্টেই অ্যালাউ হয় নি। বাল্যকালে মাতৃহীন, বাপের আদরে বড় হয়েছে। খেয়েছে বাড়িতে, খেলেছে পাড়ায় পাড়ায়। কি ভাবে কোন্ প্রভাবে এমন ধারাটা হয়েছে তার জীবনের সে নিজেও তার

সঠিক বিশ্লেষণ করতে পারে না। তবে ইংরিজী বুকনি দিয়ে কথা বলাটা ওদের পরিবারগত। ওর বাপের কথাবার্তা এইরকম ছিল। কিন্তু তাঁর কথা ছিল সিরিয়স ব্যাপার। বাবুল ওটাকে সিরিওকমিক করে নিয়েছে সেটা নিজের চরিত্রমতও বটে, আবার যুগের হাওয়ার জন্যও বটে। ছেলেবেলা থেকেই বাবুল বেঁকিয়ে কথা বলে, খুঁচিয়ে কথা বলে হাসতে ভালবাসে। লোকে হাসে, দেখতেও ভালবাসে। অভিনয়েও ঝোঁক ছেলেবেলা থেকে। এখন ১৯৪৪ সালে ওর বয়স বত্রিশ চৌত্রিশ, তার মানে তার পাঁচ সাত বছর শৈশব বাদ দিয়ে আঠারো উনিশ সাল থেকে রুচিটা আপনা থেকেই দেখা গিয়েছে। প্রথম সুরু ইস্কুলে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনে সুকুমার রায়ের হাসির কবিতা আবৃত্তি করে। তা ছাড়া ওর একটা বিচিত্র স্বভাব ছিল বেড়াল ডাকা। একঘর লোক বসে কথায়বার্তায় মশগুল, ও তক্তাপোশের তলায় ঢুকে বেড়াল ডাকতে সুরু করত। লোকে সচকিত হয়ে উঠত, তাতেই ছিল ওর অপার আনন্দ। স্কুলে পড়াশুনোর জন্যে প্রাইজ সে পেত না কিন্তু রেসিটেশন-প্রাইজ সে পেতই। এতেই ওর দোর খুলল ভবিষ্যতের। পুরাতন ভৃত্যে—'কেষ্টা বেটাই চোর' আবৃত্তি করতে গিয়ে সে নাম কিনে ফেললে। তারপর থেকে রেসিটেশন কম্পিটিশনে কাপ-মেডাল পাওয়ার ঝোঁকে পেয়ে বসল ওকে। তারপর থিয়েটার। পূজোর সময় পাড়ার থিয়েটারের চন্দ্রগুপ্ত নাটকে ও বাচালের পার্ট পেলে, এবং ভাল পার্ট করলে। সেই থেকে অ্যামেচারে হল প্রতিষ্ঠা। এইটেকেই সে পেশা করবে বলে ঠিক করে নিলে। তার আগে থেকেই বাচনভঙ্গিতে, হাত-পা নাড়ার ভঙ্গিতে বাবুল বোস অভিনয়ই করে যায়। এবং ওইটেই হয়ে গেল তার স্বাভাবিক ভঙ্গি। ছেলেবেলা মা মারা গিয়েছিলেন, বাপ চাকরি করতেন, পেন্সন নিলেন এবং তখন যখন এই ছোট ছেলেটির দিকে তাকালেন—তখন আর তাকে তাঁর নিজের ইচ্ছেমত দিকে চালাবার সময় চলে গেছে। তবু ঝগড়াঝাঁটি কম হয় নি। এবং বড় দুই ছেলের কথায় ছেলেকে

বাড়ি থেকে বের করে দেবার ভয় দেখাতেই সে নির্ভয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেল। গুণ ছিল বন্ধুত্ব জমানোর। এবং আর এক গুণ ছিল, মান অপমান জ্ঞান বাড়িতে তার যত উগ্র এবং তীক্ষ্ণ ছিল বাইরে বন্ধুদের কাছে সেইটে ছিল তত নরম এবং মোলায়েম। যার জন্যে কোন বন্ধুর বাড়ি পাঁচ দিন থাকতে থাকতে যেই বুঝত তারা বিরক্ত হচ্ছে অমনি তার সুটকেসটি তুলে নিয়ে বলত, স্প্রেডিং উইংস। ফ্লাইং টু নর্থ।

বন্ধুবান্ধবে ওর কথা প্রায় সকলেই বুঝত। কেউ না বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা করত, মানে ?

—মানে ডানা মেললাম—উত্তর অভিমুখে উড়ব। হংস-বলাকা। সাইবিরিয়েন গ্যাণ্ডার।

অন্য কোন বন্ধুর বাড়ি গিয়ে সোজা বলত, দেখ, দিন কয়েক থাকব, ফাইভ সিক্স ডেজ। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড !

মধ্যে মধ্যে কলকাতার বাইরেও চলে যেত। সেটার সুবিধেও তখন হয়েছিল। থিয়েটারে ওর নাম তখন ছুটেছে। পারে সব। ডিরেকশন প্রোডাকশন মেকআপ মোশন মাস্টারী সবই কিছু কিছু পারত, নিজের সিরিওকমিক পার্ট তো আছেই। সর্বত্রই এক কথা, উত্তরে যাব, গাছ পেয়ে বসেছি। বুঝেছ ? তাড়া দিলেই উড়ব।

এর মধ্যে হঠাৎ বাবা মারা গেল হার্টফেল করে, বাবুল বোস ফিরে এসে বাড়িতে জেঁকে বসল।

—ফাদারস্ সন্ ইকোয়াল রাইট।

সেটা সে আদায় করলে। বাড়ির ছিল খানচারেক ঘর। একখানা ঘর নিয়ে একখানা ঘরের একের তিনের জন্য হাজার দেড়েক টাকা বড় ভাইদের কাছে আদায় করে ব্যাঙ্কে মজুত করে বললে, নাউ এ ক্যাপিট্যালিস্ট। দেড় হাজারের মালিক। স্টোভ কিনে রান্না করত, অথবা হোটেলে খেত। এবং থিয়েটার করে বেড়াত। ফিল্ম স্টুডিয়োতে ঘুরতে সুরু করলে। এরই মধ্যে এল ১৯৪২ সাল।

টাকা নোটে পরিণত হয়ে উড়তে আরম্ভ করলে। ময়দান হোটেল বার অঞ্চলে নোট উড়তে লাগল। এবং কিছুটা তার এসে পৌঁছল ওসব এলাকা ছাড়িয়ে মানুষের এলাকায়। সেখানে আমোদ প্রমোদ কালচারাল ফাংশন বর্ষার শেষে ব্যাঙের ছাতার মত গজাতে লাগল। ব্যাঙের ছাতার তরকারি খেয়েছে বাবুল বোস, এবার দেখলে ওর তলায় বেশ রোদ জল বাঁচিয়ে দাঁড়াতেও পারা যায়। অবশ্য আরও একটা কথা মনে হয়েছিল তার। মনে হল মানুষেরা সব ব্যাঙ। বড়গুলো জলে থাকে, গর্তে থাকে, পুকুর ডোবা থেকে ধারের গর্তগুলো দখল করে বসে আছে আর তারা সব ব্যাঙাচি এখনও লেজ খসে নি, খসলেও মটর দানা বা তার থেকে বড় গোছের তাদের আকার. এই ছত্রাকের তলাতেই ভিড় জমিয়ে বেশ আছে। জমিয়ে আছে। এখন অবশ্য সে অনেকটা বেড়ে বড় হয়েছে। নামডাকে লাফ দিয়ে চলছে। এরই মধ্যে একদা অলকা দাশ চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ। এক পাড়ায় বাড়ি, একটু দূর; অলকা দাশ চৌধুরী, চৌধুরী সাহেবের মেয়ে নাচে চমৎকার; কথাটা তখন উচ্চ মার্গের কথা। বললেই কথাকলি ভরতনাট্টম নিউ এম্পায়ার মনে করিয়ে দেয়। অর্থাৎ দস্তুর মত হোটেল প্রাঙ্গণে মধ্যাহ্নের রঙীন বড় ছাতার তলায় বেতের চেয়ার টেবিলের ব্যাপার দাঁড়ায়; সেখানে গগলস-চোখে সরোবর-বাসিনী সবুজ রঙের লম্বা অর্থাৎ দীর্ঘাঙ্গ বেঙীর মতই অলকাকে কল্পনা করে সকলে; ছত্রাকের তলায় কাঠ ব্যাঙেরা ওদিকে লাফ মারতে ভরসা পায় না। সেই সময় বাবুল বোসকেই একদিন এমনি একটি রঙীন ছাতার আসরে ডেকেছিল স্বয়ং চৌধুরী সাহেব। ডেকেছিল তারই দেওয়া একটা পার্টিতে। অলকা নাচবে; গাইবে আধুনিক গাইয়ে মন্টি সেন, আর কমিক করবার জন্য বাবুলকে প্রয়োজন হয়েছিল। পাড়ারই কেউ নামটা বলে দিয়েছিল। মন্টি সেন নাম-করা গাইয়ে, দুখানা গান গেয়েই চলে যাবে। অলকার নাচ দুখানা, ফাঁকগুলো ভরাবে বাবুল বোস। বাবুলই কিন্তু বাজিমাৎ করেছিল

সে আসরে। আলাপ সেই সূত্রে। তারপর আর খুব জমে নি। হঠাৎ মাস আষ্টেকের মধ্যে চৌধুরী সাহেব ডিগবাজি খেয়ে থ্রম্বসিসে পড়ে গেলেন। তখনই একদিন সে অলকাদের নতুন বাসার সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিল, অলকা তাকে নিজেই ডেকেছিল। বাবুল সবিস্ময়ে বলেছিল—এখানে! ম্যাটারটা কি?

—কেন? এখানেই এখন থাকি আমরা।

—মানে?

—সে অনেক কথা। বসুন।

অনেক কথার কিছু কথা সেই দিনই সে তাকে বলেছিল। এবং যাওয়া-আসার পথে কয়েক দিনের মধ্যে আলাপ একটু নিবিড় হয়েছিল। তার মা-ও তার সামনে বের হচ্ছেন তখন। বাবা তখনও ঠিক সুস্থ নন। কয়েকদিন পর সেদিন হঠাৎ অলকার মা প্রশ্ন করেছিল—কে বলছিল তুমি নাকি সিনেমায় নামছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এখন আমি লাকি ক্যাট—শিকে ছিঁড়ে একটা পার্ট পেয়েছি।

—ভাল পার্ট? হিরো?

—হিরো! মাই ঈশ্বর! বাবুল বোসকে খোদা চোরা ক্যাট করে তৈরী করেছেন। চিরকাল টাইগারের মাসী তো বলতে পারি না, মামাই ধরুন—মেট্যারন্যাল আঙ্কল। মানে কমিক ছাড়া পারিও না কিছু, চেহারাও টাইগার—মানে হিরোর না। ছোট একটা কমিক পার্ট। তবে আশা করছি এতেই ওয়া গুরুজী কি ফতে করে দেব। জমাব। ডিরেক্টার বলছে গুড। সেদিন বলেছে ভেরি গুড।

অলকার মা বলেছিল, বাঃ। বস, আমি চা আনি।

সমাদর করে চা খাইয়ে মা বলেছিল, দেখ, আমার খুব ইচ্ছে নয়, তবে অলির ইচ্ছে ও সিনেমায় নামে। ওর বাপের কথা তো শুনেছ, জানও। একেবারে আলট্রামডার্ণ, কোন কিছু মানে না। বলে, সংসারে কোন পথে পাপ নেই, যদি পাপ মানে পরের অনিষ্ট নিজের

অনিষ্ট না করে। আর মিথ্যেকে যে কি ঘেন্না! এই তো পাঁচজনে ওর ডিপার্টমেণ্টে পেছনে লাগল। কেন? না ওদের সঙ্গে ক্লিক করে কিছু করবে না। সাহেব ভালবাসে, অনেস্টির জন্যে উন্নতি হয়, বাস্, সে ওদের সয় না। পিছনে লাগল। জেদী মানুষ, একদিন ফিরে এসে বললে, আই হ্যাভ কিকড দেম আউট। চাকরি ছেড়ে দিলাম। দুঃখ দুর্দশা—কুছ পরোয়া নেই। বাড়ি করেছি, বিক্রি করব। ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়ে ব্যবসা করব ওই টাকায়। অসুখ হয়েছে, তাতেও বলে ঠিক আছে। তিনি বলেন, ঠিক লাইন ধরেছে অলি! মেয়েদের পক্ষে সব থেকে শাইনিং লাইন। ওই লাইনেই যাবে ও। 'ক বলব বল!

অবাক হয়ে শুনছিল বাবুল। অলির মা থামতেই বলে ফেলেছিল, সত্যিই তো। টেল মি নট ইন মোর্ণফুল নাম্বারস—ও বিষণ্ণ ভাবে কিছু বলবেন না। মানে দুঃখ করবেন না। তা নামুক না। উনি ঠিক বলেছেন—শাইনিং লাইন বটে। নেমে যাও অলি। আচ্ছা, আমি চলি।

—তুমি একটু দেখো। একটা ভাল বই, হিরোইনের পার্ট—এ হলে আমি আপত্তি করব না। বুঝলে? আমি ওকে বলছি একটা বই তুমি নিজেই করে ফেল। তা সে ওর ভাল লাগছে না।

—ইয়েস, ইয়েস, ও ইয়েস, আমি ঠিক বুঝেছি! রাইট বলেছেন। টুইংক্‌ল্ টুইংক্‌ল্ লিটল স্টার চিরকাল লিটল স্টারই থেকে যায়, সান মুন কি বৃহস্পতি শুক্র হয় না। একবারে হিরোইনের পার্টই ভাল। ভেরি ভেরি ভেরি রাইট। আচ্ছা, চলি আমি। সেই বইয়ে আমাকে একটা ভাল কমিক পার্ট দেবেন। চৌধুরী সাহেব ভাল হয়ে উঠুন, একটা বই প্রডিউস করে ফেলুন। বাস্, এক বইয়েই অলকা দি নিউ মুন!

বলেই সে চলে এসেছিল, দাঁড়ায় নি। রাস্তার পিছন থেকে অলকা ডেকেছিল, শুনুন!

—মাই খোদা, তুমি !

—হ্যাঁ।

অলকা কাছে এসে বলেছিল, আপনি তো পাঁচটা অ্যামেচারে পার্ট করেন, আমাকে তাতে পার্টটার্ট করার সুযোগ করে দেবেন ?

সোজা বাংলা বেরিয়ে এসেছিল বাবুলের মুখ থেকে বিস্ময়ের আতিশয্যে. তুমি আমাদের সঙ্গে এই সব অ্যামেচারে পার্ট করবে ?

—করব। না হলে আমাদের সংসার অচল হয়েছে।

—সংসার অচল হয়েছে !

—হ্যাঁ, সে অনেক কথা। এই আজকেই বাবার একটা ওষুধ কিনতে হবে। ইটালিয়ান ওষুধ। বাজারে নেই। ডাক্তার বললেন একজনের কাছে আছে, কিন্তু দাম নেবে কুড়ি টাকা। আসল দাম আড়াই টাকা। বাবার নতুন রোগ হয়েছে বাত। একেবারে পঙ্গুর মত। ডাক্তার বলছেন দুটো ইনজেকসন দিলেই সেরে যাবে। কিন্তু কোথায় টাকা ! এমন কি ঘরে বিক্রি করবার মতও কিছু নেই। আমার গায়ে যা রয়েছে সব গিল্টির।

বাবুল তাকে সেই দিনই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল একটি অ্যামেচার পার্টির কাছে। তিন দিন প্লে হবে, তাতে অলকা পার্ট করবে। নাচের পার্ট—তার জন্যে দেড়শো টাকা পাইয়ে দিয়েছিল। অনুগ্রহের দেড়শো টাকা। এবং অলকাকে বলেছিল, দেখ, আসল পার্ট স্টেজের বাইরে। বিটল থেকে লাইম খসলেই ইউ আর গন।

অলকা তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

বাবুল বলেছিল, নট আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ? পান থেকে চুন খসলেই তুমি যাবে। হয় দিস সাইড, নয় ছাট সাইড। এক সাইডে আঁস্তাকুড়, অন্য সাইডে খদ। মানে ছাট প্রডিউসার লম্বাচুলো রিচম্যানস্ সন—ওর সঙ্গে ইয়ারকিও দিতে হবে, মানে ফিস অ্যাণ্ড ফিস-ক্যাচার প্লে। ঠোক্কর মারবে, কিন্তু গিলবে না। বুঝেছ ?

গিললে গন। আর ঠোকরও যদি না মার তবে রাস্কাল চারে ঢেলা মেরে ভাগাবে। আর পাবে না পার্ট।

অলকা একটু হেসে বলেছিল, জানি।

—জান ? মাই খোদা ! আমি ভেবেছিলাম কাঁচা—

—অভাবের তাড়ায় পেকেছি বাবুলদা ! তোমাকে দাদাই বলব, কেমন !

—ও-কে ! বাট্, দাদা বললে আজকাল লোকে সন্দেহ করে।

—তা করুক।

—আপত্তি নেই। কিন্তু দোহাই তোমার, আমাকে যেন তুমি ফিস ভেবো না। ও আমার সইবে না।

সেই দিন থেকে বাবুল বোসই ওকে সঙ্গে নিয়ে এখানে-ওখানে পার্ট পাইয়ে দিয়েছে। অলকা নামও করেছে অ্যামেচারে। কিন্তু সিনেমায় সুবিধে হয় নি মাথায় খাটো বলে। একটু মোটাও মনে হয় সে দৃষ্টে। এবার মঞ্জরী অপেরায় নিজে ঢোকবার সময় ওকেও নিয়েছে। মেয়েটার উপর একটা মায়া ওর আছে। কিন্তু আজ অলকা যা বললে এবং ওর বাড়িতে ওর বাপ-মায়ের যে সম্ভাষণ শুনে এল এটা সে কল্পনা করে নি।

অলকাদের বাসা থেকে তার বাড়ি প্রায় আধ মাইল পথ। টালিগঞ্জের এলাকায় রসা রোডের দু পাশে দুটো নতুন কলোনী হচ্ছে। অলকারা থাকে পশ্চিমে, বাবুলদের বাড়ি পূবে। রাস্তা জনবিরল হয়ে গেছে, তার উপর ব্ল্যাক আউটের অন্ধকার। কিন্তু তাতে খুব ভয় নেই বাবুলের। পাড়ার রাত্রিচর এবং রোয়াকবাজেরা তাকে জানে; দেখলেই হেসে ফেলে, সে হাত নাড়লেও হাসে, রাগ করলেও হাসে। ভয় হয় কোনদিন যদি মর্মান্তিক যন্ত্রণায় ও কাঁদে তাহলে সেটাও একটু নতুন কমিক কিছু বলে হেসে গড়িয়ে পড়বে। তার মাই লর্ড, মানে গোরাবাবু, তার বইয়ে তার পার্টের এমনি একটা সিন লিখেছে। কামন্দক অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে গাছতলায় আর কাতরাচ্ছে। শবর

মেয়েরা এসেছে বনে কাঠ সংগ্রহ করতে; তৃষ্ণায় কাতর হয়ে সে তাদের জল চাচ্ছে। অবশ্য নিজের ভঙ্গিতে—

মুমূর্ষু মুমূর্ষু অহং, জলং জলং সুশীতলং—
শীঘ্রং দেহি, ভো শবরী, নচেৎ মরণং ধ্রুব।

শবরী বলছে—তোমার জাত যাবে যে ঠাকুর—

কামন্দক বলবে—বৃহৎ কাষ্ঠে দোষং নাস্তি আতুরে নিয়মো নাস্তি
তথাপি যদি যায়—শবরোহংভবিষ্যামি।

ওরে রাক্ষসী, তোর ঘরেই তখন হাঁড়ি কাড়ব।

মেয়েগুলো হেসেই আকুল। বলে, ঠাকুরের ঢং দেখ!

কামন্দক চীৎকার করে উঠবে, জল জল জল। ওরে, প্রাণ যায়!

তারা হি হি করে বেশী হেসে উঠবে। এমন সময় নায়ক গোরাবাবু ঢুকবে। জল দেবে। সেই সূত্র ধরে রাজবয়স্য কামন্দক নায়ক ব্রাহ্মণপুত্রের মিত্র হল। এবং ব্রাহ্মণকুমার রাজজামাতা হয়ে শেষে রাজকন্যার ধর্মপরায়ণতা এবং শুচিতার নিষ্ঠুরতায় নির্মম ভাবে পীড়িত আহত হয়ে ঘর ছেড়ে ওই গন্ধর্বকন্যার প্রেমকে অবলম্বন করে সারা জীবন পতিত হয়েই কাটিয়ে দিল। তখনও সে তার সঙ্গী হয়ে রইল।

পার্টটা ভাল। গোরাবাবু তার ইংরিজী বুকনির মুদ্রাদোষ বা স্বভাবকে চমৎকার ব্যবহার করেছে ভুল সংস্কৃত বুকনিভরা বক্তৃতায়। বেড়ে হয়েছে জায়গায় জায়গায়—ঝঞ্ঝাটং ঝঞ্ঝাটং সত্যং ঝঞ্ঝাটং জগতংময়ং—। ওটা এরপর শ্রোতাদের মুখে মুখে ফিরবে। এবং কথাটাও সত্য, খাঁটি সত্য।

বাড়িতে ঘরের তালা খুলে ঘরে ঢুকে, আলোর সুইচ টিপে দেখে আলো জ্বলে না। বারবার চেষ্টা করেও আলো জ্বলল না। সে এবার চীৎকার করে বলতে লাগল, আলো জ্বলে না কেন? অ্যাঁ! বলি আলো জ্বলে না কেন? বাড়ির সব ডেড্ না কি? সাড়া দেয় না? ওরে ও গোপাল! গোপ্লা রে! এই!

উপর থেকে মেজ বউদির কণ্ঠস্বর শোনা গেল, মরণ! এই রাত্রে ষাঁড়ের মত চীৎকার! ফিউজ হয়েছে গোটা বাড়ি। আলো জ্বলবে কি করে!

ওদের সঙ্গে মানে দুই ভায়ের স্ত্রীদের সঙ্গে ওর কথা নেই। ভাইদের সঙ্গেও নেই। ভাইপো-ভাইঝিদের সঙ্গে আছে, তারা ওর ভক্ত।

ঝঞ্ঝাটিং ঝঞ্ঝাটিং সারং ঝঞ্ঝাটিং জগতময়ং। মাই খোদা, হে গড, এয় ভগবান—দেশলাইয়েও দেখা যায় গোটা কয়েক কাঠি।

অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে শুয়ে পড়ল বাবুল বোস। পৈতৃক বাড়িতে উপরে নীচে খানচারেক ঘর; ও বাইরের ঘরখানা নিয়ে বাকীটা ওদের ছেড়ে দিয়েছে। বাইরে থেকে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়, আবার এসে তালা খুলে ঘরে ঢোকে। ভিতরের দিকে দরজা বন্ধই থাকে। বাবুলের কল পাইখানা বাড়ির পাশের চার ফুট গলির মধ্যে। শুধু ইলেকট্রিক গিটারটা একসঙ্গে আছে। এটাও ঘোচাতে হবে। এবার করবে। মঞ্জরী অপেরায় চাকরিটা প্রায় সাত আট মাসের। বাইরে বেরুতে পারলে টাকা জমবে। দৈনিক খোরাকি আছে, এক প্যাকেট সিগারেট আছে, শুধু মদের দাম। তা হয়ে যাবে। বিগ ব্রাদার আছে, মাই লর্ড আছে। ওরা দুজনে রইস আদমি। অ্যারিস্ট্রোক্র্যাট! মাই লর্ড গুণী লোক। বইখানা—

বিগ ব্রাদার বলছিল—বইখানা মাই লর্ডেরই জীবন একরকম। গরীবের ছেলে, গুণী ছেলে, গুণ দেখে বড়লোকরা জামাই করে বাড়িতে রেখেছিল। কিন্তু বড়লোকের ধার্মিক শুচিবাইগ্রস্তা মেয়ের তাপ সইতে পারে নি। পালিয়ে এসে মঞ্জরীর প্রেমে পড়ে মঞ্জরী অপেরা খুলেছে। যাত্রাতে মঞ্জরী করবে সেই স্ত্রীর পার্ট। অলি মঞ্জরীর পার্ট—মন্দ ব্যাপার নয়!

নয়

'গন্ধর্বকন্যা'র প্রথম অভিনয় হল কলকাতায়—মঞ্জরী অপেরার পেট্রন পাকপাড়ার রাজাদের বাড়ির উঠোনে। কুমার বিমল সিংহ পণ্ডিত লোক, রসিক লোক, অমায়িক লোক, এ যুগে এমন লোক র্লভ। তাঁর দুই ভাই অমরেশ সিংহ, বৃন্দাবন সিংহ এবং ওঁদের কাকা জগদীশ সিংহ সকলেই উচ্চশিক্ষিত এবং রসিক লোক। ওঁদের বাড়ির নাট্যরসামোদিতা বহুকাল থেকে বিখ্যাত। ওঁদের বেলগেছের বাড়িতেই প্রথম থিয়েটার হয়েছিল। রাসের সময় মুর্শিদাবাদে ওঁদের মূল বাড়িতে আজ কয়েক বছরই মঞ্জরী অপেরা নিয়মিত গান করে আসছে। প্রথম কোন বই খোলবার সময় প্রথম গাওনাটা এই ভাবে কে.ন বড় বাড়িতে গেয়ে দেখে নেয় পার্টি—বইটা দাঁড়াল কেমন। মে টামুটি ওটা একরকম ড্রেস-রিহার্স্যাল। অভিনয় কিছুটা ছাড়াছাড়া এবং কাটাকাটা হয় বটে তবে কেমন জমাট হবে, লোকের কেমন লাগবে, এটা বোঝা যায়।

জমাট নাটক। গোড়া থেকেই প্রায় জমে গেল। বংশীর কৃতিত্বই জমিয়ে দিলে। গানে সে এমন সুর দিয়েছিল যে প্রথম গানেই যেন আসর রমরম করে উঠল। আশা নিজে নেমেছিল সখীর দলে। তার ওদিকে নিয়েছিল চোদ্দ পনের বছরের নতুন মেয়েটাকে। নতুন হলেও মেয়েটার গলা আছে আর নাচবার মত লম্বা দেহ আছে। এখনও ঠিক যুবতী সে হয় নি, কিন্তু ওকে আশা ঠিক যুবতীই বানিয়ে তুলেছিল। এবং মোটামুটি তালে পা ফেলাটাও ঠিক চালিয়েছিল।

আনো আনো, রঙীন মাধুরী আনো—
টানো টানো, কাজলের রেখা টানো—

বলে চোখের কোলে কোলে বুড়ো আঙুল এবং তর্জনী টেনে কটাক্ষ হেনে একটু ঝুঁকে একটু থেমে জলদে সজল নয়ন মুছে ফেলে সই কাজলের রেখা টানো, বিরস অধর সরস করিয়া রঙীন মাধুরী

আনো, ধরতেই যেন আসর তালে তালে নেচে উঠল, দুলে উঠল। বাঁয়া তবলায় সঙ্গতে সে যেন হিল্লোল বইয়ে দিলে একটি। আসরের লোকের পিছনে রীতুবাবু ব্রহ্মমিত্র সেজে দাঁড়িয়েছিল, তার পাশে সর্বাণী সেজে শোভা, তারা একটু পরেই ঢুকবে। ব্রহ্মমিত্রের প্রবেশ এই গানের পরেই। তারও আগে দাঁড়িয়ে দলের আর কয়েকজন লোক। যোগাবাবুও রয়েছে। যোগাবাবুর গণ্ডগোল মিটে গেছে, সে আবার দলে ঢুকেছে। রীতুবাবু অনেক বলে-কয়ে অপরাধ মাফ করিয়ে দিয়েছে। অপরাধ যোগাবাবু নিজের অজ্ঞাতসারে ঠিক না হলেও মূর্খতার জন্য করে ফেলেছিল। ওই পাঁচুন্দির কাছের বায়নাটা সে এনেছিল, কিন্তু সমস্ত জেনেশুনেও সে ঠিক বুঝতে পারে নি যে, এটা গোরাবাবুর বুড়ো ঠাকুরদা এবং গোরাবাবুর শ্বশুরদের আঘাত দেবার জন্যই বায়না করছে।

গোরাবাবু ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল—আপনি তো জানতেন, ওখানে যখন শ্বশুরবাড়ী আপনার তখন আমার বাড়ি ওখানে, শ্বশুর-বাড়ী ওখানে, তা তো জানতেন।

যোগা সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করেছিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। জানতাম। নিশ্চয়ই জানতাম। জানতাম না বললে অন্যায় মিথ্যে বলা হবে যে। জানতাম। এককালে আপনার শ্বশুরদের সঙ্গে ঠোকাঠুকি ছিল তাও জানতাম। আবারও হবে যখন আবার এরা মাথা তুলেছে, তখন আবার লাগবে, তাও জানি।

—আমার ঠাকুরদার ব্যাপার? জানতেন না?

—মিথ্যে বলব না। জানতাম। শুনেছি। হ্যাঁ শুনেছি। শুনেছি বইকি!

—তবে!

—এতটা ভাবি নাই বাবু। না, আমি ভাবি নাই।

—ভাবেন নি?

—কি করে ভাবব বাবু! আমি তো নিজে যাত্রাওলা। যাত্রা-

গান গেয়ে খাই। ওদের ওখানে যাই, কত্তা আদর খাতির করে। আমার অপমান তো লাগে না।

বলেই সে পা দুটো চেপে ধরেছিল গোরাবাবুর—দোহাই বাবু, বুড়ো বামুন, ঘরে দুই পরিবার, গণ্ডাখানেক বিটি। তার কটা আইবুড়ো, একটা বিধবা—

—ছাড়ুন। যান, কাজ করুন গে।

—ঈশ্বর মঙ্গল করুন বাবু। মঞ্জরী অপেরার জয়জয়কার হোক। আমি মিছে বলব না, সত্যি বলব। কত্তার কাছে মঞ্জরী অপেরার বড়াই করেছিলাম, তা উনি বলেছিলেন, আন দেখি দল, দেখি। যদি আনতে পার তবে বকশিশ দেব তোমাকে বিশ টাকা। আমি বলেছিলাম, আলবৎ আনব। বুঝতে পারি নাই বাবু। বোকা গাঁজাখোর বামুন তো, ঘোরপ্যাঁচ বুঝি নাই।

গোরাবাবু বলেছিল—ঠিক আছে। যান।

যোগাঠাকুর চলে গিয়েছিল শোভার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে—শোভ দিদি শোভাদিদি, আমার জিৎ, তোমার হার।

বাঁতুবাবুই যোগাঠাকুরকে নিয়ে এসেছিল, সে বললে—অন্যায় করলেন দয়াময়। ক্ষমা করা উচিত ছিল না—টাকা নিয়েছে। জানলে আনতাম ওকে আমি!

—ওর চেয়ে আমার অন্যায় বেশী মাস্টারমশাই। আমার বায়না নেওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু আমার শ্বশুরদের অপমান হবে এইটের জন্যে এবং আর একটা কথা, মঞ্জরীকে বিয়ে করেছি, যাত্রা করি এতে আমি কোন অন্যায় করি নি। এইটে দেখাবার জন্যে আমি বায়না নিয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম মাস্টারমশাই, এমনি করেই আমি ভেবেছিলাম। কিন্তু ভাবি নি এর ধাক্কায় দাদু মারা যাবেন। তবে আমার সান্ত্বনা আমি মঞ্জরীর অপমান করি নি।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—যোগাবাবুকে আমি নিজেই ডাকতাম। আপনি নিয়ে এলেন সেটা ভাল হয়েছে। বোকা লোক,

কিন্তু সরল। বুঝতে পারি নি, কৈফিয়তটা আমি ষোল আনা বিশ্বাস করেছি।

যোগাবাবু দর্শকদের ঠিক পিছনে দলের লোকের আগে দাঁড়িয়ে তারিফ করছিল—বাহবারে বেটা বাহবা! বেটা আমার সুরের খেলে আচ্ছা খেলোয়াড়!

অর্থাৎ বংশী। এবং ওই সব ঝোঁকের মাথায় সঙ্গীদের দেহ হিল্লোলের সঙ্গে সঙ্গে ওর দেহেও হিল্লোল খেলাচ্ছে ও। অত্যন্ত কুৎসিত লাগছে সে খেয়াল নেই।

রীতুবাবুর হাতের সিগারেটটা পুড়েই চলেছে।

শোভা পাশে দাঁড়িয়ে মধ্যে মধ্যে মৃদুস্বরে বলছে—আমার পা নাচছে মাস্টার।

রীতুবাবু ভদ্রতার খাতিরে বললে—হুঁ।

—চল না, এরপর আমরা দুজনে ডুয়েট্ নাচ নাচতে নাচতে গিয়ে ঢুকি।

রীতুবাবুর হঠাৎ মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, সে একবার একটু মুখ ফিরিয়ে একটা রূঢ় দৃষ্টি হেনে বললে—চুপ কর।

শোভা থমকে গেল। তার মনে হল তার মুখের উপর একটা চড় মারলে রীতুবাবু। চুপ করে গেল সে। আলো এখানে আবছা নইলে হয়তো দেখা যেত, শোভার মুখের পেণ্টে সাদা রঙের মাত্রা যেন বেশী হয়ে গেছে।

গান শেষ হতেই রীতুবাবু গিয়ে ঢুকল—রাজা ব্রহ্মামিত্র, বন্ধ করো, বন্ধ করো গান। বন্ধ করো উৎসব উল্লাস।

ভরাট গলায় আবেগ সঞ্চারিত কণ্ঠস্বর গম গম করে উঠল। আসরের পরিবেশ সুন্দর, প্রশস্ত উঠোনের চারপাশে জোড়া জোড়া গোল থামের ঘের, বারান্দায় পুব দিকে মেয়েদের আসর, অন্য দু দিকে বিশিষ্ট দর্শকেরা চেয়ারে বসেছেন। মাঝখানে উঠোনে সাদা ফরাস,

চারপাশে উজ্জ্বল আলো। উপরটা খুব সযত্নে ঢাকা ; ব্ল্যাক-আউট, যাতে এক ফোঁটা আলো না বের হয়। রীতুবাবু প্রথম বক্তৃতাতেই ক্ল্যাপ পেলে। তার পরেই ঢুকল শোভা—মহারাণী সর্বাণী আর নিজে মঞ্জরী—সে রাজকন্যা শুচি। শান্ত ধীর কণ্ঠে মঞ্জরী তার পিতার প্রসারিত বাহুর সীমানা থেকে সরে দাঁড়িয়ে বললে :

ক্ষমা কর পিতা, দেবকার্যে রত আমি,
হাতে মোর পূজা উপচার

বাধা দিয়ে সর্বাণী বললেন—শুচি, শুচি! পিতারে প্রণাম কর!

ব্রহ্মমিত্র বললেন :

না না রাণী। গন্ধর্ব আলয় থেকে
প্রত্যাগত মোর দেহে মনে—পাপ গ্লানি—

শুচি বাধা দিয়ে বললে :

তাও মোর কাছে বাধা নয়। আমি কন্যা, তুমি পিতা।
কিন্তু পিতা এ পুরে প্রবেশ করি কাহারও প্রণাম ভক্তি
লইবার আগে তুমি নিজে ভক্তিভরে প্রণাম
করহ আসি এ গৃহের দেবতার পদে।
গঙ্গাবারি স্নান তরে রয়েছে প্রস্তুত।
কর স্নান, পট্টবস্ত্র পর, খোল মুক্তাহার—
কৃতাঞ্জলি পুটে তোমারই স্থাপন করা
দেবতার পদে প্রণাম করিয়া লহ
তাঁর আশীর্বাদ। তারপর আসিয়া
দাঁড়াও রাজাসন পাদপীঠে, আমরা প্রণত
হয়ে ধন্য হই সবে।

চারিদিকে রব উঠে গেল—সাধু সাধু সাধু।

সাধুবাদ প্রথম দিয়েছিলেন গৃহকর্তা নিজে।

ওদিকে গ্রীনরুমের মধ্যে গোরাবাবু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রস্তুত করছিল। এবার ঢুকবে সে। নাটুবাবু বসুমিত্র, বাবুল

ঘোস কামন্দক। নাটুবাবুও ভাবছিল—নিজের পার্ট। বাবুলের কিন্তু ওসব ভাবনা চিন্তা নেই, সে বাইরে দাঁড়িয়ে দেখছিল, ফিরে এসে টেবিলের উপর থেকে একটা টর্চ তুলে নিয়ে কানে লাগিয়ে বললে—হ্যালো, হ্যালো। জলদি ফায়ারব্রিগেড। মেক হেস্ট! ফায়ার। কোথায়? আমাদের পালা—হ্যাঁ গন্ধর্বকন্যা—একদম ফায়ার। ফায়ারব্রিগেড না থাকে কাউকে মেঘমল্লার গাইতে বলুন। Yes, yes, yes—গন্ধর্বকন্যা ফায়ার। হ্যাঁ, রাম ফায়ার!

সত্যিই পালাটা খুব জমাট হয়ে চলেছিল। বংশীর দেওয়া গান নাচ তার স্বাদ গন্ধ রূপকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল। সকলের মধ্যে নার্ভাস হয়েছে শুধু অলকা। তার গলা শুকুচ্ছে, ঘন ঘন জল খাচ্ছে। সেই হিরোইন, সেই গন্ধর্ব কন্যা মালবিকা। শোভা বিমর্ষ হয়ে আছে। গোপালীর সঙ্গে বার তুই কথা কাটাকাটি হয়েছে। মঞ্জরী খুব গম্ভীর। তার পার্টের ছায়া পড়ছে যেন। রাজকুমারী শুচি বিবাহের রাত্রে বাসরে জয়ন্তকে বলছে:

জীবনে চাহিয়াছিনু পুরুষ-উত্তম যিনি—নারায়ণ অবতার
রাম সম পরম পুরুষে। পিতা মোর তোমারে আনিয়া
কহিলেন, তুমি তাঁর প্রতিনিধি। নারায়ণ সাক্ষী করি
তোমারে প্রণাম করি দেহ মন সঁপি ধরি তব হাত।
ধর্মপথে পুণ্যপথে একদিন সেই পথে মিলিবে সাক্ষাৎ
লক্ষ্মীনারায়ণ সাথে। তুমি মোর সাক্ষাৎ দেবতা—
লহ প্রণাম আমার!

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জয়ন্ত তার মুখের দিকে।

শুচি বললে—মুখপানে চেয়ে কি দেখিছ স্বামী! রূপ?

জয়ন্ত বললে—রূপ নয়, খুঁজিতেছি হৃদয় তোমার!

শুচি বললে—হৃদয় হৃদয়ে নাই—তোমার চরণতলে করেছি অর্পণ।

জয়ন্ত বললে—না।

—না? শুচি নয় অসত্যবাদিনী!

—অসত্যবাদিনী নয়। সত্যেরে সে বোঝে নাই।

—সত্যেরে বোঝে নি শুচি ?

—না। তব বাক্য প্রমাণ তাহার।

হৃদয় বাক্যের উৎস দেবী।

হৃদয় সঁপেছ তুমি ধর্মের চরণে।

আমি ধর্ম নই।

—স্বামী! কি বলিছ তুমি ?

—সত্য কথা কহি দেবী : আমি ধর্ম নই।

সামান্য মানব আমি। জয়ন্ত আমার নাম।

ধর্মের নিয়ম আছে, সে নিয়ম ভাঙে না, ছেঁড়ে না-

নিয়ত বন্ধনপীড়া, আমারে পীড়িত করে—

আমি সব ভেঙে ছিঁড়ে মুক্তি চাই।

ধর্মের নাহিক তৃষ্ণা—মোর তৃষ্ণা অফুরন্ত।

জয়ন্ত খুঁজিয়া ফেরে সুখ। দুঃখ মাঝে

পরিতুষ্ট ধর্ম— সুখ নিদ্রাভোর। ধর্ম মোর আছে,

কিন্তু তারে আমি গড়ে লই।

শুচি এবার স্তম্ভিত হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

জয়ন্ত বললে :

বল দেবী, যে মাল্য পরায়ে দেছ গলে—

ফিরাইয়া দিই ; এই স্তব্ধ নিশীথ প্রহরে—

সবাকার অগোচরে চলে যাই আমি !

তুমি চল আপনার পথে। আপন তপস্যা

তব পূর্ণ কর তুমি। পাও তুমি নারায়ণে।

শুচি এসে হাত ধরে বললে :

আমার তপস্যা বলে

তোমারেই হতে হবে সনাতন ধর্মের প্রতিভূ।

তোমারে ছাড়িয়া নাহি দিব। আজি হতে
এই হবে তপস্যা আমার।

করতালিতে আসর ভরে গেল।

মঞ্জরী কিন্তু ফিরে এল। তার মুখে হাসি নেই, তার মুখ থমথম করছে।

অলকা গন্ধর্বকন্যা মালবিকা, কুসুমিকা তার মা, যে রাজা ব্রহ্মদত্তের গান্ধর্বমতে বিবাহিতা স্ত্রী, এ পার্টে নেমেছিল গোপালীবালা। দলের সকলেরই একটা ধারণা ছিল, খাটো মাথায় একটু হৃষ্টপুষ্ট অলকাকে পার্টে ঠিক মানাবে না, বিশেষ করে গোরাবাবুর দীর্ঘদেহ নায়কের বিপরীতে নায়িকা হিসেবে বেমানান হবে। রিহারশ্যালে পার্ট সে মন্দ বলে নি, এবং নতুন মেয়ে বলে গোরাবাবু রীতুবাবু এবং মঞ্জরী পরামর্শ করে তার পার্ট কমিয়ে ছোট করেও দিয়েছিল। কিন্তু আসরে বিপরীত ব্যাপার ঘটে গেল। অলকা মেক-আপের আর্টটা জানে, সে চূড়ো করে চুল বাঁধার ঢঙটাকে একটু বদলে নিয়ে মাথায় চুলের এমন একটি খোঁপা তৈরী করেছিল যে তাকে খুব খাটো বলে মনে হয় নি, এবং তার পোশাক এমন আঁট-সাঁট করে পরেছিল যে তাকে তন্বীর মতই মনে হয়েছিল। কিন্তু একটা ভুল করেছিল সে। তার পার্টের সঙ্গে মিলিয়ে সাজসজ্জা যা করেছিল, তাতে জৌলুষ ছিল না। জৌলুষহীন সাজে কেমন যেন ম্লান লাগছিল। তার উপর পার্টের বেলায় কেমন মিইয়ে গেল। নার্ভাস হয়ে গেল বলে মনে হল। পার্টটি অত্যন্ত শান্ত স্নিগ্ধ ফুলের মত কোমল একটি সদ্যযুবতীর পার্ট।

কুসুমিকা গন্ধর্বকন্যা দেব-পরিচর্যা করতে গিয়ে দেখা পেয়েছিল দেব-অংশোদ্ভূত মানববংশের বীর্যবান রাজা ব্রহ্মমিত্রের। এবং পরস্পরের প্রণয়ে মুগ্ধ হয়ে গন্ধর্বমতে বিবাহ করে জীবনযাপন করছিল, তারই ফল মালবিকা। দেবতাদের ষড়যন্ত্রে ব্রহ্মমিত্র কুসুমিকাকে

বিশ্বাসঘাতিনী ভেবে দেবলোক গন্ধর্বলোক ছেড়ে নিজের রাজ্যে চলে এসেছেন; কিন্তু কুসুমিকা বিশ্বাসঘাতিনী নয়, সে ব্রহ্মমিত্রকে অপরাধী করে নি, নিজের অদৃষ্টকে দায়ী করে, আপন জীবন-তপস্যা করে চলেছে কন্যাকে নিয়ে। দেবতাদের অজস্র প্রসাদের প্রলোভন উপেক্ষা করে নারায়ণ-মন্দিরে নারায়ণ-মহিমা কীর্তন করে জীবন ধারণ করে। কন্যাকেও সেই ব্রতে দীক্ষা দিয়েছে। মালবিকা সেই কন্যা। সে রাত্রে নারায়ণ-মন্দিরে এসে আরতি নৃত্য করে। চোখে তার স্বপ্ন—নারায়ণ দেখা দেবেন। চন্দ্রালোকিত মন্দির-প্রাঙ্গণে আরতি করবার জন্য দুই হাতে পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে প্রথম প্রবেশ তার; আরতি নৃত্য করে নতজানু হয়ে সে প্রার্থনা করছে গানে—

পূর্ণ করো পূর্ণ করো—পুণ্য করো পুণ্য তুমি, পুণ্যময়—।

নাচলে সে ভালই। গান থেকে থেকে ম্লান হতে লাগল। গানখানা ভাল হল না। গানের গলা তার চলনসই; তার উপর গলা সে তুলতেই পারলে না। জমাট অভিনয়ের আসরে ঢুকেছিল। প্রথমেই ছিল নাচ। তারপর গান। সে ভুলতেই পারলে না যে তার গলা মঞ্জরীর মত ভাল নয়। ঠিক একটা দৃশ্য আগে মঞ্জরী গান গেয়ে এনকোর পেয়ে গেছে। লোকে প্রথমটা অপেক্ষা করছিল যে গলা ধীরে ধীরে উঠবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই লাউডার—শুনতে পাচ্ছি না—রব উঠতেই সে চঞ্চল হয়ে পড়ল, গলা চড়াতে চেষ্টা করতেই বেসুরো হয়ে গেল। যাই হোক, গান শেষ হতেই ওর মা কুসুমিকা এল, এবং তাকে বললে তার জন্মকথা। বললে নিজের ব্রতের কথা, এবং তাকে নিয়ে তার আকাঙ্ক্ষার কথা। বললে:

মালবিকা, গন্ধর্বের কুলে জন্ম—দেবতালোকের মোরা
বিলাস সামগ্রী। বিধাতা নির্দেশে—
এরই তরে সৃষ্ট মোরা—কোন পাপ স্পর্শ নাহি করে।
তবু, তবু চিত্তলোকে নারীমন করে হাহাকার
স্বামী পুত্র গৃহ লাগি। মন চায় তুলসীমঞ্চের

তলে প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া স্বামী দেবতার লাগি
প্রতীক্ষা করিতে। সহসা পুরিল সাধ। একদিন
দেবলোকে সমাদৃত নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ ব্রহ্মমিত্র—
সাথে হল দেখা। দিব্যকান্তি বীরবপু—
মানুষের চিত্তলোক হাসি কান্না,
সুখ দুখ—মেঘরৌদ্র খেলায় বিচিত্র,—
নয়নে কি প্রেম দৃষ্টি আকাঙ্ক্ষার মণিদীপ শিখা।
তাঁহারে বরিয়াছিনু।—তিনি মোরে গন্ধর্ব বিধানে
বিবাহ করিয়া মোর সাথে বাঁধিলেন ঘর।
তার ফল তুই। অর্ধেক গন্ধর্ব তুই অর্ধেক মানবী।
তাই তোর চিত্তলোকে সতীত্বের সাধনা পিপাসা
সুগভীর অন্তস্তলে বয়ে যায়—পাতালের
গঙ্গাধারা ভোগবতী সম।

চমকে ওঠে মালবিকা—মাতা! সত্য কথা? মানবের কন্যা আমি সত্যিই মানবী! আমার পিতার নাম ব্রহ্মমিত্র রাজা?

একটু স্তব্ধ থেকে বলে—তাই তাই!

কুসুমিকা বলে—তাই কি মালবিকা?

মালবিকা বলে :

তাই মোর দেবতারে ভাল নাহি লাগে। তাহার বেদনা নাই,
মাতা, আনন্দের স্পর্শ চেয়ে বেদনার স্পর্শ মোর
মধুর মধুরতর লাগে। তাই মাতা, মোর চক্ষুজলে
লবণাক্ত স্বাদ! তোমার মতন স্বাদহীন জলবিন্দু নয়!
আমি মানবী!

কুসুমিকা : হ্যাঁ মালবিকা, মানবশ্রেষ্ঠের কন্যা তুমি মানবী!

মালবিকা একটু চুপ করে ভেবে নিয়ে বলে : তাই! মাগো তাই!

তাই মোর স্বর্গ-শিলা দিয়ে গড়া এই যে বিগ্রহ—
নারায়ণ মূর্তিখানি এও যেন—

—চুপ মালবিকা, চুপ।

মালবিকা চুপি চুপি বলে ঃ

এও মোর চিত্ত নাহি ভরে। এরই পদে
ঢেলে দিতে আসি দেহ প্রাণ মন, কিন্তু দিতে এসে
ফিরে যাই। বলে যাই, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর মোরে—
ভয় লাগে; নিদারুণ ভয়; নারিলাম দিতে।
ফিরে যাই আমি। তাই মাগো, তাই
মন মোর, দৃষ্টি মোর যত ধায় উর্ধ্বলোকে—
তৃপ্তি যত পাই আমি আলোকের ধারাস্নানে—
তত দেখি আমারই কায়ার ছায়া কৃষ্ণরূপ ধরি
পদতলে বসুন্ধরা বক্ষখানি আঁকড়িয়া ধরে।
তাই মাতা—তাই!

কুসুমিকা বলে—হ্যাঁ তাই—তাই!

মালবিকা বলে ঃ

তাই মাতা মনে মনে কল্পনায় জেগে ওঠে
এক অচেনা জনের ছবি; মুখে যার আধো আলো
আধো ছায়া খেলা করে মেঘ রৌদ্র সম। বুকে যার
তটপ্রান্তে উল্লাসের আনন্দে তরঙ্গ ভাঙিয়া পড়ে
কল-উতরোলে—আর সুগভীর অন্তস্তলে
বেদনা কাঁদিয়া ফেরে বিষণ্ণ কল্লোলে।
যাহার দেহের ছায়া গাঢ় হয়ে আমারে ঘিরিয়া
অবলুপ্ত করি দেয় কৃষ্ণসমুদ্রের তলদেশে—
স্বপ্ন ঘেরা প্রবাল পুরীতে।

কুসুমিকা বলে ঃ তারই স্বপ্ন সাধনা তোমার কন্যা—নরশ্রেষ্ঠ
ব্রহ্মমিত্র সুতা! তাহারই তপস্যা কর। তাই আনিয়াছি
গৈরিক বসন। দীক্ষা সাথে দিনু এই বাস—
তপস্যা সার্থক করা তপস্যা তোমার।

কুসুমিকা গৈরিক বস্ত্র দিলে, মালবিকা সেখানি উত্তরীয়ের মত অঙ্গে জড়িয়ে মাকে প্রণাম করে বলে—কর আশীর্বাদ!

—আশীর্বাদ!

এমন ভাল কথাগুলি সে বলে গেল, কিন্তু জোর দিয়ে আবেগ দিয়ে বলতে পারলে না। সাজঘরে ফিরে এলে কেউ তাকে উচ্ছ্বসিত হয়ে সম্বর্ধনা করলে না। বাবুল বললে—ম্যাটারটা কি? একদম যে ড্যাম্প মেরে গেলে!

রীতুবাবু বললে—ঠিক আছে, পরের সিন থেকে জোর দিয়ে বল, গলা চড়িয়ে বল। লোককে শোনাতে এসেছ, শোনানোটা সব থেকে আগে। গলা চড়াও।

গোরাবাবু বললে—বলার দিক থেকে তোমার ঠিক হয়েছে। ও পার্ট চ্যাঁচানোর পার্ট নয়। সে দিক থেকে ঠিকই হয়েছে। আর একটু লাইফ, লাইফ দিতে হবে। বুঝেছ?

অলকা চুপ করে বসে রইল আপনার জায়গায়। হাত পা ঘামছে।

কিন্তু অলকা তা আর পারলে না। সে যেন ভেঙে পড়ে গেল। এবং শেষ দৃশ্যটা মালবিকা এবং জয়ন্তের মিলন দৃশ্য—সে দৃশ্যটায় গোটা বইখানা একেবারে যেন মুখ থুবড়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। গোরাবাবুকে লোকে খাতির করে, তবুও কে একজন চীৎকার করে উঠল—ধুর!

গোরাবাবু চিন্তান্বিত মুখে ফিরে এল। অলকা গ্রীনরুমে কাঁদো কাঁদো হয়ে ঢুকে তার নিজের বাক্সের উপর বসে ঘাড় হেঁট করে বসে রইল; কে যেন বললে—ঢঙ! তার চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। একটু দূরে চেয়ারে মঞ্জরীও মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল।

রীতুবাবু বললে—হল না কত্তা। শেষটাই একেবারে ভিজে নয়, ডুবে গেল!

নাটুবাবু বললে—হিরোইন বদলে দিন স্যার।

বাবুল বললে—রাবিশ! আমিই রেসপনসিবল স্যার। কিন্তু এমন তো হয় না। পার্ট তো ভালই করে।

গোরাবাবু চুপ করে বসে রইল।

শোভা একটি কথা বললে না। রীতুবাবুর কাছে সেই ধমক খেয়ে অবধি সে চুপ করেই আছে। পার্ট কিন্তু ভালই করেছে।

হঠাৎ মঞ্জরী ডাকলে—গোপাল মামা!

ম্যানেজার গোপাল বাইরে বারান্দায় চুপচাপ পায়চারি করছিল বাস আসবার অপেক্ষায়। জিনিসপত্র সব তুলতে হবে। রাত্রি বারোটা বাজে। প্রথম রাত্রির অভিনয়ে তিন ঘণ্টার জায়গায় সাড়ে চার ঘণ্টা লেগে গেছে। তার উপরে প্লেটার এমন অবস্থা হওয়ায় মন মেজাজ তার ভাল নেই। মঞ্জরীর ডাক শুনে সে গিয়ে তার সামনে দাঁড়াল। মঞ্জরী বললে—শুনুন।

একটু সরে গিয়ে মঞ্জরী বললে—কাকে পাওয়া যায় বলুন তো? ওসব নতুন টতুন নয়, পুরনো—মানে ওতরানো অ্যাকট্রেস।

—দেখি। কুমারী নায়িকা যে! নইলে আর লোকের অভাব কি! এই তো এস্টারের হরিমতী রয়েছে, সন্ধ্যা রয়েছে—

গোরাবাবু এসে দাঁড়াল, বললে—কুমারসাহেব ডাকছেন, ওপরে উঠবেন, ডেকে পাঠিয়েছেন দেখা করে যাবেন।

মঞ্জরী উঠে দাঁড়াল। কথা পরে হবে। পশ্চিমদিকের বারান্দার কোলে ওদের ড্রইংরুম। মস্ত লম্বা হল, ভিতরে পুরনো আমলের মুল্যবান আসবাব; সে যেমন কাঠ তেমনি পালিশ তেমনি ভারী আর আকারেও তেমনি বিচিত্র। প্রকাণ্ড ঘরখানায় অন্তত পঞ্চাশ ষাটজন লোক বসে। তারই মধ্যে ঠিক মাঝখানে ওরা চারজন বসে আছেন—আছেন তিন ভাই আর খুড়ো কুমার জগদীশ সিংহ। সোনার মত দেহবর্ণ, তেমনি সৌম্য মিষ্ট চেহারা। বসে কথাবার্তা বলছিলেন, হাসছিলেন। গোরাবাবু মঞ্জরী ঘরে ঢুকে নমস্কার করবার আগেই

নমস্কার করে বললেন—এই যে আসুন। আপনাদের কথাই হচ্ছিল। বেড়ে ওটা লিখেছেন মশায়—ঝঞ্ঝাটং ঝঞ্ঝাটং সত্যং ঝঞ্ঝাটং জগতংময়ং, ঘাটং মাঠং হাটং গৃহং ঝঞ্ঝাটং নাস্তি কুত্রো বা! ঝঞ্ঝাটং দিবসে রাত্রে শয়নে স্বপনে চাপি; মরণে মৃত্যুলোকে চ ঝঞ্ঝাটস্থ দাপাদাপি। বেড়ে হয়েছে ওটা!

একজন বললে—লোকটি পার্টও করেছে খাসা। আরে দাঁড়িয়ে রইলেন যে! বসুন।

বড়কুমার বললেন—মঞ্জরী দেবীর পার্ট অপূর্ব হয়েছে। আপনার কথা বলব না, নিজে নাট্যকার।

কুমার জগদীশ বললেন—তবে মশায়, শেষটা ঠিক হল না।

গোরাবাবু বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ। শেষটা বড্ড মার খেয়ে গেল। ভাবছি আমরা।

মঞ্জরী মৃদুস্বরে বললে—হিরোইন ফেল করলে মার তো খাবেই।

—উঁহু। গোরাবাবু বললে—হিরোইন ফেল করেছে ঠিক কথা, কিন্তু—

বড়কুমার হেসে বললেন—হ্যাঁ, আরও কিন্তু আছে। সেইটে বলব বলেই ডেকেছি। মানে, বাস্তবে যাই ঘটে ঘটুক, নাটকের বাস্তব ও নয়। ব্যাপারটা ঘটেছে শুচির মত ধর্মপরায়ণা মেয়েকে ছেড়ে ওই নায়িকা যতই রোমান্টিক হোক, ওর সঙ্গে মিলনে মানুষের আপত্তি হবেই। অন্তত এদেশে হবে। শুচিকে শুধু দজ্জাল করুন, তা হলে নেবে। সূর্য সে গ্রীষ্মকালের হলেও সূর্য ডুবলেই রাত্রি হয়, সে পূর্ণিমা হলেও রাত্রি। রাত্রি মানুষের জন্যে নয়, ওটা তাদের চোখ বুজে থাকার কাল—ঘুমের সময়।

সকৌতুকে হেসে বললেন—পূর্ণিমার রাত্রেও ভূত বেড়ায়, লোকে দেখে মশাই। সেইজন্যে বলছি শুচিকে আগুন করুন, তা হলে চলবে।

একজন বললেন—তা হলে এ মেয়ে হবে তোমার জল না কি?

—উঁহু, তুলসীতলার প্রদীপ! বলেই বললেন—আর এক কাজ

করতে পারেন। সুবিধে আছে পৌরাণিক নাটক। শেষ দৃশ্যে নারায়ণকে নিয়ে আসুন শুচির হাত ধরে। এসে বলুন ঝগড়াটা কিসের? শুচিও যে, মালবিকাও সে; দুইয়ে মিলে ওরা সম্পূর্ণ। ধর্মকামনা, পুণ্য আর জীবনকামনা প্রেম দুইয়ে মিলে তবে নারী সম্পূর্ণ। লক্ষ্মী আর রাধা। বুঝলেন না? মালবিকা শুচির সঙ্গে মিশে যাক। দেখবেন কি রকম নেয় লোকে। আমি রসিকতা করি নি, ভেবে দেখবেন।

এক ভাই বললেন—তুমি রসিকতা কর নি, কিন্তু মানুষের বোকামির সুযোগ নিয়ে ওটা একটা নিদারুণ রসিকতা। আপনার ড্রামা মশাই পৌরাণিক হলেও খুব মডার্ন। সাহস থাকে চালান, না থাকে ড্রপ করে দিন।

হঠাৎ সব যেন শক্ত হয়ে উঠল, সরসতাটুকু উবে গিয়ে সমস্যাটা সমস্যা নিয়ে আলোচনার আসর—সব গম্ভীর হয়ে ভুরু কুঁচকে সামনে দাঁড়াল।

বড়কুমার বললেন—আপনাদের কিছু সম্মানী আমি ম্যানেজার বাবুকে বলে দিয়েছি। আচ্ছা, আজ তা হলে উঠি।

মঞ্জরী ওদের পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলে। গোরাবাবু নমস্কার করে বেরিয়ে এল। বাইরে দরজার পাশে গোপাল, যোগাবাবু, বংশী, মণিবাবু অনেকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিল।

মঞ্জরী গোরাবাবুকে বললে—এগিয়ে এস একটু।

চলতে চলতে বললে—বই যেমন আছে তেমনি থাকবে। মালবিকা আমি করব। শুচির পার্টের লোক দেখ।

—তুমি করবে মালবিকা?

—হ্যাঁ, কিন্তু শুচির পার্ট তুমি করবে—

বলে সবিস্ময়ে গোরাবাবু বলতে গিয়ে থেমে গেল।

বাধা দিয়ে মঞ্জরী বললে—কিন্তু মালবিকা তো আমি।

—তা হলে শুচিকে আগুনই করে দি।

—না। তার উপর অবিচার করবে কেন? সে তো সত্যিই ধর্মের জন্যে এতটা করেছে।

—সে যে ভুল ধর্ম।

—সত্য তাও তুমি বল নি এতে। যা আছে তাই থাকবে। তা ছাড়া এখন বই বদলালে বদনাম হয়ে যাবে। অন্য দল হাসবে। পার্ট বদল করে আর একদিন পুজোর আগে প্লে করে নাও। দলের কথা ভাব।

দশ

মঞ্জরী কথাটা ঠিক বলেছিল। কথাটা যাত্রাদলের পক্ষে খুব সত্য। শুধু যাত্রা কেন, থিয়েটার ফিল্ম সব তাতেই কথাটা খাটে। যে বই অভিনয়ের পর কাটতে হয়, বদলাতে হয়, তার একটা বদনাম হয়ে যায়। ফিল্মে যে বইয়ে সেন্সারের কাঁচি না ঠেকে তার একটা সুনাম হয়। সেন্সারে ছুঁতে পারে নি। যাত্রা থিয়েটারে বদল ছাঁটাই একটু-আধটু হয়ই, কিন্তু তার বেশী হলেই অন্যদল মুচকে হেসে বলে, ঢেলে সাজতে হচ্ছে। কিন্তু তাতেই কি আর ধরে! এমন কি দলের সাধারণ আসামী বা অ্যাক্‌টরেরাও হতাশ হয়। তারাও নিজেদের মধ্যে ওই কথা বলাবলি করে। শুধু তাই নয়, যে কোন দলের, অবিশ্যি বড়দলের কোন নতুন নাটকের প্রথম অভিনয়-রাত্রে অন্য দলের লোক কিছু আসে, চুপিসাড়ে এসে দেখে যায়। তারা গিয়ে রিপোর্ট করে কেমন কি বৃত্তান্ত। পাকপাড়ার আসরে তিন চারটে বড় দলের চর এসেছিল, দেখে গেছে। এবং কয়েকদিনের মধ্যেই বাজারে রটিয়েছে অপ্সরা কন্যা নয় ধপ করে পড়া কন্যা—শেষ সিনটা চমৎকার তালগাছের মাথা থেকে কন্যে ধপ করে মাটিতে পড়ে ঘাড় ভেঙেছে।

কথাটা এসে বললে গোপাল ম্যানেজার। বললে—যোগামাস্টার

শা কোম্পানীর দলের ছোকরা গাইয়ে দেবু ঘোষের সঙ্গে বিশ্রী কাণ্ড করে এসেছে, শেষ পর্যন্ত মারতে গিয়েছিল। দেবু ঠেলে দিয়েছে, যোগামাস্টার পড়ে গিয়ে হাঁটুর চামড়া তুলেছে। আমি বকলাম ওকে। তা সেই ভাঙা পা নিয়েই তড়পাচ্ছে।

কাগজ পড়ছিল গোরাবাবু। যুদ্ধের খবরই সব। আজকের খবর ইউরোপে জার্মানী হারছে। সে বাঁচবার জন্য লণ্ডনে ইংলণ্ডে বোমা বর্ষণ করছে। জেনারেল রোমেলের কোন খবর নেই। মন খারাপ হয়ে গেছে গোরাবাবুর। রাজনীতির ধার খুব ধারে গোরা-বাবু। তবে শতকরা সত্তর ভাগ এ দেশের লোকের মত ইংরেজ হেরে যাক এটা চায়। সেইজন্যে জার্মানী হারলে তার মন খারাপ হয়। এর উপর পূর্বসীমান্তে নেতাজীর আবির্ভাব, আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরীর সংবাদে মনটা আরও অক্ষশক্তির পক্ষে হয়েছে। ইউরোপে রাশিয়াতে জার্মানীর বিপর্যয় ঘটেছে। প্রচণ্ড লড়াই করছে রাশিয়ানরা। জার্মানী হটছে। রোমেল গোরাবাবুর প্রিয় জেনারেল,—রীতুবাবু বলে—বাঘের বাচ্চা একটা। রোমেলের খবর নেই। সেখানেও কিছুদিন থেকে এরা জিতছে।

পাতাটা উল্টে দিল। দ্বিতীয় তৃতীয় পাতায় বিজ্ঞাপন আর সভাসমিতি, আইন আদালত। আইন আদালতে একবার চোখ বুলোলে। সেখানেও এমন কিছু নেই। পকেটমারের কারাদণ্ড। ব্যাঙ্ক প্রতারণা, ভুয়া চেকে টাকা তুলিতে গিয়া হাতেনাতে ধৃত—

চারের পাঁচের পৃষ্ঠায় দেশের খবর। খবর মানে দেশের দুঃখ—অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, মহামারীর প্রাদুর্ভাব। বাড়ির দরজায় চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ অঞ্চলের চার পাঁচটি তো বাসা গেড়ে রয়েছে। ফুটপাথেই শুয়ে থাকে। আর খবর জেলে বন্দী নেতাদের। জিন্না সাহেব বম্বেতে বসে চেঁচাচ্ছে। বাংলা দেশে নাজীমুদ্দিন সুরাবর্দী ফজলুল হক।

মঞ্জরী বললে—গোপালমামা কি বলছেন শুনেছ ?

—গোপালবাবু কখন এলেন ?

—এই তো একটু আগে, তোমার সামনে দিয়ে পেরিয়ে গেলেন। তুমি কাগজে মুখ ঢেকে কাগজ পড়ছিলে। কিছু না বলেই আমার কাছে চলে গেছেন।

—ও! আমি পায়ের শব্দ শুনেছি, ভেবেছি শিউনা। কি বলছেন ?

শিউনন্দনকে কখনও কখনও 'শিউনা' বলে থাকে গোরাবাবু। ওটা মঞ্জরীর খুব ছেলেবেলায় দেওয়া নাম। গোটাটা বের হত না, মুখে বলত 'শিউনা'।

মঞ্জরী বললে—শোন না নিজের কানে। কাগজটা রাখো। কাগজে তো সব আছে যুদ্ধ যুদ্ধ। তাও যদি হার জিত একটা কিছু হত।

হেসে গোরাবাবু বললে—এ কি যাত্রার দল যে পাঁচ মিনিট তলোয়ার ঘুরিয়েই একজন পড়ে গেল আর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল! তবে মনে হচ্ছে এবার একটা ধারে এসে পৌঁছবে।

—বাবাঃ, বাঁচি তাহলে। এই ব্ল্যাক-আউট থেকে রেহাই পাই। বলেই ডাকলে—গোপালমামা!

গোপাল এসে দাঁড়াল। এবং সরাসরিই বলে ফেললে—বই পালটানো টালটানো হবে না বাবু। না। তাহলে মান সম্মান আর কিছু থাকবে না।

—কি হল ?

যা ঘটেছিল বলে গোপাল বললে—যোগাবাবুর হাঁটু একরাত্রে ফুলে লা—ল হয়ে উঠেছে! আমাদের ছোঁড়ারা বলছে, দেবু ঘোষকে ঠেঙাবে। ও আমাদের আপিসের পিছনের খোলার ঘরে আসে যায়। কালই দিত, তা রীতু মাস্টারমশাই মানা করলেন।

—কি করলাম আমি! আমার নাম হচ্ছে যে!

সিঁড়িতে মাস্টারমশাইয়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কিন্তু পায়ের

শব্দে যেন আরও লোক আছে বলে মনে হল। গোরাবাবু ডাকলে—আসুন মাস্টারমশাই।

মঞ্জরী একটু ঘোমটা টেনে দিলে মাথায়। গোপাল হেসে সিঁড়ির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল অপেক্ষা করে। মাস্টারমশাইয়ের পিছনে বাবুল বোস। গোপাল ঘোষ তার বুক পর্যন্ত তাকে দেখা যাওয়া মাত্র বললে—কালকের সেই কাণ্ড বলছি মাস্টারমশাই।

রীতুবাবু হেসে বললে—ছোঁড়ারা আমার উপর চটেছে। কথাটা ঠিক বুঝলে না আমার। বুঝলেন না দেবতা, মানুষেরই রসজ্ঞান কমে গেছে। বললাম, অন্য কোথাও মারিস বাবা—বরং যুদ্ধ করে মারিস। এ অবস্থায় মারা বারণ—মহর্ষি বাল্মিকী বারণ করে গেছেন। সেটা তো একটা পাখী।

গোরাবাবু হেসে উঠল। মঞ্জরী মুচকে হেসে মুখ ফেরালে। বাবুল বোস—বাবুল বললে—বাট, ছাট জটেবুড়োর নী-খানা একেবারে লক্ষ্ণৌর মেলন—মানে খরমুজা হয়ে উঠেছে মাই লর্ড। মনে হচ্ছে রাইপ করবে। গায়ে ফিবার। কলকাতার রাস্তায় পড়েছে। একটা ব্যবস্থা করুন। বিগ ব্রাদার কি একটা মলম বাতলে এলেন।

রীতুবাবু বললে—নতুন যাত্রার দলে ঢুকেছং কামন্দকং সবুরং করু। ক্রমে বুঝবে। মানুষের মধ্যে যাত্রাদলের আসামী আর জলের জীবের মধ্যে কইমাছ, গাছের মধ্যে মথোঘাসের মরণ সহজে হয় না। ব্যবস্থা ঠিক করেছি আমি, গরম জলে কার্বলিক সাবান দিয়ে ধুয়ে হারাণ কবরেজের ক্ষতারি মলম লাগিয়ে দিয়েছি, ওতে আমার পায়ের এমনি ফোলা সেরেছিল, এই তো বছর খানেক আগে। ডাক্তার দেখিয়েছিলাম, সে বলে সেলুলাইটিস। হারাণ কোবরেজ বন্ধু, গেলাম তার কাছে। কোবরেজ, কি করি বল তো! মলম এক কৌটো দিয়ে বললে—সেলুলাইটিস তো সেলুলাইটিস, সব টিস্ টিস্ সেরে যাবে। স্রেফ চব্বিশ ঘণ্টা! বারো ঘণ্টাতেই বুঝতে পেরেছিলাম কমছে। তিন দিনের দিন ব্যাণ্ডেজ বেঁধে স্ট্র্যাপ-বাঁধা

চটি পরেছি। তা ছাড়া যোগা শক্ত আছে। গেলাম তো, দেখি ফোলা হাঁটুর উপর হাত বুলোচ্ছে, আর গাইছে—হায় রে, ভ্রমে অন্ধ দু নয়ন ; রাঙা দেখেই ভাবলি অধর, নারলি চিনতে শ্রীচরণ! মানে জরা ব্যাধের গান।

—সেটা আবার কেটা বিগ ব্রাদার ? হু ইজ দ্যাট জরা ব্যাটা ?

—সে অনেক বিত্তান্ত ঠাকুর। সইয়ের বউয়ের বকুলফুলের বোনপো বউয়ের বোনঝি জামাই।

গোরাবাবু হেসে বললে—সে বোঝাতে তোমাকে রামায়ণ থেকে মহাভারত পর্যন্ত পড়তে হবে দিলদার। ওটা ভিনসেণ্ট স্মিথের ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রিতে নেই। যাত্রাদলে থাকতে থাকতেই জানবে।

মঞ্জরী বাধা দিয়ে বললে—ওসব কথা থাক এখন। যোগাবাবুর বাড়াবাড়ি হলে কাল পর্যন্ত না কমলে ডাক্তার দেখাব। কিন্তু কথাটা চাপা পড়ে গেল। এরপর মঞ্জরী বললে—বইয়ের কথাটা। মাস্টারমশাই, উনি সেই কুমার বিমল সিংহের কথা ধরে আছেন। বই পাল্টাবেন। শুচি আর মালবিকাকে মিলিয়ে এক করে দেবেন ভাবছেন।

—উঁ-হু! উঁ-হু! উঁ-হু! বড্ড দুর্নাম হয়ে যাবে। ও পালা আর শুনতেই চাইবে না লোকে, জোর করে শোনাতে গেলে জমবে না যদি পাল্টান। লোকে জমতে দেবে না।

গোরাবাবু চুপ করে ভাবছে। মনে মনে ছবি আঁকছে। মঞ্জরী বললে—আমি সেদিন থেকেই বলছি। আজও বলছি। বই যেমন আছে থাক্। আমি মালবিকার পার্ট করব। শুচির পার্টের লোক দেখুন। ও পাওয়া যাবে।

গোরাবাবু তবুও চুপ করে রইল। রীতুবাবু বললে—দাঁড়ান, ভাবি। মনে একবার আপনাকে মালবিকা সাজিয়ে দেখি।

—মেক-আপে ঠিক হবে মাস্টারমশাই। তা ছাড়া—

—হ্যাঁ, পার্ট তোমার। কথাটা বলেছ সত্যিই। কিন্তু ভাবছ

না সে কাল থেকে আজ কত বছর কেটে গেছে। ভারী হয়েছ, মাথায় বেড়েছ।

—তা হলে বইটাই বন্ধ কর।

গোরাবাবু হঠাৎ বললে—হ্যাঁ, তাই হবে। হয়েছে। তুমিই কর মালবিকার পার্ট। শুধু নাচ যা আছে সেটা তুমি নাচবে না। বুঝেছেন মাস্টারমশাই, মালবিকার ফার্স্ট অ্যাপিয়ারেই নাচ আছে তো?

—হ্যাঁ, আরতি নৃত্য।

—হ্যাঁ। মঞ্জরী হাতে বা মাথায় আরতির প্রদীপজ্বালা থালা নিয়ে এসে দাঁড়াবে। সখী ওর চারপাশে নাচবে। নাচ শেষ হলেই সে চলে যাবে, মালবিকার পার্ট সুরু হবে।

—তা হলেও লোকে বলবে।

—বলুক তাতে ক্ষতি হবে না। কিন্তু—

থেমে গেলেন গোরাবাবু।

—কি কিন্তু শুনি? মঞ্জরী বললে।

—নাচলে পার্টে তুমি দাঁড়াতে পারবে না। এবং নাচটা তো দরকার নেই। ওটা অলকা ভাল নাচে বলেই দেওয়া হয়েছে।

দৃঢ়স্বরে মঞ্জরী বললে—তা হলে নাচ বাদ দাও। আমি দাঁড়িয়ে আরতি করে থালা নামিয়ে রেখে প্রণাম করব, তারপর গান। না, তাও বাদ দেবে?

—অন্যায় বলছ, গান তা হলে বাড়িয়ে দেব মালবিকার। কিন্তু—

—আবার কিন্তু কি?

—বাবুলবাবু আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন।

—বুঝলাম না।

—অলকাকে জবাব দেবে?

—ভেবে দেখতে হবে।

—কিন্তু সেটা অন্যায় হবে।

—অন্যায় হবে? মঞ্জরী গোরাবাবুর মুখের দিকে তাকালে।

গোরাবাবু বললে—হবে। অন্তত আমার মন তাই বলে। মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞাসা কর। কি মাস্টারমশাই ?

তার আগেই মঞ্জরী বললে—তুমি বলছ, তার ওপর কথা থাকতে পারে না। থাকবে ও। নাচ গানের পার্ট তো রয়েছে। জনাতে মোহিনী মায়া। সতীতুলসীতেও কৃষ্ণের পার্ট, রিহারশ্যালে ভাল করছে। আর মানাবে খুব ভাল। মুখে কেমন একটু পুরুষালি ভাব আছে। ও থাকবে যেমন আছে। এতেও নাচ দেব বলছ, তা না হয় দাও। কি মাস্টারমশাই ?

রীতুবাবু বললে—খাঁটি প্রোপ্রাইট্রেসের মত কথা। বাস্‌ বাস্‌, ও থাকবে।

বাবুল বলে উঠল—গড সেভ দি প্রোপ্রাইট্রেস। সত্যং বলতে আমি বেশ চিন্তিতং ছিলাম।

রীতুবাবু বললে—কিন্তু একটা কাজ করবেন। এই দীনদরিদ্রের কথাটা শুনবেন। শুচির পার্টটা আরও কড়া কাঠ কাঠ করে দিন। আর মালবিকার সম্বন্ধে ওই যে ওর মায়ের কথা রয়েছে একাধারে কলালক্ষ্মী-তপস্বিনী সরস্বতী দেবীকে অর্চনা করি পেয়েছিনু তোরে, ওটাকে আরও একটু ফুটিয়ে দিন।

—শুচির পার্ট কড়া করে দেব ?

মুখ মচকে একটু হেসে মঞ্জরী বললে—পার্টটার উপর মায়া আছে তোমার, না ? কিন্তু আসলে তো কড়া কাঠ কাঠ হওয়াই উচিত ছিল। ছিল না, বল বুকে হাত দিয়ে ?

শিউনন্দন তরিবৎ করে ডিম পাঁউরুটি চা এনে নামিয়ে দিল।

রীতুবাবু বললে—একটু আদার রস দিতে পারিস শিউনা ?

—হাঁ। লিয়ে আসি।

মঞ্জরী বললে—ওটা খান আপনি। নতুন চা আদা দিয়ে করে আন শিউনা।

—হোহাই নট উইথ তেজপাতা বিগ ব্রাদার ?

—উঁহু, সে পাঁচন হয়ে যাবে।

চায়ের কাপে চুমুক দিল রীতুবাবু।

—কি ভাবছ বল তো? মঞ্জরী গোরাবাবুকে বললে।

গোরাবাবু সত্যিই ভাবছে। খাবার, চায়ের কাপ এসব দিকে দৃষ্টিও ফেরায় নি। এতগুলো কথা হয়ে গেল তাতেও তাকায় নি। মঞ্জরীর সেটা চোখ এড়ায় নি।

গোরাবাবু বললে—হ্যাঁ ভাবছি।

—কি, তাই তো জিজ্ঞাসা করছি।

—আমি বলব দয়াময়?

একটু হাসল, সে হাসিও চিন্তাকুল। বললে—আমিই বলছি। ভাবছি অবিচার হচ্ছে বোধ হয়।

—কিসের অবিচার? মঞ্জরী প্রশ্ন করলে।

—অবিচার হচ্ছে এই যে, শুচির পার্ট কড়া করব, মালবিকাকে সরস্বতীর অংশ বলব, তাহলে একবার অলকাকে চান্স দেওয়া উচিত না? এতে তো ও-ও দাঁড়াতে পারে।

দৃঢ়কণ্ঠে মঞ্জরী বললে—না, পারে না।

—সেটা তো অনুমান।

—নো মাই লর্ড, অনুমান নয়। প্রোপ্রাইট্রেস রাইট। অলি শান্ত সিরিয়াস পার্ট পারবে না। আমাকে কাল বলেছে। কাল আমার ওখানে এসে হাজির। ক্রাই-ক্রাই মুখ। বলে, এ পার্ট আমার হবে না বাবুলদা। আমার দ্বারা ওন্ট ডু। আর আমিও দেখেছি, নাচ, অল্প গান, ফষ্টিনষ্টি, মানে—চঞ্চলা-ফঞ্চলা হলেও একসেলেণ্ট। তারপর বলে, আমাকে কি ছাড়িয়ে দেবে? ওর হোমলাইফ টেরিবল হয়েছে। ফাদার মাদার দুইয়ে মিলে চুষে খাচ্ছে, খেতে চায়। ফাদার তো এখন হাফ ম্যাড। কাল বলেছে, টাকা চাই। যেখান থেকে যেমন করে হোক আনতে হবে। কি একটা সার্টিফিকেট আছে—একশো টাকার। কাল টাকা দিতে হবে।

একবার দু টাকা ব্রাইবিং করে ব্যাক কিক্ করে দিয়েছিল, আদালতে মিসেস অ্যাণ্ড মিস দরখাস্ত করেছিল অল অস্থাবরস তাদের। কর্তা ইনসলভেন্সী ফাইল করবেন বাট পাওনাদার ভেরী হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ন পাওনাদার—সে বডিওয়ারেণ্ট বের করেছে। খবরটা পেয়ে গেছেন। কোথাও যে ফ্লাই করে লুকোবেন তার জায়গা নেই। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবেন সে ক্ষমতাও নেই। এখন অ্যাসেট হল ডটার। আন তুমি মানি, হোয়ার টু গেট সে আমরা কি জানি! মাদার কাল চুলের মুঠো ধরে লেডী দুঃশাসনের পার্ট করেছে। দ্রৌপদী না হলে এখন আর উপায় কি! টাকাটা আমি দিয়েছি কিন্তু ও আর ও বাড়িতে থাকবে না। এখন চাকরিটা গেলে শুধু জাম্পিং ছাড়া পথ নেই—হয় মাদার গ্যাঞ্জেসে নয় সামবডিস স্কন্ধোপরি।

—তুমি অ্যাফ্রেড না কি? রীতুবাবু বললে।

—তা লিটল্ লিটল্ অ্যাফ্রেড হতে হচ্ছে বইকি!

মঞ্জরী বললে—আপনি ওকে বিয়ে করে ফেলুন বাবুলবাবু।

—বিয়ে! ও মাই লর্ড, হে মাই ঈশ্বর! অয় মাই খোদা! ও প্যাঁচে আমি নেই ম্যাডাম।

—কিন্তু ও তো তোমাকে ছাড়বে না লিটল ব্রাদার! এবং তুমিও তো—

—দেয়ার ইজ দি বিপদ বিগ ব্রাদার। মেয়েটার প্রতি আমার অ্যাফেক্শন্ আছে।

গোরাবাবু উঠে ভেতরে গিয়ে মঞ্জরীকে ডাকলে—শোন।

কিছুক্ষণ পর দুজনেই বেরিয়ে এল এবং মঞ্জরী দুশো টাকা বাবুলের হাতে দিয়ে বললে—আপনি একশো টাকা যেটা অলকাকে দিয়েছেন সেটা নেবেন। আর একশো টাকা ওকে দেবেন। বলবেন, কোথাও একটা আস্তানা দেখে নিতে।

রীতুবাবু বললে—সাবালিকা তো? আঠারো পার হয়েছে? না হলে বাপ নাবালিকা বলে হাঙ্গামা বাধাবে।

গোরাবাবু বললে—সব থেকে ভাল হয় ওর যদি একটা মেকী বিয়েও দিয়ে দাও। মেয়েটার দোষ অনেক হয়তো কিন্তু তার সবটার জন্য ও দায়ী নয়। কিন্তু গুণও অনেক আছে। পার্ট ও করবে ভাল ভবিষ্যতে। একধরনের পার্ট। নাচে ভাল। গলা মাজলে ভাল হবে। দাও না ভাই দিলদার ওকে একটা চান্স। তোমাদের দুজনের সঙ্গে আমরা তিন বছরের কণ্ট্রাক্ট করে নিচ্ছি।

বাবুল বললে—জাঁহাপনা এর অ্যানসার তো দিলদারের কোশ্চেনের মধ্যে আছে। লেজ যদি কুকুরকে চালাতো তবে কুকুরের কি হতো ? মাই লর্ড, সে সমস্যার সমাধানের জন্যে হুজুরাইনের কুকুরের লেজটা কেটেই ফেলেছেন। আই অ্যাম এ লেজকাটা জীব মাই লর্ড, লেজ জুড়ে ফ্যাসাদ আমার সইবে না। তার থেকে ওয়ান থিং করুন না। অলিই বলছিল। বলছিল, ওঁদের মীনস আপনাদের বলে কয়ে ওঁদের বাড়িতে একটু থাকবার জায়গা করে দিন, আমি পুলিসকে বলে-টলে ওখানে গিয়ে উঠব। তারপর যা হয় করব। মানে একেবারে মরীয়া।

মঞ্জরী বলে উঠল—পাগল নাকি! ও হয় না। না, সে হবে না।

রীতুবাবু এবার বললে—খাওয়া শেষ করে একটা পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুলে বললে—যেদ্দাও মহেন্দর—ও সব কথা যেদ্দাও। যত সব বাজে কথা। ছেড়ে দিন। ও মেয়ে আপনার প্রবলেম আপনি সল্‌ভ্‌ করবে। 'হ্রদ বক্ষে জলরাশি যথা বাঁধ ভেঙে নামে সমতলে।'

গোরাবাবু বলে উঠল ঃ

"সব ক্ষেত্রে সত্য নয় দেব, ব্রহ্মপুত্রে মুক্তি দিতে
পরশুরামের ভীম কুঠারেরও হয় প্রয়োজন।
ব্রহ্মকমুণ্ডলে বন্দিনী গঙ্গার মুক্তি
ভগীরথ তপস্যার অপেক্ষায় থাকে।"

মঞ্জরী মাথায় অকারণে কাপড় টেনে দিয়ে বললে—রুক্মিণীহরণ পালা গাইতে সুরু করলে যে। ও সব রাখ, রেখে এখন আসল কথা ভাব। আর তো দেরী করবার সময় নেই, ভাদ্র মাস শেষ। ১০ই

আশ্বিন পুজো। অষ্টমীর রাত্রে গাওনা সুরু। নতুন বই ধরবার সময় নেই। ধরলেও মহা দুর্নাম। এই বেশী কাটাকুটিতেও তাই। কাটাকুটি তার রিহারশ্যাল সেটা, কি দাঁড়াল দেখা—এসব হাঙ্গামা তো আছে। তা ছাড়া অন্যদলে দুর্নাম রটাবে—ওই বই বেজমাট, বাজে।

—প্রোপ্রাইট্রেস ঠিক বলেছেন মাই লর্ড। কি বিগ ব্রাদার?

—আমি তো আগেই বলেছি।

গোরাবাবু বললে—বেশ, যা বলেছেন তাই মানলাম। বই আমি আজই যে সংশোধন দরকার করে দিচ্ছি। ভাল, বলুন—এক নম্বর শুচির পার্ট একটু কড়া করতে হবে?

—হ্যাঁ।

—কতটা?

মঞ্জরী বললে—ওই ধর প্রথম সিনে সব শেষে যেখানে ব্রহ্মমিত্র সীমান্তে যুদ্ধে যাবার সময় বলছে, বল শুচি, আমার অন্তর চিত্ত-শুদ্ধির আগে এই যুদ্ধেই যদি মরি তা হলেও তুই কি আমাকে স্পর্শ করবি নে আমি অশুচি বলে? শুচি বলছে, তা হলে পিতা তোমার শীতল হিম ললাটের উপর আমার ললাটখানি রেখে আমার অশ্রুজলে তোমার সব গ্লানি ধুয়ে দেব।

—ওটা কাটব?

—কাটবে।

গোরাবাবু চুপ করে ভাবতে লাগল।

—মায়া হচ্ছে? কিন্তু ওটা তো সত্যি নয়। যা সত্যি তাই লিখতে বলছি। এটা আমি শুচির পার্ট করব বলে তুমি জুড়েছিলে। নিজে মুখে বলেছ আমাকে।

—বেশ তাই হল। তারপর?

—তারপর জয়ন্তকুমারের সঙ্গে বিচ্ছেদের সিনটা।

—ওটাতে কি কাটতে বল?

—পড়।

—মুখেই বল না।

—তা হলে মুখে বলতেই বা হবে কেন? নিজেই মনে করে সত্যি যা তাই লেখ। কাটতে হবে না। ওখানে শুচি বলছেঃ

গন্ধর্ব কন্যার মোহ কলঙ্কিত অঞ্জনের মত
গাঢ় কৃষ্ণ রেখাঙ্কনে অঙ্কিত নয়নে তব!
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোমা ব্রাহ্মণ তনয়!
অস্বীকার করিতে কি পার? যাও নাই তাহার
ভবনে?

গোরাবাবু বললে—জয়ন্ত বলছে, গিয়েছিলাম। অস্বীকার করব কেন? তোমার পিতার অনুরোধেই গিয়েছিলাম।

—হ্যাঁ। শুচির উত্তর—তাতে তোমার ধর্ম পবিত্রতা রক্ষা হয় নি! তুমি সে গৃহে পদার্পণ করেছ, সেখানে বসেছ, তাদের স্পর্শ করে দেহ অপবিত্র হয়েছে, শুধু দেহ নয়, রূপে মুগ্ধ হয়ে অন্তরে মনে চিত্তে অপবিত্র হয়েছ!

জয়ন্তের উত্তর—না। তারপর বল কি আছে?

গোরাবাবু বললেঃ

না, ভুল ভুল, ওই শাস্ত্রবিধি ভুল, দর্পিত মনের সৃষ্টি,
এ সংসারে এ সৃষ্টিতে বিধাতার সমদৃষ্টি রৌদ্রালোক সম।
চণ্ডাল ব্রাহ্মণ রাজকন্যা ভিখারিণী শিরে রবে সমান দীপ্তিতে
সমান উত্তাপস্নেহে।
চণ্ডাল চণ্ডাল নয় জন্মের বিপাকে। এ ভেদ সমাজসৃষ্ট।
সত্য তত্ত্ব—ব্রাহ্মণও চণ্ডাল হয় আপনার কর্মের কলুষে!
গন্ধর্বের এই কন্যা দেহোপজীবিনী নয়,
স্বর্গদেবতার মনস্তুষ্টিবৃত্তি দূরে তুচ্ছ করি,
প্রসাদ উপেক্ষা করি
সন্ন্যাসিনী সম তপস্বিনী! রাজকন্যা ব্রাহ্মণ তনয়া সে।
তবুও সে নহে তাহা সমাজের বিভ্রান্ত বিধানে।

শোন শুচি, পবিত্র সে তোমারই মতন,
কিন্তু তোমা চেয়ে শ্রেষ্ঠা সে যে নারীহৃদয়ের
কোমলতা স্নেহ প্রেম সব ধর্মগুণে।

গোরাবাবুই বলে গেলেন। শুচি বলছে বাধা দিয়ে :

স্তব্ধ হও। স্তব্ধ হও, কামার্ত পুরুষ।
রূপে মোহে ভ্রান্ত তুমি।
শোন মোর কথা। আমি নহি দেহাভিলাষিণী
নারী মানব-লোলুপা। লক্ষ্মী-অংশে
জন্ম মোর। কামার্ত প্রেমার্ত হয়ে বরণ করি নি
আমি তোমারে কখনও। আমি নারায়ণ
অভিলাষিণী সাধিকা, ধর্ম সাক্ষী করি
তোমারে বরণ করি চেয়েছিনু তোমার মাঝারে
নারায়ণে টানিয়া আনিতে। সে সাধনা
নিষ্ফল করিয়া দিলে। আজি হতে
তব সাথে সম্পর্ক আমার আজি এইক্ষণে
ছিন্ন করি দিনু। চলে যাও সম্মুখ হইতে,
চলে যাও দেবভূমি রাজ্য হতে। চলে যাও,
চলে যাও।

মঞ্জরী এবার বললে—শুচি বলে উঠুক এবার এইখানে এর সঙ্গে জুড়ে দাও, তুমি আমার বাবার অন্নদাস, আজ আমার অন্নদাস। যে অন্নদাস তার মুখে এত বড় কথা সাজে না। সত্যের বাইরে যেতে বলছি নে আমি। মানে যা সত্যি তাই লেখ। দেখ ঠিক হয়ে যাবে। আমি তো আর শুচির পার্ট করছি নে। মায়াই বা তা হলে কিসের বল।

গোরাবাবু ডাকলেন—শিউনা ?

—যাই।

—বইয়ের খাতা কলম কাগজ আর বোতল গ্লাস নিয়ে আয়। আসুন মাস্টারমশাই, ধরুন।

সিগারেটের বাক্সটা খুলে ধরলেন—দিলদার!

ওরা সিগারেট নিল। রাতুবাবু বললে—আপনি কাজ করুন তা হলে। এখন উঠি।

—হ্যাঁ। কিন্তু বোতলটা আসছে, একটু করে নিয়ে যান।

মঞ্জরী বললে—তার আগে আর একটা কথা শেষ করে নাও। শুচীর পার্টের জন্যে বুঁচিদি কেমন হবে? বুঁচিদির সঙ্গে শিউনার দেখা হয়েছিল। শিউনা গঙ্গার ঘাটে যাচ্ছিল, বুঁচিদি ডেকেছিল, শিউনা শোন্। মঞ্জরীর দলে নাকি লোক নেবে রে? মঞ্জরী যে পার্ট করেছে সেই পার্ট? খুব তেজী মেয়ের পার্ট? শিউনা বলেছে, ঠিক তো হয় নি, তবে বাত হচ্ছিল। বুঁচিদি বলেছে, বলিস রে আমার কথা। আমি বসে আছি অনেক দিন। থিয়েটারে তো এখন আবার গেরস্ত হাফ-গেরস্ত এসে ভিড় জমিয়েছে। দাসীতে আর থিয়েটার চলছে না, দেবী চাই। বলিস। বুঝলি?

গোরাবাবু তাকিয়েছিল গেলাসের দিকে, শিউনন্দন তিনটে গেলাস টেবিলের উপর রেখে মদ ঢালছিল, কিন্তু ঠিক মদ ঢালা যেন দেখছিল না, সম্ভবত লেখার চিন্তাতে মগ্ন ছিল। সে উত্তর দিল না। মঞ্জরী বললে—চুপ করে রইলে যে? মাস্টারমশাই কি বলছেন?

গোরাবাবু অকারণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—হুঁ। তা—

একটু চুপ করে থেকে বললে—বুঁচির বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। নইলে অ্যাকট্রেস তো ভাল।

—নিয়ে নিন। গ্লাস তুলে নিয়ে রাতুবাবু বললে—নিয়ে নিন। এ পার্ট ভাল করবে। খাপ্‌চো মুখ ওর মানাবে মশাই। মেয়েটার আশ্চর্য চেহারা। যত আকর্ষণ তত বিকর্ষণ। সাজলে বেশ লাগে, অথচ ওই খাপচো মানে থুতনিটা সামনের দিকে ঠেলে থাকায় মনে হয়

বড় নিষ্ঠুর। বয়স হয়েছে, ভাল পেণ্ট করলে ঠিক বিশ বছর চুরি করে মেরে দেবে। ওঃ, ওর খাঁটী যৌবনে সখীর দলের নাচের ঠমক তো দেখেন নি! ওরে বাপ রে, শীলদের এক সৌখীন ছোকরা—

মঞ্জরী বললে—ওঃ, শেষ বুঁচিদিকে জুতো দিয়ে পিটেছিল। তারপর ছেড়ে দিয়েছিল। বড় বদ মেজাজী ছিল শীলদের ছেলেটা। মরলও তেমনি।

বাধা দিয়ে গোরাবাবু বললে—তাই মরে। থাক ওসব কথা। নাও তাই, বুঁচিকেই নাও। বিলিতী ভাল পেণ্ট আনলেই হবে। গোপালমামা চলে যান আপনি বুঁচির কাছে। কত মাইনে বলবেন? অলকার সমানই বলবেন। কি বল?

—সে কি! তাই হয়? বেশী দিতে হবে। কত বড় অ্যাকট্রেস ছিল!

—তাই। আচ্ছা মাস্টারমশাই, আমি বসলাম। ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং—। লেখা শেষ করে উঠব। আর গোপালবাবু মানিকতলার কারখানার বিশ্বকর্মা পূজোর বায়নাটা নিন। বলে আসুন ওদের ওখানে আমরা প্রথম গান করে দল খুলেছি, ওরা যা দেবে তাই নেব। ওই আসরেই গন্ধর্বকন্যার টেষ্ট হয়ে যাক। বুঁচি পাঁচ দিনেও পার্ট ঠিক করে নেবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা। আরতি নৃত্যটা তা হলে অলকার থাকছে? কথা দু চারটে দেব না কি?

—তা হলে কিন্তু সিক্‌ল্ সিক্‌ল্ কথা—মানে কাস্তের মত বেঁকা করকরে কথা দেবেন। জোক, হিউমার, হিট করে কথা—একটু হেলে দুলে—। যাঃ ফাদার, ওয়ান গ্লাসে লেগে লেগ আটকে যাচ্ছে!

নিজেই হেলতে দুলতে গিয়েছিল বাবুল; পায়ে পায়ে ঠেকে গেছে। খানিকটা অতি চঞ্চলতার জন্যে, খানিকটা মদের প্রভাবও বটে বইকি!

গোরাবাবু বললে—তাহলে সময়ে গৃহে গচ্ছ। এবং ট্রাম থেকে নেমে রিক্সা করে নিও।

দলের হেড চাকর বিপিন এসে দাঁড়াল। বললে—বায়না করতে লোক এসেছে।

রীতুবাবু ডাকলে—গোপাল!

উত্তর পেলে না। রীতুবাবু ডাকলে—শিউনন্দন!

—বাবু!

—গোপাল কোথায়? ছাদে উঠেছে?

—হাঁ। হয়ে গিয়েছে এতুক্ষণ। ম্যানিজারবাবু বলে সে হাঁকলে। পরমুহূর্তেই বললে—এই নেমে এসিছে। যাও, বায়না নিয়ে লোক এসিছে।

গোপাল সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে মুখ তুলে চাপা দম ছাড়লে হুস করে, অল্প খানিকটা ধোঁয়া বেরিয়ে গেল। গোপালও ছাদে নেশা করতে গিয়েছিল। ওর নেশা গাঁজা। গাঁজা কল্কেতেও খায় আবার বিড়ির তামাকের সঙ্গে মিশিয়ে বিড়ি পাকিয়েও খায়। গোপাল দ্রুত নেমে এসে বারান্দায় এদের আসরে আর দাঁড়াল না, সরাসরি বিপিনকেই বললে—চল্। কোথাকার লোক? বসিয়েছিস, চা-টা খাইয়েছিস তো? চল্।

বিপিনের উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে নামতে লাগল। গোরাবাবু বললে—আড়াই শো রাত্রি, তার কমে রাজী হবেন না। আর—

—যদি যাওয়া-আসার পথে পড়ে?

—ওই বিশ-পঁচিশ কম। আর বুঁচির কথা বলেছি, শুনেছেন না? ছাদে ছিলেন। মাইনের কথা এখানে এলেই হবে। আজই সন্ধ্যেতে আনবেন। এখানে।

ঘাড় নেড়ে জানালে গোপাল—হ্যাঁ।

নীচে নামছে রীতুবাবু ডাকলে—দাঁড়াও ম্যানেজার, দাঁড়াও। আমরাও যাব।

গোপাল ফুটপাথে বেরিয়ে একটা বিড়ি ধরালে। কোন সময় কোন তান, গাঁজার শেষ টানটা সব থেকে মৌজের, সেটাই সে নিতে পায় নি।

রীতুবাবু বাবুল সিঁড়ি ভেঙে নেমে দরজার মুখে আসতেই নীচের তলার ঘর থেকে শোভার গলা শোনা গেল। সেই পাকপাড়ার বাড়িতে অভিনয়ের রাত্রে রীতুবাবুর ধমক খেয়ে অবধি সে গুম হয়ে আছে। রীতুবাবুর সঙ্গে কথা বলে না। সে ঘরের ভিতর থেকে বলছিল—সিঁড়িটা কাঁপছে মা চলনের দমদমানিতে! বলে যে সেই অতিবাড় বেড়ো না ঝড়ে ভেঙে যাবে! এত বাড়! বাড়ি কাঁপিয়ে চলা! বুকের ছাতি ফুলিয়ে! বাপ্!

বাবুল বললে—বিগ ব্রাদার!

—শোন ব্রাদার, তুমি শোন। মা কুরু গর্বং! শুধু তোমার পিছনে অলকাই লাগে না। আমার প্রেমেও পড়বার নায়িকা আছে। আবার এই দেখ শ্রীমতী বুঁচি আসছেন—

—তিনিও—

—হ্যাঁ। এক সময় পট্‌লীচারু মারার পর ওর চারে ঘোরা ফেরা করেছিলুম। মজতে মজতে জমাটি ভেঙে গেল। থিয়েটারের অ্যাক্‌টর রূপেন এসে থিয়েটারে নিয়ে গেল।

গোপাল বললে—বলুন।

দোরের সামনে অপেক্ষা করে সে দাঁড়িয়েছিল।

রীতুবাবু বললে—চল, আজ আপিসেই ভোজনং শয়নং দিনের বেলাটা। ভেবেছিলাম এখানেই কাটবে। তা কর্তা দেখলাম লেখায় বসল। চল। একসঙ্গে যাই। তুমি তো লিটল ব্রাদার ট্রাম ধরবে—ওখানেই ধরবে।

—চলুন।

—তুমি কি শ্রীমতী অলকার চাকরির জন্যে এসেছিলে?

—ইয়েস। নইলে শোল্ডারের উপর মৃত সতী না হোক ঘুমন্ত বা হতচেতন সতীর মত চেপে পড়লে করব কি বলুন তো? মাই ফাদার—সে আমি ভাবতেই পারি না!

—তবে এ লাইনে এলে কেন?

—আরে সেই জন্যেই কমিক অ্যাক্টর। নইলে সিরিয়াস পার্ট করে হিরো সেজে ব্যাম্বুফ্লুট বাজাতাম। ও প্রেমকে আমার বড় ভয়!

—তাহলে বিয়ে করে ফেল গেরস্ত কন্যা দেখে।

—মাইণ্ডের কথাটি বলেছেন। করব—সে কিছু সঞ্চয় করি, তারপর। তাও হয়তো করতাম, বাড়ির শেয়ারে আয়, দাদাদের কাছে হাজার দেড়েক টাকা যখন গেট করলাম তখন একবার উইশ হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের মার্কেট—হোয়াইট মার্কেটে লং—লম্বা কিউ আর ব্ল্যাকে থ্রোট কাটিং লাইফের ধার দেখে ওয়াইফের ভাবনাকে ভল্ট ডিপোজিট করেছিলাম। তবে ওয়াইফের অভাবে ওয়াইনটা অভ্যেস হয়ে গেল—মানে বেশী বেশী। বিয়ে করলে ওটা বাড়ত না। অলকা মেয়েটার পচ ধরেছে, নইলে হয়তো—

—গলায় বেঁধে ঝুলতে।

—ইয়েস। ক্যাচ করেছেন!

—লভ করতে দোষ কি?

—মাই খোদা! এয় ভগবান! হে গড! লভ যে আসে না বিগ ব্রাদার! হাসি পায়।

গোপাল ঘোষ নীরবে শুনতে শুনতে যাচ্ছিল, এবার সে খিক্ খিক্ করে হেসে উঠল। গোপালের রসের হাসি ওই খিক্ খিক্ করে। ওই হাসির মধ্যে যেন একটা প্রচ্ছন্ন কাতুকুতু আছে, সেটা অপরকে অনেক হাসি হাসিয়ে দেয়। সে হাসিতে রীতুবাবু বাবুল এমন কি বিপিন শুদ্ধ হেসে উঠল। রীতুবাবু বললে—তোমার গলায় রসের খুকি লাগে, না গোপাল? এমন খিক্ খিক্ শব্দ ওঠে!

এবার গোপাল পর্যন্ত উচ্চ হাসিতে ভেঙে পড়ল। সত্যিই সে হাসতে হাসতে কুঁজো হয়ে গেল। রীতুবাবু বললে—এটা ট্রাম লাইন গোপাল, ওদিক থেকে ট্রাম আসছে। পড়ে গেলে চাপা পড়বে। মঞ্জরী অপেরার দাঁত ভেঙে যাবে।

গোপাল একটু দন্তরও বটে। দাঁত তার ভেঙেছে কিন্তু সামনের বড় দাঁত দুটোই আছে। ওর হাত চেপে ধরলে রীতুবাবু। বাবুল বললে—আমি এই ট্রামেই উঠলাম। বেলা দশটা।

* * *

বিডন স্কোয়ারে একটা ভিড় জমেছে। অনেক লোক। রীতুবাবু বললে—ওটা কি? কি ব্যাপার রে বিপিন?

বিপিন বললে—একটা ভিখিরি মেয়ে সকাল থেকে ধুঁকছিল। মরেছে এই কিছুক্ষণ আগে।

রীতুবাবু বললে—এর থেকে দে না বাবা গোটাকত বোমা ঝেড়ে সব শেষ করে। জাপানীগুলো যে কি করলে—ক-দিন ফুটফাট করে থেমে গেল।

বলতে বলতে উঠে এল ওপরে। নায়কপক্ষ অর্থাৎ বায়নাকারীদের লোকটি বসে আছে, ওঘর থেকে তাকে অনর্গল মঞ্জরী অপেরার প্রশংসা শুনিয়ে যাচ্ছে যোগামাস্টার শুয়ে শুয়ে। এবং তার উপলক্ষ্য হল, নতুন বই গন্ধর্বকন্যা।

বলছিল—হ্যাঁ, বই বটে একখানা, বই বেটা বই বলে, এ মশাই বইয়ের বাবা বই। হ্যাঁ, দেখবেন মঞ্জরী দেবীর কি পার্ট। শালা আগুন। তেমনি গোরাবাবুর জয়ন্ত। আর ওই নতুন ছোকরা বাবুল—ঝঞ্ঝাটং ঝঞ্ঝাটং সত্যং ঝঞ্ঝাটং জগতংময়ং ঝঞ্ঝাটং দিবসে রাত্রে—তার পরে কি বটে! আর কুমারী হিরোইনের নাচ একখানা দেখবেন, স্রেফ পাগল হয়ে যাবে লোক। উন্মাদ। পাকপাড়ার রাজকুমারেরা অঃ—কি পেশংসাই করলে! কলকাতার ফাস্টো দল। কালীয়দমনে কণ্ঠমশায় যেমন দল করেছিলেন, শখের যাত্রায় মঞ্জরী অপেরা এবার

তেমনি দল করেছে। মেয়েতে মেয়ের পার্ট করে। আর সে সব মেয়ে কী! যেমন রূপ তেমনি যৈবন, তেমনি কটাক্ষ। ওই কুমারী হিরোইন না, ও মশাই খাস ভদ্র ঘরের দস্তুরমত পাশ করা মেয়ে।

গোপাল এবং রীতুবাবু ঘরে ঢুকে নমস্কার করে বসল, গোপাল বাক্স খুলে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট দিয়ে বললে—খান। দেশলাই নিজে জ্বেলে ধরিয়ে দিয়ে বললে—বিশ্বকর্মা পুজোয় বায়না, ছুটো বায়না হয়ে গেছে, এর ওপরে বায়না এসেছিল, আমি ফেরত দিয়েছি। তারা খোদ কর্তা আর প্রোপ্রাইট্রেসের কাছে গিয়ে ধরেছিল। তাই ডেকে পাঠিয়েছিলেন ওরা, সেখানে গিয়েছিলাম। কিছু মনে করবেন না।

লোকটি বললে—না না—

—মনে করবেন কি? কি মনে করবেন? আমি হাজির রয়েছি। খাতিরের কোন ত্রুটি হয় নাই। কত কণ্ঠমশাইয়ের দলের গল্প বললাম। তিনি বলতেন, কালদমুনের কাপ, সাতখুন মাপ। মানে যাত্রাদলের দোষ ধরতে নাই। যত ছুঃখু তত সুখ। রাত্রে রাজা, দিনে ফকির বাউণ্ডুলে।

—মাস্টার অনেক বকেছ। অসুখ বাড়বে, থাম। রীতুবাবু বললে।

গোপাল প্রশ্ন করলে—কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

—ভোমরাপুরা কলিয়ারী থেকে। বরাকর থেকে উত্তরে, নতুন কলিয়ারী।

—কখন বায়না?

—বরাকরের বাজারে তো আপনারা লক্ষ্মীপুজোতে যাবেন?

—হ্যাঁ, বায়না ওখানে ছু রাত্রি আছে।

—আমরা যদি লরি দি, তাহলে ওই ছুদিন দশটা থেকে আমাদের ওখানে গাইতে পারেন?

—প্রথম দিন একটার আগে হবে না। ওদেরই আরম্ভ বলেছেন

আটটায়। লাগবে সাড়ে তিন ঘণ্টা। একটা দেড়টা হয়ে যাবে। আর যদি বেলা চারটে থেকে নেন, তবে হতে পারে। দ্বিতীয় দিন এগারটা। আর যে বই এখানে হবে, সেই বই ওখানে হবে। দলের জিনিসপত্র লোকজন যাবে, আবার ফিরে বরাকরে আসবে, তার জন্যে লরি হাজির থাকা চাই। তা চারখানা। একখানা অন্তত বাসটাস, মানে ঢাকা গাড়ি চাই।

—কত করে নেবেন?

—আড়াই শো। বরাকরে দুশো পঁচিশ নিয়েছি। ওরা আমাদের প্রতিবছর নায়কপক্ষ। ওদের সঙ্গে কারুর সঙ্গ নেই।

—তা হলে হল না।

—ওর কমে আমাদের মাইনে মেটে না স্যার। শেষ রাত্রে গাওনা, তাদের বেশী দিতে হবে। অন্য দল বিশেষ দেয় না। কিন্তু আমাদের তা হবার উপায় নেই।

—তা হলে উঠি।

গোপাল রীতুবাবুর দিকে তাকালে। রীতুবাবু মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। গোপাল কাশলে, তবুও চোখ তুলল না।

ওঘর থেকে যোগামাস্টার খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে বললে—মনামনি হয়ে গিয়েছে ম্যানেজার বাবু, ওঁরা অনেক মন নিয়ে এসেছেন, আমাদেরও মন আছে। এখন আর কষাকষি করবেন না, ও দুশোতে করে নেন। বুয়েচেন, মণ্ঠমশায় কখনও ফেরাতেন না। বলতেন, ওহে, ওদের গান শোনার তেষ্টা—সেটা মুড়কির দাম দিতে পারে, দোকানদারের মত জল দেবে না। ও বাবা, তা এ যে কট্‌কট্‌ করছে পাখানা—

আসল কথা গোপাল ঘোষ ওর দিকে কট্‌কট্‌ করে তাকিয়েছিল।

রীতুবাবু বললে—তাই নাও হে। বুড়ো যোগামাস্টার বলে ফেলেছে, নাও।

চোখের ইসারাও করলে—নাও।

—আপনারা বলছেন। তা বেশ, বায়না কত দেবেন ?

—এক শো টাকা।

গোপাল বাক্স খুলে ওদের দলের চিঠির কাগজ বের করলে।

বায়না করে ভদ্রলোক চলে গেল। গোপাল ম্যানেজার একদফা যোগামাস্টারকে তিরস্কার করলে। যোগামাস্টার রাগ করলে না, স্বীকার করলে বারবার—হ্যাঁ, অন্যায় হয়ে গিয়েছে ম্যানেজার। তা হয়েছে।

গোপাল ধরে রইল—তা হবে কেন ?

রীতুমাস্টার নাপিত ডেকে বারান্দায় বসে কামাচ্ছিল আর নীরবে শুনছিল। হঠাৎ বিস্ফোরণ হয়ে গেল। যোগামাস্টার বললে—কেন হল সে বলা তো বিপদ গো! গানে কেন তাল কাটে, তালে কেন পর্দা ছাড়ে, বেয়ালায় কেন তার ছেঁড়ে, কালা আমার পরপুরুষ—মন তবু কেন তার সঙ্গে ফেরে ? এ যার-তার কথা নয় ম্যানেজার, কণ্ঠমশাইয়ের কথা।

গোপালের আর সহ্য হল না, সে বলে উঠল—কিছু না বলেছে বামুনকে—নিকুচি করব যদি ফের কণ্ঠমশাই কণ্ঠমশাই করবে তুমি !

—অ্যাঁ! কি ? কণ্ঠমশাই বললে নিকুচি করবে তুমি। পাপী, মহাপাপী তুমি, চণ্ডাল তুমি। পাষণ্ড তুমি। তোকে আমি পৈতে ছিঁড়ে শাপ দেব।

বলে সে পৈতে দু হাতে টেনে ধরলে। কালো ময়লা মোটা সুতোর পৈতেটা মজবুদ। গোপালের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। রীতুবাবু নাপিতের ক্ষুরটা সন্তর্পণে ঠেলে সরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলে—যোগামাস্টার !

এ ডাকে যোগামাস্টার স্থির হয়ে গেল। রীতুবাবু বললে—পৈতে ছাড়।

—কি ভাবে কণ্ঠমশায়কে অপমান করলে! বললে কণ্ঠ মশায়ের নিকুচি করি—

—না। তা বলে নি ম্যানেজার। বলেছে বারবার কণ্ঠমশাই কণ্ঠমশাই করলে তোমাকে নিকুচি করবে। কণ্ঠমশায়কে নয়। তিনি সাধক—পুণ্যাত্মা। ছাড়, পৈতে ছাড়।

সঙ্গে সঙ্গে পৈতে ছেড়ে দিলে যোগামাস্টার। রীতুবাবু বললে—যাও, ও-ঘরে যাও। ম্যানেজারের কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও। নইলে—

যোগাবাবু সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল—তা আমাকে ক্ষমা কর ম্যানেজার। আমি বুঝতে পারি নাই। হ্যাঁ, বুঝতে পারি নাই। মানে বুদ্ধি তো কম!

তারপরই হঠাৎ একটু ঝুঁকে গোপালের হাত ধরে বললে—ক্ষমা কর ভাই। একসঙ্গে কত গাঁজা খাই। বন্ধু নোক। আর কিছু হত না, বুঝলে আমি পৈতে ছিঁড়লেও কিছু হত না। মাইরি বলছি, কতবার পৈতে ছিঁড়েছি, লোককে শাপান্ত করেছি, কারুর কিছু হয় নাই।

গোপাল হেসে ফেললে।

রীতুবাবু আবার গিয়ে কামাতে বসল, নাপিত ক্ষুর লাগাবার আগেই বললে—বায়নার রকমটা কি রকম গোপাল? কতদিন হল? মানে ঢাকের বাজনায় হল কিছু?

—ভাল হয়েছে মাস্টারমশাই।

—কি রকম।

—পুজোতে কলকাতায় অষ্টমী নবমী চার পালা। সাতটায় মল্লিক বাড়ি, বারোটায় শোভাবাজার বারোয়ারীতলা। আর দশমী বাদ একাদশী দ্বাদশী কলকাতা। তারপর দু দিন নেই। পুণিমের সকালে রওনা, লক্ষ্মীপুজোয় দু দিন বরাকর বাজার। তার সঙ্গে এই দুদিন হল। তারপর কদিন ফাঁক। কালীপুজোর দিন থেকে নাগাড় সাত দিন—কোন দিন দুটো, কোন দিন একটা।

—জগদ্ধাত্রী পুজোয় কোথায় ?

—আসানসোলর কাছে।

—রাসে ?

—কান্দী বাঁধা আছে রাজবাড়িতে।

কামানো শেষ করে উঠে বললে—তা হলে তো ভালই। বলে বিপিনকে ডাকল—বিপ্পন্ রে! বিপ্পন্।

বিপিনকে আদর করে বিপ্পন বলে রীতুবাবু।

—আজ্ঞে ?

—একবার যাও বাবা। একটা নিয়ে এস। ছোট একটা। মাংস ভাতের ব্যবস্থা করে এস। বলে এস রাগু ঠাকুরকে। নাও, দু টাকার নোটটা রাখ। একটা সিগারেট চাই। বাড়তি লাগলে দিও। দেব এর পর।

সিঁড়ির মুখে, যোগামাস্টারদের ঘর। যোগা বলে উঠল—শিউনন্দন যে! কি খবর ? এই তো ম্যানেজার এল, আবার তুই কেন রে বাবা ?

—চিঠি আছে। আর বড় মাস্টারবাবু আছেন ইখানে ?

—রীতু মাস্টার ? আছে বইকি। একটা বায়না হয়ে গেল রে।

শিউনন্দন এসে এ-ঘরে ঢুকল। গোরাবাবুর চিঠি এনেছে। গোপাল পড়লেঃ আপনাকে বুঁচির ওখানে যাইতে হইবে না। বুঁচি নিজেই আসিয়াছিল। কথা পাকা হইয়া গেল। মাস্টারমশাই থাকিলে আটকাইবেন। এখানে পাঠাইয়া দিবেন। এখানেই খাওয়াদাওয়া করিবেন। বরাকরে সাহেব কলিয়ারীর চিঠি আসিয়াছে, তাহাদের কালীপুজার দিন নড়চড় হইয়াছে; বিলাতের সাহেব আসিতেছে, সে কালীপুজার দশ দিন পর কলিয়ারী আসিবে। উৎসব সব সেই সময়। সায়েব যাত্রা দেখিবে। হিসাব করিয়া দেখিতে হইবে অন্য কোথাও বায়না আছে কি না। ইতি বিজয় চক্রবর্তী।

এগার

পূজো এবার শেষ আশ্বিনে। ২৯শে আশ্বিন সপ্তমী। অক্টোবরের চোদ্দই। বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ সাল থেকে যুদ্ধ, দেশে দুর্ভিক্ষ মড়ক এসেছে, যুদ্ধও শেষ হয় নি, দুর্ভিক্ষ মড়কেরও শেষ হয়নি; তবে সে সময়ের মত বোমার আতঙ্ক নেই এবং দুর্ভিক্ষ মড়কের ঠিক সে চেহারাও নেই। রেশনিং হয়েছে, কিউ হয়েছে, কাপড়ের কণ্ট্রোল, কেরোসিনের কণ্ট্রোল, কয়লার কণ্ট্রোল—সঙ্গে সঙ্গে ব্ল্যাকমার্কেটও ফাঁপছে, ফলে দুর্ভিক্ষ মড়ক যুদ্ধাতঙ্ক এসবের অবস্থাটা কলেরা থেকে বেঁচে-ওঠা কঙ্কালসার লোকের মত। লঙ্গরখানা অনেক হয়েছে। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি দুধ বিলুচ্ছে, কম্যুনিস্টরা জনযুদ্ধ বলে চেঁচাচ্ছে, কিন্তু ওদিকটা গোটাই যেন ঝিমিয়ে পড়েছে—জোর নেই। কালোবাজারই জোর হয়ে উঠেছে, তার সঙ্গে সর্বজনীন পূজো—মিলিটারী কণ্ট্রাকটার, ব্যবসায়ীদের ঘরের পূজো এবং সমারোহ বেড়েছে। হাওয়াতে নোট উড়ে ছুটছে, যাদের গাড়ি আছে তারা হাঁকিয়ে গিয়ে ধরছে, যারা পায়ে হাঁটে তারা ছুটতে গিয়ে হুঁচোট খেয়ে পড়ে মরছে। কিছু কিছু ঝড়তি-পড়তি মেয়েরা পুরুষেরা যারা গলিঘুঁজিতে ঢুকতে সাহস করে, চেনে, তারা পাচ্ছে। এই গলিগুলোর দুপাশের দেওয়ালে ঠেকে নোট দু-দশখানা ঝরে পড়ে। মঞ্জরী অপেরার সে দিক থেকে দুশো-দুশো পঁচিশের বায়নাগুলো ঠকা হয়েছে। ব্যাপারটা বোঝা গেল বিশ্বকর্মা পুজোতেই। মানিকতলার খাল ধারে বিস্কুটের কারখানায় মঞ্জরী অপেরার আসর ছিল। এই কারখানাতেই মঞ্জরী অপেরা প্রথম ব্যবসার আসর পেতেছিল চার বছর আগে, নেমেছিল সতীতুলসী নিয়ে। দক্ষিণে দিয়েছিল পচাত্তর টাকা। সেই অবধি বিশ্বকর্মা পুজোয় ওখানে ওদের বাঁধা আসর। কারখানার লোক নিজে না এলে গোপাল নিজে গিয়ে বায়না নিয়ে আসে। তার আগে ওদের পাকপাড়ার রাজবাড়িতে যে আসর বসে

সেটা ব্যবসার আসর নয়। সেটা প্রকৃতপক্ষে ড্রেস-রিহারশ্যাল। এবার বিস্কুট কোম্পানীর লোকেরা নিজেরা থিয়েটার করছে বলে ওরা আসে নি। গোপাল ঘোষ নিজে গিয়ে দাবী করে বলে এসেছিল —বেশ তো, আমরা বিনা পয়সায় গেয়ে যাব। প্রোপ্রাইট্রেস তাই বলেছেন। আমরা চারটে থেকে আটটায় পালা শেষ করে চলে যাব। পরে আপনাদের থিয়েটার হবে। কিছু দিতে হয় দেবেন, না হয় দেবেন না। আমাদের আসা-যাওয়া মাল আনা-নেওয়ার খরচ আর আসর খরচ দেবেন।

ওরা বলেছিল—আপনাদের পালাটা কি গন্ধর্বকন্যা? জমে নি বলছে।

—কে বলছে?

—এই তো অন্য দলের লোক বলছে।

—ভাল, পাকপাড়ার কুমারের সার্টিফিট দেখুন।

সেটা গোপালের সঙ্গেই ছিল। গোরাবাবু নিজে গিয়ে কুমার-বাহাদুরের কাছে ওটা লিখিয়ে নিয়ে এসেছে। রীতুবাবু পরামর্শ দিয়েছিল। কারণ রটনাটা অন্য দলে বেশ উচ্চ রবে চাউর করেছে। কুমারবাহাদুর ভাল প্রশংসাপত্র দিয়েছেন। বলেছেন—শেষ দৃশ্যটা তো খারাপ ঠিক হয় নি, তবে জমে নি। কিন্তু জমাট হওয়াই তো একমাত্র গুণ নয়। আর বলছেন সংশোধন করেছেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সংশোধন করেছি। হিরোইন পাল্টেছি।

—হ্যাঁ, ও মেয়েটি বড় কাঁচা। তবে মশাই নাচে বড় ভাল।

—ওর নাচটা রেখেছি। সেটা আছে।

—সে কি করে হল!

—হল একটু কৌশল করে। মঞ্জরী নিজে সাজছে মালবিকা।

—সে কি! শুচি করবে কে মশাই?

—করবে বুঁচি বলে একজন পুরনো অ্যাক্‌ট্রেস। ভাল অ্যাক্‌ট্রেস। থিয়েটারে ছিল। ভাল করবে।

—ভাল করবে? তা করতেও পারে—শুচির সঙ্গে বুঁচির মিল আছে মশাই।

হেসে উঠেছিলেন তিনি। কৌতুক বড় ভালবাসেন কুমার-সাহেব। লেখাটি রেখে দেবার মত। ওটাকে বাঁধিয়ে রেখে দেবেন। গোরাবাবু ঠিক করেছেন। তার আগে ব্লক করে নিয়েছেন। বিজ্ঞাপনের প্যাম্পলেটে ছাপবেন। প্রেসের ফেরতই গোপাল গিয়েছিল।

লেখাটি পড়তে পড়তে কারখানার ম্যানেজার বললেন—এটার মানে কি? পণ্ডিত বিদ্বানের প্যাঁচ ধরতে পারি না। ক্কি পরিতুষ্ট হইয়াছি লিখিয়া মনে হইতেছে ঠিক হইল না, তোষণ শব্দে ঠিক বলা হয় না, তৃপ্তি—পরমতৃপ্তি পাইয়াছি লিখিলে তবে ঠিক হয়। নাটকের অভিনয়ে পরিতৃপ্তি পাইয়াছি। যেমন সুন্দর নাটক, ভাব ভাষা গ্রন্থন, তেমনি অভিনয়। গৌড়জন আনন্দে সুধা পান করিবে।

গোপাল বললে—গোরাবাবু বলছিলেন, ওর মানে বুঝে বোঝা যায় না। গন্ধের মত ধরতে হয়।

—ও বাবা! এ যে আরও শক্ত! বেশ, তাই করবেন।

অভিনয় থিয়েটারের জন্য বাঁধা স্টেজের উপরেই হয়েছিল। একটা সিন পিছনে রেখে যন্ত্রীরা সব স্টেজের উপর আসরের মতই চারপাশে বসল। তারই মধ্যে গাওনা হল প্রবেশ-প্রস্থান উইংসের ভেতর দিয়ে, এতে জমাটির পক্ষে ভালই হয়েছিল, শুধু অসুবিধে হয়, তিন দিক বন্ধ থাকে, একদিকে মুখ করে গাইতে হয়। তাতে যাত্রাদলের যেটা নড়াচড়ার ঢঙ সেটা খা য না। যাত্রার আসরে চারিদিকে মুখ করে গাইতে হয়। যোগামাস্টার বলে—কণ্ঠমশায় বলতেন, ঘুরে ঘুরে বাবা, ঘুরে ঘুরে। তাও তালে তালে। যাত্রাদলে গাওনা করতে হলে চারিদিকে চারটে মুখ চাই, চতুর্মুখ ব্রহ্মা হতে হয়।

রীতুমাস্টার কথাটা কপালে হাত ঠেকিয়ে কণ্ঠমশায়কে প্রণাম

করে গ্রহণ করেছে, সেও কথাটা বলে। এবং রিহারশ্যালে ওটা অভ্যেস করতে হয়। স্টেজে সেই অভ্যেস সরিয়ে রেখে গাওনা। তাতে অসুবিধে হয় নি বিশেষ। বড়দের তো হয়ই নি। ছোটদের কিছু কিছু হয়েছে। আবার সুবিধে ঢের। সোজা একমুখে কথা ছুঁড়লেই শুনতে পাবে সমস্ত লোক। তিনদিক ঘেরা, আওয়াজ চার পাশে ছড়িয়ে পড়ে না, তিন দিকে ঠেক খেয়ে একদিকের জোরটা বেড়ে যায়।

প্রথম দৃশ্য থেকে প্লে জমাটিই ছিল। এখানেও ওই বংশীর গানে জমেছিল। এখানে সখীর দলের সামনে ডান দিকে ছিল আশা, বাঁ দিকে ছিল অলকা। অলকা মাথায় একটু খাটো বটে কিন্তু তার মুখে আছে পরিমার্জনার সুন্দর একটি শ্রী। তার উপর মেক-আপ সে জানে। ওর নিজের একটা ছোট বাক্স বরাবরই আছে, এবার সেটাকে বেশ ভালো করে গুছিয়ে নিয়েছে। এর উপরেও তার বয়স, নূতন যৌবন শ্রী। এই ধরণের সখী যাত্রাদলে থাকে না। যাত্রা-দলের সখীরা সবই ছোট ছেলে নিয়ে হয়ে থাকে। চোদ্দ বছর যেতে-না-যেতে গলায় বয়সা ধরে ছেলেগুলোর, মুখে ব্রণ বেরোয়। কারুর কারুর মুখে দাড়ি গোঁফের হাল্কা সবুজ আভাস দেখা দেয়। এবং ওই ছোঁড়াগুলোকে কোনক্রমেই যুবতী দূরের কথা কিশোরী বলেও মনে হয় না। তবুও ওদের বুকে কাঁচুলী পরায়। সে আদৌ মানায় না। এখানে দুই দিকে দুটি সত্যিকারের মেয়ে সখী, ওদের আড়াল করে পিছনে রেখে দাঁড়াবামাত্র, দর্শকেরা খুশী হয়ে উঠেছিল, চোখ মন দুই ভরে গিয়েছিল। এই সখীর দলের নাচে অলকার অসুবিধে হয়েছিল, তার বরাবরই একলা নাচার অভ্যাস। তাতে মুদ্রার কাজ বেশী। এ সকলের সঙ্গে পা মিলিয়ে গায়ের হিল্লোল মিলিয়ে নাচা এই তার প্রথম। এবং আশার মত সে ঘন ঘন কটাক্ষ হেনে একটু পঙ্কিল ভাবে গায়ের হিল্লোল খেলিয়ে, হেসে নাচতে ঠিক সে পারে নি। বংশী স্টেজের উইংসের পাশ থেকে বারবার

প্রম্পটিংয়ের মত বলেছে—একটু নুন ঝাল মিশিয়ে। হেসে, চোখ খেলিয়ে।

বুঝতে পারে নি প্রথমটা অলকা যে কথাটা তাকেই বলছে। সে মুখ ফেরায় নি। বংশী এবার গলা ঝেড়েছিল—উঁ-হু, উঁ-হু। অলকাকে কি বলে ডাকবে সেটা বংশীর বিনত এবং অশিক্ষিত ড্যান্সিং মাস্টারের মাথায় আসে নি। এবার বংশীর পিছন থেকে গোরাবাবুর গলা শোনা গিয়েছিল—অলকা! অলকা!

অলকা মুখ ফেরাতেই বংশী কিছু বলবার আগেই কথাটা মুদ্রার সঙ্গে অর্থাৎ নিজে নৃত্যভঙ্গিতে দেহ হেলিয়ে কটাক্ষ হেনে হেসে দেখিয়ে দিয়ে বলেছিল—এই ভাবে। আশার মত। একটু সেক্স মেশাও।

অলকা ফিক করে হেসে ফেলেছিল।

গোরাবাবু বলেছিল—এই হয়েছে। হ্যাঁ, চালিয়ে যাও।

ওদিকের সামনের উইংসে দাঁড়িয়েছিল ব্রহ্মমিত্র রীতুবাবু, সর্বাণী শোভা। তারা গোরাবাবুর নাচ দেখানো দেখে হেসে ভিতরে ভিতরে প্রায় ভেঙে পড়ল। শোভা মুখে কাপড় চাপা দিলে। তবু খুক খুক শব্দ বেরিয়ে পড়ল। ওর পাশে ছিল যোগাবাবু। সে অতিবিস্মিত কৌতুকে কুঁজো হয়ে পড়ে বলে উঠল—এ মা! তারপরই মুখে হাত চাপা দিলে। রীতুবাবু কিন্তু হাসে নি। তার কাছে এটা হাসবার ঘটনা নয়। গোরাবাবু না দেখালে হয়তো সেই নেচে দেখাত। এটা দেখাতে হয়। বিশেষ করে স্টেজে। পার্টে খামতি হলে, ভুল হলে উইংসের ফাঁক থেকে নীরবে অথবা ফিসফিস করে বক্তৃতার ভঙ্গি অঙ্গভঙ্গি দেখিয়ে দিয়ে থাকে প্রবীণেরা। যাত্রাদলেও আসরের মধ্যেই কো-অ্যাক্টরকে ফিসফিস করে বলে দেয়, জোর দিয়ে বল। অথবা গলা চড়িয়ে। আবার প্লে জমে গেলে আনন্দে বড় বড় অ্যাক্টর পর্যন্ত ছেলেমানুষের মত নেচে দেয়।

ওদিকে গ্রীনরুমে ঠিক তাই হল।

নাচের ঘুঙুর এবং গানের সুরের তালে তালে পা নাচতে লাগল, গা দুলতে লাগল। যারা বসে ছিল তারা দাঁড়িয়ে উঠল, যারা দাঁড়িয়েছিল তারা এগিয়ে এল স্টেজের দিকে। বাবুল বোস মেক-আপ করতে করতে উঠে একটা পাক খেয়ে কপালে চাপড় মেরে বলে—অহো অহো। হা হতোস্মি। দেখ্‌তেং পেলাম নারে।

মঞ্জরী কথা বলছিল বুঁচির সঙ্গে।

বুঁচি পাকা অভিনেত্রী। কোঁকড়া চুল, নাকটি ছোট, গোল মুখ, বড় বড় চোখ, থুতনির দিকটা সামনের দিকে একটু বেরিয়ে আসা, চল্লিশ বছরেও সমুদ্ধত যৌবন শুধু একটু বেশী ভারী। মিনার্ভা থিয়েটারে কিছুদিন মঞ্জরী অভিনয় করেছিল—সে প্রায় বছর আষ্টেক আগে। তখন মঞ্জরী ছিল তরুণী নায়িকা, ইয়ং হিরোইন। যাত্রাদলে যাকে বলে কুমারী নায়িকা, আর বুঁচি করত ভারী বড় পার্ট। ঠিক প্রায় আজকের মতই। আজ সে শুচি, মঞ্জরী মালবিকা। তখন পরস্পরের সঙ্গে একটা আঁকশা-আঁকশিও ছিল। এ ওকে মারতে চেষ্টা করত অর্থাৎ খাটো বা ছোট করে দিতে চাইত। একদিন মঞ্জরী অভিনয়ের মধ্যে হঠাৎ নতুন ভাবে বুঁচির কথা ধরে এণ্ট্রান্স দিয়ে ক্ল্যাপ পেয়ে গিয়েছিল। আগে তারা তিন চারজনে প্রবেশ করত একসঙ্গে, বুঁচির কথা ছিল বেশী। সে যা বলছিল তা ঠিক ন্যায়সঙ্গত নয় কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস করছিল না, শেষে মঞ্জরী অসহ্য বোধ করে বলে উঠেছিল, এ অন্যায়, আমি এর প্রতিবাদ করি। তাতে ফল অবশ্যই হত কিন্তু ক্ল্যাপ পড়ত না। বইয়ের অথার সেদিন স্টেজে ছিলেন, তিনি সেদিন ওকে বলেছিলেন, তুমি ওদের সঙ্গে ঢুকো না তো। ক্যাচ ধরে ঢোক। দেখ তো কি হয়। মঞ্জরী তাই করেছিল।

বুঁচির পার্ট ছিল ঃ এ আমার কঠিন আদেশ। যে আদেশ লঙ্ঘন করবে, প্রতিবাদ করবে—

সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জরী ঢুকে দৃপ্ত ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে বলেছিল, প্রতিবাদ

আমি করছি। তোমার এ অন্যায় আদেশ সর্বাগ্রে লঙ্ঘন করব আমি।

ফল হয়েছিল বিদ্যুতের চমক দেওয়া স্পর্শের মত। সমস্ত দর্শক তার স্পর্শে চকিত এবং উল্লাসে দীপ্ত হয়ে উঠে করতালি দিয়ে তাদের অভিনন্দন জানিয়েছিল। বুঁচির মুখ হয়ে উঠেছিল হাঁড়ির মত। তারপর প্রাণপণ উত্তেজনা সঞ্চার করেও মঞ্জরীর পার্টের ব্যক্তিত্বের উপরে উঠতে পারে নি। স্টেজ থেকে বেরিয়ে এসে সে প্রায় ব্যাঘ্রীর মত তাকে আক্রমণ করেছিল, কেন তুমি এ ভাবে ঢুকলে? কেন?

মঞ্জরী অথারকে দেখিয়ে দিয়েছিল। বুঁচি তাতেও নিরস্ত হয় নি। সে থিয়েটারের ম্যানেজারের কাছে গিয়ে অভিযোগ করেছিল। এবং জিতেছিল। অথার রাগ করেছিল কিন্তু ম্যানেজার সেই আগের মত অভিনয় ব্যবস্থাই বাহাল রেখেছিলেন। প্রতিযোগিতা রেশারেশি সত্ত্বেও ভালবাসাও ছিল। পাকা অ্যাক্‌ট্রেস—তবু মঞ্জরীর করা পার্ট সম্পর্কে তার কাছে কিছু কিছু জেনে নিচ্ছিল। রিহারশ্যালে মঞ্জরী একবার দেখিয়ে দিয়েছিল, তাতেই সে অবলীলাক্রমে আয়ত্ত করে নিয়েছিল পার্টটা।

সেই প্রথম যেদিন চাকরীতে ঢোকে সেই দিন বিকেলেই।

মাইনে হয়েছিল একশো পঁচিশ টাকা। খোরাকি এক টাকা। বুঁচি খুশী হয়েই চাকরী নিয়েছিল। বলেছিল, মঞ্জরী, আমার ইজ্জত রাখলে ভাই। যা অবস্থা হয়েছিল, কি বলব!

থিয়েটারে যাত্রায় তখন মাইনের বাজার সত্ত উঠছে। আগে থিয়েটারেই বড় বড় অভিনেত্রীরা একশো পঁচিশ পায় নি। সেদিন রিহারশ্যাল হয়েছিল মঞ্জরীর বাড়িতে। রীতুবাবু গোরাবাবু মঞ্জরী আর বুঁচি। শোভাকে ডেকেছিল মঞ্জরী কিন্তু শরীর খারাপ বলে সে আসে নি। বিছানায় সত্যিই শুয়েছিল। নিজের মনে বকেছে। মধ্যে মধ্যে বাবা বাবা বাবা বলে উচ্চকণ্ঠে ডেকে উঠেছে। প্রথমটা রিহারশ্যাল দিতে দিতে এরা থেমেছিল। শিউনন্দন ছিল

সেখানে, ফরমায়েস খাটাচ্ছিল। সে হেসে বলেছিল—উ আজ পিয়েছে।

—পিয়েছে!

—হ্যাঁ। আমি তো আনিয়ে দিলম।

—আচ্ছা। রীতুবাবু বলেছিল—নিন, চলুন। আমার কপাল আর কি!

বুঁচি মুখ মচকে হেসেছিল। মঞ্জরীও। গোরাবাবু বলেছিল—বিচিত্র চরিত্র তুমি নারী। ছিন্নমস্তা ধূমাবতী তুমিই হইতে পার। নিন, বলুন মাস্টার মশাই—

রীতুবাবু হেসে বুঁচিকে বলেছিল—হাসছ কি?

—কেন হাসব না?

—হাসবে না এই কারণে যে তুমি আজ অগ্নির শিখায় ঘৃতাহুতি সম এসে পড়েছ।

—মরণ! আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই।

—তোমার কাজ হয়তো আছে, কিন্তু ও ভাবছে আমার কাজ নেই।

—সত্যি?

—সে ও বলবে। আমি কি করে বলব। নাও, এখন বল। বলান স্যার!

বই ধরে প্রম্‌ট্‌ করছিল, গোরাবাবু ফার্স্ট সিনে ব্রহ্মমিত্র। সর্বানী, শুচি। গোরাবাবু বললে—বলুন মাস্টারমশাই, আয় আয়, আয় মাগো, কোলে আয়, বুকে আয়!

রীতুবাবু উঠে দাঁড়িয়ে, হাত বাড়িয়ে বললে কথাগুলি। গারাবাবু প্রম্‌ট্‌ করলে—না না না পিতা, না! না!

মঞ্জরী নতজানু হয়ে বসে কথাগুলি বলে দেখিয়ে দিল। গোটা পার্টটাই শেষ পর্যন্ত করে গেল। তারপর বুঁচি উঠল। বললে—একটা কথা বলব?

—বলুন।

—আমি হাঁটু না গেড়ে যদি প্রণাম করতে যাই এমন সময় উনি ওই কথা বলেন আর আমি পিছিয়ে পিছিয়ে চাই—তা হলে ভাল হয় না?

—তা হলে মেয়ের আর বাপকে প্রণাম করার মোমেণ্ট হবে না। তা ছাড়া ওই ভাবে এগুনো আর পিছুনো ওটা খারাপ দেখাতে পারে।

—হ্যাঁ, তা বটে। ঠিক বলেছেন।

রিহারশ্যাল ভাল দিয়েছিল, এবং শুচির কঠিন মনের দিকটা ওর মুখের গড়নের জন্যে ভাল হয়েছিল, জায়গায় জায়গায় মঞ্জরীর চেয়েও ভাল হয়েছিল। এবং মঞ্জরীও ওই আসরে মালবিকার পার্টের রিহারশ্যাল দিয়েছিল। সত্যিই, রিহারশ্যালেই মঞ্জরী ওই ঝিমিয়ে-যাওয়া, এলিয়ে-পড়া শেষ দৃশ্যটা জমিয়ে তুলেছিল।

রীতুবাবু বলেছিল—সাবাস্! মাথায় পাগড়ী কি টুপি থাকলে খুলে ফেলে মাটিতে নামিয়ে দিতাম। ওঃ, দেবতাও আজ আর এক জয়ন্ত হয়ে গেলেন!

মঞ্জরী হেসে বলেছিল—পার্টটা আমার মাস্টারমশাই!

—হ্যাঁ।

—আট বছর আগের তুমি আমি হলে দেখতে কি হত! ওই নাটকটার অনেক কথাই আমার ভাল লাগে, কিন্তু একটা কথা আশ্চর্য ভাল লাগে। "জীবনে সমাপ্তি আছে, থামা চলে, কিন্তু পিছনে ফিরে যাওয়া যায় না।"

—তবু অনেকখানি গেছেন। ভাল হয়েছে। বুঁচি বলেছিল—সুন্দর হয়েছে।

—মেলোড্রামা বড্ড বেশী রকম করে তবে হল। গোরাবাবু বলেছিল।

রীতুবাবু বলেছিল—যাত্রার দলে ওটা বাদ দিতে অনেক কাল

লাগবে স্যার! হোক মেলোড্রামা, বই জমেছে। এখন কুমার-বাহাদুরের একটা প্রশংসাপত্র নিয়ে প্যাম্পলেট ছেপে বিলিয়ে দিন। এই পালাতেই আমাদের জয়জয়কার হয়ে যাবে।

মঞ্জরী বলেছিল—বুঁচিদি শুচির পার্ট আমার থেকেও ভাল করবে।

বুঁচি বলেছিল—কি যে বল ভাই! তুমি অনেক উন্নতি করেছ। এখন—

বাধা দিয়ে মঞ্জরী বলেছিল—আমি মিথ্যে কথা বলি নি বুঁচিদি। দিব্যি করে বলছি। ও পার্টটা আমার ভাল লাগত না। মনের মত ভাল হবে কি করে?

—কেন? পার্ট তো ভাই ভালো পার্ট।

—সে তো ভাই মনের কাজ।

—বুঝেছি। শুনছিলাম বটে। তা মালবিকা-জয়ন্তের মিলন দৃশ্যটাতে আঁচ আছে। হ্যাঁ, আঁচ আছে।

গোরাবাবু অকস্মাৎ উঠে পড়ে বারান্দার রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—উঃ, কত তারা আর কি সুন্দর জ্যোৎস্না মাখা আকাশ! মেঘগুলো ভেসে চলেছে—

রীতুবাবু বলেছিল—হ্যাঁ, এই সময়ে সাইরেন অ্যাঁ-ও করে উঠলেই মাথায় চড়বে। আসুন, ফিরে এসে বসুন। শিউনন্দন, গলা শুকিয়ে গেল বাবা! সেরেফ ডেরাই মেরে গেল! রিহারশ্যাল তো ওভার।

রিহারশ্যালে মদ্যপান নিষিদ্ধ। শিউনন্দন সাড়া দিয়েছিল—হমি সব তৈয়ার করে রেডি রাখিয়েছি, মাস্টারবাবু!

—তা ইভরেডী ব্যাটারীর আলো দেখাও, সন্ধ্যে অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ।

মঞ্জরী উঠে পড়েছিল—মা গো, আমার ঠাকুরঘরে প্রণাম হয় নি!

—আমিও উঠলাম ভাই। একটা রিক্সা এনে দেনা বাবা শিউনন্দন।

গোরাবাবু পানের আসরেও অন্যমনস্ক ছিল। রীতুবাবু জিজ্ঞাসা করেছিল—দেবতা, এত চুপচাপ কেন বলুন তো? বই জমে গেল, নির্ঘাৎ জমে গেল! তবু—

হেসে গোরাবাবু বলেছিল—ভাবছি একটু।

—কি বলুন তো!

—শুচির পার্টটায় অবিচার হয়ে গেল। ক্যারেকটারটা খামতি হল।

—কি ব্যাপার? মায়া না কি গো? অ্যাঁ?

কথাটা বলেছিল মঞ্জরী।

—তুমি?

—হ্যাঁ। শুনে ফেলেছি।

—আমি কি অন্যায় বলেছি?

—আমিও অন্যায় বলি নি। তার উপর মায়া না হলে এ কথা বলতে না! দাদুর শ্রাদ্ধের সময় যে চিঠিখানা লিখেছিল, তুমি আমাকে দেখাও নি, কিন্তু আমি দেখেছি। তারপরেও যদি বল শুচির পার্ট কঠোর করে অন্যায় করেছ, তাহলে কি বলব। এর কারণ হয় তোমার মায়া নয় আমার উপর বিতৃষ্ণা।

স্থির দৃষ্টিতে মঞ্জরীর দিকে তাকিয়েছিল গোরাবাবু, তার কথা শেষ হলেই বলেছিল—দেখেছ সে চিঠি?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু—

—কি কিন্তু? এর পরও কিন্তু?

—হ্যাঁ। সে কিন্তুটা হল কমলা আর শুচি এক নয়। কমলা রক্তমাংসের মানুষ, শুচি বইয়ের চরিত্র—আমার সৃষ্টি। কমলার উপর অবিচার করুণা ঘৃণা সব করবার আমার অধিকার আছে, শুচির বেলা তা নেই।

—ওরে বাবাঃ। বড় বড় কথা। তা বেশ তো, কাটা কথাগুলো দাও না রেখে। বুঁচিদি ক্ল্যাপ পাবে।

—চুপ করলাম।

রীতুবাবু হঠাৎ উঠে পড়ে বলেছিল—উঠলাম মাই লর্ড!

—মানে? এখানে খেয়ে যাবেন। বসুন।

—না স্যার। যুদ্ধের বাজার। ব্ল্যাক-আউটের রজনী—

কেমন যেন অপ্রতিভের হাসি হেসেছিল রীতুবাবু।

—সত্য?

—এটা কি মিথ্যা?

—আমি বলব?—মঞ্জরী বলেছিল।

—বলুন।

—আমি দেখেছি।

—দেখেছেন?

—হ্যাঁ। চারিচক্ষুর কথা আমার কাছে ছাপি নেই।

হা হা করে হেসে উঠে গোরাবাবু বলেছিল—তবে এতক্ষণ বসে কেন স্যার? বেচারী একলা গেল!

রীতুবাবু হেসে বলেছিল—ভাবছিলাম।

—শুভরাত্রি।

—ধন্যবাদ। বলে দু পা এগিয়ে গিয়ে ফিরে এল, এক গ্লাস মদ ঢেলে সিগারেট ধরিয়ে গোরাবাবুর কানে কানে কিছু বললে। গোরাবাবু বললে—নিশ্চয় না। বলে উঠে গিয়ে দশ টাকার দুখানা নোট এনে হাতে দিল।

সেদিন রীতুবাবু বুঁচির ঘরেই কাটিয়েছিল। শুধু সেদিনই নয়, মধ্যে মধ্যে এর মধ্যে আরও গেছে। শোভা কিন্তু সামলে নিয়েছে। আবার পুর্বের মতই সহজ হয়ে উঠেছে।

রীতুবাবু বুঁচির পার্টটাও তৈরী করিয়ে দিয়েছে। কয়েক দিনই বুঁচির বাড়ি গেছেন বুঁচির নিমন্ত্রণে।

শোভা এখন বেশ সহজ ভাবেই সেই নিয়ে রীতুবাবুকে ঠাট্টা করছে।

আজও নামবার আগে বুঁচি মঞ্জরীকে জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছিল পার্টের কথা। আজ জানতে চাচ্ছিল—মঞ্জরী এই সিনে কোথায় কোথায় বাহবা পেয়েছে, ক্ল্যাপ পেয়েছে। পার্টের কাটাকুটির কথাও সে জানে, রীতুবাবু সে সব প্রায় খুলেই বলেছে। সেই কথাই হচ্ছিল।

—শেষটা কাটা হয়েছে। ক্ল্যাপের কথাগুলিই নেই। ক্ল্যাপ ওখানে পড়বে না। আমি জানি।

মঞ্জরীর পার্ট পড়বে পঞ্চম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে। সে মেক-আপ নিচ্ছিল। সে তার দিকে জিজ্ঞাসু ভঙ্গিতে মুখ তুলে তাকালে। বুঁচি কিন্তু সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলে—কত্তার ঘরের বিয়ে করা বউ এমন দজ্জাল ছিল? বাবাঃ!

মঞ্জরী হেসে বললে—মাস্টারমশাই আমাদের সদাশিব!

বুঁচি হেসে উঠল। হেসে বললে—ওই পার্টের কথা থেকেই কথা উঠল। মানুষটা তো খোলা প্রাণের। তার উপর নেশা। জিজ্ঞাসা করতেই বললে, আগাগোড়া হুবহু সত্যি প্রায়। সে যে কি রমণী—তা ওই গোরাবাবুই জানেন। ওঃ! আমাকে বলেছেন, বোধ হয় মঞ্জরীকেও বলেন নি—বলেছেন মাস্টারমশাই, মঞ্জরীর সঙ্গে দেখা না হলে হয়তো শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যাই করতাম। তুমিও তাকে নাকি দেখেছ?

—দেখেছি। বাপ তো আমাদের এক। সে মানুষ যে-সে মানুষ নয়। কঠিন মানুষ। তাকেই সে যা—

ঠিক এই সময়ে গ্রীনরুমের ভিতর পর্যন্ত স্টেজের ধার থেকে উল্লাস এবং কৌতুক রসে ঢেউটা ভেসে এল। মঞ্জরীর জন্য পর্দা দিয়ে ঘিরে তৈরী ছোট ঘরটির মধ্যেও ধাক্কা দিয়ে গেল।

বাঁশ বাঁধা থিয়েটারের স্টেজের গ্রীনরুম ; তেরপল দিয়ে তালা-বন্ধ আপিস স্টোরের বারান্দাটার আশপাশ ঘিরে, স্টেজের সঙ্গে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটা ছোট পাশ মেয়েদের জন্যে, বাকীটায় পুরুষরা। প্রথম দিকটায় পুরুষ, মেয়েরা একেবারে একপাশে। নইলে উঁকি মারবে পুরুষেরা। দলের পুরুষেরাই। তারই মধ্যে আবার মঞ্জরী অপেরার ম্যানেজারের নির্দেশে ছোট একটি পর্দা-ঘেরা খুপরী হয়েছে প্রোপ্রাইট্রেসের জন্যে। এখানে একটা চেয়ার টেবিলও আছে। বাকী সব যাত্রাদলের ধারাপদ্ধতি অনুযায়ী লম্বা এক একটা সাজের বাক্সের ওপর আপন আপন মেক-আপ বাক্স, ছোট্ট টিনের স্যুটকেস খুলে বসে গেছে। সবাই আবার বসবার জন্যে সাজের কালো স্টীল ট্রাঙ্ক পায় না। তারা মেঝের উপর বিছানো সতরঞ্জি বা যা হোক কিছুর উপর বসে। স্টেজের উইংসের ধার থেকে পুরুষদের গ্রানরুম হয়ে ঢেউটা বয়ে নিয়ে এসেছিল গোপালীবালা। মেয়েদের গ্রীনরুমে তখন মঞ্জরীর ঘেরা ঘরে মঞ্জরী এবং বুঁচি ছাড়া কেউ নেই। শোভা সর্বাণী, সে স্টেজে এখনই ঢুকবে। ব্রহ্মমিত্রের পরই। আশা অলকা এবং কিশোরী মেয়েটা আসরে নাচছে। গোপালীও ছিল ওখানে, ও বড্ড হাসে। হাসি একটা রোগ বললেই হয়। রীতুবাবু ওকে হ্যাখন হাসি বলে, তাতেও হাসি, যোগা ওকে ফ্যাকফ্যাকানি বলে, তাতেও হাসি। ইদানীং বাবুল এসে ওর নাম দিয়েছে বিস্কারণী টুথপেস্ট, থার্টি টু। ম্যানেজিং এজেণ্ট নাটু কোম্পানী! এতে ও আজকাল হেসে গড়িয়ে পড়ে। হি-হি-হি-হি-হি-হি করে হাসতে হাসতে গোপালী গ্রীনরুমে ঢুকল। এবং হাসতেই লাগল।

মঞ্জরী চকিত হয়ে উঠল—এত হাসছে কেন? এখন তো কোন কমিক সিন নয়, সিরিয়াস সিন, গান হচ্ছে, বুঁচি মঞ্জরী দুজনেরই পায়ের পাতা ছন্দে তালে গোপন নৃত্য করে যাচ্ছে, এখন হাসির কি হল? কেউ হাস্যকর কিছু করে ফেললে না কি? পা হড়কে পড়ল?

না, কারুর চুল বা দাড়ি খুলল, না কেউ বিশ্রী বদজবান করে ফেললে ? এ হয়। থিয়েটারেও হয়। একবার নামজাদা অ্যাকৃট্রেস ফিলিং দিয়ে পার্ট করতে করতে তোমার ছিন্ন শির বলতে বলে ফেলেছিল, তোমার শিন্ন ছির—। এবং থেমে গিয়েছিল আচমকা। স্টেজের অ্যাকৃটর থেকে অডিটোরিয়ম হাসিতে ফেটে পড়েছিল। সে হলে প্লে গেল। সর্বনাশ! প্রথম আসরে এ হলে আজকের প্লে জমবে না, এবং নতুন বইয়ের পালা শেষ। মঞ্জরী বলে উঠল—কি হল ?

বুঁচি পর্দা সরিয়ে দেখে বললে—গোপালী হাসছে। ও কিছু না।

মঞ্জরী কিন্তু স্থির থাকতে পারলে না, বেরিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে বুঁচিও। ওর তো পার্টই আছে সিনে।

পুরুষদের সাজঘরে বাবুল বোস পাক খাচ্ছে তখনও, আর গাইছে, টাইমায়ার ঢায়ার ঢায়ার, ডাব্‌লে সাডার ডাইনো মোনাই—। টাইমায়া—। গানটা—বাংলা তিমিরে ধীরে ধীরে ডুবলো সাধের দিনমণি। মেমসাহেব রোমান স্ক্রিপ্টে লিখে নিয়ে শিখতে গিয়ে ওই বানিয়েছিল তাকে। ওটা বাবুলের পেটেণ্ট কমিক। অন্য সকলেও হাসছে। মঞ্জরী সোজা গিয়ে স্টেজের উইংসের ফাঁকে গিয়ে দাঁড়াল। বললে—কি, হল কি ?

রীতুবাবু ঢুকবার জন্য পা বাড়িয়েছিল, সে চট্ করে বলে দিল—প্লে জমে গেছে। বলেই সে ঢুকল—

বন্ধ করো বন্ধ করো গান! বন্ধ করো উৎসব-উল্লাস—
নির্বাপিত করে দাও আলোকের মালা।

মুহূর্তে সব স্তব্ধ গম্ভীর হয়ে গেল। মঞ্জরী ভ্রূ কুঞ্চিত করে শোভাকে জিজ্ঞাসা করলে—কি হয়েছিল ? এত হাসছে সব!

শোভা আবার মুখে কাপড় দিলে। আবার তার হাসি পেয়েছে।

যোগামাস্টার বললে—কত্তা নেচে দিলে মা!

—কে ?

—কত্তা। গোরাবাবু। ওঃ, সে কি নাচ! নাচও উনি জানেন ?

—চুপ কর। এখানে গুজ গুজ ফুস ফুস করছ কেন? প্রম্পটিং শুনতে পাবে না যে!

গোরাবাবু এদিকে এসে দাঁড়িয়েছে।

—না, মা—

—আবার!

মঞ্জরী বললে—আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম। এত হাসছে কেন?

—চল ভিতরে গিয়ে বলছি।

ভিতরে এসে গোরাবাবু হেসে বললে—আমার নাচ দেখে হাসছে সব।

—শুনলাম। তুমি নাচলে—সেটা কি রকম? আনন্দে! কতটা মদ খেয়েছ এর মধ্যে?

—আঃ।

—আঃ করলে কি হবে? মদ না খেলে নিজের পজিসন ভুলে নাচে কেউ?

—না, মদ খেয়ে নয়। দায়ে পড়ে। বুঝলে? দলের ম্যানেজার আমি, বই আমার—দায় যে অনেক।

মঞ্জরী থমকে গেল। গোরাবাবু বললে—সখীর ব্যাচে অলকা নাচে নি কখনও, প্রথম নেমে আশার সঙ্গে তাল রাখতে পারছিল না।

—ওর নাচে তো তাল কাটে না। নাচে তো ভাল।

—সে সোলো ড্যান্স। আর সখীর দলের নাচ ও নয়। তাল ঠিক কাটছিল না, তবে আড়ষ্ট হচ্ছিল। না দেহ খেলে, না চোখ খেলে। বংশী উইংস থেকে বলেও শোনাতে পারে না। তখন আমি নাম ধরে ডেকে নিজে নেচে বললাম, এই ভাবে।

—পারলে?

—ভাল পেরেছে। হয়তো আমার নাচ দেখে ইনস্‌পিরেশন পেয়েছে।

মঞ্জরী এবার হাসলে। বললে—আমার ভাগ্যি আমিই দেখতে পেলুম না।

ওদিকে মঞ্জরীর কুঠরীর বাইরে মেয়েদের গ্রীনরুমে আশা, কিশোরী মেয়েটি, অলকা ঝম ঝম শব্দে ঘুঙুরের শব্দ তুলে ঘরে এসে ঢুকল। ঘুঙুরের সঙ্গে হাসি। শুধু অলকা বললে—কি হাসছ এত?

আশা বললে—ওরে বাপরে, কত্তার নাচ! কি চোখের খেলা!

গোরাবাবু গলা ঝেড়ে সাড়া দিলে। ওরা চুপ হয়ে গেল। গোরাবাবু ডাকলে—অলকা!

অলকা সাড়া দিলে—অ্যাঁ।

—প্রোপ্রাইট্রেসের ঘরে এস।

পর্দাটা সে তুলে ধরল। অলকা গোরাবাবুর হাসিমুখ দেখে আশ্বস্ত হয়েছিল, নইলে ভয় হয়েছিল। তার জন্যে গোরাবাবুকে নাচতে হয়েছে। স্মিত হাসি-মুখেই এসে দাঁড়াল।

ওর পিঠে মৃত্থ চাপড় দিয়ে গোরাবাবু বললে—ওয়েল ডান। ভাল নেচেছ। এত শাই কেন? এটা অভিনয়। সব মিথ্যে। আর অভিনয় ঘৃণা লজ্জা ভয় তিন থাকতে নয়! অভিনয়ে শুধু দেবীই সাজলে চলবে না, পিশাচী সাজতেও হয়। পারলে তবে অ্যাক্ট্রেস!

—পারবে। নিশ্চয় পারবে। বেচারী নতুন—সেটা ভুলে যাচ্ছ তোমরা। মঞ্জরী বললে।

অভিভূত হয়ে গেল অলকা। এত অভিভূত হল যে, তার মত শিক্ষা-দীক্ষা-কৌলীন্য গরবিণীও হঠাৎ হেঁট হয়ে মঞ্জরীকে প্রণাম করে বসল।

মঞ্জরী শশব্যস্ত হয়ে উঠল—ও কি, আমাকে প্রণাম করছ কেন ভাই? না না না, বরং ওঁকে প্রণাম কর। ব্রাহ্মণমানুষ, পণ্ডিত, অথার মানুষ। তোমাকে আজ দেখিয়ে দিয়েছেন নেচে!

গোরাবাবু বললে—সে নাচ ছবি তুলে রাখার মত। বংশী হেরে যায়। সে যথাসাধ্য অঙ্গ ছুলিয়ে কটাক্ষ হেনে—

হেসে উঠল গোরাবাবু।

অলকা লজ্জা পেয়েছিল। সে এই ফাঁকে টুপ করে একটি প্রণাম করে বেরিয়ে পালাচ্ছিল। মঞ্জরী ডাকলে—শোন।

অলকা দাঁড়াল। মঞ্জরী বললে—লাস্ট সিনে নাচটা কিন্তু খুব—কি হবে বল না গো?—মানে খুব সংযম থাকা চাই। আরতি নৃত্য তো! আর গোটা সিনটাই মিলনান্ত হলেও বেশ পবিত্র। তোমার সখীর কথাগুলো খুব যেন—দেখ আমরা বলি 'নোস্তা'—নোস্তা না হয়!

—আচ্ছা।

অলকা আবার যেতে উদ্যত হল। এবার গোরাবাবু বললে—ভাল অ্যাক্‌ট্রেস হবে তুমি। একটু স্কিপিং করো। আর তোমার নতুন বাসায় ভাল আছ? ভাল লাগছে?

—খুব ভাল লাগছে।

মঞ্জরী বললে—বাবা মা—

—না। আমি খালাস পেয়েছি, আপনারা সে জানেন না। পুলিসে আমি ডায়রী করে তবে চলে এসেছি। আমি বেঁচেছি।

বলে সে চলে গেল। এ অলকা সঙ্কুচিত বিমুগ্ধ অলকা নয়। আর এক অলকা!

—বাবু! পর্দার বাইরে থেকে গোপাল ডাকলে—বাবু!

—গোপালবাবু! আসুন।

—আপনার পার্ট এবার।

—ফার্স্ট সিন হয়ে গেল?

—শেষ হচ্ছে। বঙ্কিম ক্ল্যাপ মেরে দিলে, দূতের পার্ট।

—বঙ্কিম সাধু?

—হ্যাঁ, ভাল বলেছে।

বরানগরের বঙ্কিম সাধু, যার ছেলের অসুখে টাকা দিয়েছে মঞ্জরী অপেরা।

মঞ্জরী হেসে বললে—ভগবান বলে একজন আছেন, বুঝলে?

বেচারীকে টাকাটা দিয়েছি, তিনি দেখিয়ে দিলেন, লোকের ভাল করলে তোমারও ভাল হয়।

গোরাবাবু ও কথায় গেল না, প্রশ্ন করলে—শুচি কেমন করলে?

—ফার্স্ট ক্লাস। হাজার হলেও পুরনো চাল। রীতুবাবুর কোচিং।

একটু হাসল গোরাবাবু। ডাকল—শিউনা!

—হাঁ। লিয়ে হামি দাঁড়িয়ে আছে।

মদের গ্লাস। গোরাবাবু যেতে উদ্যত হতেই মঞ্জরী বললে—হুঁ-হুঁ—

—কি?

—কপালের সাদা ফোঁটাটা।

সাদা পেন্ট দিয়ে ফোঁটাটা সে ভাল করে এঁকে দিল। গোরাবাবু বেরিয়ে এল। শিউনন্দন গ্লাস এগিয়ে দিলে। সেটা খেয়ে নিয়ে সিগারেট ধরিয়ে, হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করে উইংসের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। পিছনে পিছনে মঞ্জরীও।

প্রথম সিনের লোকেরা বেরিয়ে আসছে।

এবার দ্বিতীয় সিনে নাটুবাবু আর বাবুল বোস। বসুমিত্র আর বিদূষক। সঙ্গে সঙ্গে ঢুকবে গোরাবাবু, জয়ন্তকুমার আর তার সঙ্গীরা।

সিগারেটটা ফেলে দিয়ে পা দিয়ে টিপে দিলে।

বুঁচিদি বেরিয়ে এসেছে, রীতুবাবুর সঙ্গেই হাসতে হাসতে গ্রীন-রুমের দিকে চলেছে। এবার বোতল খুলবে মাস্টারমশাই। বুঁচিদি? বুঁচিদি খায়, অন্তত খেত। শোভাও খায়। গোপালীও। আশার তো কথাই নেই। কিন্তু প্লের সময় এক আশা লুকিয়ে-চুরিয়ে খায়, তা ছাড়া কেউ খায় না। বুঁচিদি যদি এর ওপরে একজনের সঙ্গে দুজন হয়, তবে খারাপ হবে। ওটা বারণ করতে হবে।

এদিকে তখন দ্বিতীয় দৃশ্য সুরু হয়ে গেছে। লোকে হাসছে। বাবুল খাসা ধরতাই ধরেছে—

বাবা বাবারে বাবারে, পিতা পিতরৌ পিতরঃ—
ভো ভো ব্রাহ্মণকুমার, নাহি গচ্ছ নাহি গচ্ছ—
একাকী এই বনোমধ্যে ভয়াৎ ধ্রুবং মরিষ্যামি।

খাসা ভঙ্গি করে বলেছে।

গোপাল এসে বললে—সেজে নিন মা। বিপিন দাঁড়িয়ে আছে, বলতে পারছে না।

—যাই।

অলকাও সাজছে। বাঃ! মেয়েটা সাজতে জানে। মঞ্জরী ঘরের মধ্যে ঢুকল। তাকেও সাজতে হবে। এ সজ্জা বড় কঠিন। ঝকমকানি বাদ দিয়ে সাজতে হবে। রজনীগন্ধার মত। জয়ন্তকুমার মালবিকাকে জ্যোৎস্না রাত্রে নারায়ণ-মন্দিরে দেখে বলবে—

রজনীগন্ধার শুভ্র অনুপম স্নিগ্ধ লাবণ্যে গঠিত তনু
মৃদুগন্ধা মৃদুচ্ছন্দা অপরূপ কোমল মাধুরী
তপস্বিনী সম রুক্ষ বেশভার—

চুল শ্যাম্পু করেছে মঞ্জরী, ফুলে ফেঁপে পিঠে পড়ে রয়েছে, কপালের উপর দু গোছা ইচ্ছে করেই টেনে দিয়েছে, সেগুলি এলোমেলো হয়ে উড়ছে। মুখে সে বিলিতী পেণ্ট ব্যবহার করেছে। রুজ একটু বেশী হয়েছে। তা হোক। খুব অল্প বয়স লাগছে। কাপড় কাঁচুলি একটু বেশ নিবিড় করে শক্ত করে পরলেই নিখুত হয়ে যাবে। কপালে সে টিপ পরলে কুমকুমের।

আয়নায় কার ছায়া পড়ল! কে? অলকা!

—আসব?

ফিরে তাকাল মঞ্জরী। চোখ আর তার ফিরল না। এমন করে সেজেও অলকার পাশে দাঁড়িয়ে তার বয়স বেশী মনে হবেই।

—মেক-আপটা দেখাতে এলাম।

—ভাল হয়েছে।

—আপনার মুখের রঙটা পাউডারের পাফ দিয়ে রুজটা একটু

মেরে দেব? আর চুলগুলি ঠিক করে দেব? আরও ভাল হবে।

—দাও। তুমি ভাল সাজতে পার।

—বিউটি সেলুনে গিয়ে মেক-আপ করতাম তো। সেখানে শিখেছিলাম।

ঠিক করে দিলে সে। মঞ্জরী দেখলে সত্যিই ভাল হয়েছে আগের থেকে।

সে হঠাৎ বললে—যাত্রাদলে তোমার আসা ঠিক হয় নি। মানে এ সব শেখার পর।

—কি করব? ম্লান হেসে বললে অলকা, চেষ্টা তো কম করি নি। চান্স পাই নি একবারে তা নয়। কিন্তু পারলাম কই? যাত্রাদল পেয়েছিলাম বলে বেঁচেছি। নইলে, যে কশাই বাপ মায়ের পাল্লায় পড়েছিলাম! ওরাই আরও হতে দিলে না।

ত্বজনেই এর পর চুপ হয়ে গেল।

বাইরে খুব হাস্যরোল উঠছে। কান পেতে শুনে অলকা সচকিত হয়ে বললে—বাবুলদা। ঝঞ্ঝাটিং ঝঞ্ঝাটিং সত্যং। যাই দেখে আসি।

—যাও।

একটু পরই গোরাবাবু এসে ঢুকল। বললে—বাবুল, ওয়াণ্ডার-ফুল! মারভেলাস!

ওঘরে রীতুবাবু বাবুলকে পিঠ চাপড়ে বলছে—জিতা রহো, জিতা রহো, মাস্টার। লঙ লিভ মাই লিটল ব্রাদার।

বাবুল বললে—টুইঙ্ক্‌ল্‌ টুইঙ্ক্‌ল্‌ লিট্‌ল্‌ স্টার—। ওপেন ওপেন বট্‌ল সুন। ইয়োর লিটল স্টার ইজ থাষ্টি।

—নাও। রেডি করে রেখেছি।

—এ বোতল যে সিকি শেষ করেছেন এর মধ্যে!

—তা করেছি।

—আমাকে কিন্তু বারণ করবেন। অল আর্থ হয়ে যাবে।

গোরাবাবু মঞ্জরীকে বললে—তুমি একটু ভাবছ! নার্ভাস হলে নাকি?

—তা একটু হয়েছি।

—নতুন কথা। কিচ্ছু ভেবো না। রিহারশ্যালে আমি প্রায় অঙ্ক কষে হিসেব করেছি। প্লে জমবেই। লাস্ট সিনে ক্ল্যাপ তুমি পাবে না, কিন্তু লোকে তোমার জন্যে পাগল হয়ে যাবে।

—একটু বাধা দাঁড়াচ্ছে।

—সেটা আবার কি?

—অলকাকে দেখেছ?

—দেখেছি বইকি।

—উঁহু। অলকা। অলকা। শোভাদি, আশা, কে আছ অলকাকে পাঠিয়ে দাও তো।

—আমাকে ডাকছেন? আসব? পর্দার ওধার থেকে অলকার সাড়া এল।

—হ্যাঁ। ভিতরে এস।

অলকা ভিতরে এসে দাঁড়াল—কি?

—তোমার মেক-আপ দেখাচ্ছি ওঁকে। দেখ।

—বাঃ! সেদিন তো এমন মেক-আপ কর নি রাজবাড়িতে?

—বলেছিলেন যে মালবিকা হবে বিষণ্ণতার মত। রূপ দিয়ে সে জয় করছে না। পবিত্র পরিচ্ছন্ন নিশ্চয় হবে, রজনীগন্ধার মত, কিন্তু ঝলমলানি থাকবে না। সেইজন্যে এ ধরনের মেক-আপ করি নি।

—হুঁ। তুমি বড় অ্যাক্‌ট্রেস হবে গো।

মঞ্জরী বললে—আচ্ছা যাও তুমি।

অলকা চলে গেল।

মঞ্জরী মৃদুস্বরে বললে—আমার বয়স মেক-আপ করেও ওর মত দেখাবে না।

—না না, তোমার মেক-আপ অপূর্ব হয়েছে। আমার সে কাল মনে পড়ছে।

তবুও মঞ্জরী বললে—উঁহু। ও সিনে ওর কথাগুলো না থাকলেই ভাল হত। মানে নাচ শেষ করেই যদি ও চলে আসত, তা হলে ঠিক হত। ভেবে দেখ তুমি।

—কিছু ভেবো না। তুমি পার্ট করে যাও। তোমার রূপ আমার চোখ দিয়ে দেখবে অডিয়েন্স। নিজের চোখে নয়।

শিউনন্দন এসে দাঁড়াল—মাস্টারসাহিব, বাবুলবাবু ডাকছেন আপনাকে।

—চল।

সত্যিই তৃষ্ণা পেয়েছে। সিগারেটও খায় নি অনেকক্ষণ।

কথা মঞ্জরীর সত্য হল না। গোরাবাবুর কথাই সত্য দাঁড়াল। গন্ধর্বকন্যা সুন্দর জমাটির মধ্যে শেষ হল। এবং সত্যই গন্ধর্বকন্যা তপস্বিনী মালবিকা দর্শক মনে সন্ধ্যার অন্ধকারে রূপে গন্ধে সন্থ-ফোটা রজনীগন্ধার মতই একটি রোমান্টিক নেশা ধরিয়ে দিল। মঞ্জরী নিজেও অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। সে স্টেজ থেকে ফেরবার পর অনেকক্ষণ কেমন স্তব্ধ হয়ে ছিল। বুঁচি এসে জড়িয়ে ধরে চুম খেয়ে বলেছিল—আমার ইচ্ছে হচ্ছিল প্রেমে পড়ি তোর পুরুষ হয়ে। শোভা বললে—সতীতুলসীতেও এমনি আছে কিন্তু এত ভাল নয়। তারপর কানে কানে কি বলেছিল যা শুনে মঞ্জরীর অভিভূত ভাব কেটে গিয়ে সে চপলা হয়ে উঠেছিল এবং বলেছিল—যাঃ। কি অসভ্য মা!

শোভা হেসে ভেঙে পড়ত। গোপালী কথাটা না শুনেও গড়াচ্ছিল হেসে। অলকা বুঝতে পারে নি, সে মুগ্ধার মত দাঁড়িয়েছিল। সে সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেছে।

—মঞ্জরী!

গোরাবাবু এসে ঢুকল, সকলে চলে যাচ্ছিল, গোরাবাবু

বললে—বায়না। কাল। একটা নয় দুটো। দুটোই দুশো পঁচিশ করে, আসর খরচ পঁচিশ, লরি বাস। নিই ?

গোপালও পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। মৃদু মৃদু হাসছে, কিন্তু সে হাসি কেমন বোকা-বোকা। আশা ফিসফিস করে বললে গোপালীকে—দু কল্কে গাঁজা একসঙ্গে খেয়েছে ; হাসিটা দেখ ক্যাবলার মত ! মরণ !

গোপালী খিল খিল করে হেসে উঠল।

—কিন্তু এদের থিয়েটার পক্ষ খুব রেগেছে। বলছে ওদের প্লে এর পর ধরবে না। আর ওরা চাচ্ছে অলকাকে। ওদের দুটো অঙ্কে যদি দুটো নাচ দেয়—টাকা দেবে। চল্লিশ টাকা। কি বলব ?

—তা—

—যাক। ওর কিছু হবে। কি বল ?

—বেশ।

পরের দিন অন্য দুটো কারখানায় দুটো অভিনয়। ওই একই বই। এক বই নইলে দু জায়গায় গাওনায় অসুবিধে অনেক। সাজগোজ সব পালটাতে হয়। এ প্লেতে যে যুবক সে হয়তো অন্য প্লেতে বুড়ো। একজন এক প্লেতে অনার্য কি দৈত্য, গতবার থেকে মঞ্জরী অপেরার দৈত্য অনার্য এদের পেণ্টে নীল রঙ মিশিয়ে নীলচে করে রঙ। তাকে অন্য বইয়ে দেবতা সাজতে হলে পেণ্ট তুলতে হয়। তারপর পালার একসেসেরিজ মানে জিনিসপত্তর। তারপর পোশাক, হাঙ্গামা অনেক। এক প্লে হলে, এক জায়গার প্লে শেষ করে সেই মেক-আপ নিয়েই অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসরা চলে এসে সাজঘরে নেমে পনের মিনিটের মধ্যে নেমে যেতে পারে। যারা বাদ্যযন্ত্রী তাদেরও এক প্লের গান সুর সব তাকে তুলে নতুন প্লের গান সুর তাক থেকে পেড়ে নিতে হয় না। তা ছাড়া দুই কারখানাই নিজে থেকেই গন্ধর্বকন্যা চেয়েছে। দুই কারখানারই লোক এসেছিল দেখতে।

তাদের উদ্যোগ শেষ বেলায় সম্পূর্ণ হয়েছে; আগে দল বায়না করতে পারে নি। এখন যুদ্ধের বাজারে কারখানাগুলির ফাঁপি অবস্থা; সব জায়গাতেই যাত্রা হচ্ছে প্রায়। প্রায় সব দলই আজ গাওনা করছে। আর্য অপেরা, নবরঞ্জন, রয়েল বীণাপাণি সব। কারখানা ছুটির লোক কয়েক জায়গাতেই যাত্রা শুনেছে, এবং টেলিফোন করে নিজেদের কর্তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে মঞ্জরী অপেরাকেই বায়না করতে মনস্থ করেছে।

মঞ্জরী একটা প্রায় অদ্ভুত কাণ্ড করলে। এবং নাটক সম্বন্ধে নিজের জ্ঞানবোধ প্রমাণ করে দিলে। এটা সে বিশ্বকর্মা পুজোর অভিনয়ের পরই বোধ হয় ঠিক করে রেখেছিল। বাবুল বোস রীতুবাবু নাটুবাবু আর বুঁচিদিকে বলে রেখেছিল, সকাল বেলাতেই বাড়ি আসবার জন্যে। বলেছিল, চা খাবেন, আর কথা কিছু আছে আমার।

সকলেই এল। রীতুবাবু সকলের থেকে দেরীতে। বুঁচি বললে—আমার ওখানে গিয়ে একটু বসেই সে কাল বাড়ি চলে গেছে। বাড়ি মানে হাওড়ায় একটা টিনের চাল, ইটের দেওয়াল কোঠার দোতলায় এককুঠুরী এক আস্তানা।

বাবুল বললে—ইয়েসটারডে থেকেই বিগ ব্রাদারের কেমন মেণ্ডিক্যাল্টি মেজাজ হয়ে গেছে। প্লের পর ভাম হয়ে বসেছিল। অল অন এ সাডেন না বলে উঠল লিটল ব্রাদার। বললাম, ইয়েস বিগ ব্রাদার! বললে, কি ফিল করছ, বলতো? বললাম, ভাদ্র মাস তো, বড্ড গরম ফিল করছি। অ্যাণ্ড পান বেশী হয়ে গেছে, বিলকুল সব পোঁ পোঁ রীল করছে। বললে, রাবিশ। তুমি একটা পথল স্টোন! প্রেম ফিল করছ না? বললাম, না। বিগ ব্রাদার বললে, আমি ফিল করছি, প্রেম ছাড়া কিছু নাই কেহ নাই। ইচ্ছা হয় প্রেম লাগি সন্ন্যাসী হইয়া যাই। প্রেম ছাড়া সব মিথ্যা। বললাম, বুঁচিদিকে ডাকি? বললে, তুমি একটি উল্লুক। নইলে অলকার

প্রেমে পড় না? আমি চেপে গেলাম জাঁহাপনা। দিলদার সব পারে—এভরিথিং। এনিথিং। বাট্ প্রেম নট্। ওর থেকে টাইফয়েড, টি-বি ভাল।

সকলে হেসে উঠল। রীতুবাবুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল—ভাগো, বহুৎ দিয়া হ্যায়। যাও, যাও।

রিক্সায় টুন টুন শব্দ উঠল। রিক্সাওলাকে বকছে। তারপরই গলা শোনা গেল—"এ মায়া প্রপঞ্চ মায়া ভবের রঙ্গমঞ্চ মাঝে। রঙ্গের নটবর হরি যারে যা সাজান সেই তা সাজে!" নটবরের জয় হোক। কি পালাই গেঁথেছেন নটবর! "ধন্য ধন্য তুমি ধন্য, ধন্য তোমার রাধাপ্রিয়া, তোমারে বেঁধেছে ভাল রাঙাচরণ ধরাইয়া!" সিঁড়ি শেষ করে উপরে উঠে বললে—ওয়াণ্ডারফুল স্যার, নেশা লেগে গিয়েছে কাল থেকে। ইচ্ছে হচ্ছে বিবাগী হই।

সকলে হেসে উঠল। গোরাবাবু বললে—বাবুল বলছিল। কিন্তু—

—বলুন। কিন্তু। দাঁড়ান, আমার কিন্তুটা সারি। শিউনন্দন বাবা, আমাকে একটু বোতলপানি দাও। চা চলবে না। কাল প্রেম প্রেম করে স্রেফ গিলেছি। মাথা কষে আছে। পেট জ্বলছে। খাই নি পর্যন্ত কিছু।

—এই নিন খান।

মঞ্জরী একখানি প্লেট এগিয়ে দিলে, সিঙাড়া কচুরী মিষ্টি সাজানো প্লেট একটা টেবিলে আগে থেকেই নামানো ছিল।

সিঙাড়া তুলে মুখে পুরতে গিয়ে থেমে বললে রীতুবাবু—ছুটো ডিম আমাকে দে। তারপর বলুন দয়াময় কি বলছিলেন?

গোরাবাবু বললে—বলছিলাম দোহাই আপনার, এখন সন্ন্যাসী বিবাগী হয়ে মঞ্জরী অপেরাকে ডোবাবেন না।

শোভা বলে উঠল—প্রেম করে সন্ন্যেসীই বা হতে হবে কেন গুণমণি? ভালবাসলে ভালবাসাতে আমিও জানি, বুঁচিও জানে গো।

রীতুবাবু বললে—উঁহু, প্রেম করে সন্ন্যেসী সন্ন্যেসিনী হতে হবে। না হলে যাচাই কিসের? আর প্রেমের মাধুর্য কোথায়?

বুঁচি বললে—রক্ষে কর। সন্ন্যেসিনী হতে পারব না বাবা। কি গো গোরাবাবু, বল না। তার দরকার হয়? সন্ন্যেসীকে ফিরিয়ে আনি আমরা। নয়?

বাবুল বলে উঠল—রাইট, রাইট, রাইট। ডার্ক নাইটে ব্রাইট ল্যাম্পের ইসারায় টেনে এনে বলে, পথিক এস। কাম ইন ভ্যাগাবণ্ড!

—হুঁ, যে যায় সে খতম। ঘরে গেলেই গলায় দড়ি বেঁধে ভেড়া বানায়।

—যে যায় না, সে কি বলে জানেন? গোরাবাবু বললে।

—হুঁ, অয়ি পাপিয়সী!

—না না না। "সময় যেদিন হইবে সেদিন যাইব তোমার কুঞ্জে।"

—বহুৎ আচ্ছা। ভাল মনে পড়িয়েছেন। কাল বুঁচিও তাই বলেছে আমাকে। আমি বললাম, বুঁচি, ভালবেসে সব ছেড়েছুড়ে কোথাও গিয়ে কুঁড়ে বেঁধে থাকি গে চল, যাবে? বললে, এখন না। আরও বয়েস হোক। আমি চলে গেলুম। ভাবলুম, রাত্রেই চলে যাব। কিন্তু পারলুম না, ভয় করল। উঠলুম গিয়ে হাওড়ার কোটরে। এক টাকা ব্ল্যাক দিয়ে বোতল একটা কিনে আকণ্ঠ গিলে পড়ে রইলুম। নেশার ঘোরে শুধু আপনাকে সেলাম জানিয়েছি। আপনি সত্যিই একদিন সন্ন্যেসী হয়ে বেরিয়েছিলেন।

—সেই জন্যেই গন্ধর্বজ ডটার নিক্‌লেছে।

গোরাবাবু স্তব্ধ হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইল। শরতের নীল আকাশ অতি শুভ্র দিবালোকে ঝলমল করছে। কয়েকখানা সাদা মেঘ দ্রুত বেগে উড়ে যাচ্ছে। গ্রামের আকাশে এ সময় বকের ঝাঁক সাদা পদ্মের মালার পাপড়ি দুলিয়ে চলার মত উড়ে যায়।

রীতুবাবু বললে—আকাশে চোখ তুললেন যে! বলুন কি বলবেন?

—উনি বলবেন। আমাকে বলেছেন কাল।

—আপনি কি বলেছেন ?

—কিছু না। আপনারা বলবেন। আমি অথার। বই কাটা সম্পর্কে আমার ভুল হতে পারে।

—তা হলে বলুন প্রোপ্রাইট্রেস !

মঞ্জরী বললে—সে হিসেবে আমি বলছি নে। আমি অ্যাক্‌ট্রেস, বইয়ে হিরোইন, আমি সেই হিসেবে বলছি। আমার সিন চারটে, তার মধ্যে তুটোতে সখী আছে। অলকার পার্ট। ওর আরতি নৃত্য ঠিক আছে। নাচে খুব ভাল। আমার স্থির হয়ে আরতির ডালা ধরে দাঁড়িয়ে থাকাটা ভালই আছে। কিন্তু আমার গানের পর মা কুসুমিকা ঢোকে। তার সঙ্গে মালবিকার কথা হয়, জন্মকথা। সেখানে সখী থাকবে কেন ? আমার খুব অস্বস্তি লাগে।

রীতুবাবু বললে—কথাটা তো ঠিক বলেছেন। নিশ্চয় অস্বস্তি লাগবার কথা।

গোরাবাবু বললে—শেষটায় ওর কাজ আছে, কথা আছে। জয়ন্ত স্বর্গপুরীর দৌত্য নিয়ে যাবার পথে নারায়ণের মন্দিরে প্রণাম করতে ঢুকেছে, তাকে দেখে মালবিকা মুগ্ধ হয়ে বলছে, এ কি অপরূপ রূপ ! নারায়ণ ? এ কি, নারায়ণ এসেছেন ছলিতে আমায় ! সখি, সখি !

তখন কৌতুক করে সখী মঞ্জুলিকা বলছে, চোখ ধুয়ে ফেল সখি, চোখ তুটো কুঁজোর জলে ধুয়ে ফেল। মালবিকা বলবে, কেন ? ও বলবে, জ্যোৎস্নার মায়া ধুয়ে যাবে। মালবিকা বলবে, জ্যোৎস্নার মায়া ? এ আমার ভ্রম ? মঞ্জুলিকা বলবে, নইলেও মানুষ দেখতে পাচ্ছ না ? মালবিকা বলবে, না না না। ভ্রম নয়, ভ্রম নয়, মায়া নয়, মোহ নয়। বাধা দিয়ে মঞ্জুলিকা বলবে, দেখছ না তুটো হাত ! দেবতা হলে কমপক্ষে চারটে হাত হত। বানর হলে ল্যেজ থাকত। অপ্সরা হলে ডানা থাকত। এগুলো নাটকের অঙ্গ। তা ছাড়া রিলিফ। লোকে হাসে।

—আরও হাসির দরকার আছে বিদূষকের ওপর ? তা ছাড়া

মালবিকার মোহ নয় এটা। এটাতে সে সত্যিই নারায়ণকে দেখছে জয়ন্তর মধ্যে। সুতরাং ওটা বাদ দিলেই নাটক আর ফুটবে! সাবিত্রী সত্যবান মনে আছে? সেখানে তুজন তুজনকে দেখে বিহ্বল হয়ে যায়। ভুলে যায় সব। সেখানে কমিক ঢোকালে সেটা থাকে? বলুন মাস্টারমশাই?

—তা দেখুন না—আজ ওটুকু বাদ দিয়ে।

—নাটুবাবু?

—আমার তো আপনার কথা খুব সত্যি মনে হচ্ছে।

—বুঁচিদি?

—তুমি হিরোইন, তুমি নিজে যখন অসুবিধা বোধ করছ, তখন কাটাই উচিত।

—আমার মন রেখে বলছ না তো?

—না না না। আমার সেই উষাহরণ প্লের কথা মনে পড়ছে। উষা সেজে নাকাল হত আমার এমনি একটা সিনে। অনিরুদ্ধের সঙ্গে প্রথম দেখার সিন।

মঞ্জরী এবার শোভাকে জিজ্ঞাসা করলে—শোভাদি?

শোভা বললে—আমি ভাই অতশত বুঝি নে। তোমাকে নিয়ে বই—অসুবিধে হলে বাদ দাও। কিন্তু ভাই, মেয়েটা সুন্দর সাজে তো, আর চটপটে খুব। ঘুর-ঘুর করে, ফষ্টি-নষ্টি করে বেশ! বেশ রসিয়ে দেয়। তেল-ঝোলে, ধানি কাঁচা লঙ্কার জিভে ঠেকে চিড়িক মারার মত—বেশ চিড়িক দেয়!

—বাবুলবাবু?

—অ্যাঁ?

—আপনি?

—বললে তো ঠাট্টা করবেন?

—কেন?

—বলবেন অলির প্রেমে পড়েছি।

—তা বলব না।

—মেয়েটা বড় দমে যাবে। হয়তো কেঁদেই ফেলবে শুনে।

গোরাবাবু বললে—তুমি বুঝিয়ে বলো দিলদার। ওর নাচ বাদে পার্ট বাদই পড়ল।

মঞ্জরী বললে—সতীতুলসীতে ওকে কৃষ্ণ দিয়েছি। ভাল পার্ট। জনাতে মোহিনীমায়া পেয়েছে। বরং গন্ধর্বকন্যায় প্রথম নাচ আশা বংশীর বাদ দিয়ে ওকেই দেব। তা ছাড়া কাল ওকে থিয়েটারে নাচতে দিয়েছি। অবিচার আমরা একটুও করি নি তার ওপর—

—তাই হল। আসর শেষ করুন। রাত্রে হুটো প্লে। রীতুবাবু কথাটা শেষ করে দিলে।

ভেঙে গেল আসর। যে-যার চলে গেল। লরি বাস আসবে ঠিক সাড়ে পাঁচটায়। ছটায় রওনা। সাড়ে সাতটায় প্লে সুরু। প্রথম আসর নারকেলডাঙায়, দ্বিতীয় আসর বরানগরে। সেখানে পাশের কারখানায় সন্ধ্যে থেকে নিউ শাহা কোম্পানীর থিয়েটি্ক্যাল যাত্রাপার্টি। প্লেতে খুঁত এতটুকু হলে চলবে না।

তা হলও না। মঞ্জরীর কথা আশ্চর্যরকম ফলে গেল। সখীর পার্টটুকু বাদ দেওয়াতে হিরোইন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এবং মিলনান্ত হয়েও যে একটি পবিত্রতার সুর সাদা গন্ধপুষ্পের মত মাখানো আছে আখ্যানবস্তুতে সেটি গন্ধে এবং বর্ণ-শুভ্রতায় আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। অলকা শুধু গম্ভীর হয়ে গেল। একবারও সে নিজে থেকে মঞ্জরীর কাছে এল না। মঞ্জরী তাকে বোঝালে মিষ্ট কথায়। সে শুধু বললে—ঠিক আছে। যেমন বলবেন তেমনি করব। দুঃখ কিসের?

কথাগুলি প্রাণহীন। মঞ্জরী দুঃখ পেলে, বুঁচি ছিল সেখানে, তাকে বললে—বেচারীকে দুঃখ দিতে হল! কি করব!

প্লের শেষেও মঞ্জরী অলকাকে ডেকে বললে—দেখলে?

—হ্যাঁ।

—ভাল হল না ?

—হয়েছে। অনেক ভাল হয়েছে। এর পরেরটা আরও ভাল হবে।

—মানে ?

—মানে, ঐ প্লেতে তো কেটে প্রথম প্লে। দ্বিতীয় প্লেতে আরও ভাল নিশ্চয় হবে।

তাই হল। রাত্রি তিনটেতে প্লে ভেঙে দল ফিরল মহানন্দে। শাহা কোম্পানী পাশের কারখানায় খুব মারামারি খুনোখুনির পালা 'উত্তরা' করে গেছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শেষ। বিয়োগান্ত করুণ রসের বই। লোকে কেঁদেছে। তবুও এই প্লে লোকের বড় ভাল লেগেছে। রূপকথার মত। ও কারখানা তিনখানা মেডেল দেবে। এ কারখানাও চারখানা মেডেল দিতে চেয়েছে। মালবিকা জয়ন্ত বিদূষক আর অলকাও পেয়েছে তার সুন্দর নাচের জন্য।

মঞ্জরী বলেছিল, খুশী হয়েছ এবার ?

অলকা বিচিত্র প্রশ্ন করেছিল, মঞ্জরীর দিকে তাকিয়ে বলেছিল—আপনারা বলে দেওয়ালেন নাকি ?

—এ কথা বলছ কেন ?

—মনে হল তাই বললাম।

গোরাবাবু তার পিঠ চাপড়ে বললে—বি এ স্পোর্ট! এ সব সন্দেহ কেন ? আমি নায়ক পক্ষ হলে তোমার জন্যে গোল্ড সেণ্টার মেডেল দিতাম। নাচ তোমার অপূর্ব হয়েছে। এবং আমি বলছি, সতীতুলসীতেও তুমি মেডেল পাবে। কলিয়ারী অঞ্চলে চল না। দেখবে মেডেল দেওয়ার বহর। কম্পিটিশন।

গাড়ি এসে দাঁড়াল চিৎপুরের আপিসে। রাত্রির বেশী নেই। বাকী রাত্রিটা প্রায় সকলেই এখানে কাটাবে। গোরাবাবু মঞ্জরী তাদের সঙ্গে শোভা বুঁচি চলে গেল বাড়ি।

অলকা বললে—ট্যাক্সি পেলে বাবুলদা আমি চলে যাই।

—কিন্তু এত রাত্রে ট্যাক্সি কোথায় ?

গোরাবাবু বললে—কাল সকালে হিসেবপত্র করে বেলা দশটা নাগাদ যাবেন গোপালবাবু, তার আগে নয়।

বারো

দলের লোকের মাইনের হিসেব। এখন থেকে পুজো পর্যন্ত বায়না নেই। পুজো পর্যন্ত ছুটি। প্রায় সকলেই বাড়ি যাবে। মাইনে নিয়ে যাবে, পুজোর কাপড়-চোপড় কিনবে, বাড়ির কাজকর্ম দেখবে। মফস্বলের লোকদের অনেকে গৃহস্থ বাড়ির ছেলে। যোগাবাবু নাটুবাবুর মত আরও কয়েকজন গৃহকর্তাও আছে। আশ্বিন মাস—চাষবাস একটু দেখবে। দোকানদানির দেনা মেটাবে। মাইনেতে আর কত হয়! হয়তো ধার-দেনাও দেখতে হবে। এখন কেউ কেউ দাদনও নেবে। হিসেব তারই।

শহরের লোকেরাও নেবে। তাদেরও পুজো আছে, খরচ আছে। রীতুবাবুর মত আর কজন? কেউ নেই। রীতুবাবুরই কিন্তু বেশী খরচ। এবার তো বুঁচিকে একখানা দামী কাপড় দেবেই। আজও সে এদের সঙ্গে গেল না। আপিসেই থাকল। বিড়বিড় করছে। প্রেমের নেশা লেগেছে এই বয়সে। তা লাগুক। সন্ন্যাসী হবে না। তবে নতুন একটা স্বাদ পেয়েছে। পটলীচারুর সঙ্গে সেও এককালে ঘর বেঁধেছিলেন। প্রেম তার মধ্যেও ছিল? ছিল বইকি। কিন্তু এতে যা আছে তার কোন্‌টুকু যে ছিল না তা বলতে পারবে না। তবে ছিল না, বেশ কিছুর অভাব ছিল। এই বইটা তো শুধু বই নয়, এর সঙ্গে গোরাবাবু মঞ্জরী এমন ভাবে মিশে আছে—যাতে বইটা সত্য হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, রথের দিন গোরাবাবু হঠাৎ বক্তৃতা আবৃত্তি করেছিল। বুদ্ধদেব নাটকের মারের বক্তৃতা, মনে পড়েছিল সে নিজে একবার পার্টটা করেছিল। এই ধরনে জোরালো ভিলেনের

পার্টে তখন ঝোঁক ছিল তার। মানুষকে মাতিয়ে অ্যাক্‌টিং করা যায়, নিজেরও বেশ মাতন লাগে।

—মৃত্যুপথযাত্রী ওরা—

তাই বটে। মৃত্যুপথযাত্রী অবশ্য সবাই, মরবে না আর কে? কিন্তু, তবু সকল মানুষ থেকে স্বতন্ত্র। বাউণ্ডুলে মন—কোথাও স্থির নয়; দিন দিন নয়, রাত্রি দিন। মানুষের মনে যা আনন্দ দেয়, বিচিত্র বিচিত্র কথা ঘটনা—তারা বলে ঘটায় অভিনয় করে, রাত্রিকালে আলো ঝলমল আসরে, দিনের আলোয় সব ঝুঁটা হয়ে যায়। হয়তো সবই ঝুটা। সবই মিথ্যে।

অনেক টাকা যদি হত বা থাকত রীতুবাবুর, তা হলে একটা ভাল দল করত। আর সব বাউণ্ডুলেকে খানিকটা স্বস্তি শান্তি দেবার ব্যবস্থা করত।

করেছিল—বাগবাজারের একজন। হ্যাঁ, ওই সব মানুষই পারে। গরীব মজুর মানুষ ছিল। হাওড়ায় বার্নের ডকে জাহাজ মেরামতি রিপিটিং করত। একখানা জাহাজ এসেছিল, ফোরম্যান বলেছিল তিন চারদিনের মধ্যে কাজ শেষ করে জলে নামিয়ে দেবে। কন্‌ট্রাক্‌টার বলেছিল, অসম্ভব। যাতে অন্তত দশ দিন লাগবে তা তিন চার দিনে হয় না। হতে পারে না। আমি পারব না। ডকের ফোরম্যান এই লোককে ডেকে বলেছিল—তুমি কাজের লোক যোগাড় করতে পার? তিনগুণ লোক। পারবে? সে বলেছিল, পারব। সাহেব বলেছিল, বাস, তুমি কন্‌ট্রাক্‌টার কাম্‌ তুলে দাও। সে এবার পিছিয়ে বলেছিল, সাহেব, কন্‌ট্রাক্টে বিলে টাকা। আমি এদের দেব কি? কাজ করবে—দিন আনে দিন খায়। সাহেব অ্যাডভান্স ঢেলে দিয়েছিল। মজুর মানুষ—তিন দিনে কাজ তুলে কন্‌ট্রাক্টর হয়ে গেল। বাঁধা কাজ। তার শখ হয়েছিল যাত্রাদল করবার। করেছিল। এবং দলের লোকের সব অভাব সে মেটাবার ব্যবস্থা করেছিল। যে আসামী এসে দাঁড়িয়েছে বাবু

বিপদ!—সে বলত, ভয় নেই। টাকা চাই? নিয়ে যা টাকা। লোকের ঘরের খোঁজ করে বলত—দাও হে, ওর মাগছেলে উপোস যাবে, টাকা পাঠিয়ে দাও। ও এখানে একটা খানকী নিয়ে থাকে—ওকেও টাকা দিয়ো বন্ধ করো না, মেয়েটারও তো পেট আছে, পেটের জ্বালায় খুনোখুনি করবে। নীলকণ্ঠ মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছিল, তো বলেছিল—প্রভু আপনি সাধক সিদ্ধ ভক্ত, আমাকে আশীর্বাদ না করে যারা যাত্রা করে তাদের আশীর্বাদ করুন যেন শান্তি পায় বেটারা।

শান্তি! শান্তিই বা কি বস্তু? তার জীবনে শান্তি নেই না কি? বুঝতে তো পারে না। বেশ তো আছে। দুঃখ আছে। টাকা নেই অনেক। হাঁটতে হয়। গরম লাগছে ভাদ্র মাসের গুমোটে, অসুখ করে, দাঁত নড়ছে; এবার পড়বে। মাথা ধরে। কিন্তু অশান্তিটা যে কোথায়? এই এখন প্রেমের নেশায়—ওটা পায় নি বলে মনে কেমন একটা কি হচ্ছে, বুঁচির বাড়ি যেতে ভাল লাগছে না, রাত্রে ঘুম হচ্ছে না, কিন্তু দিন কতক—দিন কতক গেলেই ওটা যাবে।

—মাস্টারমশাই আপনি এখানে? গোপাল ম্যানেজার ছাদের কোণটায় এসে হাজির হয়েছে। এ পাশটায় রীতুবাবু একা বসে আছে একটা মাদুর পেতে। কতকগুলো মাদুর এখানে কিনে রেখেছে দল থেকে—রিহারশ্যালে পেতে বসা হয় আবার এমনি গাওনার রাতে পালাশেষে এক একজন এক একখানা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ে। নাটুবাবু, রমণী নাগ এদের নিজের আছে। নাম লেখা। যে সে মাদুরে শুতে পারে না। রীতুবাবুর ও বালাই নেই। তবে সে তো বড় এখানে রাত কাটায় না। বেশীর ভাগ কর্তা গিন্নী নিয়ে যায়। আজ সে কিছুতেই যায় নি।

গোপাল বললে—আপনি এখানে?

—নিশ্চয়, এ কথা কেউ না বলতে পারে না? ক্ষীরোদ প্রসাদের পদ্মিনী নাটকের কথা, কথাটা বেরিয়ে গেল আপনি মুখ থেকে।

গোপাল বললে—আমি আপনাকে খুঁজছি। একবার ছাদে এসেছিলাম, তা এ কোণে বসে আছেন কি করে জানব ?

—কিন্তু ব্যাপারটা ? ম্যানেজার, এতরাত্রে খুঁজে বেড়াচ্ছ ? সন্দেহ করেছ লুকিয়ে প্রেম করছি ?

—রাধে রাধে। কি যে বলেন !

—তবে ?

—ছেলেটার বড় জ্বর। উ-আঁঃ করছে। কি করি বলুন তো ?

—কার ? তোমার নিতুর ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—জ্বর ?

—খুব জ্বর। ঠিক দিশে নেই। জ্বর নিয়েই গান করেছে তো !

—এত রাত্রে কি করবে ? মাথাটা ধুয়ে দাও। আর অ্যাসপিরিন-টিরিন থাকলে আধখানা খাইয়ে দাও। স্টকে আছে তো ?

—আছে।

—তবে তাই দাও। আর আমাকে একটা দিয়ে যাও হে।

গোপাল চলে গেল। রীতুবাবু একটু হাসল। এই এক ব্যাপার যাত্রার দলে। ব্যাপারটা বোঝে সে। এতেও একটা রঙ আছে। ছোঁড়াগুলো রঙ মেখে চুল কাঁচুলি পরে মেয়ে সেজে মেয়েলিপনা করে, প্রেমের অভিনয় করে, গান গায়, নাচে—তখন নেশা ধরে। আর এ তো নেশার রাজ্য। নেশা আর ছোটে না !

মনে পড়ে গেল তার প্রথম জীবনের কথা। দলের সঙ্গে বেরিয়েছে মফস্বলে। দিনের বেলা সকলে ঘুমুচ্ছে, তার ঘুম আসে নি। তখন সে তরুণ নায়ক। কিসের জন্যে ঘুম আসে নি মনে নেই। পাশে ম্যানেজার। শেষ চোখটি জুড়ে এসেছে, জোড়টা ছেড়ে গেল কান্নার আওয়াজে। কে কাঁদছে। উঠে বসে দেখলে, একজন অ্যাক্টর একটা বারো চোদ্দ বছরের ছোঁড়াকে নিঃশব্দে

মারছে। ঘাড় ধরেছে। ছেলেটাও চীৎকার করে না, শুধু যন্ত্রণায় কাত্‌রে কাত্‌রে কাঁদছে।

সে বলেছিল—ওকি, ওকে মারছেন কেন? ও মশায়?

সে লোকটি ফিরে তাকিয়ে তাকে তুচ্ছ করে আবার ঘাড়টা তার নুইয়ে দিয়েছিল।

ম্যানেজার অকস্মাৎ মাথা তুলে উঠে বলেছিল, শুয়ে পড়ুন মাস্টারমশাই। ও যা করছে করুক।

—সে কি কথা? একটা ছেলেকে—এইভাবে—

—আরে মশাই দয়া করে অধমের কথাটা শুনুন! চোখ বুজে থাকুন, দেখবেন না ওসব। ও সব—। বলব, পরে বলব। আপনি নতুন মানুষ, নিজেই জানবেন পরে।

কথাটা সে শুনেছিল, শুয়ে পড়েছিল। শোনা কথা মনেও পড়েছিল। আরও মনে পড়েছিল, ছোঁড়াটা সখীর দলের মুখপাত।

পরে বলেছিল ম্যানেজার। যাত্রা জীবনের ব্যাধি!

ছোঁড়াটা আবার সন্ধ্যেবেলা তাকে প্রণাম করেছিল হঠাৎ। জিজ্ঞাসা করেছিল—প্রণাম কেন রে?

—এই নতুন জামা রুমাল হয়েছে আমার।

ঠিক মেয়েদের গয়না হলে প্রণাম করার মত।

গোপালের ওই বাচ্চাটার উপর আশ্চর্য মমতা। যাত্রাদলে সবাই তাই মনে করে। তবে কেমন সন্দেহও হয় রীতুবাবুর। আর হলেই বা কি!

মৃত্যুপথযাত্রীদের জটলা। বাজারের মধ্যে কালোবাজার, সন্ন্যাসের মধ্যে ভণ্ডামী, মানুষের মধ্যে চুরি ডাকাতি, মেয়ে-পুরুষের মধ্যে, তার মত পুরুষ, বুঁচির মত দেহব্যবসায়িনী বাদ দিয়েও, কত পাপ! যাত্রার দলে এ পাপ বল, ব্যাধি বল, প্রবেশ করে বসে আছে কালের মধ্যে কলির মত, খাদ্যের মধ্যে বিষের মত, পথের ধারে মদের দোকানের মত; সংসারের মধ্যে অভাবের মত, জীবনের

মধ্যে দুঃখের মত, দুশ্চিন্তার মত; মনের মধ্যে হিংসার মত, লোভের মত। মত কেন? বিকৃত জীবন, বিকৃত প্রেম-কামনা, বিকৃত দেহলালসা!

গোপাল ফিরে এল—নিন মাস্টারমশাই। এক গ্লাস জলও এনেছে।

—দাও।

—জল এনেছি, জল দিয়ে খাবেন, না—

—মদ ফুরিয়ে গেছে।

—এনে দেব?

—না হে। মনটা এখন আকাশে উড়ছে, ফটিক জল—ফটিক জল করছে।

—তেষ্টা পেয়েছে?

—পেয়েছে। কিন্তু সে তুমি বুঝবে না।

জল দিয়ে অ্যাসপিরিন খেয়ে রীতুবাবু বললে—বোস, অলকা এখানে রয়েছে না?

—হ্যাঁ। মঞ্জরী মা বলে গেলেন, ওদের অভ্যেস নেই—ওদের একটু যত্ন করতে। বাবুল মাস্টার পুবের বারান্দায় শুয়েছে। অলকা ঘরে আছে। আশা গোপালী আর ওই ছোট মেয়েটাকে ছোট ঘরটা দিয়েছি। অলকা তক্তাপোশে শুয়েছে।

—প্রোপ্রাইট্রেস ভাল লোক।

—তা—একবার!

—তোমাকে একটা কথা বলব? তুমিও ভাল লোক। নইলে বলতাম না।

—নিতুর কথা বলবেন তো?

—তুমি তো বোঝ সব গোপাল—তবে?

গোপাল চুপ করে রইল। রীতুবাবু বললে—ওর থেকে তুমি মেয়েছেলের সঙ্গে সংসার পাত না কেন? এই বয়সে সেবা যত্ন পাবে!

—মাস্টারমশাই!

—বল !

—ছেলে—বাচ্চা ছেলেকে ভালবাসলে কি ওই হতে হবে ?

রীতুবাবু চমকে উঠল, আরক্ত চোখ দুটোকে বিস্ফারিত করে বললে—গোপাল ?

—ওকে আমি ছেলের মত ভালবাসি।

—ছেলের মত ?

—ও আমার ছেলে মাস্টারমশাই—

—আমার গা ছুঁয়ে বলতে পার ? তবে ও তোমাকে বাবা বলে না কেন ? দোষ কি ?

—আপনার গা ছুঁয়ে বলছি। তবে ও আমার পরিবারের ছেলে। আমার নয়। তাই ওর বাবা ডাক শুনলে আমার গাটা ঘিন্ ঘিন্ করে ওঠে। কেউ জানে না। বলতে পারি না—আজ বললাম যখন তখন সবটা বলি শুনুন।

—বল—শুনতে শুনতে বাকী রাতটা কেটে যাক। যাঃ !

—কি হল ?

—আকাশে একটা তারা খসে গেল হে !

তারপরই হঠাৎ বললে—অলকা কোথা হে ?

তারপর আবার বললে—না থাক, তোমার কথা বল। শুনি—তোমার একথা গোপাল, আমার কাছে আজ অমৃতসমান মনে হচ্ছে। শুনলে পুণ্যবান হব বল !

—ডালিমের কথা তো জানেন ? ত্রৈলোক্য মায়ের দলে ওরই টানে ঘর ছেড়ে এসে ঢুকেছিলাম।

—সে-কাহিনী ভুবন বিদিত।

—ডালিম মরে গেল। আমি কিছুদিন ছুটো চরে বেড়িয়ে—গণেশ অপেরায় ম্যানেজার। হঠাৎ কি খেয়াল হল বিয়ে—

বাধা পড়ল।

—বিগ ব্রাদার !

ছাদের দরজায় বাবুল বোস ডাকলে। গোপাল থেমে গেল। হঠাৎ সিড়ির ঘরটার কোণ ঘুরে বাবুল সামনাসামনি দাঁড়াল।

রীতুবাবু ডাকলে—ইয়েস ব্রাদার।

—এখানে? কাউন্টিং স্টারস?

—শুনছিলাম, হঠাৎ একটা খসে যাওয়ায় ক্ষান্ত দিলাম। তারপর গোপালের সঙ্গে গল্প হচ্ছে। ও এসে পড়ল।

—হোয়াট গল্প? চলুক তাই। আমার ঘুম হল না—নাকের ডাকের শব্দে। অনেকক্ষণ থেকে—কিন্তু প্রথম ঘরে মেয়েরা স্লিপিং, দরজা বন্ধ, আসি কি করে? লাস্ট, অলকাকে ডেকে দরজা ওপেন করিয়ে উঠে এলাম। ওটাও ঘুমোয় নি!

—কি ব্যাপার?

—আই থিঙ্ক আজকের ব্যাপার। মেড়েলে বেদনা মরে নি। হয়তো ছেড়ে দেবে।

—মেয়েটার পার্টস আছে হে!

—ছাড়ান দ্যান ওর কথা। বলেন গোপালবাবু কি বলছিলেন!

—অ্যাঁ? গোপাল ভেবে পেলে না কি বলবে। সে কথা—

রীতুবাবু বললে—ধর, কলকাতায় মহাষ্টমী-নবমী ছুটো করে চারটে। দশমী বাদ দিয়ে একাদশী-দ্বাদশী দুদিনে দু রাত্রি। একদিন বোধ হয় দক্ষিণেশ্বরে। না?

—হ্যাঁ।

—তারপর?

গোপাল বাঁচল। সে বললে—তারপরই কলকাতা থেকে মফস্বল। কোজাগরীতে বরাকর বাজারে দু রাত্রি। তারপর আসানসোলে আড্ডা। কালীপুজো পর্যন্ত বাঁধা বায়না নেই। দু-চারটে ধরতে হবে। রাণীগঞ্জ অণ্ডাল কাজোড়া, ওদিকে কুলটী বার্নপুর। কাঁচা পয়সা! দু-চার রাত্রি হবে, বসেও থাকতে হবে দু-চার দিন। তারপর কালীপুজো থেকে নাগাড় দশ দিন। কালীপুজো

থেকে চার দিন তো দুটো করে। শেষ হবে সায়েব কলিয়ারীতে—সেখানে তিন দিন গাওনা। আপনি তো জানেন ওদের। এবার আবার বেশী ধুমধাম, বিলেত থেকে সাহেব আসছে। তাকে যাত্রা শোনাবে।

রীতুবাবু বললে—ওদের দিল খুব বড়। একদিন খাওয়ায়—সে খুব উঁচুদরের খাওয়ানো!

রাস্তায় ঘড় ঘড় শব্দ উঠল।

রীতুবাবু পূব আকাশের দিকে তাকিয়ে বললে—ভোর হয়ে গেল?

ময়লাফেলা গাড়ি চলছে রাস্তায়।

—বাবুলদা!

অলকাও উঠে এসেছে বাবুলের খোঁজে।

—ইয়েস!

—দেখ না একখানা ট্যাক্সি রিক্সা যা হোক।

—ডেস্পারাস। মাই ফাদার! এই ভোরে বেরিয়ে লালবাজার লকআপে যাই!

—কেন?

—পথে পুলিস ক্যাচ করবে—বলবে ইলোপ করে নিয়ে যাচ্ছ! ওয়েট—

—বাবাঃ! জান আমি মরে যাচ্ছি! সারারাত ঘুমুই নি!

—ডোণ্ট বদার। অভ্যেস হয়ে যাবে দুদিন পর।

রীতুবাবু বললে—যোগামাস্টার একটি ভাল কথা বলে—ওর তো সবই কণ্ঠমশায়ের কথা—তবে এটা হতেও পারে। তিনি নাকি বলতেন, তেল মাখবে আবাথাবা, মানে ঘটিতে হাত ডুবিয়ে এখানে খানিকটা ওখানে খানিকটা থপথপ করে লাগিয়ে পরে ঘষে সমান করে নেবে। চিত হয়ে শোবে বাবা, চিত হয়ে শুলে জায়গাটা বেশ বসবে। আর খাল দেখে পাড়বে পাত, মানে মাটি খাল থাকলে

ডাল ধরবে বেশী। তবে খাবে কালদমনের ভাত। কালদমন কালীয়দমন মানে কৃষ্ণযাত্রা। তখন তো সবে শখের যাত্রা হচ্ছে। কালীয়দমন কৃষ্ণযাত্রাই তখন যাত্রা ছিল। এতে অনেক কষ্ট অলকা। কষ্ট কলঙ্ক—অনেক কিছু। এই ভোরবেলা—মেজাজটা রাত্রে আজ আকাশে উড়েছিল। একটা তারা চোখের সামনে খসে গেল। তোমার মুখটা মনে পড়ল। গোপালকে বললাম, অলকা কোথায়? তারপরই ভাবলাম, যাক গে, যে খসবে সে খসবে। বললাম, না, থাক। অন্য কথায় চলে এলাম। তা তুমি এলে, এই ভোরবেলা, সারারাত্রি ঘুমোও নি—মায়া লাগছে। তুমি এ রাস্তা ছাড়।

অলকা বললে—না রীতুবাবু—

—এই, সাটআপ!

—কেন? কি করলাম? অলকা বিস্মিত হয়েই বললে—কিন্তু ক্ষুব্ধ বা ক্ষুণ্ণ হল না, বাবুলকে সে জানে।

বাবুল বললে—মাস্টারমশাই সে—কর। মানে বল।

—তাই। এখনও রপ্ত হয় নি। হয়ে যাবে। তবে ফেরা আর আমার হবে না মস্টারমশাই। এসেছি অনেকটা। অনেকটা—

—দাগা পাবে। এখনও সপ্তপদী হয় নি। সাতপাকে জড়িয়ে যাও নি যাত্রার সঙ্গে।

—কি জানি ক' পা, তবে মা বাপ যে দাগা দিয়েছে, তারপর আর কি বেশী দাগা হবে! তবে ছাড়ব। কিছুদিন পর। এখানে নাম করে দেখিয়ে দিয়ে ছাড়ব।

রীতুবাবু বললে—বহুৎ আচ্ছা। তুমি মেয়েছেলে, নইলে বলতাম এই তো মরদ কি বাত! আজ বড্ড লেগেছে না?

অলকা উত্তর দিল না।

শুধু অলকা নয় সবাই চুপ হয়ে গেল। বাবুল বলে উঠল—হরি হে, রাজা কর। মেক মি এ কিং প্লিজ!

দেখতে দেখতে পুবদিকে আলো ফুটেছে তখন। ট্রাম চলে গেল একখানা। বাবুল বললে—নাও, এইবার ওঠো। ট্রাম বেরিয়েছে। চায়ের দোকানে চা খেতে খেতে ট্রাম আসবে। কাল আসব বিগ ব্রাদার।

দোতলায় সব আসামীই উঠে বসেছে প্রায়। ঘুম ভাল কাল কারুরই হয় নি। মনের মধ্যে একটা উৎকণ্ঠা রয়েছে, আর রয়েছে একটা করে হিসেব। পুজোর কাপড়, তিরিশ—না, তিরিশে কি করে হবে? যুদ্ধের বাজার। কণ্ট্রোলে কাপড় যে মেলে না। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের হাত। তার মর্জি। কেউ কেউ ঘুষ খায়। ব্ল্যাকে কিনতে দাম গলাকাটা। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। কারুর বা বিশ-পঁচিশ। কারুর হাল হদিস নেই, পাল দরুণে বাচ্চা। ছিট কিছুটা এখান থেকে কিনতে হবে। কারুর খাজনা আছে দিতে হবে। দোকানের বাকী আছে। জুড়তে জুড়তে তিন অঙ্কে পৌঁছে যায়। কালো যবনিকার মত সব অন্ধকারে ঢেকে যায়। এ টাকা দাদন চাইবেই বা কি করে? মাইনে তিরিশ-চল্লিশ; পঞ্চাশ সাত-আট জনের। শ-দুশো মাত্র ক'জনের। তাদের ভাবনা নেই। এরা ভাবছে। ভাবনায় ভাল ঘুম হয় নি, ভোরে উঠে থেকে ভাম হয়ে বসে ভাবছে সামনে একটা কালো পর্দা ঝুলছে। যোগামাস্টার গুনগুন করে গান গাইছে। কণ্ঠমশায়ের গান—

আমার ঘরে আছে দুই সতীনে—ঝগড়া করে রাত্রি দিনে—
বাড়ির দোরে দুই সতীনে—দান করে তাই আপন গুণে দুই
সতীনে ডুবুক জলে।

কণ্ঠমশায়ের বাড়ির দোরে খিড়কী পুকুর দুই সতীনে আজও আছে। ওই পুকুরে বন্যা ঢুকত। সেই বন্যায় কোন্ কালে কোন্ দুই সতীন ঝগড়া করে দুজনেই ডুবেছিল—তাই নাম ছিল দুই সতীনের পুকুর। পুকুর ছিল জমিদারের। জমিদার বাড়ি গাওনা করতে গিয়েছিলেন, জমিদার খুশী হয়ে বলেছিলেন, কণ্ঠমশায়, আপনার যা

ইচ্ছে হয় আমার কাছে চেয়ে নিন। আমি ধন্য হই। অবশ্য আমার সাধ্যের মধ্যে হওয়া চাই। কণ্ঠমশাই চেয়েছিলেন ওই পুকুরটি। তাঁরও ছিল দুই বিবাহ। দুই সতীন ছিল ঘরে। যোগামাস্টারের দুই বিয়ে—ঘরে দুই সতীন। আজ দাদনের জন্য ধরতে হবে, তাই ওই গান মনে পড়েছে। ভাঁজছে।

বাবুল মেঝে পার হয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে বললে—ম্যাটারটা কি? গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যান, হ্যাঁ—মর্নিংএ উঠেই দুই পরিবারকে স্মরণ? রোজ কর না কি?

—বাবুলবাবু! এই যে অলকা মা গো! আঃ, কাল কি নৃত্যটাই করলে! বাহবা বাহবা! আর কি সেজেছিলে! মুনিজনের মন ভোলে গো!

অলকা লজ্জিত হল। রাগও হয়েছিল, কিন্তু মা বলায় সে রাগের সুযোগ হল না।

—বাড়ি চললেন?

—হ্যাঁ। এস অলকা।

—আসছেন তো দশটার সময়?

—কেন?

—অ। আপনারা বুঝি দাদন, মানে অগ্রিম নেবেন না? আজ দশটাতে দেবেন তো। কাল অডার হয়ে গিয়েছে। তা আপনি এলে আমার সুবিধে হত। আমার জন্যে বলে দিতেন। ঘরে দুই পরিজন, দুজনের আটটা বিটি—তার চারটে মরেছে, চারটে মজুত। একটা বিধবা, ঘাড়ে ফিরে এসেছে। একটা সধবা, তার তত্ত্ব আছে। দুটো আখণ্ড যুবতী এখনও সোঁদা। আবার শখ কত—বলে, বাবা, মানে-না-মানা শাড়ি এনো। একটুকুন বলে-টলে দিতেন। রীতুমাস্টার চটে আছেন। আমি রতনপুরে বাবুদের কাছে টাকা নিয়েছিলাম বলে।

—এলে, শ্যাল টেল ওল্ড ব্যাণ্ডমাস্টার! এস।

সিঁড়িতে পিছন থেকে অলকা বললে—তুমি আসবে না?

—নো। আমি দাদনে নেই।

—তোমার ব্যাঙ্কে টাকা আছে। তোমার ভাবনা নেই। আমাকে আসতে হবে।

—মানে? অলরেডি টু হাণ্ড্রেড দিয়েছে। আবার আস্ক করবে কি বলে?

—আমি আস্ক করব না। তুমি করবে আমার হয়ে।

—মাই খোদা! সে আই ওণ্ট।

—তা হলে তুমি সেই একশো টাকা দাও। পুজোর সময় আমার না হলেই চলবে না।

হঠাৎ কণ্ঠস্বর গাঢ় করে অলকা বললে—আমার যন্ত্রণা তুমি জান না বাবুলদা। আমি চলে আসার পর সব বেচা হয়ে গেছে, মা-বাবা উপোস করছে। বাবা বোধ হয় দু-এক মাসের মধ্যেই যাবে। দু-একদিনও হতে পারে। কিছু টাকা দিতেই হবে। তুমি ভাইদের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিঁড়েছ। তারা অভাবীও নয় খুব। এ বাপ মা। আর আমি হাজার হলেও মেয়ে।

প্রগল্‌ভ বাবুল বোস চুপ হয়ে গেল। নীচে নেমে বললে—চল দোকানটায় চা খেয়ে নি।

চা খেতে বসে অলকা বললে—তা হলে তুমি দেবে?

—উঁহু। শ্যাল কাম। কি করব? পরশু তো থিয়েটারে ফর্টি পেয়েছ!

—আমার দরকার দু শোর।

—দু শো! নো বডি উইল ম্যারি ইউ!

হেসে অলকা বললে—তুমি তো এভরিবডি নও! দেখো!

—আমি তাদের বলে দেব।

—তবুও তারা বিয়ে করবে।

—মরুক তারা। উইল গো টু হেল! নাও নাও, খেয়ে নাও। ট্রামের শব্দ উঠছে।

আজ জুতো ঠিক আছে তো? এস।

ট্রামে উঠে বাবুল ঘুমিয়ে পড়ল। অলকা ঠিক ঘুমোল না। ঢুলুনির মধ্যে ভাবছিল নিজের কথা। মনের মধ্যে কাল রাত্রি থেকে একটা ক্ষোভ জমে আছে। তার পার্ট বাদ দিয়ে সারা দলের কাছে তাকে ছোট করে দিয়েছে। গন্ধর্বকন্যার হিরোইনের পার্ট কেড়ে নিলে। সে বলতে পারে নি কিছু। সে পারে নি—তা বুঝেছিল। সখীর পার্টটা পেয়ে সে খুশীই হয়েছিল। এই ধরণের পার্টই তার প্রিয়। গোরাবাবু কথাগুলি দিয়েছিলেন চমৎকার। করেছিলও সে ভাল। লোকে হেসেছিল। সে হাসি বাবুলের ওই ভালগার ভাঁড়ামি শুনে হাসি নয়। সত্যিকারের রসিকতা শুনে হাসি। চিরকুমার সভার মত। মঞ্জরী দাঁড়াতে পারছিল না, অসুবিধে হচ্ছিল। সেটা তার অক্ষমতা, তার নয়। সে হিরোইন—সে প্রোপ্রাট্রেস, সুতরাং দাও তার পার্টটা কেটে উড়িয়ে। এসপ্লানেডে এসে বাবুলকে ডেকে তুললে সে—ওঠো। এসপ্লানেড।

টালিগঞ্জের ট্রাম দাঁড়িয়েছিল, উঠে বসে অলকা বললে—তুমি যদি—

—যদি হোয়াট? থামলে কেন?

—বেনা বনে মুক্তো ছড়িয়ে হবেটা কি?

—মুক্তোর গাছ হবে। বলে ফেল।

—তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতে, তবে—

—মাই ভগবান!

—সবটা শোন না। তা হলে দুজনে একটা যাত্রার দল খুলতাম।

—স্কাই ফ্লাওয়ার! তার থেকে দশটার সময় কাম। নিয়ে আসব। অ্যাণ্ড গোরাবাবুকে বলে অ্যানাদার টু হাণ্ড্রেডই করে দেব অ্যাডভান্স। আমার ব্যাঙ্কের ওই কটা টাকার দিকে তাকিয়ো না!

—বেশ। কিন্তু যাত্রার দল আমি একদিন করবই তুমি দেখ।

—দেন ক্যাচ রীতুবাবু।

—ভাগ্‌!

—দেন সাট-আপ।

ট্রামটা তখন জগুবাজারে এসেছে, একদল লোক উঠছে।

দশটার সময় এসে অলকা অবাক হয়ে গেল। তার থেকেও বেশী অবাক হল বাবুল বোস। দাদনের আসরে লোক নেই, বারান্দাটা প্রায় ফাঁকা, শুধু গোরাবাবু বসে আছে। আর তার সামনে বসে আছে একজন পাগড়ী-বাঁধা লোক।

গোরাবাবু বললে—আরে এই যে! তোমার ওখানে গাড়ি নিয়ে শিউনন্দনকে পাঠাচ্ছিলাম।

—মি? বুকে হাত দিয়ে বললে বাবুল।

—নো। অলকা। ইনি বসে আছেন। কাল রাত্রে উনি আমাদের প্লে দেখেছেন, নারকেলডাঙার ওদের কারখানার সাপ্লায়ারও বটেন—মালও কেনেন। সিনেমায় নামবেন। পৌরাণিক বই। অলকার নাচ ভাল লেগেছে। নাচ দেবেন খান দুয়েক। অলকার সঙ্গে কন্‌ট্রাক্ট করবেন। কাল রাত্রে আমাকে আমার জন্যে বলছিলেন। আজ সকালে এসে বলছেন অলকাকেও নেবেন। কি বল? উনি কন্‌ট্রাক্ট সই করিয়ে যাবেন। আমি বলেছি দুখানা নাচে পাঁচশো টাকা। উনি বলছেন—দুশো।

বাবুল বললে—রাবিশ!

অলকার চোখ জ্বলজ্বল করছিল, সে বললে—সাড়ে তিন-শো দেবেন। উনি বলেছেন পাঁচশো, আপনি দুশো—সাতশোর অর্ধেক সাড়ে তিন-শো। দেবেন?

—লিন, সহি করেন। এখুন এক-শো দিব। বাকী কাম খতমকে বাদ।

—না। মধ্যে আর এক-শো দেবেন। গোরাবাবু বললে।

—সহি।

—আর আমাদের ডেট—রাসের পর, বড় দিনের আগে নয় বড় দিনের পর সরস্বতী পুজোর আগে। কেমন ?

—হাঁ, উ ঠিক আছে।

সই করিয়ে লোকটি টাকা দিয়ে চলে গেল। গোরাবাবুর সই হয়ে গেছে, টেবিলের উপর আড়াই-শো টাকা পাথর চাপা রয়েছে। ওর কন্‌ট্রাক্ট হাজার টাকার।

মঞ্জরী এবার বেরিয়ে এসে বললে—এবার খুশী অলকা। কাল তুমি রেগেছিলে।

লজ্জিত হল অলকা, বললে—না রাগি নি তো! তবে দুঃখ হয়েছিল।

—হবার কথা। সে বুঝি। কিন্তু বইটার দিকে তাকাতে হবে তো!

অলকা চুপ করে রইল।

বাবুল বললে—ও এসেছিল অ্যাডভান্সের জন্যে।

গোরাবাবু বললে—এই তো হয়ে গেল।

—আমার বাবার অসুখ। বড্ড অসুখ। ভেবেছিলাম ওদের কথা আর কখনও ভাবব না। কিন্তু—

—কত চাই বল।

—আগে দুশো দিয়েছেন, এখন আরও দুশো চাচ্ছি।

বাবুলের চোখ বড় হয়ে উঠল। কিন্তু সে মুখে কিছু বললে না। মেয়েটার অবলীলাক্রমে চাওয়াটাকে আশ্চর্য মনে হল তার। কিন্তু কোন সঙ্কোচ হল না অলকার। এবং ঠিক যেন অশোভন মনে হচ্ছে না—সম্ভবতঃ এই সিনেমা কন্‌ট্রাক্টটা তার একটা কারণ।

মঞ্জরীই বললে—বেশ, বেশ। তা নিয়ে যাও। আপিসে যেতে হবে না, এখান থেকেই দিচ্ছি আমি। রসিদ একটা আর খাতায় সই পরে করে দিয়ো। জান, ভারী ভাল লাগল তোমার কথা। কি কথা

জান? তোমার বাবার অসুখ—সংসার থেকে বেরিয়ে এসেও আজ না দিয়ে থাকতে পারছ না। ভারী ভাল লাগল।

গোরাবাবু সামনের দিকে তাকিয়েছিল। বললে—আমাকে কিছু অ্যাডভান্স দাওনা প্রোপ্রাইট্রেস! আমি মঞ্জরীর জন্যে শাড়ি কিনব।

—আমিও ম্যানেজারের কাছে চাইব, আমাকে দেওয়া হোক—। যত সব! এস অলকা, ভেতরে এস।

গোরাবাবু বললে—সামথিং হবে নাকি দিলদার?

—এই দেখুন! নো অফার তো নো ওয়াণ্ট। অফার তো এভার রেডি। তখন সামথিং মেনিথিং হয়ে যায়।

—শিউনা!

শিউনন্দন হাজির। তবে সে পাকা লোক। মাপ তার কষা। এবং সোডা ব্যবহার করতে সে ভোলে না। হাজির করে দিল সে দুটো গ্লাস।

মঞ্জরী এবং অলকা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মঞ্জরী বললে—তোমার এই তেষ্টা বড় বেড়ে যাচ্ছে।

—অনন্ত তৃষ্ণা গো!

—জলের তৃষ্ণা মেটে। মরীচিকার তৃষ্ণা যে!

—হ্যাঁ, তৃষ্ণা ছোটে—মরীচিকা পিছোয়। তৃষ্ণা থামে—মরীচিকা থামে। তৃষ্ণা পিছোয়—মরীচিকা এগিয়ে আসে। ডাকে।

অলকা বললে—সুন্দর কথাগুলি।

—রাবিশ! হি ইজ অ্যান অথার।

মঞ্জরী বললে—অথার এখন জোরালো করে একখানা বিজ্ঞাপন লিখুন তো! মঞ্জরী অপেরার। বাবুল ঘোষ—সিনেমা আর্টিস্ট, অলকা চৌধুরী—সিনেমা আর্টিস্ট।

—উঁহু, অলকা নয়—অলি চৌধুরী। লিখব, নিশ্চয়। লিখতে হবে।

—আমরা উঠলাম জাঁহাপনা।

—ডুব মেরো না, এস। বুঝেছ ?

—মরীচিকার টানে আসব। আচ্ছা, হরিণেরা দল বেঁধে মরীচিকার পেছনে ছোটে কিনা বলতে পারেন মাই লর্ড ?

—নিশ্চয়। হরিণীর পিছনে ছুটলে গুঁতোগুঁতি করে। এতে বেরাদারি বেড়ে যায়।

—রাইট রাইট রাইট। উঠি। হ্যাঁ, একটা কথা।

—সেটা কি ? তোমার তো দরকার নেই টাকার !

—বাবুলদা তো মহাজনি করে।

—ডেঞ্জারাস ! ও সব ডোনট্ সে। মানি লেণ্ডার্স অ্যাক্টে ধরবে।

অদ্ভুত কথা বলার ভঙ্গি বাবুলের, এক নিশ্বাসে ওরই সঙ্গে লাগিয়ে বললে—আমি ওই জটেবুড়ো যোগামাস্টারের কথা বলছিলাম। দুটো বড় পাঁচটা মেয়ে। রাস্কেল বলে বিটি !

—রাঢ় যে। তাই বলে রেঢ়ো রা। আমিও রেঢ়ো। তা সে দেড়শো নিয়েছে। কণ্ঠমশায়ের গান শুনিয়ে, ওই পঞ্চকন্যার দোহাই দিয়ে—ঠিক আদায় করেছে।

—ও কে। চলি।

—আমিও যাই। অলকা বললে।

—এস।

মঞ্জরী বললে—দেখো, পার্ট যেন শিকেয় তুলো না। সতীতুলসীর শ্রীকৃষ্ণের পার্ট ভাল পার্ট, বড় পার্ট। পুজো পর্যন্ত রিহারশ্যাল নেই। পুজোতেই সতীতুলসী হবে।

গোরাবাবু বললে—ও ঠিক করবে। আমি বলে রাখলাম দেখো। কিছু ভেবো না প্রোপ্রাইট্রেস, এবার মঞ্জরী অপেরার বিজয় অভিযান। গন্ধর্বকন্যা, সতীতুলসী, জনা। বিজয় চক্রবর্তী প্রণীত অনুপম নাট্য নিবেদন। নাট্য-সম্রাজ্ঞী মঞ্জরী দেবী। বিখ্যাত

চিত্রাভিনেত্রী— ওরফে ছোট বুঁচি, সিনেমাস্টার লাবণ্যবতী অলি চৌধুরী।

বাবুল বললে—নটচূড়ামণি, উঁহু চূড়ামণি কেমন ভটচায্যি ভটচায্যি ঠেকছে।

মঞ্জরী বললে—ওঁর টাইটেল আছে নটসুধাকর।

—ওয়াণ্ডারফুল।

গোরাবাবু বললে—সিনেমা অভিনেতা বাবুল ঘোষ। তোমার টাইটেল দেব—নটরসরাজ!

—বিগ ব্রাদার।

—উনি শুধু রীতুবাবু। যাত্রাজগতে ভীষ্ম। টাইটেল উনি নেন না।

মঞ্জরীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। মঞ্জরী অপেরার বিজয় অভিযান যেন তার চোখের উপর ভাসছে।

প্রথম পর্ব সমাপ্ত

দ্বিতীয় পর্ব

এক

সত্যই বিজয় অভিযান শুরু হল মঞ্জরী অপেরার।

পুজোয় মহাষ্টমী মহানবমীতে শুরু করে লক্ষ্মী পুজোয় বরাকর তারপর কয়েকদিন আসানসোল এবং তার আশপাশ। এর মধ্যে বিরতি ছিল। কিন্তু কালীপুজোর দিন থেকে নাগাড় দশ দিনের সাত দিন রাত্রে দুটো করে গাওনা গেয়ে শেষে এসে উপস্থিত হল বরাকরের কাছে সাহেবদের প্রকাণ্ড কলিয়ারীতে। সেখানে পর পর দু রাত্রি অভিনয়। এখানে অভিনয় শুরু সাড়ে আটটায়, ভাঙতে সাড়ে বারোটা। এবং আতিথ্য প্রচুর। কালীপুজোর পালার জের থেমে গেছে। সুতরাং এক একটা অভিনয় রাত্রে। এদের এখানেই দলের প্রথম বছর থেকে কালীপুজোয় গাওনা হয়ে আসছে। ঠিক কালীপুজোর রাত্রি থেকে তিন দিন গাওনা হয়। এবার পিছিয়ে দিয়েছে এরা সায়েবদের জন্যে। বিলেত থেকে সায়েব এসেছে, তার ইনস্পেকসন শেষ হবে যেদিন থেকে, সেদিন থেকেই যাত্রা শুরু। তার আগে ওদের নিজেদের থিয়েটার হয়ে যাবে। সায়েবরা ব্যাটা-ছেলের মেয়ের পার্ট দেখবে না, বা তারা খুশী হবে না ভেবে নিজেরাই থিয়েটার না দেখিয়ে মেয়েযাত্রা যখন আসছে তাই দেখাবে।

মঞ্জরী অপেরার সত্যই বিজয় অভিযান বলতে হবে। সর্বত্রই খুব সুনাম হয়েছে। যোগামাস্টার বলছে—হুঁ হুঁ, টবু তো ট্যাল মাখি নাই। অর্থাৎ তবু তো তেল মাখি নি। ওদের গ্রামে এক হাবা ছিল, তার নিজের রূপ অর্থাৎ চেহারা সম্পর্কে বাতিক ছিল, তাই কেউ যদি তাকে বলত, তাই তো রে, তোকে তো বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। নাঃ, তুই সত্যিই দেখতে ভারী সুন্দর! সে অমনি আকর্ণ বিস্তার হেসে বলত, হুঁ-হুঁ, তবু তেল মাখি নি। তার কারণ হল, বরাকরে লক্ষ্মীপুজোয় চারটে গাওনার পর থেকে এ পর্যন্ত অলকা নেই। সে

নামতে পারে নি। তার বাবা হার্টফেল করে মারা গেছেন। টেলিগ্রাম পেয়ে সে চলে গেছে। উপায় নেই, যেতে দিতে হয়েছে। তাতে ক্ষতি অবশ্য হয়েছে। বরাকরে লক্ষ্মীপুজোর পরই আসানসোলে একরাত্রি বায়না যোগাড় করে এনেছিল বিধু নন্দী।

নন্দী আগে যাত্রাদলে ফিমেল পার্ট করত। গলাটা মেয়েলি, এখন বয়স হয়েছে, তাই পার্ট করে না, তবে অভাব পড়লে করে দেয়, নইলে ওই দলের বায়না যোগাড় করে ঘোরে। চেহারায় সুপুরুষ ছিল—এখনও চটক আছে। পাতা কেটে টেরী, কথাবার্তা বড় ভাল বলে। ও কোথাও বাঁধা থাকে না। তার কারণ ছুটো, একটা হল সব পুরুষের দল হলে, তার ফিমেল পার্টের ছোকরাদের সঙ্গে ঝগড়া হয়, মেয়ে যাত্রা হলে মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া করবেই; সে ঝগড়া পার্ট নিয়ে। ফিমেল পার্টের নিষ্ঠুর সমালোচক। কথায় কথায় নিজে পার্ট করে দেখাতে যায়। এরা হাসে। ও বলে, ওরে, সে কালের লোককে জিজ্ঞাসা করিস, তারা বলবে, তারা আজও বিধু নন্দীকে ভুলতে পারে নি। বিধুর তখন নামই ছিল বিধুবদনী। দলের লোকে বলত 'বিধে'।

পুরুষেরা বিধুকে পছন্দ করে না, ওর মেয়েলি ঢঙের জন্য। বিশেষ মেয়ে যাত্রায় পুরুষেরা। আর একটা দোষের কথা সেটা হল, ওর নিজের একটা ছোট স্যুটকেস আছে, আর একটা বালিশ সতরঞ্চির বিছানা, ছুখানা কাপড়, একটা জামা। বায়না যোগাড়ে বেরুবার সময় কিন্তু ফিটফাট সাজতে হয়, সাজেও বিধু, তা সাজে যার যা ভাল আছে তাই টেনে নিয়ে চলে যায়। সে ছড়ি পর্যন্ত। এর পাঞ্জাবি, ওর ধুতি, তার জুতো। তা বড় হলেও বিধু সামলে নেয়। পাঞ্জাবির হাত গুটিয়ে খাটিয়ে নেয়, গলা বড় থাকলে চাদরে ঢাকে, জুতো বড় হলে ন্যাকড়া গুঁজে নেয়, কষা হলেও নেয়, ফোস্কা পড়ে খুঁড়িয়ে চলে, তবু অম্লান বদন। ফিরলে নির্মম লাঞ্ছনার তরবারির আঘাত পড়ে, ঝাঁকে ঝাঁকে বাক্যবাণ বর্ষিত হয়, কিন্তু জীবনে সহ্যগুণ ওর সহজাত

কবচকুণ্ডলের মত। তাতে ও আহত হয় না। তবে দলের কাছে ওর খাতির আছে, না থেকে উপায় নেই। কারণ কথা বলে বায়না যোগাড় করতে সিদ্ধ ব্যক্তি।

আসানসোলে বাজারে ছু রাত্রি এবং তারপর কাছাকাছি গ্রামে জমিদার বাড়িতে ছু রাত্রি, অণ্ডাল স্টেশনে এক রাত্রি, রাণীগঞ্জে ছু রাত্রি বায়না সে এনেছিল। কোজাগরীর গাওনার পর কালীপুজোর রাত্রি পর্যন্ত মধ্যে বারো দিনের মধ্যে পাঁচ রাত্রি বায়না। প্রত্যাশা ছিল পাশাপাশি কলিয়ারী কি বাজার কি বড়লোকের বাড়িতে আরও ছু তিন রাত্রি পাবে গাওনার পর ; ভাল গাইলে নাম হলে এ হয়। এ পাড়ায় হলে ও পাড়ায় বায়না করে। এ গ্রামে দেখে ওগ্রামে নিয়ে যায়। চাঁদা তুলে করে সব। তাও হয়েছিল আরও ছু রাত্রি। বারো রাত্রির মধ্যে আট রাত্রি গাওনা। দলের এটা গৌরবও বটে, লাভও বটে। তবে দক্ষিণে কিছু কম হয়ে যায়। তাও আড়াইশোর জায়গায় ছুশোর কমে নামে নি। ছু রাত্রি বায়না ছেড়ে দিয়েছে।

তার কারণ অলকা। তারা ধরেছিল—অলকাকে আনতে হবে।

গোরাবাবু বলেছিল—কি করে আনব। তার বাবা মারা গেছে, সে চলে গেছে।

তারা ঝগড়া করেছিল, তবে বিজ্ঞাপনে বড় বড় অক্ষরে দিয়েছেন কেন ?

—সে আমার দলে আছে, বরাকরে নেমেছে, অশৌচ গেলে আবার এসে নামবে। বিজ্ঞাপন আগের ছাপা। সুতরাং এ আপনাদের অন্যায় দাবী।

—তবে টাকা কম করুন। দেড়শো।

—আমরা গাইব না, মাফ করবেন, দরকার নেই আপনাদের। দয়া করে আসুন।

এ এক জমিদার বাড়ির ছেলে। তিন পুরুষে জমিদার। কয়লার রয়ালটি পায়। মোটর হাঁকিয়ে এসেছিল। সে ড্যাম ইট বলে

মোটর হাঁকিয়ে চলে গিয়েছিল। যোগামাস্টার বলেছিল, মরি মরি রে। সেই নটবর যাত্রাওয়ালা বলত, কে চড়ে যায় হাতি? না, হাম হ্যায় বড়লোকে নাতি, হাত ডিগ্ ডিগ্ পা ডিগ্ ডিগ্ পালোয়ানি ছাতি! তাই।

আরও দু-চার জায়গায় অসুবিধে হয়েছিল ওই অলকাকে নিয়ে। কিন্তু তারা বুঝেছিল। এবং অভিনয়ও খারাপ হয় নি। অন্তত যারা অলকার নাচ দেখে নি, তাদের হয় নি। সতীতুলসীতে অলকা যা পার্ট করেছিল তা বেশ ভালই, কিন্তু বুঁচি তার থেকে ভাল করেছিল বচনের দিক দিয়ে। কিন্তু ওর দেহের জন্যে ওকে কৃষ্ণ ঠিক মানায় নি। তা ছাড়া অলকার মত উচ্ছল হতে পারে নি। গোপালী করেছিল সখীর পার্ট। আজ জনা একদিন হয়েছিল, তাতে মোহিনীমায়া করেছিল গোপালী। এতেও অলকার নামবার কথা, কিন্তু আজ পর্যন্ত নামবার সুযোগ হয় নি। কারণ জনা ওদের পুরনো বই এবং লোকের কাছেও থিয়েটারের দৌলতে পুরনো, সেই জন্যে তিন রাত্রি নাগাড় প্লে না থাকলে জনা হয় না। এ পর্যন্ত তিন রাত্রি বায়না এক জায়গায় ছিল। আর আছে এই সায়েব কলিয়ারীতে। কলিয়ারীর বড়বাবু প্রবীণ মানুষ, এখানে চাকরী করছেন প্রায় তিরিশ বছর, ম্যানেজার সায়েব, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার বাঙালী ছোকরা, সব তাঁর হাতের মুঠোয়। একসময় নিজে থিয়েটার করতেন। বড় বড় পার্ট করেছেন। কলকাতা যেতেন থিয়েটার দেখতে। পুজো কমিটির প্রেসিডেণ্ট, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার নামে, তিনিই সর্বেসর্বা; উৎসব কমিটির প্রেসিডেণ্ট তিনি। তিনি বরাকরে এদের প্লে দেখে গেছেন। অলকার নাচ দেখে খুশী হয়েছিলেন। মঞ্জরীর অভিনয় খুব পছন্দ। চার বছরই ওকে মেডেল দিয়ে আসছেন। মা বলেন। দল কলিয়ারীতে আসতেই বললেন—সব ঠিক আছে তো? শুনেছিলাম সেই সিনেমা-স্টারটির বাবা মারা গেছে, সে ফেরে নি?

গোরাবাবু এ সম্পর্কে ব্যবস্থা করেছিল—অলকাকে আগেই

পত্র তো লিখেই ছিল, তার উপরেও দুদিন আগে তার করেছে, সে যেন বরাকর স্টেশনে ঠিক এসে পৌঁছয়। গোরাবাবু বললে সে আজ এসে পৌঁছবে।

—ঠিক তো! কি বলে এ সায়েব ব্যাটাদের ভাঁড়ে মা ভবানী। একে বলে বিলিতী মালকাটা। আমাদের এখানে জাঁদরেল। ওরা আর কিছু বোঝে না। বোঝে লড়াই আর নাচ। কি বলে, নাচটা ভাল চাই।

—না না, সে আসবে।

—বাস্ বাস্, তা হলেই একে বলে হল। নইলে আপনি আছেন, কি বলে মঞ্জরী মা আছে—প্লে আপনারা ভাল করেন। জমবেই। কবে কি করবে?

সেটা ঠিকই ছিল। প্রথম দিন গন্ধর্বকন্যা, দ্বিতীয় দিন সতী-

—ঠিক আছে। কি বলে, জনা দাও শেষ দিন। সতীতুলসী গতবারে দেখেছি। জনা বইটা, কি বলে যেমন লেখা, তেমনি কি বলে, বিষয়। আর একে বলে জনার পার্টটি উনি যেমন করেন তেমনি আপনার প্রবীর! বেশ হবে, কাঁতুক সব শেষ দিন। জায়গা টায়গা, একে বলে, আপনাদের তো সব দেখা। জানা। তবু দেখুন বাবা, কোন অসুবিধে আছে কি না! তা, সে মেয়েটি ঠিক আসবে তো?

—নিরেনব্বই ভাগ ঠিক। আমাদের লোক চলে গেছে স্টেশনে।

—কি বলে, মেয়েটি নাচে ভাল। বেশ নাচে। সে দিন, কি বলে, বরাকরে আমি ওকেও বলেছিলাম, একে বলে, আমাদের ওখানে আরও ভাল নাচতে হবে। কি বলে, ভদ্দর লোকের মেয়ে—না?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা আচ্ছা। একে বলে, কোন অসুবিধে হলেই আমাকে খবর দেবেন।

—দেব।

কলিয়ারীর এক প্রান্তে লম্বা ব্যারাকের মত একখানা লম্বা বাড়ি। দুপাশে বারান্দা। কলিয়ারীতে কোম্পানীর দেওয়া উই পি ইস্কুল। মস্ত কলিয়ারী, স্টাফ অনেক; ছেলেও প্রায় সত্তর আশীজন। স্কুলে পাশাপাশি খানছয়েক ঘর। কেবল একপাশের আপিস রুমটা বাদ রেখে পাঁচখানাই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। চারখানা বড় বড় ঘর—তা বিশ বত্রিশ হবে। একখানা ছোট একপালা; ওপালার ছোট আপিস রুমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরী; ওটাতে মাস্টাররা বসে—তাদের রেস্টরুম। ওই ঘরটায় দুখানা তক্তাপোশ দিয়ে মঞ্জরী এবং গোরাবাবুর জায়গা হয়েছে। পাশের ঘরটা মেয়েদের। তার পরেরটায় রীতুবাবু, বাবুল, নাটুবাবু, রমণী নাগ, আরও দু-চারজনও হত, কিন্তু জায়গা থাকায় ওঘরে কেউ ঢোকে নি। পরের দুটো বড় ঘরে তারা ভিড় করে ঢুকে আপন আপন জায়গা দখল করে বসল। এই কয়েক দিন, কয়েক দিন কেন, আসানসোল থেকেই এ পর্যন্ত সব গাদাগাদি করে থাকা তাদের। এমন খোলামেলা জায়গা মেলে নি। হৈ হৈ করে সব বিছানা পাড়ছে আপন আপন। যাত্রাদলের নিয়ম যে আগে এসে যে জায়গা দখল করে বাঁশগাড়ি করার মত একটা কিছু করবে, সেটা তারই। বিপিন এ ঘরের একটা ধার গোপাল ম্যানেজারের জন্য দখল করে রেখে গেছে। পাশে নিতু। গোপালের থাকবার কথা রীতুবাবুদের ঘরে, কিন্তু নিতুকে ফেলে সে যাবে না।

বেয়ালাদার তার পাশে। সে গাল দিচ্ছিল গোপালকে। বুড়ো ভূত, তার সঙ্গে আরও অশ্লীল কথা ওই নিতুকে জড়িয়ে। বিপিন চুপ করেই আছে। কথা বলতে নেই, বলা নিয়ম নয়। এ কথা যাত্রাদলে বিশ পঁচিশ বছর থেকে জেনেছে বুঝেছে। দলের লোকেরা গাওনায় মফস্বলে বের হলেই মিলিটারি ঘোড়া।

রীতুবাবু বললে—ওরে বাবা, যুদ্ধের ঘোড়া বীয়ার খেয়ে মেতে না থাকলে লড়াই করতে পারে? যাত্রাদলের আসামী তাই। বুঝলি? রাত্রে গাওনা, সারারাত্রি জাগ, থাকতে হবে কোথাও

গোয়ালে, কোথাও খোঁয়াড়ে, কোথাও সামিয়ানার তলায়। তারপর সকালেই চলো মুসাফের—পাঁচ মাইল দূরে গাওনা, যান নেই বাহন নেই, মাঠ ভেঙে হাঁটো। খানকয়েক গরুর গাড়িতে মাল আর যুদ্ধের জখমীর বাচ্চা মেয়ে আর জাঁদরেল-টাঁদরেল দু-একজন। পথে ঘাট পেলে তো যার চিড়ে আছে মুড়ি আছে সে খেলে—না আছে তো উপোস। খাওয়ার মধ্যে বিড়ি চরস গাঁজা মদ। মেজাজ দেখলে খেপিস নি। ওর মেজাজ তুই সইলে তোর মেজাজ আমি সইব।

তার উপর গোপাল ম্যানেজার, ওর সঙ্গে দলের লোকের খুঁটিনাটি ঝগড়াঝাঁটি লেগেই আছে। বিড়ি কারুর আটটা, কারুর দশটা, কারুর ষোলটা, কারুর এক বাণ্ডিল পাওনা—কিন্তু সবারই নালিশ তাই নিয়ে। কারুর একটা ভাঙা, কারুর দুটো। কারুর একটা কম।

গোপাল বলে—বিড়ি ভাঙে। তা আমি কোত্থেকে দেব। আমি গাঁট থেকে দেব ?

—তা বলে ভাঙা নেব কেন ?

—তোর পকেটে যদি ভাঙত ?

—সে আমার ভাঙত। তোমার পকেটে ভাঙলে আমি দেব কেন ?

দলের যারা সিগারেট পায়, বাক্স দরুণে তাদের গোলমাল হয় না। তারা বড় অ্যাক্‌টর। এবং বাক্সে বড় ভাঙাচোরা থাকে না। দু-এক বাক্সে দাগ ধরা সিগারেট বের হয়, সে ক্ষেত্রে রীতুবাবু বাবুল হলে কথা হয় না। বদলে দেয় গোপাল। যদি বলে, কি করব মাস্টারমশাই, এখানে সব এই পুরানো স্টক। তা হলে রীতুবাবু বলে, রেখে দাও লিটল ব্রাদার—কারণ একটু কড়া করো, জল কম দিয়ো, ও দাগী সিগারেট দু টানে গোড়ায় এসে যাবে।

দলে লোকেদের সঙ্গে আর একটা ব্যাপার নিয়ে লেগেই আছে গোপালের—সেটা খোরাকীর ব্যাপার। যাত্রার লোকেরা মাইনের ওপর বাইরে বেরিয়ে খোরাকী পায়। ছ আনা থেকে এক টাকা

পর্যন্ত। অনেক আগে চার পয়সা থেকে শুরু হত। এই যুদ্ধের আগের কোন দলে তিন আনা, কারুর দশ পয়সা, যে দলের বেশী তার চোদ্দ পয়সা ছিল, এটা এখন ছ আনা। উপরে আট আনা থেকে এক টাকা উঠেছে। মঞ্জরী অপেরা সাত আনা থেকে পাঁচসিকে করেছে এবার। গোপাল মাইনে বাড়ায় খুঁতখুঁত করে নি, খোরাকীতে আপত্তি করেছিল। কিন্তু গোরাবাবু মঞ্জরী শোনে নি। এখন গোলমাল বেধেছে তাই নিয়ে—তিন জায়গায় এক রাত্রি করে তিন রাত্রি নিমন্ত্রণ ছিল, গোপাল সেটা আটকেছে। সে বলছে, খোরাকী খাবার জন্যে, বাঁধবার জন্যে নয়। খাবার যখন পাচ্ছে তখন খোরাকী কিসের? দলের লোকে বলেছে, বাঃ রে, তুমি খাওয়াচ্ছ? গোপাল বলছে, সে তো দলের জন্যেই পাচ্ছ, না বাইরের ভদ্রলোক হিসেবে পাচ্ছ, না নায়কদের নানাতুতো ফুফু বলে পাচ্ছ? মামার বাড়ির আবদার!

যুক্তি গোপালের যত না-থাক সে জেদ ধরেছে—এ করলে দল থাকবে না। দেউলে হবে। তা হলে আমি থাকব না। তার কঠিন জেদ। সুতরাং বেয়ালাদারের গালাগালি কড়াই হয়ে গেল যতটা হওয়া উচিত ছিল তার থেকে। নিতু ছেলেটা ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রইল তার দিকে। যাত্রাদলের ছেলে, দশ বছরেই বেশ পরিপক্ক হয়েছে। গোপাল গেছে রান্নার বন্দোবস্ত করতে। ঠাকুর আর একজন চাকর নিয়ে একদিকের বারান্দার কোণে ঘেরা জায়গায় জিনিসপত্র নামাচ্ছে। মাছ কাঠ এ নায়ক পক্ষেরা দিয়ে থাকেন। সে এঁরা বেশ ভালই পাঠিয়েছেন। কলিয়ারীর মধ্যেই মুদীর দোকান, ছোট একটা বাজারও বসে। সেখানে চলে গেছে সিধু নন্দী ফর্দ টাকা নিয়ে।

শিউনন্দন মঞ্জরী এবং গোরাবাবুর বিছানা খুলে বিছিয়ে ব্যবস্থা করে রীতুবাবুদের ঘরে এল—কুছু হুকুম মাস্টার মশা?

—হুকুম আর কি? কত্তা গিন্নির চা হবে না কি? হলে দিস। বিছানা-টিছানা হয়ে গেছে। সে বিপনচন্দ্র ঠিক ব্যবস্থা করেছে।

—ইঠো বিছাইলো না কাহে? বাবুল মাস্টার সাবের।

—হ্যাঁ। বিছাইয়ে গোলে পড়ুক আর কি! বিছানার সঙ্গে গুটোন কি আছে—কে জানে!

—উনি তো ওই অলকাকে আনতে গেইলো।

—গেইলো নয়, আইলো বুঝি। সাইকেল রিক্সার হর্ন বাজতা হ্যায়। দেখ, অলকা এলো?

তার জবাবে গোরাবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—এসেছ? গুড!

অলকা এসেছে।

বাবুল এসে ঘরে ঢুকল—বিগ ব্রাদার, স্যাড নিউজ। হাতে একখানা কাগজ।

—কি নিউজ? লণ্ডনে বোমা? না রোমেলে পুনরাবির্ভাব?

যুদ্ধের ব্যাপারে রীতুবাবু হিটলারের উপাসক। সে বলে—আমি শক্তের ভক্ত বাবা। ইংরেজকে যে পিটবে তার দিকে। বাবুল মিত্রপক্ষের দিকে, অবশ্য রাশিয়ার খাতিরে। আই-পি-টি-এর পত্তনের সময় ও তাদের সঙ্গে কিছুদিন ছিল। সেই সময় থেকেই রাশিয়ার পক্ষ। তবে আই-পি-টি-এ আর ভাল লাগে না। ওদের ওপর চটাই খানিকটা।

—না ব্রাদার, গণনাথ সেন কবিরাজ নো মোর। মারা গেছেন।

—সে কি?

—এই দেখুন। কাগজখানা ফেলে দিল। পরশু রাত্রে মারা গেছেন, বুধবার ৮ই কার্তিক রাত্রে। আজ কাগজে সম্পাদকীয় লিখেছে। রীতুবাবু কবিরাজ মশায়ের ভক্ত ছিল। কবিরাজ মশায়ও অভিনেতা অভিনেত্রীদের ভাল বাসতেন। কত যে বিনা পয়সায় দেখেছেন। আহা—হা! গোরাবাবু মঞ্জরীও তাঁকে দেখিয়েছে। তারাও তাঁর ভক্ত।

নাটুবাবু, রমণী নাগ ঘুমুচ্ছে। রীতুবাবু বেরিয়ে গেল গোরাবাবুর ঘরের দিকে।

—গোরাবাবু, বড় দুঃসংবাদ মশাই। আমাদের গণনাথ সেন মশাই নেই।

গোরাবাবুর ঘরে মঞ্জরী নেই, স্নানে গেছে। অলকা দাঁড়িয়ে কথা বলছে। গোরাবাবু বলছিল—কঠিন পরীক্ষা তোমার। সাহেবদের ভাল লাগাতে হবে।

—আচ্ছা, দেব পরীক্ষা।

সংবাদটা শুনে গোরাবাবুও চমকে উঠেছিল—বলেন কি মশাই?

—এই দেখুন!

* * *

সারা দুপুরটা সেদিন খবরের কাগজ বড় হয়ে উঠল। এদের রাত্রিটা দিন—দিনটা রাত্রি। বাস্তব সংসার সমাজ দেশ—সব কোথায় অন্তরালে চলে যায়; এরা বিচরণ করে গন্ধর্বলোকে, অথবা শঙ্খচূড়ের শৈলরাজ্যে, কখনও মহারাণী জনার মাহিস্মতী পুরীতে; কাল পিছিয়ে চলে যায় কখনও দ্বাপরে, কখনও ত্রেতায়, কখনও সত্যযুগে। বাস্তব পৃথিবীর সবকিছু যবনিকার বাইরে রেখে তারা যবনিকার অন্তরালের কল্পলোকে হাসে, কাঁদে, খেলাঘর পেতে খেলা করে। খেলার পালা শেষ হয়, আলো নেভে, যবনিকা নামে, তারা ঘুমোয়। রাত্রি শেষ হয়, সূর্য ওঠে, আলো চোখে লাগে, তারা পিছন ফিরে শোয়। এরই মধ্যে হঠাৎ কোন একটা কিছুকে উপলক্ষ্য করে ওরা এই কালে এই পৃথিবীতে জেগে ওঠে।

আজকের কাগজখানাকে নিয়ে তেমনি ভাবে কয়েকজন জেগে উঠেছিল। শুধু গোরাবাবু রীতুবাবু এবং বাবুলই নয়, যোগামাস্টার পর্যন্ত এসে বসেছিল। ভাইদ্বিতীয়ার একটা কার্টুন—চার্চিল বোন সেজে স্টালিনকে ফোঁটা দিচ্ছে থেকে, রোমেলের মৃত্যু, হিটলারের ঘোষণা—শত্রুদের চূর্ণ করব, ভি-টু রকেট ছুঁড়ে এবং ভি-টু রকেটের গতি ঘণ্টায় তিন হাজার মাইল—তা গিয়ে দক্ষিণ ইংলণ্ডে পড়েছে,

আবার জার্মানীর চূড়ান্ত পরাজয় আগামী বসন্তে বা গ্রীষ্মে। এটা ধ্রুব। রাশিয়ায় প্রায় নব্বুই লক্ষ জার্মাণ সেনা নিহত অথবা বন্দী এই খবরগুলিকে নিয়ে অকস্মাৎ মানুষগুলি যেন কিছুক্ষণের জন্য একালের স্বাভাবিক মানুষ হয়ে উঠল। গণনাথ সেনের মৃত্যুতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, ভারতী বলে একটা বউয়ের রহস্যজনক মৃত্যুর মামলায় এক ভিখারিণীর সাক্ষ্যে শাশুড়ীর অত্যাচারের কথা এবং সুমতি বলে একটি বন্ধ্যা বউয়ের আত্মহত্যায় শাশুড়ীর প্ররোচনা দেওয়ার খবর পড়ে এ দেশের শাশুড়ীদের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠল। তারই সঙ্গে কিসমৎ ছবির সাতান্ন সপ্তাহ চলছে, উদয়ের পথে সতের সপ্তাহ চলছে এ নিয়েও তারা তারিফ করলে। করতে করতে কখন আলোচনা মৃদু হতে মৃদুতর হয়ে থেমে গেল, রীতুবাবু বসে বসেই ঘুমুতে ঘুমুতে নাক ডাকলে, গোরাবাবু নিজের ঘরে গিয়ে শুল; সেখানে মঞ্জরী গাঢ় ঘুমে প্রায় অচেতনের মত পড়ে আছে। মঞ্জরীর পূর্ণ যৌবন। কপালে কয়েক বিন্দু ঘাম ফুটে রয়েছে। মুখটি ঈষৎ হাঁ হয়ে গেছে। বড় বড় চোখ দুটি অর্ধমিমীলিত। কিছুক্ষণ দেখতে চেষ্টা করলে, কিন্তু ঘুমকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না। ঘুমিয়ে পড়ল। শুধু জেগেছিল অলকা। সে ভোরে উঠে ট্রেন ধরে এসেছে। তার দেহে মনে রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি নেই। এই এত নাক ডাকার আওয়াজের মধ্যে তার ঘুম হয় নি। শোভা বুঁচী গোপালী আশা এদের সবারই নাক ডাকছে। সে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কলিয়ারীর দিকে চেয়ে রইল। কলিয়ারী সে দূর থেকেই দেখেছে—এমন কলিয়ারীর ভিতরে আসে নি। আকাশে চিমনী, মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে একটা দুটো তিনটে। দুটো লোহার, একটা ইটে গাথা। সবগুলোর মাথায় ধোঁয়া উঠছে। দুটোতে বেশী, একটাতে কম। প্রত্যেকটার কোলো হাওড়া ব্রিজের লোহার ফ্রেমের মত লোহার ফ্রেমে গড়া কিছু খাড়া হয়ে রয়েছে। প্রত্যেকটার মধ্যে দুটো করে চাকা,

তার মধ্যে স্টীলের দড়ি পরানো। মধ্যে মধ্যে দুটোই ঘুরছে। একটা খুলছে, একটা জড়াচ্ছে। বরাকরে বাজারের কাছে এ দেখে গেছে। ওতে করে কয়লায় খালি টব নামছে—বোঝাই টব উঠছে। উপরে আকাশে ফোটানো লোহার দড়ি চলে গেছে কতদূর পর্যন্ত, তাতে ঝুলে টবগুলো চলে যাচ্ছে। অনবরত ফোঁস ফোঁস শব্দ উঠছে একটা। ওটা খাত থেকে পাম্প করে জল তুলে ফেলছে—সেই পাম্পের শব্দ। চাকাগুলো যখন ঘোরে তখন ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে।

বিচিত্র রাজ্য। ওই দূরে সামিয়ানা দেখা যাচ্ছে। ওখানে যাত্রা হবে। তাকে আজ ভাল করে নাচতে হবে। নাচবে সে। নাচ তার ভালই হয়। সে তা বুঝতে পারে গোরাবাবুর চোখের মুখের ভাব দেখে। নাচবে সে আজ খুব ভাল করে। সায়েবদের সে দেখিয়ে দেবে এ দেশের নাচ কত সুন্দর। মঞ্জরী অপেরার ধ্বজা উড়িয়ে দেবে সে।

সে স্বাদ পেয়েছে। শুধু স্বাদ নয়—একটা সিঁড়ি উঠেছে। একটা সিনেমা কনট্রাক্ট পেয়েছে। এর আগে ঘুরে ঘুরে সে পায় নি। থিয়েটারে গেছে—ফিরিয়ে দিয়েছে। সবাই হাত বাড়ায় তার দেহের দিকে। কিন্তু অলকার ঘৃণা হয়েছিল। সব থেকে ঘেন্না হয়েছিল থিয়েটারের ম্যানেজার-ডিরেক্টার অ্যাক্‌টারটার উপর। তাঁর কাঁধের উপর হাত দিয়ে টিপে বলেছিল—তোমাকে হিরোইন করব, তবে কথা শুনে চলতে হবে। বুঝেছ?

সে চলে এসেছিল। এখানে কষ্ট অনেক, হয়তো যাত্রা বলে একটু ছোটও ভাবে লোকে। ভাবুক। এখান থেকেই সে উঠবে। সিনেমা, থিয়েটার—এতে তাকে পার্ট পেতেই হবে। দেওয়ালে তার নাম, তার ছবি বেরুবে। তারপর? থাক তার পরের কথা। মরাল, নীতি—এ সব তার নেই, কিন্তু মন আছে।

ঢং ঢং করে ঘড়ি পিটছে। এক দুই তিন চার পাঁচ। পাঁচটা। ওঃ, তাহলে পাঁচটা বাজল! কিন্তু এরা সব এখনও ঘুমুচ্ছে। না,

কে যেন উঠেছে। ডাকছে—বিপিন, বিপিন, ওঠ। চায়ের জল চড়াতে বল ঠাকুরদের। পাঁচটা বাজল। ওঠ, ওঠ।

ম্যানেজার সেই কাঁচাপাকা চুল, নাদুসনুদুস গোপাল ঘোষ। হ্যাঁ, গোপাল ঘোষ বেরিয়ে এল। তাকে দেখে হেসে বললে—উঠেছেন! না—ঘুমোন নি?

—খানিকটা ঘুমিয়েছিলাম।

—দাঁড়িয়ে আছেন? কলিয়ারী দেখছেন?

—হ্যাঁ।

—আগে দেখেন নি—না?

—বরাকরে দেখেছি। ট্রেন থেকে দেখেছি।

—সে আবার দেখা! নিচে নেমে দেখবেন?

—দেখাবে? দেখতে দেবে?

—দেখাবে না? কৃতার্থ হয়ে দেখাবে। বিশেষ আপনাকে। ওঃ, কত জায়গায় যে কৈফিয়ত দিতে হল আপনার জন্যে! সিনেমা-স্টার অলি চৌধুরী কই? এখনও এখানে জানে না আপনি এসেছেন। তাহলে ভিড় লেগে যেত।

হাসলে অলকা।

গোপাল বললে—একবার সাজঘর দেখে আসি। বেশকারীদের তুলে দিয়ে আসি। সাজপোশাক বের করে সাজাক। ওদের একটু ভাল করে বলবেন ভাল পোশাক দিতে। নইলে ওরা ঠিক দেয় না।

অলকা বললে—আমি এবার আমার পোশাক এনেছি। আমার নিজের সেট তো ছিল।

—তা কিন্তু দেখিয়ে নেবেন। মানে পার্টের উপযুক্ত হওয়া চাই তো। মানানসই হওয়া চাই। প্রোপ্রাইট্রেস না হয় কত্তাকে দেখিয়ে নেবেন। ওই দেখুন কতকগুলো ছোঁড়া এসেছে, আপনাকে দেখছে। দেখাচ্ছে দেখছেন না?

হাসতে লাগল গোপাল। হাসতে হাসতে চলে গেল সে সাজঘরের দিকে।

অলকা ওদিকের বারান্দা থেকে উলটো দিকে এসে দাঁড়াল। এদিকটা ফাঁকা, সামনে খানিকটা দূরে বরাকর নদ। ওপারে কতকগুলো ছোট পাহাড় দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের মাথাটায় সূর্য লাল হয়ে ঢলছে নিচের দিকে। কার্তিক মাস, আজ বোধ হয় দশ তারিখ। ইংরেজি সাতাশে অক্টোবর। বেলা অনেক ছোট হয়েছে। বিষয়ের তুনিয়ায় কাজের সময় কমে গেছে। তাদের এই বিচিত্র জগতের কাজের সময় বেড়েছে। কাজ করার পক্ষে প্রকৃতিও অনুকূল। গরমে পেণ্ট গলে নামবে না, ঘামে সর্বাঙ্গে অস্বস্তি হবে না। পোশাক পরে আরাম পাবে। তুটো গাওনা করেও খানিকটা গড়াতে পাবে। বিষয়-জগতে সূর্য ডুবছে—তাদের জগতে আলো জ্বলছে। এখানে ইলেক্‌ট্রিক লাইট আছে। এক্ষুনি দপ করে জ্বলে উঠবে কলিয়ারীময়। তাদের আসরে কয়েক হাজার বাতির আলো জ্বলে উঠবে। শুধু সাদা নয়, লাল নীল সবুজ হরেক রকম। সব মিশে দিনের আলোর থেকে প্রখর না হোক, ঝলমলানিতে তাদের গলার কাচের তৈরী হীরে মানিকের মত ঝলমলে হয়ে উঠবে। অন্যত্র হলে এতক্ষণ দশ পনেরটা ডেলাইট নিয়ে মিস্ত্রীরা ম্যাণ্টেল-পোকার, স্পিরিটক্যান নিয়ে জ্বালতে বসে যেত; স্পিরিটের গন্ধ উঠত। যাত্রার দলের লোকেরা শুঁকে শুঁকে নিশ্বাস নিত। তারপর দেখে মনে মনেই বলত—ও! তা নয়।

—বিপিন! বিপিন! রীতুবাবুর গলা।

—অরে অ—বিপন! যোগামাস্টার! ওঠ হে শ্যাম, ওঠ। কার গলা? কোঁ-কোঁ শব্দে বেয়ালার তারে ছড় টানছে কেউ। খুট-খাট। হে-হে-হে—গলা ঝাড়ছে কে! খক্ খক্ শব্দ উঠছে কারুর কাশীর।

—শিউনা! মিষ্ট নারী কণ্ঠ। প্রোপ্রাইট্রেস স্বয়ং।

তাদের তুনিয়ায় জাগরণের আলোয় সাড়া জেগেছে। জাগছে।

—এখানে দাঁড়িয়ে?

মঞ্জরীর গলা শুনে অলকা ঘুরে তাকাল, মঞ্জরীর মুখে স্মিত হাসি। সেও হাসলে। সে কথা বলবার আগেই মঞ্জরী কথা বলে প্রশ্নটা সম্পূর্ণ করলে।—এদিকে? এদিক তো খাঁ খাঁ। প্রকৃতির শোভা দেখছ?

—ঠিক না। ওদিকে কতকগুলো ছোঁড়া সিনেমা-স্টার দেখছিল।

মঞ্জরীর মুখে কৌতুক হাস্য ফুটে উঠল। মেয়েটা বলে কি? খুব তো নিজের সম্বন্ধে সচেতন! সিনেমা-স্টার মানে তাকেই দেখতে এসেছে! মেয়ে যাত্রার দল—যাত্রাদলের মেয়েদের দেখতেও অনেক ভিড় হয়। শুধু ভিড় নয়, ঢিল-বাঁধা প্রেমপত্রও এসে ঝপ করে পড়ে। তাদের দল চলে যায় গাওনা শেষ করে, ভক্তের দল প্রেমিকের দল সঙ্গে সঙ্গে চলে। ট্রেন হলে ট্রেনে, পাকা রাস্তা হলে সাইকেলে, কাঁচা মেটো পথে হাঁটতে হাঁটতে যায়; কিছুদূর এসে ক্লান্ত হয়ে হতাশ হয়ে বাড়ি ফেরে। কত গানই শুনেছে!—আজি এসেছি এসেছি বঁধু হে—লয়ে এই হাসিরূপ গান থেকে—। কারুর নিজের বাঁধা হু কলি গান পর্যন্ত। বক্তৃতাও করে—পাষাণী আমি তব ধাইব পশ্চাতে লয়ে এই তপ্ত আঁখিজল—তুমি কিন্তু চলে যাও ফেরায়ে বদন! আজ শ্রীমতী অলকার ধারণা—যারা আসছে এখানে তারা তাকে দেখতেই আসছে। তার মুখের হাসিটি মুহূর্তে বক্র এবং ধারালো হয়ে উঠল। সকৌতুকেই বেশ ধারালো গলায় বললে—তাই নাকি?

—চা হয়েছে মঞ্জরী? গোরাবাবুর কণ্ঠস্বর—কি করছ ওখানে?

—যাই। অলকার সঙ্গে কথা বলছি।

—অলকা? তা হলে তুমিও এস সখী। আজ গন্ধর্বকন্যায় তুমি সখী। এখন থেকেই রপ্ত করছি। এস, চা তৈরী।

অলকা এসে বসল মঞ্জরীর বিছানায়। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বললে—আজ সখীর পার্টে কি পোশাক পরব বলুন তো?

—সে ড্রেসার ঠিক দেবে। গোরাবাবু বললে।

অলকা বললে—আমার নিজের কিছু পোশাক করানো আছে তো। সেগুলো বাড়িতে ছিল, এবার এনেছি। মাপ দিয়ে তৈরী—

—কাপড় পরবে—মাপ কী হবে! হ্যাঁ, ব্লাউজ পরতে পার

—শাড়িও এনেছি।

—বাঃ! তুমি বড় অ্যাক্‌ট্রেস হবে। মেকআপ হল খুব বড় কথা অভিনয়ে। আমরা ওদিকটায় নজরই দিই নে। অথচ জান, যখন আমি প্রথম অ্যামেচারে প্লে করতাম তখন ড্রেস আমি তৈরী করাতাম।

মঞ্জরী বললে—এখনও তোমার ড্রেস মাপ দিয়েই তৈরী হয়।

—হয় না বলছি নে। তবে এক ড্রেস দুটো প্লেতে চালাই এখন। আমিই চালাই। না হলে খরচ বৃদ্ধি। আর অধিকাংশেরই তা হয় না। বুঁচি মোটা তোমার থেকে—তোমার ব্লাউস বোতাম আঁটে না, সেপটিপিন দিয়ে আঁটা হয়; পিট কাপড়ের আঁচলে ঢাকা থাকবে। বুঁচি নিজের জামা আনে নি, আনবেও না। এই বলছি আর কি!

এরপর সবাই কিছুক্ষণ চুপ হয়ে গেল। একটু পর চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে অলকা বললে—লাল বেনারসী আছে—

—লাল বেনারসী! সে কি করে চলবে? আমি তো ঝলমলে পোশাক পরছি নে। তুমি সখী হয়ে পরবে! আর এটা আরতি নৃত্য।

—যদি সাদা মুরশিদাবাদ সিল্ক পরি? লাল পাড়?

—ব্লাউস? জামা কি পরবে?

—সেও সাদা। সাদা সার্টিন।

—বর্ডার?

—বর্ডার শাড়ির পাড়ের মত।

—লাল বেনারসী বাদ দিয়ে লাল কিছু পর না।

—আপনারও তো লাল। এক হয়ে যাবে না?

—আমি বরং লাল পাড় সাদা গরদ পরব। তুমি নাচবে তো!

—বেশ। তাও আছে আমার। তবে ঠিক লাল নয়—ফিকে গোলাপী। সিল্ক নয় অরগ্যাণ্ডি।

—ওরে ব্বাপ! কত এনেছ?

—করিয়েছিলাম তো অনেক। প্রথম ইচ্ছে ছিল—রাগিণী কি রুক্মিণীর মত ডান্সার হব। ইউরোপ আমেরিকা যাব। সাধ তো অনেকই হয়!

গোরাবাবু বললে—ওর জন্য যে পার্টনার চাই, ট্রুপস চাই। বাবুলের পিছনে না ঘুরে তাই যদি কাউকে খুঁজতে তো এতদিন হয়তো তা হত।

মঞ্জরী বললে—গোরাবাবুর কথাটা সরিয়ে দিয়েই বললে—একবার দেখিয়ে নিয়ো। তুমি সাজো ভালই। তবে এ পার্টটা তো ঠিক একটা আলাদা পার্ট নয়, এটা বলতে গেলে—গন্ধর্বকন্যারই ছায়া। তুমি ভাল নাচ—আমি নাচব না—তাই তোমাকে দেওয়া হয়েছে। নয়?

—হ্যাঁ, তা বটে। অলকা সত্যিই সপ্রশংস হয়ে উঠল কথাগুলি শুনে।

গোরাবাবু বললে—নাচে সাজবার স্কোপ তোমার জনায় মোহিনী মায়ায়। সে জেনো। দেখব।

বলে গুনগুন করে উঠল—ধরা দিতে গিয়ে পারি নি—আমি যে সোনার হরিণী, মরুর অঙ্গে বায়ুতরঙ্গ মরীচিকা মনোহারিণী।

* * * *

অভিনয় আরম্ভ হতে রাত্রি হয়েছিল। দল যথাসময়ে সেজে বসেছিল। কালীমূর্তি বিসর্জন ছিল আজ। দশ দিন রাখা হয়েছে, আর রাখা চলে না। বিলেতের সাহেবের দেখা হয়ে গেছে আজ বিসর্জন। ব্যাণ্ড বাজিয়ে বাজি পুড়িয়ে ধুমধামের বিসর্জন। দলের লোকেদের অনেকে দেখেও এল। সাহেবরা ওদিকে সাঁওতাল নাচ দেখতে

বসেছে। এলেই আরম্ভ হবে। এদিকে দশটা বেজে গেল। আসর ভরে উঠল লোকে লোকে। মস্ত আসর। প্রকাণ্ড বড় বড় সামিয়ানা—সে চারখানা চারদিকে, মাঝখানে একখানা লাল সালুর লতাপাতা আঁকা, ঝালর-দেওয়া সামিয়ানা। আসরের মাঝখানে তক্তাপোশ পেতে ডায়াসের মত যাত্রার আসর। একদিকে কলিয়ারীর সাহেব, আশপাশের কলিয়ারীর অতিথিদের বসবার চেয়ার। তার পিছনে স্কুলের সারি সারি বেঞ্চি, তাতে সব বাবুরা বসবে। তার পিছনে আর একটা তক্তাপোশ সাজিয়ে ডায়াস, তার উপরে বেঞ্চি—সেখানে বসবে ভদ্রঘরের মেয়েরা। বাকী তিন দিকে তেরপল পাতা। তার উপর সাধারণ লোক বসবে। সবই ভরে গেছে—কেবল সাহেবদের খান-আস্টেক চেয়ার ছাড়া। সে সব সোফা-সেটের আসন। বড়বাবু অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের বাড়ি থেকে আনা হয়েছে। লোক বার তিনেক গেল, ফিরে এল। সায়েবরা সাঁওতাল নাচে মশগুল। শেষ বড়বাবু নিজে গিয়ে ফিরে এসে বললে—একে বলে এরই মধ্যে টোর হয়েছে—বলে একে বলে not to-day বড়াবাবু, postpone your jatra till tomorrow—this is very interesting। কি বলে মরুক গে, আপনারা আরম্ভ করুন। না আর কিছুক্ষণ—একে বলে—

গোরাবাবু বললে—আর দেরি করতে বললে আমরা বন্ধ করব আজ। দশটা বাজে। শেষ হতে তুটো হয়ে যাবে।

—তা হলে আরম্ভ করুন কি বলে।

রীতুবাবু বললে—ব্যাটারা মাঝখানে এসে বলবে না তো ফিন পহেলেসে শুরু কর।

মদ বসে বসে রীতু এরই মধ্যে প্রায় আধ বোতল শেষ করেছে। একা নয়, বাবুল বোসও ছিল।

বাবুল বললে—দেন উই অল জাপানী সেজে সোর্ড হাতে এসে দাঁড়াব। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড? ওয়ান মিনিট অ্যাণ্ড সায়েবরা রাণ অ্যাওয়ে।

—পিস্তল বার করলে ?

—ক্যাপ খুলে বলব ফ্রেণ্ড। সেজেছি। এবং অলিকে ঢুকিয়ে দেব—ঝমঝম করে ঘুঙুর বাজিয়ে ঢুকে পড়বে।

ওদিকে আসরে ঘণ্টা পড়ে গেল। সব এক মিনিট খানেক চুপ। প্রণাম সারছে। বিচিত্র কয়েকটি মুহূর্ত। মেঘাচ্ছন্ন রাত্রির আকাশে হঠাৎ যেন মেঘ একটু কেটে একটি দীপ্যমান তারা কয়েক মুহূর্তের জন্য জ্বলজ্বল করে উঠে মিলিয়ে গেল। তারপর বাতাস ও ধারাপাতের শব্দের সঙ্গে বর্ষণের মত আরম্ভ হয়ে গেল অভিনয়। কনসার্টের বাজনা থামল। ঘণ্টা পড়ল। ওদের রাত্রিজীবনের কল্পলোকের যবনিকা উঠল, আশপাশ থেকে কলিয়ারী আপিস পত্তর, বিষয় জগৎ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। কোন এক কল্পলোকের দেবদ্বার সত্য হয়ে উঠল। মহামন্ত্রীবেশী রমণীনাগের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল—

এই দেবদ্বার রাজ্যে আজ শুভদিন। জয়ন্তীপুরের
প্রাসাদের বিষণ্ণ আঁধার অবসান এতদিনে—

কোন দিক থেকে কে যেন বলে উঠল—লাউডার—

কাছেই সাজঘর। ছোট একটা বাংলো—মানে দুদিকে বারান্দাওয়ালা খাপরার চালের তিনখানা ঘর। এইটেকে দুদিকে তেরপলের আড়াল দিয়ে সাজঘর করা হয়েছে। একখানা বড় ঘর মেয়েদের। একখানা বড়, একখানা ছোট পুরুষদের। পুরুষদের ছোট ঘরটায় চারখানা চেয়ার, চারখানা টেবিল। মেয়েদের ঘরে আবার পর্দা ঘিরে মঞ্জরীর ঘর—তাতে চেয়ার টেবিল। মেয়েদের জন্যে বেঞ্চি আর হাই বেঞ্চি। এখানকার বড়বাবুর এদিকে খুব নজর। থিয়েটারে তাঁদের যেমন করেন—তেমনি করে দিয়েছেন। গ্রীনরুম থেকে আসর পর্যন্ত প্রবেশ-পথ বাঁশের খুঁটো পুঁতে শালুমোড়া দড়ি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। পুরুষদের ছোট ঘরটাই আসরের দিকে। লাউডার কথাটা খুব জোরেই বলেছিল লোকটা। কথাটা সাজঘরেও পৌঁছল। গোরাবাবুর মাথায় চুল আঁটছিল বেশকারী শিবু নিকিরী, তার হাতটা

ঠেলে দিয়ে গোরাবাবু আসরের দিকে তাকাল। বাবুল বলে উঠল—এই ডাই ডায়েড ডায়েড! মরেছে নাগনন্দন!

রীতুবাবু বললে—রমণী নিশ্চয় মদের উপর গাঁজা টেনে গেছে। যোগাবাবু খাইয়েছে। গলা দেবেছে।

নাটুবাবু বললে—প্রথমেই লাউডার খেলে!

পরমুহূর্তেই রমণীর কণ্ঠস্বর চড়ে উঠল—পরাও আলোর মালা—উড়াও পতাকা।

রীতুবাবু বললে—সাবাস! গাঁজার ঝিমিনি কাটিয়েছে।

গোরাবাবু শিবুকে বললে—আঁট। সামনেটায় আমার চুল যা পরচুলোর সঙ্গে আঁটবি—সেখানে যেন নতুন শক্ত ক্লিপ দিবি। পুরনো ক্লিপ হলেই বেরিয়ে আসবে।

বাবুল গিয়ে জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিল। পর্দা ফাঁক করে দেখছিল—মাই ফাদার! পিতঃ হে! স-র্ব-না-শ!

—কি হল?

—লোক যে ক্যাট্যারে ক্যাট্যারে বিগ ব্রাদার। নাগনন্দনের দোষ কি! সবাই মিলে ছোট্ট করে য়েঁা করলে—কোরাসে যে ম্যান অব ওয়ারের ভোঁ বেজে উঠবে।

—ঘাবড়াও মাৎ। বংশীর দল ঢুকতে দাও। অল সাইলেন্স। ওই গানেই জমে যাবে। আঃ, গান যেমন লিখেছেন দেবতা, হারামী বংশী কি তেমনি সুর দিয়েছে!

গোরাবাবুর কি যেন মনে পড়ল। বললে—শিবু!

—আজ্ঞে।

—অলকাকে ডাক তো।

—কি ব্যাপার?

—ওকে একটু সাহস দিয়ে দি। লোক দেখে—

হাসলে গোরাবাবু।

নাচের পোশাকে সেজেছে অলকা। ঘাঘরা ব্লাউস ওড়না। এগুলো

দলের পোশাক। প্রথম দৃশ্যে নগর নর্তকী সেজে নামছে দলের সঙ্গে। ওদের সঙ্গে মিলিয়ে সাজতে হয়েছে। তবে মুখের পেণ্ট, চোখের রেখা ভুরু নিয়ে মেকআপে ওর নিজের বৈশিষ্ট্য ফুটেছে। ওর মেক-আপ বাক্সে নিজের কেনা রং কসমেটিকস আছে।

গোরাবাবু বললে—ভুল হবে না তো ?

—কি ?

—সেই স্টেজে দেখিয়েছিলাম। এখানে তো স্টেজ নেই যে নেচে দেখাব !

হেসে ফেললে অলকা। বললে—তারপরও তো করেছি, কলকাতায়, বরাকরে লক্ষ্মীপুজোতে।

—করেছ। তারপর বাড়ি গিছলে। তা ছাড়া লোক দেখেছ ? যাও, পর্দা ফাঁক করে দেখে এস।

মঞ্জরী এসে ঢুকল—হ্যাঁ গা, প্রথমেই নাকি লাউডার পড়েছে !

—হ্যাঁ। গোরাবাবু বললে—কিন্তু সে শুধরে গিয়েছে। ঠিক চলছে এখন।

—খুব লোক হয়েছে বুঝি ?

—দেখ না। অলকাকে দেখতে বললাম। আগে থেকে ওকে একটু চাঙা করে দিচ্ছি।

মঞ্জরীও গিয়ে দেখলে। বললে—হ্যাঁ হয়েছে, কিন্তু গতবার গৌহাটির সেই রেল কলোনীর মত নয়। মাস্টার মশাই ?

—হ্যাঁ একটা রেকর্ড লোক। আমার গলা যে লাউডস্পীকার তাই হার মানলে। তবে এও খুব লোক। তবু তো সাঁওতাল ড্যান্স এখনও চলছে। মাদল বাজছে।

মঞ্জরী অলকার হাত ধরে বললে—কোন ভয় নেই। তোমাকে ওর মন্ত্র শিখিয়ে দেব এস। চুপি চুপি বলব, সবার সামনে নয়।

আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললে—কিচ্ছু না। নার্ভাস মনে হলেই

একবার চোখ বুজে রামকৃষ্ণদেবকে মনে করে বলে দেবে জয় রামকৃষ্ণ। বুঝলে? আর কারুর মুখের দিকে চাইবে না। দেখবেই না।

প্রথম দৃশ্যে অলকা নার্ভাস হল, কিন্তু সামলে নিয়ে মন্দ নাচলে না। মুদ্রা থেকে নাচ সকলের সঙ্গে মিলিয়েই করে এল। মঞ্জরীই বাহবা দিলে আগে।

খুশী হয়ে সে মালবিকার সখী সাজতে বসল। মুখের রঙ থেকে শুরু করে চোখ ভুরু আবার একবার সযত্নে ঠিক করে নিলে। বেণী বাঁধা চুল খুলে চুল এলিয়ে দিলে, চুল তার যথেষ্ট এবং সযত্নে সে শ্যাম্পু করেছে ও বেলা। নিজের চিরুণী দিয়ে আঁচড়ে বুরুস বুলিয়ে সামনেটা হাত দিয়ে ফুলিয়ে নিয়ে ফিকে গোলাপী অর্গ্যাণ্ডির কাপড় ব্লাউস বের করে পরে সাজ শেষ করে দেখছিল নিজেকে। হঠাৎ ছন্দ কেটে গেল। কেটে দিলে শোভা।

এই ভাবে ছন্দ কাটা—বিশেষ করে অভিনয়ের সময় গ্রীনরুমের মধ্যে—একটা সাধারণ ব্যাপার। ছন্দ কাটা মানে আসরে জমাট অভিনয়ের সাফল্যের আনন্দর মধ্যে চলতে চলতে হঠাৎ ঝগড়া বেধে গেল এর সঙ্গে ওর। কারণে অকারণে বেধে যায়।

যোগামাস্টার নাটুবাবুকে ভুরু নাচিয়ে ইসারা করছে—গাঁজা তৈরী খেয়ে নাও। রমণী নাগ বলে উঠল—কি, ইসারা করে কি বলছেন কি? আমি কিছু বুঝি না?

—কি বিপদ! কি বলছ কি নাগ?

—কি বলছি? বুঝলেন ভুল, কথা আটকে যাওয়া এ সবারই হয়। ঐ নিয়ে ইতরে ঠাট্টা করে।

—নাগ!

—ধমকাচ্ছেন কি? রমণী নাগ কাউকে ভয় করে না।

যোগামাস্টার বলে ওঠে—যোগামাস্টার কাউকে ভয় করে নাকি?

রীতুবাবু নয় তো গোরাবাবু এসে দাঁড়ায়—গোলমাল হচ্ছে। করছেন কি? বাইরে আসর পর্যন্ত যাচ্ছে। থামুন।

থেমে যায়। অভিনয় শেষ হতে হতে দেখা যায় রমণী নাটু এবং যোগা তিনজনে একসঙ্গে সিগারেট খাচ্ছে, হাসছে। রমণী বিনয় করে যোগাকে বলছে—একটু খাওনা যোগাদা!

—না ভাই। ওতে নাই। জান, কণ্ঠমশায়ের কাছে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলাম। উটি খাবার জো নাই! তিনি বলেছিলেন, যোগানন্দ, সব খেয়ো. মদটি খেয়ো না। ওই খেয়ে প্রভুর এতবড় যতুবংশ নলখাগড়ার ঘায়ে শেষ। এই সিগারেট দিয়েছ, এই ঢের।

আসর থেকে বেরিয়ে তুজনে যাদবে মাধবে হয়তো গ্রীনরুমে ঢুকেই লড়্ইয়ে মেড়ার মত দাঁড়িয়ে গেল। যাদব ক্ল্যাপ পেয়েছে, কিন্তু ইমোশনের মাথায় এমন করে হাত ছুঁড়েছে যে, হাত লেগে মাধবের পাগড়ীটা আলগা হয়ে পড়ে যেতে যেতে থেকেছে। মাধবেরও হাত আস্ফালন করা ছিল, কিন্তু পাগড়ী চেপে ধরতে গিয়ে সেটা আর হয়ে ওঠে নি। কিংবা মাধবের কথা শেষ হতে না হতে যাদব মাঝখানে তার বক্তৃতা ধরে দিয়েছে। মাধবের সবটা বলা হয় নি, অচল যাদব তাতেই ক্ল্যাপ মেরে দিয়েছে।

হয়তো তাড়াতাড়ি যেতে গিয়ে কারুর গায়ে ধাক্কা মেরেছে। সে বলেছে—বুকের ছাতি দেখাচ্ছে।

উত্তর সঙ্গে সঙ্গে এসে গেল—আলবৎ দেখাচ্ছি। ছাতি আছে দেখাচ্ছি।

—সাট-আপ!

—তুমি সাট আপ!

গোপাল ছুটে এসে একজনের হাত ধরে বলে—পরে হবে, পার্ট—পার্ট এসেছে।

বিনা বাক্যব্যয়ে সে ছুটে চলে যায়। অভিনয় শেষে এক ফ্লিটে খায়, খেতে খেতে উচ্চকণ্ঠে হাসে তুজনেই।

দু চারটে ঝগড়া মেটে না। দু চার দিন যায় তবে মেটে। একটা আধটা, তাও সচরাচর নয়, বছরে একটা ঘটে। কারুর সন্দেহ হল, তার প্রণয়াস্পদা কি প্রণয়াস্পদ কারুর সঙ্গে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসেছে। ঝগড়াটা ওই কথা নিয়ে বাধে না, অন্য কথা নিয়ে বেধে একটা স্থায়ী ঝগড়ায় পরিণত হয়। তার পরিণামে হয়তো বিচ্ছেদ হয়ে হয়। দল ছেড়ে চলে যায় লোক। গতবার যেমন কমিক অ্যাক্‌টর বোকা গেছে।

ছোটখাটো ঝগড়াগুলোর একধরনের ঝগড়া বেশী বাধায় যোগা আর শোভা। ওদের ব্যর্থ রসিকতা করা রোগ, সে কিছুতেই ছাড়বে না। আর তাই নিয়ে খড়ের আগুনের মত আগুন দপ করে জ্বলে ওঠে। অলকার বেলাতেও লাগালে শোভা। অলকার কল্পনার ছন্দটি কেটে দিলে। অলকা মেকআপ করে নিজের পোশাকের দিকে তাকিয়ে দেখে, আয়নায় মুখ দেখছিল।

বুঁচি শোভা অভিনয় সেরে ঘরে ঢুকল। বুঁচি তাকে দেখে বললে—দেখি দেখি, ঘুরে দাঁড়াও তো। বাঃ, চমৎকার হয়েছে! তুমি সাজতে জান ভাই।

শোভা বলে উঠল—আঃ, হায় হায় হায়রে, হায় হায়!

অলকা সবিস্ময়ে তার দিকে তাকাল।

শোভা বললে—এত সাজলে তো ভাই, কিন্তু দেখবে কে?

—মানে? খচ্‌ করে লাগল অলকার মনে। তার ভুরু কুঁচকে উঠল। বুঁচির কথা ভুলেই গেল। তার দিকে মুখই ফেরালে না।

শোভা বললে—সায়েবরা তো দেখলে না। কালো জামে মন মজেছে—রাঙা আপেল গড়ায় ভুঁয়ে! হায় হায় নয়?

অলকা মুখ মচকে বলে উঠল—কেন, আর দেখবার লোক নেই না কি?

—ওই মালকাটারা আর কয়লাবাবুরা?

—উহুঁ, তারাই বা কেন?

—তবে ?

—ভেবে দেখ না। নাচ দেখছে কে ?

—ও মা! গোরাবাবু? জয়ন্তকুমার ? পেটে পেটে এত!

—শোভাদি! চীৎকার করে উঠল অলকা।

শোভা মুহূর্তের জন্য চমকে উঠে পরমুহূর্তে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সেও চেঁচিয়ে উঠল—কি ? নিজে মুখে বলে আবার ধমক! বললে না তুমি ?

—না। চীৎকার করলে অলকা।

বুঁচি ব্যস্ত হয়ে বললে—শোভাদি, অলকা!

—কি হল ? কি ? মঞ্জরী বেরিয়ে এল।

—এত বড় কথা বলেন আপনি ? জানেন আমি ভদ্রঘরের মেয়ে ?

আগুনটা দপ্ করে জ্বলে উঠে দাউ দাউ করে উঠল। শোভা বলে উঠল—হ্যাঁ হ্যাঁ, জানতে বাকী নেই।

—চুপ চুপ। শোভাদি চুপ। মঞ্জরী বলল।

—শোভাদি! গোরাবাবু গম্ভীর কণ্ঠে ডেকে এসে দাঁড়াল। শোভা চুপ হয়ে গেল।

গোরাবাবু বললে—কি ?

গোরাবাবু আসর থেকে প্রস্থান করে এসেছে—এসেই যেন গোলমাল শুনে ছুটে এসেছে। ওকে আবার যেতে হবে।

—উনি আমায় অপমান করলেন।

—বল নি তুমি—

—কি বলেছি ? এই তো ইনি, এই বুঁচিদি ছিলেন। উনি বলুন। আমি বলেছি নাটকে নাচ আমার যাকে দেখাবার তাকেই দেখাব, তিনি দেখবেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। তা কে দেখছে ? জয়ন্তকুমার দেখছে না ?

—না। আরতি করছি আমি নারায়ণ মন্দিরে নারায়ণের।

তিনি দেখছেন, তাকে দেখাচ্ছি আমি। আপনি জয়ন্তকুমার বললেও রাগতাম না—আপনি গোরাবাবু, নাম করেছেন। কি বুঁচিদি ?

গোপাল এসে ডাকলে—আপনার পার্ট।

গোরাবাবু বললে—যাই। অলকাকে বললে—বি এ স্পোর্ট! মঞ্জরী তুমি দেখ বাপু।

চলে গেল গোরাবাবু।

মঞ্জরী অলকাকে হাতে ধরে নিয়ে গেল নিজের ঘরে—দূর, ঠাট্টা করেছে।

—এমন ঠাট্টা করবেন কেন ?

বুঁচি শোভাকে বললে—তুমি যেমন শোভাদি! ওদের সঙ্গে ঠাট্টা করে ?

শোভার চোখ থেকে হঠাৎ আগুন বেরিয়ে গেল—ঠিক জায়গায় খোঁচা দিয়েছি কি না!

বললে সে। কিন্তু কয়েক মিনিট পর চোখ থেকে জল গড়িয়ে এল তার। তার দিক হয়ে কেউ একটা কথা বলে নি।

ঘটনাটা কাঁটা নয়—তীরের মত কাজ করলে। অলকার নাচ ভাল হল না। তবে অভিনয় করলে চারজন। যেমন শুচি তেমনি বিদূষক তেমনি জয়ন্তকুমার তেমনি মালবিকা' অভিনয়ে মঞ্জরী অপেরার রথ বিজয় অভিযানের পথে একটা পাথরের টুকরোর উপর একটা ঝাঁকি খেলে মাত্র, তার বেশী কিছু নয়। রথ সমগতিতেই চলল।

* * * *

দ্বিতীয় দিন সাহেবরা এল। আসানসোলের জনচারেক সাহেব মেমকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছে—ডিনার সেরে তাদের সুদ্ধু নিয়ে এসে বসল জাঁকিয়ে। সামনে টিপয়ের উপর বোতল গ্লাস সাজিয়ে সোফা-সেটের উপর আসানসোলের মেয়েদের পাশে নিয়ে এরা বসল, আসানসোলের সায়েবরা আলাদা আলাদা চেয়ারে বসল। আজ

জনা হবে। বড়বাবু আগে বলেছিল। জনা তার প্রিয় বই। এক সময়ে নিজে নাকি প্রবীর করত। তা ছাড়া সতীতুলসী জনা দুখানা বইয়েরই বিষয়বস্তু ইংরাজী করে সায়েবদের দেওয়া হয়েছিল। ওরা সতীতুলসী বুঝতেই পারে নি। বলেছে ভালগার। ভগবান স্বামীর ছদ্মবেশে এসে তুলসীর সতীত্ব নাশ করে গেল—এটা ওদের কাছে দুর্বোধ্য এবং ভালগার মনে হয়েছে। মেমসায়েব দুটো চোখ ছানাবড়া করে বলেছে—মাই গড! নো—নো—নো। স্টপ দ্যাট বুক। দিস বুক—'জানা'—গুড বুক!

সায়েব জিজ্ঞাসা করেছিল—ড্যান্স?

—হিয়ার সার।

লেখার এক জায়গায় আঙুল দিয়ে দিয়ে বড়বাবু বলেছিল—এ ফেয়ারী ডান্সার উইল কাম, অ্যাণ্ড ড্যান্স ভেরী ভেরী বিউটিফুল ড্যান্স বিফোর দি হিরো প্রবীর—

—দ্যাট্স গুড। ওয়াণ্ডারফুল। আর একটু পড়ে বলেছিল—ইয়েস দিস ইজ এ গুড বুক। প্রবীরা ফাইট উইথ অর্জুনা টিরিবল্ ফাইট। দ্যাট্স গুড। ফেয়ারী ড্যান্স! টেরিবল ফাইট! গুড বুক!

এ সব কথা হয়েছিল বাংলোতে। আসরে আসবার আগে। বড়বাবু এসে গ্রীনরুমে ঢুকে বললে—কি বলে—ম্যানেজার সাহেব কই?

—বলুন।

গোরাবাবু চেয়ারে বসে সিগারেট টানছিল, উঠে দাঁড়ালে, রীতুবাবুর হাতে গ্লাস, বাবুল গালের দাড়িতে হাত বুলিয়ে দেখছিল কামানোটা ঠিক হয়েছে কি না, নাটু আজকের পাওয়া সিগারেটের বাক্সটি খুলে ফেলে জামার পকেটে পুরে জামাটা পাট করছিল। রমণী নাগ নাকের সামনে হাতের তেলো রেখে দেখছিল নিশ্বাস কোন্ নাকে জোরে পড়ছে। একটা তুক আছে ওর, সেই তুকটা করবে।

বড়বাবু এসে বললে—বসুন, বসুন।

—আপনি বসুন। আমি বলেই কি বলে চলে যাব। একে বলে কাজ তো বুড়োর ওপর কম নয়। সাহেব ব্যাটাদের সামনে কি বলে—যেতে এই বুড়ো। আসরে একে বলে গোলমাল হচ্ছে—ও ব্যাটারা বলবে একে বলে—হে বড়াবাবু, প্লিজ সি, ইট ইজ ভেরী নয়েজী। প্লিজ সি। ওদিকে রান্নাশালে কি বলে ঠাকুররা বলবে—বড়বাবু কই, একবার ডাকুন—মাংসের নুনটা দেখিয়ে নেব। আবজুসের জল কি বলে হয়ে গেছে, সেটা কি বলে দেখতে হবে। দাঁড়িয়েই কি বলে ভাল। নইলে মশায় একে বলে আমি গপ্পে মানুষ, বসলেই কি বলে জমে যাব।

—বলুন।

—জনা। জনাই হবে। জনা কি বলে আমাদেরও মত। কিন্তু সতীতুলসী সম্পর্কে একে বলে পাষণ্ডরা কি বলে জানেন? কি বলে—বলে ভালগার।

বলে খালি চেয়ারে বসে অনেকগুলি একে বলে ও কি বলে সহযোগে ব্যাপারটি বললেন। বলে বললেন—তাহলে কি বলে তাই হোক, জনাই একে বলে হয়ে যাক। ওই মেয়েটিকে—এই যে গো—তা তুমি, কি বলে ওল্ডম্যান, তুমিই বলছি—কি বলে রাগ করো না—অ্যাঁ?

মঞ্জরী বুঁচি অলকা শোভা এবং আরও অনেকেই এসে দাঁড়িয়েছিল। কি হবে তাই জানবার জন্য। অলকা সামনেই ছিল। সে বললে—না না না। বলুন না—তুমি। কি মনে করব?

—না গো, কি বলে মডার্ন গার্ল তোমরা। একে বলে—বলে বসতে পার—তুমি কাকে বলছেন—একে বলে আপনি বলতে পারেন না? বলে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন—নাচটা কিন্তু ওয়াণ্ডারফুল কি বলে—ব্যাটাদের একে বলে মাথা ঘোরানো হয়—। বুঝেছ! তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—যাই তাহলে কি বলে। আপনারা কি বলে রেডি হোন—

অলকা আশ্চর্য নাচলে। সাহেব থেকে সাধারণ লোক থেকে দলের লোক পর্যন্ত থ মেরে গেল। রিহারস্যাল জনার হয় নি। নাচের গানের রিহারস্যাল সে দিয়েছিল, কিন্তু সেজেগুজে রিহারস্যাল দেয় নি। তার মেক-আপ, তার সাজ—নাচের মধ্যে সেই মেক-আপে এবং নাচের ব্যঞ্জনা ও মুদ্রায় একটা আশ্চর্য কিছু করে ফেললে। প্লে অবশ্য গোড়া থেকেই জমেছিল। বংশী এবং আশা গোড়াতেই মহিষাসুর বধ নৃত্যনাট্যের ভঙ্গিতে নেচেছিল। সাধারণ লোকের তা ভাল লাগার কথা, লেগেছিলও তা; একজন সিংহ সেজেছিল; দস্তুরমত লেজ মুখ কেশর নিয়ে সিংহ। ঘাড় নেড়ে, হাত-পা চারটেই গেড়ে চতুষ্পদের অঙ্গভঙ্গিতে লাফিয়ে বেশ কৌতুকের সৃষ্টি করেছিল। সায়েবরাও উপভোগ করেছিল। বড়বাবু পাশে বসে 'কি বলে' ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন ইংরিজীতে। বলছিলেন—ডেমন দি বাফেলো অ্যাণ্ড ইটারন্যাল মাদার অ্যাণ্ড গডেস অব অল পাওয়ার—উই কল হার সৃষ্টি স্থিতি লয়রূপিণী। কি বলে—বেগ ইওর পার্ডন—আই মীন—। যাই হোক বুঝিয়েছিলেন কোন রকমে।

তারপর পালা আরম্ভ হল—রীতুবাবু নীলধ্বজ, জনা মঞ্জরী, স্বাহা গোপালী, অগ্নি রমণী নাগ, প্রবীর গোরাবাবু, মদনমঞ্জরী বুঁচি, শোভা গঙ্গা, অর্জুন নাটু, বিদূষক বাবুল।

রীতুবাবুই জমিয়ে দিলে ভরাট কণ্ঠস্বরের বক্তৃতায়। তারপর বিদূষক বাবুল আজ বাক্য থেকে জোর দিয়েছেন অঙ্গভঙ্গিতে। গোড়া থেকেই খোঁড়ানো চলন ধরেছিল—যেন বিদূষক বাতে ভুগছে। ঢুকেই হাঁটুতে হাত দিয়ে বলেছিল—বাতং!

অমনি আসর হেসে সারা। গতকালের ঝঞ্ঝাটং ঝঞ্ঝাটং শতং ঝঞ্ঝাটং জমাতং ময়ো—মনে পড়েছিল। সাহেবরা বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিল—হোয়াটস ছাট? লেম ম্যান?

—নো সার। কি বলে—ওল্ডম্যান হ্যাস রিউম্যাটিজিম।

—হু ইজ হি ?

—কোর্ট ক্লাউন।

সায়েব হাততালি দিয়ে বলে উঠেছিল—ওয়াণ্ডারফুল !

রীতুবাবু ভুরু কুঁচকিয়েছিল। কেউ ক্ল্যাপ পেলে অন্যের ভুরু আপনি কোঁচকায়। তার উপর বইয়ের বাইরে গেছে বাবুল। কিন্তু তারপরই হাসলে—হুঁশিয়ার লিটিল ব্রাদার। সায়েবরা হাসছে হাসুক।

এর পরই জনা আর প্রবীর। আসর স্তব্ধ হয়ে গেল। বড়বাবু বললেন—জনা অ্যাণ্ড প্রবীরা, মাদার অ্যাণ্ড সন। মাদার এ গ্রেট হিরোয়িক লেডী।

সায়েব বললে—স্টপ বড়াবাবু, স্টপ।

কথার সুর ও সঙ্গীতের প্রভাব বিদেশীগুলোকেও আচ্ছন্ন করেছিল। মধ্যে মধ্যে তারা সেই টাইপ করা কাগজ থেকে দেখে বিষয়টা বুঝে নিচ্ছিল। ফিস্‌ফিস্ করে মেমসাহেবদের বলে দিচ্ছিল। তারা বলেছিল—ছাটস ওয়াণ্ডারফুল। বিউটিফুল অ্যাক্‌টিং। ইয়েস।

প্রতিটি সিনের শেষে গ্লাস পূর্ণ হচ্ছিল, এবং হাতে নিয়ে সিপ্‌ করতে করতে পরের সিনটা শেষ করছিল। মদনমঞ্জরী সেজে বুঁচি আসতেই তারা উৎসাহিত হয়ে বললে—হাউ বিউটিফুল! লাভলি কুইন !

—বাট দি মাদার—দি গ্রেট হিরোইন—ইজ লাভলিয়ার। সি ইজ ওয়াণ্ডারফুল। বলেই সায়েব বললে—আই উইশ হার অল সাক্‌সেস। বড়াবাবু টেল দেম—হার সন—মাস্ট উইল দি ব্যাটল। মাস্ট। বোথ অব দেম আর গ্রেট অ্যাক্‌টারস্। আই ড্রিঙ্ক দেয়ার হেলথ্‌। ওয়েল—

গ্লাসে গ্লাসে ঠেকে শব্দ হল—ঠুন—ঠুন—ঠুন।

বড়বাবু বুঝলেন—ব্যাটারা কি বলে মরেছে। না মরুক মজেছে, কি বলে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

হঠাৎ আসরে যেন শূন্য থেকে আবির্ভূত হল মোহিনীমায়াবেশিনী অলকা। একখানা চাদর আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে সে এসে আসরে যাত্রীদের পাশে কখন বসে পড়েছিল। প্রবীর যুদ্ধে অর্জুনের সঙ্গে সমকক্ষ যোদ্ধার মত যুদ্ধ করে পাণ্ডবসৈন্য নিহত করে ঘরে ফিরছিল মায়ের কাছে। গঙ্গার উপাসিকা জনা—গঙ্গার কাছে বর পেয়েছেন—তাঁর গঙ্গাপূজার প্রসাদধন্য হাত মাথায় ঠেকিয়ে পুত্র যুদ্ধযাত্রা করলে—স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে সে অজেয় হবে। আজও সে অজেয় হয়েই ফিরছে—কাল নিশ্চয়ই বিজয়ী হবে—কাল মায়ের গঙ্গাপূজা ব্রত শেষ হবে—গঙ্গার কাছে মহাস্ত্র পাবেন জননী জনা—সেই মহাস্ত্রে অর্জুনকে নিহত করবেন বা পরাজিত করবেন প্রবীর। তিনি চলেছেন প্রাসাদে ফিরে—সেখানে পত্নী মদনমঞ্জরী মাল্য হাতে প্রতীক্ষা করছেন—বরণ করবেন—ওষধিযুক্ত চন্দন পঙ্ক প্রস্তুত করে রেখেছেন—বীর স্বামীর দেহের অস্ত্রখতমুখে প্রলেপ দেবেন। সখীরা নৃত্যগীতে তাঁর যুদ্ধচিন্তাভারাক্রান্ত চিত্তকে প্রসন্ন প্রশান্ত করবে। হঠাৎ পথের মধ্যে আবির্ভূত হল দেবপ্রেরিত মোহিনীমায়া।

নাটকের অভিনয়ে প্রবীর আসরে প্রবেশ-পথের দিকে পিছন ফিরে তার বক্তৃতা (সলিলকি) সেরে প্রাসাদে যাবার জন্য ওই পথের দিকে ফিরবার সময় ওদিক থেকে মোহিনীমায়া গান ধরে ধীরে ধীরে আসরের দিকে আসবে এবং প্রবীর পিছিয়ে আসবে—এইটেই ছিল নাটকীয় নির্দেশ। অলকাকে তা বলেও দেওয়া হয়েছে। অলকা রিহারস্যাল দিয়েছে, অভিনয় করে নি। রিহারস্যালের সময় শিশিরকুমার এতে যে নতুন ব্যঞ্জনা দিয়েছিলেন তার কথাও হয়েছে। অলকা সে সব দেখে নি—শুনেছে। গোরাবাবু মঞ্জরী সে অভিনয় দেখেছে। তার কথায় পঞ্চমুখ তারা। হবে নাই বা কেন—তারাসুন্দরী জনা—শিশিরকুমার প্রবীর। তারাসুন্দরী নাকি শেষ বয়সে পুত্রশোক পেয়ে সব ছেড়ে প্রায় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন, স্থির করেছিলেন—আর অভিনয় করবেন না। শিশিরকুমার

এসে তাঁকে তাঁর সম্প্রদায়ে যোগ দিতে অনুরোধ করে বলেছিলেন—আমরাও তো আপনার সন্তানতুল্য। আমাদের নিয়ে এ শোক কাটিয়ে উঠুন। অভিনয়ই তো আপনার সাধনা। শোকে সাধনা পরিত্যাগ করবেন? তারাসুন্দরী একটু ভেবে বলেছিলেন—বেশ, তাই হল। তোমরাই সন্তান। নামব আমি তোমার সঙ্গে। তবে প্রথম বই কর জনা। তিনকড়ি দাসী—তখন তো দাসীই বলত আমাদের—তিনি করেছিলেন জনা। এত ভাল করেছিলেন যে তিনকড়ি মরার পরও আমি পার্ট করতে সাহস পাই নি। পুত্রশোক বুকে নিয়ে নামব—ওই পার্টই আমি প্রথম করব।

তাই করেছিলেন—এবং বাংলার অভিনয়ের ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় অভিনয়। মঞ্জরী তা দেখেছে। সে তাঁকেই অনুসরণ করে। আজও করছে। এরই মধ্যে সে নিজেকে গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অলকাও নিজে আজ সারাদিন মনে মনে অনেক ভেবেছে। আজ অভিনয় শুরু থেকে অধিকাংশ অ্যাক্টর-অ্যাক্ট্রেস আসরের প্রান্তে জনতার সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে আছে। অভিনয় পুরনো, কিন্তু আসরে আজ সাহেব মেম জাঁকিয়ে বসেছে—মদ খাচ্ছে—তারিফ করছে—তালে-বেতালে একটা কিছু করে বসছে—সেই কৌতুক তারা উপভোগ করছে; তার সঙ্গে সাহেব মেম বলে বেশ সম্ভ্রম খাতিরও আছে বইকি! এরই মধ্যে ভেবে ভেবে অলকা তার প্রবেশ সম্পর্কে একটা নতুন পথ বের করেছে। সে মোহিনীমায়া—মায়ার মতই সে আবির্ভূত হবে।

প্রবীর ঘুরে দাঁড়াল—বেরিয়ে যাচ্ছে প্রাসাদের পথে। এদিকে যন্ত্রীরা মোহিনীমায়ার গানের সুরটি ধরেছে। বেয়ালাদার বাঁশী সব মৃদুস্বরে ধরবার মুখের সুরটি হারমোনিয়মের সঙ্গে মিলিয়েছে। মন্দিরা-বাজিয়ে মন্দিরা বেঁধে তৈরী; কিন্তু তাকিয়ে আছে প্রবেশ-পথের দিকে। কিন্তু কই, মোহিনীমায়া অলকা কই? আসরের প্রান্তে যারা দাঁড়িয়েছিল দলের লোক, তারা সবিস্ময়ে গ্রীনরুমের

মুখের দিকে তাকিয়ে—কই? গোপাল ছুটে ভিতরে গেল—বিপিন, মোহিনীমায়া? কই!

হঠাৎ হাততালি পড়ল আসরে। হাততালি দেবার মত ব্যাপার বটে। অলকা তার নিজের একখানা সাদা চাদর আপাদমস্তক জড়িয়ে কখন এসে ওই প্রবেশ-পথের ধারে অভিনয়মুগ্ধ দর্শকদের মধ্যে বসে পড়েছিল। প্রবীর ও যন্ত্রীরা উৎকণ্ঠিত হয়েছে। প্রবীর ভাবছিল—সে চলে গিয়ে গ্রীনরুম থেকে ওকে আগে পাঠিয়ে ওর পিছনে পিছনে মোহমুগ্ধের মত আসবে নাকি? এ ছাড়া তো উপায় নেই। এই মুহূর্তটিতেই শ্বেতবস্ত্রাবৃত মূর্তিটি উঠে ঠিক আবির্ভূত হওয়ার মতই একখানি হাত বাড়িয়ে পথ আগলে দাঁড়াল এবং তার সাদা আবরণটি খসে পড়ে গেল।

বেশও তার অপূর্ব। অপূর্ব মেক-আপ করেছে, সেজেছে।

ফিনফিনে গোলাপী অর্গ্যাণ্ডির একখানি ওড়না মাথায়—ঊর্ধ্বদেহ অনাবৃত মনে হচ্ছে—অনাবৃত নয়, পেণ্টের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে রঙ করা তার সিল্কের ইল্যাস্টিক—গেঞ্জির মত জামা ছিল নাচের জন্য—সেটা গায়ে দিলে মনে হয় বুঝিবা অনাবৃত-দেহা। বুকে অজন্তার ছবির মেয়েদের মত গাঢ় নীল রঙের একফালি ন্যাকড়া বাঁধা। পরনে খুব মিহি, নীল অর্গ্যাণ্ডির কাপড়ে কোমর পর্যন্ত আবৃত। কুঁচিয়ে থাকে থাকে তাকে ঘাঘরার মত দেখাচ্ছে। তাও বেশ খাটো করে গুটিয়ে পড়েছে। পায়ের গোছ অর্ধেক বেরিয়ে আছে। একবার এম্পায়ারে দেবদাসী নৃত্যে এইরকম সেজেছিল সে। মাথার চুল তার বেশ ভালই আছে, তার দুটি গোছা দুই কানের পাশ থেকে কাঁধ বুক পর্যন্ত ঝুলছে। পিঠে একগোছা ঝুলছে, বাকীটা সুন্দর একটি চূড়ার মত করে এমন ভাবে উচু করে বেঁধেছে যে তার চেহারার খাটো ভাবটা ঘুচে বেশ দীর্ঘাঙ্গী দেখাচ্ছে।

অবাক হয়ে গেল গোরাবাবু। শুধু গোরাবাবু নয়—দর্শকেরাও,

দলের লোকেরাও। হাততালি পড়ে গেল। রীতুবাবু বললে—আরে ব্বাপরে—করলে কি?

মোহিনীমায়া তখন ত্রিভঙ্গিমঠামে দাঁড়িয়ে—একটি হাত বুকে, অন্য হাতখানি মুঠো বেঁধে তার উপর চিবুকটি রেখে মৃদু মৃদু দুলছে—মুখে মৃদু হাসি। যন্ত্রীরা অবাক হয়ে ভাবছে গান ধরবে কখন!

মোহিনীমায়া অশরীরী যেন দুলছে।

গোটা আসরটা মোহমুগ্ধ হয়ে গেছে। সাহেবদের হাতের গ্লাস হাতে আছে। আঙুলে ধরা সিগারেট পুড়ে যাচ্ছে। বার বার গোরাবাবু প্রশ্ন করলে—কে? কে? কে তুমি?

এরই মধ্যে গান ভাষা পেলে।

অলকা গাইলে—ধরা দিতে গিয়ে পারি নি
আমি যে সোনার হরিণী—
মরুর অঙ্গে বায়ুতরঙ্গে মরীচিকা মনোহারিণী।

দুই

মঞ্জরী আপনার কাপড়-ঘেরা ছোট সাজ-ঘরটিতে অভিভূতের মত বসেছিল। তারাসুন্দরীর অভিনয় মনে করছিল। মনে মনে গোটা পার্টটা ভাবছিল—কল্পনা করতে চাইছিল—প্রকাণ্ড প্রচণ্ড একটা মহাবিপর্যয় তার জনা জীবনকে গ্রাস করতে আসছে।

ছুটে এল বুঁচি—মঞ্জরী!

চমকে উঠল মঞ্জরী—কি হল?

—অলকা যা করছে না, তা আশ্চর্য! ওঃ, আশ্চর্য!

একটু হেসে মঞ্জরী বললে—খুব ভাল নাচছে বুঝি?

—দেখবে এস। না দেখলে বুঝতে পারবে না। এ ডিরেকশন কার? এই মেক-আপ? মনে হচ্ছে যেন গায়ে জামা নেই। বুকে শুধু কাপড় বেঁধেছে। গোরাবাবু পর্যন্ত পার্টের পোজ ভুলে যাচ্ছে।

অবাক হয়ে দেখছে। সাহেবগুলো হাঁ করে যেন গিলছে। গিলছে সবাই। সবাই ভাবছে খালি গা তো! বড্ড বেশী হয়ে গেছে।

মঞ্জরী উঠল এবার। এসে সে পুরুষদের ঘরের জানলার ধারে দাঁড়াল। বেশকারী শিবু জানলায় দাঁড়িয়ে দেখছিল—সেও এমন মগ্ন যে মঞ্জরীর পায়ের শব্দ সে পায় নি। মঞ্জরী বললে—একটু সর তো শিবু। আমি একটু দেখি।

মঞ্জরীরও ভ্রম হল। বিস্ময়ও বোধ করলে—এ অলকা! খাটো মাথায় মেয়েটা দীর্ঘাঙ্গী তন্বী হল কি করে! জামা বা ইল্যাস্টিক গেঞ্জির অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে একটি গোলাপবর্ণা অপরূপা মেয়ে অর্ধনগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, বুকে একখানি অপর্যাপ্ত গাঢ় নীল বক্ষাবরণী রয়েছে মাত্র। মাথার স্বচ্ছ পাতলা ওড়নাটার আবরণ আরও বিভ্রম জাগাচ্ছে। পরনে ঘাঘরার মত পরা কাপড়খানাও খাটো, প্রায় হাঁটুর নিচে থেকেই সব দেখা যাচ্ছে। বঙ্কিম লীলায়িত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দুলছে যেন নাগিনীর মত। ওর মুখ দেখা যাচ্ছে না। সামনে দাঁড়িয়ে প্রবীর। গোরাবাবুও সত্যি সত্যি যেন— ; নার্ভাস হয়ে গেল নাকি!

অলকা গাইছে—

চিরচঞ্চল মম চরণ দুখানি ক্লান্ত অতি ক্লান্ত
পারি নে আর যে পারি নে ওগো পান্থ ওগো পান্থ
বন্ধন কর বন্দিনী কর—আমি বন্ধন ভিখারিণী—

দুখানি হাত সে প্রসারিত করলে। এবার গোরাবাবুর সম্বিৎ ফিরেছে। সে অগ্রসর হল। সে বললে—

চিনিয়াছি, চিনিয়াছি তোমা। তুমি যে বিজয়লক্ষ্মী
ত্রিভুবনে গরিমা সুষমা! গৌরবে গঠিত তনুখানি
সর্ব অঙ্গে অপরূপ সুখের সুষমা! ধরা দিতে এসে ধরা দিতে নার,
পরিপূর্ণ জয় পায় না মানব। কুরুক্ষেত্র রণে জয়ী ধনঞ্জয়

তবু তার বক্ষে শেল অভিমন্যু শোক! তোমারে সে
পেয়েও পেল না।

অশ্বমেধ রণোদ্যম তারই লাগি। কিন্তু তাও সে পাবে না।

পরাজিত আমি কাল করিব তাহারে; তাই—তাই তুমি

ধরা দিতে আসিয়াছ মোরে। ক্লান্ত তুমি—অতি ক্লান্ত,

এস এস বীরের মানসী এই মোর বীরবক্ষে

রাখ তব শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ, লভ দেবী নিশ্চিন্ত বিশ্রাম।

অগ্রসর হল সে।

মোহিনীমায়া নৃত্যছন্দে মুখর হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পাতলা ওড়নাখানিও খসে মাটিতে পড়ে গেল। যেন দেহের সকল আবরণ খুলে ফেলে নগ্ন বক্ষের সুষমা সুরভি দিয়ে আহ্বান করছে সে প্রবীরকে।

সায়েবরা হাততালি দিয়ে উঠল। এখানকার অ্যাংলো ম্যানেজার হেলি সায়েব বলে উঠল—ইয়া! দ্যাটস ওয়াণ্ডারফুল! ইয়া!

এখানেই শেষ নয়। সে নাচতে লাগল। নাচতে নাচতে এগিয়ে এল প্রবীরের কাছে—এবং ঠিক সেই মুহূর্তটিতে বক্ষাবরণী নীল কাপড়ের টুকরোটা খসে মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অলকা প্রবীরের পিঠে ঝোলানো ভেলভেটের টেলখানাকে টেনে নিয়ে নিজেকে ঢেকে প্রবীরকে ধরে যেন তাকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

গোটা আসরটা হাততালি সিটি আর শিসে ভরে গিয়ে হৈ হৈ করে উঠল। কে একজন বলে উঠল—হরিবোল—

সঙ্গে সঙ্গে হরিবোল আর উল্লসিত উচ্চ হাসি। হেলি সায়েব উঠে দাঁড়িয়ে বললে—ইয়া! দিশ ইজ ড্যান্স—এ রিয়াল ড্যান্স!

এর পরও ছিল। এর পরই মোহিনীমায়াকে অনুসরণ করে প্রমত্ত প্রবীর আসরে ঢুকেই তার ভয়ঙ্করী মূর্তি দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। তারপর প্রভাতে উঠে আক্ষেপ করতে করতে নিজের অসংযমকে ধিক্কার দিতে দিতে প্রস্থান করবে।

গ্রীনরুমে ঢুকেই অলকা চুল খুলে ফেললে। খানিকটা লাল রঙ নিয়ে মুখে মেখে একখানা কালো চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে এল। প্রবীর দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। তাকে বললে—আসুন।

আসরে গিয়ে কালো চাদরখানা মাথা থেকে নামিয়ে নিজেকে প্রকাশিত করলে। চুল তার লাল রঙ-মাখা মুখের উপর এসে পড়েছে—সে অট্টহাসি হেসে উঠল। প্রবীর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

কিন্তু অট্টহাসি সে ভাল হাসতে পারলে না।

তবু হাততালি পড়ল।

বিলেতের সাহেব বড়বাবুকে কি বললেন। তখন প্রবীর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। যন্ত্রসঙ্গীত বাজছে। এই অবসরে বড়বাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আমাদের কোম্পানীর বড় সাহেব যিনি বিলেত থেকে এসেছেন—তিনি এই নাচের জন্য মোহিনীমায়ার অভিনেত্রীকে একখানি সোনার মেডেল দেবেন।

আবার হাততালি পড়ল। হেলি সাহেব উঠে নিজের বুকে বুড়ো আঙুল রেখে বললে—me too. আমি একটি দিব।

তারপর তাঁরা পরম উৎসাহে মদ ঢাললেন গ্লাসে। মেমসাহেব দুজন যেন স্তম্ভিত হয়ে বসে আছে।

শুধু সাহেবরা নয়—রীতুবাবু, বাবুল বোস, নাটু এরা ফিরে এসে সাজঘরে বসল, রীতুবাবু বললে—এ তো যে-সে মেয়ে নয়! এ কি করলে লিটল ব্রাদার?

বাবুল বললে—ওই হেলি সাহেবের ভঙ্গি অনুকরণ করে বললে—me too. আমাকে শুদ্ধু হতবাক করে দিয়েছে!

—ঢাল, গেলাস ভর। নাটুকে শুদ্ধু দাও।

যোগা গান গাইতে গাইতে ঘরে ঢুকল—এ কি রঙ্গ কর হে শ্যাম, রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে যায়। হ্যাঁ, রঙ্গ একখানা দেখালে বটে! পেলে ফায়ার রীতুবাবু!

—একদম টেনে নাও পরমানন্দে।

—নিশ্চয়, শুতি ভাতি প্রভাতী ; এ হল সকাল—ভাত খাবার পর, শোবার আগে নিয়ম মতন। এ ছাড়া আঁতাতী—উল্লাসী যখন তখন। আঁতাতী—

—বলতে হবে না, জানি। আঁতাতী মানে বন্ধুত্বের খাতিরে—উল্লাসী মানে উল্লাস হলেই। কেমন তো? এটা উল্লাসী।

—এটা উল্লাসী। রীতুবাবু ছাড়া জানবে কে?

—নিশ্চয়, রসিকের কথা রসিকে বোঝে, তুমিও রসিক, আমিও রাসক।

—মরি মরি মরি। কি নাচলে বলেন তো? আর গোরাবাবুর চোখের তারিফটা বলুন তো! রসিকের কথা রসিকে বোঝে। "রীতুবাবু কই! রীতুবাবু কই! সব শূন্য রীতুবাবু বই!"

বাবুল বললে—রাবিশ! হোয়াট ননসেন্স টকিং বিগ ব্রাদার? গেলাস শেষ করুন।

গোপাল এসে বললে—যোগাবাবু, তোমার গান। ভুলে মেরেছ না কি!

—হেই মা রে! তাই পারি! দাঁড়াও—

কোঁচড় থেকে নিভিয়ে রাখা গাঁজার কল্কেটা বের করে হাতে ধরে বললে—দেশলাই মেরে দাও ভাই ম্যানেজার। না, এসে খাব। সেই ভাল।

বলে সে ছুটেই চলে গেল।

রীতুবাবু বললে—কর্তা কই? গোপালচন্দর?

গোপাল বললে—খোদ প্রোপ্রাইট্রেসের ঘরে। প্রোপ্রাইট্রেস রেগে গিয়েছিল, না বলে কয়ে নিজের খুশিমত মেক-আপ করার জন্যে, আর ওইভাবে এন্ট্রান্সের জন্যে।

বাবুল বললে—জেলাসি! উয়োমেন আর অল জেলাস। মেডাল পেলে!

রীতুবাবু সিগারেট ধরিয়ে বললে—কর্তা কি বলছেন ?

—বোঝাচ্ছেন প্রোপ্রাইট্রেসকে। অন্যায় করেছে, কিন্তু প্লে খুব ভাল করেছে। অদ্ভুত করেছে। প্রোপ্রাইট্রেস বলছেন—তা নাই হত—অদ্ভুত না হয়ে ভূতই হত। কিন্তু তুমি থেমে গেলে কি হত ? গিয়েছিলে তো থেমে।

—কর্তা কি বলছেন ?

—বলছেন—হ্যাঁ, তা একটু বটে।

—অলকা ?

—সে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

নাটু গেলাস শেষ করে নামিয়ে বললে—ম্যানেজার, জলপানির ব্যাপারটা খোলসা করে ফেল আজ। তুমি বড় জড়িয়ে রাখছ।

গোপাল বললে—বেশ তো, করে ফেলুন। কত্তাকে বলুন, প্রোপ্রাইট্রেসকে নিয়ে বসুন। যা হয় করে ফেলুন। যা বলবেন, তাই করব আমি। আমার কি বলুন ? তখন সেই মাইনে যখন বাড়ানো হল, তখন আমি বলেছিলাম। কথাও হল।

বাবুল বোস সিগারেট হাতে ভাবছিল। আজ অলকার এই আশ্চর্য নৈপুণ্য দেখে সে শুধু অবাকই হয়ে যায় নি, তার মনে নেশাও ধরেছে। তার শিল্পী-মন একটা আছেই, সে মনকে সে তার বাস্তব বুদ্ধির বাঁধনে বেঁধে কায়দা করে রাখে। হিসেব করে বারবার। আজ কিন্তু বাঁধন আলগা হয়ে গেছে। হিসেব সব মুছে ফেলতে ইচ্ছে করছে। এর মধ্যে উৎসাহবশে একটু পানমাত্রাও বেশী হয়েছে। রীতুবাবু তার গেলাসে অনেকখানি ঢেলে দিয়েছিল, সেও আপত্তি করে নি। বেশ একটু থমথমে হয়ে পড়েছে মন-মেজাজ। হঠাৎ কথাটা কানে যেতেই মুখ তুলে ফিরে তাকিয়ে বললে—হোয়াট কথা ? নো কথা। কথা হল যদি তবে ফার্স্ট বায়না রতনপুর, দেয়ার ছাট ওল্ড ম্যান বড়বাবু ঝুলনের রাত্রে লুচি খাওয়ালেন। নট যেমন তেমন লুচি, নট দালদার

কারবার—রিয়াল ঘিয়ে ফ্রায়েড। কিন্তু সে রাত্রে জলপানি এভরি-ওয়ান গট। ইউ, আপনি পে করেছেন। করেন নি?

গোপাল বললে—সেটা বছরের প্রথম গাওনা, কত্তার দাদু মারা গেছে খবর পেয়েছেন, মুষড়ে আছেন—আমি গেলাম বলতে যে তাহলে জলপানিটা আজ দেওয়া হবে না তো, তো উনি বললেন—আমার দেহ মন ভাল নেই গোপালবাবু, যা হয় করুন গে। আর, প্রথম গাওনাতেই কেটে নিয়ে লোকের মেজাজ খারাপ করে কাজ নেই।

—ইয়েস, ইয়েস, ইয়েস, ওইটেই নজীর। কথা হলেও ফাইন্যাল হয় নি।

আসরে যোগাবাবুর একখানা ধ্রুপদাঙ্গের গান সদ্য শেষ হয়েছে। বক্তৃতা আরম্ভ হয়েছে মদনমঞ্জরী আর স্বাহার। হঠাৎ একটা গোলমাল এসে ঢেউয়ের মত ধাক্কা দিলে। সমুদ্রের জোয়ারের বড় বড় এক একটা ঢেউ যেমন আছড়ে এসে পড়ে উপরের তটে, অনেক দূর পর্যন্ত এসে নিশ্চিন্ত আলাপমগ্ন মানুষদেরও চঞ্চল করে তোলে, তেমনি ভাবেই আসরের গোলমালটা সাজঘরে এসে এদের চঞ্চল করে তুললে।

—কি হল?

গোপাল দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল। রমণী নাগ জানলার পর্দা ফাঁক করে দাঁড়াল।

রীতুবাবু জিজ্ঞাসা করলে—আসরে কে রমণী? এখন তো মদনমঞ্জরী আর স্বাহা? বুঁচি আর গোপালী?

—হ্যাঁ। ওরাই।

—হুঁ।

—হুঁ মানে? বাবুল জিজ্ঞাসা করলে।

—মানে, এখানটা ডাল বরাবরই হয়। ওই নাচগানের পর মদনমঞ্জরীর করুণ কান্না সব মিইয়ে দেয়, অডিয়েন্সের নাচের ঘুঙুরে

বাঁধা মেজাজে কান্না ভাল লাগে না। আজ তো তোমার অলি সুন্দরী ফায়ার করে দিয়েছে।

রমণী জানলা থেকে বললে—হ্যাঁ, মদনমঞ্জরী যেই সখীকে বলেছে, না না না, কাঁদিতে আমারে কেউ করো নাকো মানা। আমারে কাঁদিতে দাও। অমনি কে বলেছে, এই মরেছে। সঙ্গে সঙ্গে কে বেড়াল ডেকে উঠেছে।

বাবুল বলে উঠল—গুড আল্লা—

গোরাবাবু ব্যস্ত হয়ে ঘরে এসে ঢুকল—শিবু! শিবু—দে দে, চোখের কোলে কালী দিয়ে দে। এগুলো নে।

তারপর বললে—মঞ্জরী ঠিক ধরেছিল মাস্টারমশাই, আমি অলকাকে সাপোর্ট করছিলাম : মঞ্জরী বলছিল. একজনের খুব ভালো করে পার্ট করার ফলও আছে। কিন্তু এক্ষুনি ফলে যাবে ভাবি নি।

—এ জায়গাটাই ভাল। ওই নাচের পর। মহাকালের ওই ধ্রুপদাঙ্গের গানে নাচের রেশ ঠিক মরে না।

—কিন্তু চলেও তো আসছে বরাবর।

—হ্যাঁ। কিন্তু অলি প্যাটার্নে কেউ তো নাচে নি।

—তা ঠিক। আমিও তো প্রথমটা বেশ থমকেছিলাম। এ কি রে বাবা!

—দেখেছি।

—মেয়েটা মশায় চান্স পেলে বড় অ্যাক্‌ট্রেস হবে।

আবার অকস্মাৎ একটি তীক্ষ্ণ উচ্চকণ্ঠ যেন শব্দের সংকেতে বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠল।—

ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে মাহিস্মতী কুলবধূ
বীরশ্রেষ্ঠ প্রবীর প্রেয়সী ক্ষত্রিয় নন্দিনী
নয়নে অঞ্চল চাপি কাতর ক্রন্দন
ধর্ম নয় তব, সাজে নাকো তোর। তুই বীরাঙ্গনা!
কিসের ক্রন্দন? কেন এ ক্রন্দন তোর? ফেরে নি প্রবীর?

আয় মোর সাথে। এই দেখ হাতে মোর খর তরবারি—
এই দেখ বক্ষে মোর বর্ম বাঁধিয়াছি। চলিয়াছি রণক্ষেত্রে।
বাঘিনী থাকিতে বেঁচে কার সাধ বধ করে শাবকে তাহার?
নর ব্যাঘ্র প্রবীরের পত্নী যদি সত্য তুই—তবে তুইও বাঘিনী—
তোর কণ্ঠে সাজে না ক্রন্দন। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে মরণ হুঙ্কারে
কম্পিত করিয়া চারিদিক—বাঘনখ, খরসান কৃপাণ লইয়া
আয়—আয় মোর সাথে।

স্তব্ধ আসরে স্তব্ধতা ভঙ্গ করে কে বলে উঠল—ক্যাপিটাল!

তারপরই চটপট শব্দে হাততালি।

গ্রীনরুমের মধ্যে এরা সকলে স্তব্ধ এবং স্থির হয়ে শুনছিল। আসরের হাওয়াটা যেন এখান পর্যন্ত এসে স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে গেছে। হাততালির শব্দে এদের স্তব্ধ ভাবটা কেটে গেল। রীতুবাবু বলে উঠল—সাবাস সাবাস সাবাস!

বাবুল বলে উঠল—ওয়াণ্ডারফুল!

গোরাবাবু চোখের কোণে কালী নিয়ে মাথার চুল উস্কোখুস্কো করে তৈরী হচ্ছিল পরের দৃশ্যের জন্য। সে বলে উঠল—রেগে গেছে মঞ্জরী। পিচ্ চড়িয়েছে জোর। নাটুবাবু, এই পিচে ধরতে হবে।

নাটুবাবু অর্জুন।

গোপাল হন্তদন্ত হয়ে এসে বললে—আপনাদের—

—ঠিক আছি আমরা।

গোপাল বললে—এরপর আর জুড়োতে দেবেন না। যা হয়েছিল না! বেড়াল ডেকে উঠতে লোকে হি-হি হা-হা করে উঠেছে আর বুঁচির মত অ্যাক্ট্রেসের গলা বসে গেল, গোপালী কাঁপছে। সঙ্গে সঙ্গে বুয়েছেন, উনি ঢুকে পড়েছেন—স্বাহার পাট আর বলা হয় নি।
বিনোদ বললে—প্রোপ্রাইট্রেসের যা মুখ হয়েছিল তখন! আর চোখ!

—ওরকম হয়, বুঝলে, এলেম থাকলে ওরকম হয়। কাজ দেখ দিকি—বিড়েল ডাকছে! আবাগীর বেটারা কোথাকার!

ঘরে ঢুকল যোগানন্দ—এমনি করে শোধ নেয়। কণ্ঠমশায় নিয়েছিলেন লাবপুরে। তখন দলে ঢুকি নাই, শুনেছি। বুয়েছেন—ওঁর ভাই সিতিকণ্ঠকে সেবার গান করতে দেয় নি ছোকরারা, গোলমাল করে যাত্রা ভেঙে দিয়েছিল। ভাইয়ের অপমানে কণ্ঠমশায় যেচে বাবুদের লিখে বায়না নিয়ে তিন রাত্তিরি গাওনা করেছিলেন বেটাদের কান মলে। রাগ হয়।

সত্যিই রাগে যেন আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল মঞ্জরী। সাজঘরে অলকার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই রেগেছিল। শিক্ষিতা মেয়ে বলে অহঙ্কার অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু অন্য সকলকে ছোট ভাবা, অবজ্ঞা করার অধিকার আছে নাকি? সে শুধু প্রোপ্রাইট্রেস নয়—যাত্রা করছে আজ পাঁচ ছ-বছর, তার আগে থিয়েটার করেছে। সে কিছু বোঝে না?

পৌরাণিক নাটক—তার উপর ভদ্র আসর, সেখানে তুমি মোহিনীমায়া সাজছ বলে এমন সাজবে যে মনে হবে তুমি বিবস্ত্রা? এ রকম মেক-আপ করতে কে বললে তোমাকে?

অলকারও ক্ষোভের সীমা ছিল না। সে এত প্রশংসা কুড়িয়ে এসেছে—সে প্রশংসা তার একলার নয়। দলের প্রশংসা প্লে জমে গেছে আগুন হয়ে। গোটা আসর বাহবা বাহবা করছে—ছু-ছুখানা মেডেল দেবে বলেছে সাহেবরা। আর উনি তিরস্কার বলছেন—কে বলেছে এমন মেক-আপ করতে! কতটুকু বোঝেন উনি? সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারেন উনি? ক্ষোভের মাথায় সে বলে বসল—কে বলবে? ওই পার্টের ওই মেক-আপই হওয়া উচিত। তাই করেছি। ভাল করে ভেবে বুঝে বলুন না—দেবতাদের পাঠানো মোহিনীমায়া কি—কে? ওই যুদ্ধের সময় সংযমী প্রবীরকে

ভুলানো কাজটা কি শক্ত! তারপর তার রূপ ভাবুন—সে কি ভাবে এসে দাঁড়িয়েছিল, ভুলিয়েছিল ভাবুন।

মঞ্জরী নিজের রাগ অনেক কষ্টে মনে চেপে ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে রইল। কথা বললে না, পাছে শক্ত কথা বেরিয়ে যায়। এ মেয়ে তাকে নাটক বোঝায়? অভিনয় বোঝায়?

অলকা আবার বললে—তা ছাড়া গন্ধর্বকন্যায় যখন সখি সাজি, তখন বলেছিলেন—এটা আরতি নৃত্য, আর ঐ নাচটি আসলে গন্ধর্ব-কন্যার নাচ। সে পূজারিণী তপস্বিনী। তার নাচে ভক্তি পবিত্রতা ছাড়া কিছু প্রকাশ পাবে না। পোশাকও হবে অত্যন্ত শুচি। গেরুয়া রঙের কাপড় পছন্দ করে দিলেন, আমি তাই পরলাম। সাদা পোশাক পরলাম না আপনি সাদা পরবেন বলে। কথাটা ঠিক আমি মেনে নিলাম। সে সময় আপনি বলেছিলেন—মোহিনীমায়ার সময় তুমি সেজো না ইচ্ছে মত। আজও আমি ম্যানেজার ডিরেক্টারকে বলেছিলাম—আমি যদি অজন্তার ছবিতে যেমন পোশাক আছে, তেমনি ভাবে সাজি, চলবে তো? উনি বলেছিলেন—গুড গুড গুড, খুব ভালো আইডিয়া। আমি তাই সেজেছিলাম।

—উনি বলেছিলেন এই কথা?

গোরাবাবু আসর থেকে ফিরে গ্রীনরুমের বাইরে খোলা জায়গাটার দিকে গিয়েছিল। ছোট খানিকটা ঘেরা খোলা জায়গার মধ্যে একদিকে মেয়ে ও পুরুষদের জন্য স্বতন্ত্র মুখ হাত ধোয়ার জায়গা। বাকীটা পড়ে আছে। এখানে সাধারণ অ্যাক্টর সখীবেশী ছেলেগুলো বিড়ি খাচ্ছে, গল্প করছে। যে গল্প গ্রীনরুমে করা চলে না সেই গল্প। অভিনয়ের সময় এদের জীবন তিন ভাগে ভাগ হয়ে যায়। গাছের মত। অভিনয়ের আসরে ওরা ফুল ফোটায়, গ্রীনরুমে ওদের কাণ্ড, ওখানে সাজে, আলোচনা করে। আর সাজঘরের আশেপাশের এমনি জায়গায় ওদের মূল। পঙ্করস পান করে। ছোঁড়ারা বিড়ি খায়। সখীবেশী ছোঁড়াদের থুতনি ধরে আদর করে রসিকতা করে

বড়দের দু চারজন। আবার জটলা পাকিয়ে কোন বড় অ্যাক্‌টরের শ্রাদ্ধ করে। আবার খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কেউ এসে একান্তে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। হয়তো বাড়িতে ধান চাল টাকার অভাবের কথা ভাবে অথবা জ্বরে-পড়ে-থাকা যে ছেলেটাকে দেখে এসেছে তার কথা ভাবে। দু একজন আসরে পার্ট খারাপ করে এসে বিষণ্ণ মনে বসে থাকে মাথা হেঁট করে।

গোরাবাবু মুখহাত ধোওয়ার জায়গা থেকে বেরিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে ছিল। আলো এখানে খুব কম। আবছা আবছা হয়ে আছে। ছেলেগুলো এবং আর কয়েক দূতপ্রহরী অভিনেতা একেবারে অতি উল্লসিত হয়ে উঠে প্রায় অশ্লীল হয়ে উঠেছে। আলোচনা হচ্ছে অলকার নাচের। তার সারার্থ হচ্ছে—হ্যাঁ, আচ্ছা একখানা দেখালে বটে! এতবড় অ্যাক্‌টরকে ভেড়া বানিয়ে দিলে!

একজন বললে—ভেড়া নয়। আরসোলা। ঠিক মাইরী যেন কাচপোকাতে আরসোলা ধরে নিয়ে গেল।

গোরাবাবুর হাসি পেল। যাত্রার দলে গাওনার আসরে এসব কথায় রাগ হয় না, হাসি পায়। রাগের যা কিছু সাজঘরে। সে হাসি চেপেই চলে এল। মনটা তার খুশীই ছিল। অলকার এই অপূর্ব অভিনয়ের জন্যই খুশী হয়েছিল সে। মেয়েটা হবে তার আবিষ্কার।

গ্রীনরুমের ভিতরে ঢুকেই নজরে পড়ল শোভার অঙ্গভঙ্গি। সে আশার সামনে অলকার নাচের ক্যারিকেচার দেখাচ্ছে। স্থূলাঙ্গী শোভার অঙ্গভঙ্গি এবং এর পিছনে ওর ঈর্ষাতুর মনের কথা ওর অজানা নয়। হয়তো আজ সবার মুখই কিছুটা ভার হবে। এখানে একজন ক্ল্যাপ পেলে বাকী সবার মুখ ভার হয়। তারও হয়। তবে অন্য কেউ পেলে হয় না, রীতুবাবু পেলে হয়। কিন্তু অলকা কই? হুঁ, সে রীতুবাবু বাবুলের কাছে প্রশংসা শুনছে। নতুন আর্টিস্টের এ মোহ সে জানে। সে সকলের কাছে নিজে গিয়ে যেচে প্রশংসা

শুনে আসবে। মুচকে হেসে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলবে—কি করছেন? অথবা বলবে—বাবাঃ, আর পারছি নে! উঃ! তা শুনুক, অলকা প্রশংসা শুনুক, খুশী হোক। গোরাবাবু মঞ্জরীকে খবর দিতে যাচ্ছিল, অলকা সত্যিই ভাল করেছে। সে যে সে, আসরে সেও প্রায় দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিল ওর সামনে।

গোরাবাবু ঘরে ঢুকল, ঢুকেই শুনল, মঞ্জরী সবিস্ময়ে হলেও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করছে—উনি বলেছেন?

গোরাবাবু জানে, মঞ্জরী 'উনি' বলছে তাকেই। সে বললে—কি?

মঞ্জরী তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—এই যে! তুমি অলকাকে বলেছিলে এই মেক-আপ করতে?

অলকা বলে উঠল—আপনাকে আমি বলি নি? অজন্তার মেয়েদের পোশাকের মত যদি পোশাক করি? আপনি বলেন নি—

গোরাবাবু কিছু বলবার আগেই মঞ্জরী বললে—হাঁটু পর্যন্ত পায়ের গোছ বের করে পেণ্টের সঙ্গে মেলানো ইল্যাস্টিক টাইট ব্লাউস পরে বুকে একফালি ন্যাকড়া বেঁধে নামতে তুমি বলেছিলে?

গোরাবাবু একটু চমকে উঠল। এতক্ষণে তার খেয়াল হল, হ্যাঁ, পোশাকটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। মঞ্জরীর কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতা বেশ খোঁচা দিয়ে বিঁধল তাকে। গোরাবাবু বললে—যা বলছ কথাটা ঠিক। কিন্তু আর্টের দিক থেকে ভাল হবে বলেই বলেছিলাম। সায়েবরা রয়েছে। এই ধরনের নাচ ওদের ভাল লাগবে। আর—

মঞ্জরী বলে উঠল—ছি—ছি—ছি! কিন্তু এরপর? এরপর আর জমাতে পারবে?

ঠিক এই সময়েই যোগাবাবুর মহাকালের গান শেষ হল। আসর চুপ হয়ে গেছে। গোরাবাবু বললে—ওই নাও যোগাবাবু চুপ করিয়ে দিয়েছে।

পরমুহূর্তেই কোলাহল ওই সমুদ্রের বড় ঢেউয়ের মত গ্রীনরুম

পর্যন্ত এসে ভেঙে পড়ল। চকিত হয়ে কান খাড়া করে দুজনে দাঁড়াল। অলকার মুখ থমথম করছে ক্ষোভে। সে কোলাহলটা গ্রাহ্য করে নি।

মঞ্জরী দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল। তার পার্টও আছে। যাবার সময় বলে গেল—ওই শোন আবার!

সে এসে দাঁড়াল আসরের প্রবেশ পথের মুখে। পাশে দাঁড়িয়ে ছিল বরানগরের বঙ্কিম। জিজ্ঞাসা করল—কি হল বঙ্কিম?

চোখ আসরের দিকে। বুঁচিদি, গোপালীর মুখ কেমন হয়ে গেছে। গোপালী কাঁপছে যেন। গোটা আসরে ব্যঙ্গরঙ্গের উল্লাস যেন উছলে পড়ছে। খেদ কান্না ওরা আর শুনবে না। মন ওদের মাদক দেওয়া গেঁজে ওঠা তাড়ির রসে মেতে উঠেছে। আকণ্ঠ পান করেছে আদিরস। মোহিনীমায়া আদিরসের পাত্রটি উপুড় করে ঢেলে দিয়ে গেছে। কাঁচুলির বদলে বুকে বাঁধা ওই নীল রঙের ফালি ন্যাকড়াখানি খুলে ফেলে দেওয়া হয় নি—পাত্রের মুখের আবরণ ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তবু ওর রাগ হয়ে গেল। নিষ্ঠুর ক্ষোভে তীব্র প্রখর হয়ে উঠল সে। বুঁচি—গোপালী নয়—গোটা মঞ্জরী অপেরা মার খাচ্ছে। কিন্তু কি করব? হয়েছে। থাক. বুঁচি স্বাহার কথাগুলো থাক, বলতে আর দেবে না সে। সে মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে নিয়ে তার কণ্ঠস্বরকে সর্বোচ্চ গ্রামে চড়িয়ে বলে উঠল—

ধিক্ ধিক্—ধিক তোরে মাহিষ্মতী কুলবধূ—
বীরশ্রেষ্ঠ প্রবীর মহিষী!

বলতে বলতে এসে সে দাঁড়াল ঠিক আসরের প্রবেশ মুখটিতে, যেখানে প্রথম আবির্ভূত হওয়া ও কাপড় মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়েছিল মোহিনীমায়া। চোখ তার জ্বলছিল—মুখখানা ক্ষোভে রাগে আশ্চর্য রকমের উগ্র এবং থমথমে হয়ে উঠেছে। হাতে তার উলঙ্গ কৃপাণ। স্থির হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল নীরবে। দেখতে চাইলে সে কি হয়।

হল—যা সে চেয়েছিল। আসর স্তব্ধ হয়ে গেল। আশ্বস্ত হল সে। বিশ্বাস তার দৃঢ় হল। এবার সে কণ্ঠস্বর নামিয়েই তীব্র তিরস্কারের সুরে বললে—

ক্ষত্রিয় নন্দিনী, নয়নে অঞ্চল চাপি কাতর ক্রন্দন

ধর্ম নয় তব, সাজে নাকো তোরে!

বলতে বলতে আসরে ঢুকে মদনমঞ্জরী এবং স্বাহার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। মদনমঞ্জরীকে বুকে টেনে নিলে। মিষ্টসুরে বললে—তুই বীরাঙ্গনা; কিসের ক্রন্দন? কেন এ ক্রন্দন তোর? ফেরে নি প্রবীর?

হঠাৎ কণ্ঠস্বর দৃঢ় করে একটু উচ্চ করে বললে—আয় মোর সাথে, এই দেখ হাতে মোর খর তরবারী। এই দেখ বক্ষে মোর বর্ম বাঁধিয়াছি। চলিয়াছি রণক্ষেত্রে।

এরপরই তার কণ্ঠস্বরে একটা সংকল্প একটা আক্রোশ হাতের ওই সাদা ঝক্‌ঝকে নিকেলের তলোয়ারের ছটার মত যেন ঝক্‌মক্ করে উঠল, গলা চড়তে লাগল। সে বললে—"বাঘিনী থাকিতে বেঁচে কার সাধ্য বধ করে শাবকে তাহার?" তীক্ষ্ণ নিষ্ঠুর হাসি তার মুখে ফুটে উঠল। মুহূর্তপূর্বের আদিরসমত্ত দর্শকগুলো এই ক্ষুব্ধ মূর্তির সম্মুখে যেন বিহ্বল হয়ে গেছে। হাতের তলোয়ারখানা অন্যবারে এ সময় সে তোলে না, আজ তুলে ফেলেছে। উত্তেজনা—হাত কাঁপছে, সেখানাও কাঁপছে। সে আর থামলে না—বলে গেল শেষ পর্যন্ত। এবং মদনমঞ্জরীকে হাত ধরে আকর্ষণ করে সে বেশ দ্রুত পায়েই বেরিয়ে গেল। আসর তখন হাততালিতে ভেঙে পড়ছে। সে দাঁড়াল না কোথাও—এবার ঢুকবে প্রবীর আর অর্জুন। ওই যে তারা বেরিয়ে আসছে। প্রথমে প্রবীর—সে নিজেকে ধিক্কার দেবে। বলবে—মূর্খ আমি—ভ্রষ্ট আমি—ক্ষত্রিয় সাধনাভ্রষ্ট কুলাঙ্গার, বীরাঙ্গনা গঙ্গাপূজারিণী জনা জননীর অযোগ্য তনয়। ছি—ছি—ছি! এ কি করিলাম! তবু—তবু যেতে হবে জননী সম্মুখে—অপরাধ

করিয়া স্বীকার—যুদ্ধক্ষেত্রে আসি প্রাণ ত্যজি সম্মুখ সমরে, প্রায়শ্চিত্ত করিব ইহার !

সামনেই এসে পথ রোধ করবে অর্জুন। জনার সামনে গিয়ে প্রবীরকে আশীর্বাদ আনতে দেবে না। তাহলে আবার সে নতুন বলে বলীয়ান হয়ে উঠবে।

প্রবীরবেশী গোরাবাবু ঢুকবে—আসরে সে ঢুকছে গ্রীনরুমে। গোরাবাবু তাকে দেখে প্রসন্ন হেসে অভিনন্দন জানিয়ে বললে—সেলাম তোমাকে।

মঞ্জরী কেমন ভারাক্রান্ত অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। এখনও উত্তেজনার আবেগের এবং ক্ষুব্ধ মনের জের রয়েছে—সে উত্তর দিল না, ঈষৎ একটু হেসে শুধু গোরাবাবুর অভিনন্দনটি যেন স্পর্শ করে ফেলে রেখে চলে গেল। মঞ্জরী কোথাও দাঁড়াল না, পুরুষদের সাজঘরে মাস্টারমশাই রীতুবাবু বাবুল থেকে ছোট বড় সব এসে দাঁড়িয়ে আছে। সকলের মুখেই হাসি।

রীতুবাবু সহাস্যে বললে—অদ্ভুত! আশ্চর্য মোড় ঘুরিয়েছেন! বলতে বলতে থেমে গেল রীতুবাবু; কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা ফুটে উঠল—থেমে গিয়ে উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বললে—কি হল? আপনার শরীর—

মৃদুস্বরে মঞ্জরী বললে—কেমন করছে মাথাটা। বলে সটান এসে সে চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর মাথা রাখলে।

রীতুবাবু ডাকলে—শিউনন্দন!

—হাঁ মাস্টার সাব, হমি আছি।

—বাতাস কর্।

তারপর নিজের মনেই রীতুবাবু বললে—জনার যা পার্ট তা এর পর থেকে। সর্বনাশ করলে!

বাবুল বলে উঠল—মাই খোদা—তা হলে কি করবেন?

একটু ভেবে রীতুবাবু বললে—দাঁড়াও, জিজ্ঞাসা করে আসি।

—কি?

—পার্ট কেটে ছোট করে দেব কি না ?

টেবিলের উপরেই মাথা নেড়ে মঞ্জরী ইঙ্গিতে জানালে—না।

রীতুবাবু বললে—পারবেন চালাতে ? বড় বড় বক্তৃতা !

—দেখি। এতক্ষণে মাথা তুলে মঞ্জরী বললে—দেখি। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—বোধ হয় পারব। তারপর আবার বললে—পারতেই হবে। বলে একটু বিষণ্ণ বিচিত্র হেসে আবার টেবিলে মাথা রাখলে।

বুঁচি বললে—একটু ব্রাণ্ডি খাও মঞ্জরী। আমার একবার এমনি হয়েছিল—এক আউন্স ব্রাণ্ডি খেয়েই ওটা কেটে গেল।

তার কথা শেষ হবার আগেই মঞ্জরী মাথা নেড়ে জানালে—না। এরপর একটু চুপ করে থেকে বললে—শিউনা, একটু জল দে খাবার। আর একটু একা থাকতে দাও বুঁচিদি।

বুঁচি চলে গেল। শিউনন্দনকে মঞ্জরী বললে—থাক শিউনা, বাতাস ভাল লাগছে না। বলে সে বেরিয়ে গিয়ে গ্রীনরুমের বাইরে সেই খোলা জায়গায় দাঁড়াল। আসরে হাততালি পড়ছে। প্রবীর—প্রবীর হাততালি পাচ্ছে। যুদ্ধদৃশ্যে প্রবীর আহত হয়েও যুদ্ধ করতে করতে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে—মাকে প্রণাম জানাচ্ছে। এখানে প্রবীর হাততালি পায়। গোরাবাবু জায়গাটা ভালই করে। কান পেতে শুনল সে। আজ গোরাবাবুও প্রাণ ঢেলে অভিনয় করছে। করতেই হবে। না হলে সে যা করে এসেছে তাতে একটু ঠাণ্ডা হলেই মার খেতে হবে। এর পরই আবার তার। একরকম শেষ পর্যন্ত। পুত্রশোকাতুরা জনা প্রাণ ফাটিয়ে ডাকবে—প্রবীর! প্রবীর! তারপর উন্মাদিনীর মত তরবারি হাতে ছুটবে—কোথা মোর পুত্রঘাতী কপট পাণ্ডবরথী! মনে পড়ছে তারাসুন্দরীর ওই মর্মভেদী দুটি ডাক—প্রবীর! প্রবীর! না—প্রবীর, প্র-বী-র। মনে পড়ছে—বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠত সে ডাক শুনে। সে

নকল করা যায় না। সে পারে নি। কিন্তু আজ চেষ্টা করতেই হবে। চেষ্টা করা নয়—পারতেই হবে। নইলে এরপর অভিনয় নিতান্তই মেকী হয়ে যাবে, খেলো হয়ে যাবে। হয়তো দর্শকগুলো গোলমাল করে উঠবে। হয়তো প্রবীর বলে সে চীৎকার করলেই বেড়াল কুকুর ডেকে উঠবে। সায়েবরা ওই ভাষা না-বোঝা ওই বিদেশী বিধর্মী দাম্ভিকেরা বলবে—নাচ বোলাও বড়াবাবু!—বড়বাবু ছুটে আসবেন—একে বলে—নাচ একখানা দিতেই হবে—না হলে কি বলে পাষণ্ডেরা উঠে যাবে। না, সে হতে সে দেবে না। সব নির্ভর করছে একলা তার উপর। তার নিজের যাত্রার দল। অলকা—ওই উদ্ধত মেয়েটা মুচকে হাসবে। তার মন আশ্চর্যরূপে রুষ্ট হয়েছে মেয়েটার উপর। গন্ধর্বকন্যার দিন শোভা তাকে ঠাট্টা করেছিল—তার উত্তরে অলকা রেগে উঠেছিল—বলেছিল সে ভদ্র ঘরের মেয়ে। তার অর্থ? তারা—অর্থাৎ সে ছাড়া অন্য সকলে বেশ্যা! কিন্তু আজ ভদ্রঘরের কন্যা আসরে কি নাচ নাচলে? সেটা ভদ্র? সমস্ত আসরটাকে মদের মত গাঁজিয়ে দিলে!

সব থেকে তার ক্ষোভ—গোরাবাবু তার এই নাচের প্রশংসা করলে এমন উচ্ছ্বাস করে?

মাথাটা আবার যেন ঘুরে উঠল। সে চলে এল খোলা জায়গাটা থেকে। সখির দলের ছেলেকটা বিড়ি টানছিল, হাসছিল, কথা বলছিল—কিন্তু সে সব কথার একটাও তার কানে যায় নি। ছেলেগুলো প্রোপ্রাইট্রেসকে দেখে ব্যস্ত হয়ে বললে—এই, চুপ চুপ।

—কি?

কে একজন উস্ করে চাপা শিস দিয়ে তাকে বোধ হয় দেখিয়ে দিলে। ঘরে ঢুকতেই দেখা হল গোপাল ঘোষের সঙ্গে।

—পার্ট এসেছে মা।

—এসে গেছে?

—হ্যাঁ।

—কেমন হল?

—কত্তার পার্ট, ও বলতে হয়!

—ঠিক আছে। বলেই সে আসরমুখো ঘুরল। ঘরে যাওয়া হল না। জল খাওয়ার সময় নেই। মাথা ঘুরছে ঘুরুক। সেই জায়গা এসেছে। ডাক দিতে হবে—প্র-বী-র! প্র-বী-র! বুক-ফাটা ডাক!

* * * *

চমকে উঠল গোটা আসর। হায় হায় করে উঠল মানুষের মন। সন্তানহারা মায়ের বুকফাটানো ডাক!

হাততালি পড়ল না। আসর স্তব্ধ, রুদ্ধনিঃশ্বাস। অব্যক্ত বেদনা যেন বুকের মধ্যে বর্ষার মেঘের মত পাক খাচ্ছে।

—সী ইজ উইপিং! টিয়ারস ইন হার আইস!

—সাইলেন্স!

আসরের মধ্যে এক বৃদ্ধ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

মঞ্জরী কাঁদছে। মঞ্জরী ক্রোধে আক্রোশে নিষ্ঠুর তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রতিশোধের সংকল্প নিচ্ছে। এল মদনমঞ্জরী। বুঁচিও কাঁদছে। মঞ্জরী জনা তাকে শান্তকণ্ঠে বললে—এস, কিন্তু এ কি দীন সজ্জা তব মাহিষ্মতী রাজবধূ প্রবীর প্রেয়সী? কই, কই তব পুষ্পসজ্জা—সর্বাঙ্গ ভরিয়া? চিতানলে পাতিবে বাসরসজ্জা—কই? কই? কই তার যোগ্য আয়োজন? সাজো সাজো, মাগো সাজো। কোথা সহচরী—আনো—আনো পুষ্প আভরণ—আন বহুমূল্য ক্ষৌম বাস মাণিক্য খচিত। পুত্রবধূ যাবে মোর স্বর্গপুরে স্বামী সম্ভাষণে। আনো—আনো—বিলম্ব কর না!

স্তব্ধ নির্বাক অভিভূত আসরকে পিছনে রেখে সে এসে সাজঘরে ঢুকে টেবিলের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। শিউনন্দন বাতাস করতে লাগল। এতক্ষণে মঞ্জরী বললে—জল দে। জল খেয়ে

আবার মাথা রাখলে টেবিলের উপর। যেন ঠিক সোজা হয়ে বসতে পারছে না।

গোরাবাবু পরচুলো খুলে তেল মাখা হাত মুখে ঘষে রঙ তুলতে তুলতেই এসে দাঁড়াল, ডাকল—শরীর খারাপ করছে?

চুপ করে রইল মঞ্জরী। গোরাবাবু বললে—ইমোশন একটু একটু করে কমিয়ে আন। নইলে শেষ পর্যন্ত রাখতে পারবে না। নইলে আসরেই হয়তো সেন্সলেস হয়ে পড়ে যাবে।

মঞ্জরী এরও কোন উত্তর দিলে না।

মঞ্জরীর মাথায় হাত রাখতে গিয়ে সরিয়ে নিল গোরাবাবু। হাতে তেল রয়েছে—মেক-আপ খারাপ হবে মঞ্জরীর। পিঠে রাখলে হাত।

—মঞ্জু!

মঞ্জরী বললে—দেখ, বাবুলবাবু গেছেন আসরে। বেশী ছ্যাবলামো না করেন।

রীতুবাবু দরজায় এসে কখন দাঁড়িয়েছিল, বললে—সে আমি বলে দিয়েছি। তা ছাড়া এ সিন কৃষ্ণের সঙ্গে। ভক্তিরস বেশী। ছ্যাবলামো সুবিধে হবে না। আর ছোকরার ভাল আক্কেল আছে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে মঞ্জরী।

গোরাবাবু বললে—জ্বরটর হয় নি তো? এমন করে মাথা তুলতে পারছ না!

মঞ্জরী বললে—না।

গোরাবাবু আবার বললে—তবু তুমি ইমোশন কমাও।

রীতুবাবু পিঠ টিপলে। গোরাবাবু ফিরে তাকাতেই বললে—ওকে পার্ট করতে দেন গোরাবাবু। ওঁর আজ ধ্যান এসে গেছে। নিজে তো বলেন। জানেন। আসুন। উনি ঠিক আছেন। যদি অজ্ঞান হয়ে পড়েই যান আসরে, আমি নীলধ্বজ—জনার স্বামী, আমি গিয়ে তুলে আনব। কেউ জানতেও পারবে না কি হল। আসুন।

এ ঘরে নিয়ে এসে মদের গ্লাস পূর্ণ করে তুলে দিলে হাতে—

খান। জনার সাক্‌সেস্‌! এ সাক্‌সেস্‌ কদাচিৎ হয়। খান। নিজের গ্লাসও ভরে নিল সে।

রীতুবাবু বললে—শিবু!

বেশকারী শিবু বললে—মাস্টারমশাই!

—জানলার পর্দাটা খুলে দে। প্লে দেখি। গোরাবাবুকে বললে—বসে বসে খান আর দেখুন—ওঁকে ডিস্টার্ব করবেন না।

বাবুল বেরিয়ে আসছে। জনা ঢুকবে। জনা।

পুত্রশোকাতুরা জনা আর কৃষ্ণ।

তারপর গঙ্গার সঙ্গে জনার সাক্ষাৎ। গঙ্গা তার হাত ধরবে—জনার জীবন গঙ্গাপদতলে লীন হচ্ছে। কৃষ্ণ বলবেন—

ক্ষমা—ক্ষমা কর জননী আমার। ক্ষমা!
অপরাধ করিনু স্বীকার। ক্ষমা চাই। ক্ষমা!
বীরশ্রেষ্ঠ পুত্র তব পুত্রবধূ সাথে
অমরায় ইন্দ্রত্ব করিছে ভোগ। ভারতের ইতিহাসে
প্রবীরের নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে রহিবে লিখিত।
ক্ষমা কর মাতঃ—

জনা গঙ্গার হাত ধরে যেতে যেতে বলবে—ক্ষমা! ক্ষমা! বাসুদেব! কোন ক্ষোভ নাই। ক্ষমা!

কৃষ্ণ বলবেন—

যাও সতী পুণ্যবতী গঙ্গা অংশোদ্ভূতা
মহিয়সী জননী আমার—যাও তুমি আপনার স্থানে।
হে প্রবীর বীরশ্রেষ্ঠ—মহেন্দ্রের সাথে সমসুখে সমান গৌরবে—
স্বর্গ-রাজ্যে কর সুখভোগ মদনমঞ্জরী সাথে।
আমি হেথা পাষাণে বেঁধেছি হিয়া—এই পুণ্যভূমি
ভারতের মাঝে ধর্মরাজ্য করিব স্থাপন—
এই মম কার্য চিরদিন :—এই ভূমে সম্ভবামি যুগে যুগে!

হরিধ্বনি উঠল আসর জুড়ে। পালা ভাঙল, আসর ভাঙবে।

বড়বাবু উঠে দাঁড়ালেন—একটু দাঁড়াবেন সকলে। একটু। আমাদের ঘোষণা আছে।

ঘোষণা হল—বড় সায়েব একখানি সোনার মেডেল দেবেন জনাকে। আগে মোহিনীমায়াকে দেবার কথা বলেছি। ম্যানেজার জনাকে একখানি গোল্ড সেণ্টার-মেডেল দেবেন আর বিদূষককে একখানি রূপোর। আর বেঙ্গলী ক্লাব জনাকে—মোহিনীমায়াকে প্রবীরকে বিদূষককে এক একখানি মেডেল দেবেন রূপোর। আমি নিজে একখানি মেডেল দেব জনাকে। আশ্চর্য অভিনয়! এমন তো আমি অনেক—অনেক কাল দেখি নি!

অজস্র হাততালি পড়তে লাগল।

গ্রীনরুমের ভিতর এতক্ষণ যেন একটা গুমোট আবহাওয়া ছিল। কেমন যেন কি হয়—কি হয় ভাব। একটা উৎকণ্ঠা। অভিনয় শেষে এমন অসাধারণ সাফল্যে সব গুমোট কেটে গিয়ে উল্লাসের আর সীমা রইল না।

যোগাবাবু বললে—বাবা রে—ই হল কি! নাচতে ইচ্ছে করছে।

বাবুল বললে—বিগ ব্রাদার—দাও বিগ ডোজ। পড়ি তো তুলে নিয়ে যেও।

গোরাবাবু পুরো একটি গ্লাস হাতে নিয়েছে—মঞ্জরী অপেরার জয়! জিন্দাবাদ!

গ্লাস শেষ করেই গোরাবাবু এল মঞ্জরীর ঘরে—কই, মঞ্জরী?

বুঁচি বললে—সে তো চলে গেল শিউনন্দনকে নিয়ে। বললে—আমি শোব গিয়ে। দাঁড়াতে পারছি নে।

তিন

সত্যই মঞ্জরী সাজঘরে এসেই তেল দিয়ে মুখ ঘষে তোয়ালে দিয়ে মুছেই শিউনন্দনকে বলেছিল—চল্। আর আমি পারছি নে। নে, সব তোল।

শুধু দেহেই নয় মনেও সে যেন ক্লান্ত হয়ে নিঃশেষিত হয়ে গেছে। ভাল লাগছে না। আজকে এত ভাল পার্ট করেছে—মঞ্জরী অপেরার জয়জয়কার হয়েছে—সে সব কিছুই না।

দেহ ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে। মন ক্ষোভে ভরে উঠেছে।

ম্যানেজার এবং প্রধান অ্যাক্টর আজ গোরাবাবু না হলে মঞ্জরী হয়তো বলত—আপনাকে দিয়ে ঠিক চলবে না আমার। মতের সঙ্গে মিলবে না। কিছু মনে করবেন না। পৌরাণিক বই। ধর্মের বই। সেই বইয়ে এই নাচ! এই পোশাক! মাফ করবেন। আর্ট! একে আর্ট বলে!

বলবে সে। গোরাবাবুকেও বলবে, অলকাকেও বলবে। কিন্তু আজ নয়। আজকের তিরস্কার করা তার হয়ে গেছে।

মঞ্জরী বললে—চল্ শিউনন্দন।

বাইরে আসরের মুখে তখনও জটলা চলছে। বাবুদের ঘরে মদ চলছে। উচ্চহাসির শব্দ উঠছে। মেয়েরা হৈ হৈ করছে। গোপালের সঙ্গে কার যেন কথা-কাটাকাটি হচ্ছে। ছেলেগুলো জটলা করছে। মঞ্জরী মাথায় কাপড় টেনে দিয়ে আবার বললে—চল্।

—বাবু—

—থাকুন তিনি—পরে আসবেন, চল্। শুনছিস্?

কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে শিউনন্দন জিনিসপত্র নিয়ে বললে—বলে আসি।

—না।

বলেই সে বেরিয়ে পড়ল। শিউনন্দনকে বললে—আয়।

সাজঘরের এ দিকটা মেয়েদের। শোভাদি গোপালী আশা বুঁচি অলকা এরা কেউ নেই। সকলে ওদিকে পুরুষদের সাজঘরের দিকে গিয়ে জুটেছে। এটা মেয়েদের স্বভাব, মঞ্জরী জানে। আসরের ক্ল্যাপেও তাদের মন ভরে না—তারা দলের পুরুষদের প্রশংসা কুড়ুতে যায়। যে কোন অজুহাত করে যাবে। উঃ, কি না পারে মেয়েরা! দর্শক মানেই পুরুষ। অন্ততঃ মেয়েদের কাছে। কত লাস্য কত হাস্য—যৌবনের কত ছলনাই না বিস্তার করে তারা! সেও করে। করেছে। কিন্তু এই সত্যটা আজ এমন উলঙ্গ ভাবে তুলে ধরেছে অলকা যে মনে হচ্ছে এতদিন সেটা কীটের মত মনে হয়েছে চোখের স্বচ্ছ দৃষ্টির অভাবে। সেটা আজ চোখে আঙুল দিয়ে অলকা দেখিয়ে দিলে—সেটা কীট নয়, সেটা তক্ষক। ছি! ছি! ছি!

দলের লোকেরা তখনও আসরের চারপাশে। কিছু কিছু বোধ হয় চলে গেছে বাসায়। তার মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল রাত্রে যাত্রার দলের বাসার ছবি। বাসার বারান্দায় এতক্ষণে স্টোভ জ্বেলে বসে গেছে বিভিন্ন 'ফ্লিট'; রাত্রের খাবার তৈরী করছে। প্রায় নীরবেই ক্লান্ত দেহে কেউ ময়দা ঠাসছে, কেউ স্টোভ ধরাচ্ছে, কেউ আলু কুটছে বড় ছুরি দিয়ে। রুটি পরোটা লুচি খিচুড়ি—যার যেমন ফ্লিট। গোরাবাবুর আর তার খাবার তৈরি করে শিউনন্দন। লুচি তরকারি ডিম। ডিম না হলে চলে না গোরাবাবুর। মদ খাবেন। প্লের মধ্যে কয়েকবার অল্প মাত্রায় খাওয়া হয়েছে—এবার নেশার উল্লাস জমাট না বাঁধা পর্যন্ত পানপর্ব চলবে। তার মাত্রা তাকেই সংযত করতে হয়। কখনও কেড়ে নিতে হয়—কখনও ঝগড়া করতে হয়—কখনও অভিমান করতে হয়। সেও অভিনয়! কিন্তু অভিনয় আর সহ্য হচ্ছে না। আসরের অভিনয়ে পরিশ্রম ক্লান্তি আছে—শরীর ভেঙে পড়ে, তবু টেনে যেতে হয়—কিন্তু সে সহ্য হয়। অভিনয়ের আনন্দে সহ্য হয়। কিন্তু এই সহজ জীবনে একান্ত আপনজনের সঙ্গে অভিনয় জীবনটাকেই যে মিথ্যে করে দেয়। ওঃ, এ কি তার শাস্তি!

নিত্যই অভিনয়ের পর এ সত্য সে অনুভব করে, কিন্তু আজকের মত এমন নিষ্ঠুর ভাবে সে কখনও অনুভব করে নি।

ক্লান্ত পদক্ষেপেই সে চলেছিল বাসার দিকে। কলিয়ারীর বাবুদের মেসের একটা ব্যারাকে তাদের বাসা হয়েছে। পিছনে যাত্রার দলের আসরের কলরব কোলাহল এখনও শেষ হয় নি। চারিদিকে দলে দলে লোকজন ফিরে চলেছে আপন আপন ডেরার দিকে। একটু আগেই পিটমাউথে বড় একটা ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে। পাম্প চলার শব্দ উঠছে। সায়েব কোম্পানির বড় কলিয়ারী—খাদের নীচে থেকে উপরে রাস্তার ধারে পর্যন্ত ইলেকট্রিক আলো জ্বলে। অন্ধকার রাত্রে চারপাশে আলো জ্বলছে—স্থির আলো—ইলেকট্রিক বাল্ব। পাথর এবং ইটের খোয়া দিয়ে তৈরী রাস্তা। মধ্যে মধ্যে শাখাপ্রশাখা বেরিয়ে গেছে ডাইনে বাঁয়ে। লম্বা একটা ব্যারাকের সামনে তারা পৌঁছেছিল, কিন্তু মঞ্জরী থমকে দাঁড়িয়ে বললে—এ কোথায় এলি ?

শিউনন্দন বললে—এহি তো বাসা হামাদের।

মঞ্জরী ভ্রূ কুঁচকে বললে—তুই মহাপণ্ডিত! এখানে ব্যারাক আর বাড়ি সব একরকমের। কোন্‌টায় আসতে কোন্‌টায় এসেছিস। ফের্।

—আরে বাপ! কি বলব হামি! এহি হামাদের বাসা। ওই ঘর তুমহার। ওই!

সে তার হাতের টর্চটা এক পাশের একটা দরজার উপর ফেললে। দরজার গায়ে লেখা—মেস ম্যানেজার।

শিউনন্দন তো ভুল করে নি বলে মনে হচ্ছে। কারণ মেসের একটা ব্যারাকের চারটে ঘর তাদের বাসা হিসেবে দেওয়া হয়েছে—তার মধ্যে এক প্রান্তের ছোট ঘরটার দরজায় 'মেস ম্যানেজার' লেখা আছে; ওই ঘরটাই তার এবং গোরাবাবুর জন্যে নির্দিষ্ট। তার পরেরটা অপেক্ষাকৃত বড়, সে ঘরটায় থাকে অন্য মেয়েরা—তার

পরেরটা বড় হল—সেটায় থাকে মাঝারি থেকে নীচের পর্যায়ের কাজের লোকেরা, তার ওপাশের মাঝারি ঘরটায় বাবু অ্যাক্টরেরা। ওই তো হলের তক্তাপোশগুলো বের করে সামনের খোলা জায়গায় রেখেছে। বড় হলটায় লোকেরা মেঝের উপর ঘেঁষাঘেঁষি করে পরস্পরের দিকে পা করে সারি দিয়ে পড়ে থাকবে। কিন্তু এমন জনশূন্য কেন? দলের লোকেরা কই? বারান্দা জুড়ে ফ্লিটে ফ্লিটে রান্নাবান্না কই?

তাই মঞ্জরী বললে—এই বাড়িই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু এদের হল কি? গেল কোথায় সব?

—মিডেল ফিডেল দিবে—বাবুরা সব তারিফ করছে, বাত বলছে, গুলতোন হচ্ছে—সব কোই গিয়েছে হুঁয়া। তুমি তো দেখে এলে গো!

—কি বিপদ! রান্নাবান্নাই বা করবে কখন? খাবেই বা কখন? ঘুমুবেই বা কখন?

শিউনন্দন বললে—আজ তো নায়করা নিউতন দিয়েছে! সব তো লুচি খিচৌড়ি মান্‌সো খাবে গবাগব!

ও হো! ভুলে গিয়েছিল মঞ্জরী। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। মনের অশান্তিতে সব ভুল হয়ে যাচ্ছে। আজ নায়ক পক্ষের থেকে দলকে নিমন্ত্রণ করেছে বটে। খাওয়াবে। অন্য অন্য বৎসরে খাওয়ায় না, এ বৎসরই এটা নতুন ব্যবস্থা। সে ভুলে গিয়েছিল। অলি চৌধুরী এসে তার মনটাকে কেমন চঞ্চল তছনছ করে দিয়েছে। ভুল হয়েছে—ওকে নেওয়া তার ভুল হয়েছে। আজ তার সব সন্দেহ ঘুচে গেছে। অলি চৌধুরী সমস্ত দলটাকে উচ্ছৃঙ্খল করে দেবে সে বুঝতে পারে নি।

শিউনন্দন ঘরের চাবি খুলে সুইচ টিপে আলো জেলে দিলে।

ঘরের মধ্যে দুখানি চৌকিতে দুটি বিছানা। ছোট একটি টেবিল। তার উপর শিউনন্দন তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি সাজিয়ে

রেখেছে। কোণে সুটকেস দুটি পাশাপাশি রাখা। এ ছাড়াও বেতের বাস্কেট, একটি শক্ত টিনের ট্রাঙ্ক ; এটা ওটা খুঁটিনাটি জিনিস। প্রবাসে যাত্রাদলের ভবঘুরের মত জীবনে যতটুকু আয়োজন সম্ভব তার থেকে কিছু বেশীই আছে তাদের।

—বাবাঃ। বলে সে বিছানায় শুয়ে পড়ল। উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশে মুখটা গুঁজে দিয়ে বললে—আমার মাথা ধরেছে শিউনন্দন, তুই আলোটা নিভিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বাবুকে ডেকে আন্। বলবি আমি ডাকছি। খাওয়াদাওয়ার ওখানে গিয়ে ওঁর খাবারটা তুই নিয়ে আসবি। নইলে রীতুবাবু, বাবলু বোসের সঙ্গে পড়ে হয়তো কেলেঙ্কারি করে বসে থাকবে।

—তুমহার খাবার ভি লিয়ে আসব তো? বাবু ইখানে খাবে তো তুমি কি করে যাবে খেতে? না, বানাইয়ে দিব তুমার খাবার? মান্‌সো লিয়ে তো উ লোকের সব মাখামাখি। খেতে পারবে তুমি?

একটু বিষণ্ণ হেসে মঞ্জরী বললে—তুই আমার জন্যে এত ভাবিস শিউনন্দন! এত ভাবিস নে রে!

—দেখো, তুমহার দিদিমা হামাকে পথ সনি কুড়াইয়ে আনলে—বেমারিসে মরিয়ে যাচ্ছিলম, হামাকে ডাকডর দেখাইল—আপনা হাঁতে সেবা করলে। হামি তুমাকে এই বাচ্চা থেকে বড়া করলম। উ সব বাত তুমি হামাকে কেন বোলে? মাত্ বলো। হামি কুছু বনাইয়ে দি তুমাকে।

—কিছু খাব না আমি। শরীর আমার ভাল নেই। তোকে যা বললাম তাই কর্। যা—বাবুকে নিয়ে আয়।

শিউনন্দন আলোর সুইচটায় হাত দিয়েছে, এমন সময় বাইরে থেকে কে ধরা গলায় সাড়া দিয়ে ডাকলে—মঞ্জরী-মা কি ঘরে রয়েছে?

—গোপাল মামা!

—হ্যাঁ মা।

—আসুন, ঘরে আসুন। কি হল?

ঘরে ঢুকে বিনা ভূমিকায় গোপাল ঘোষ ধরা-ধরা গলায় বললে—আমি আর পারব না মা। এ রকম যদি হয় তা হলে মাঝপথ থেকে খোল তবলা হারমোনিয়ম সাজপোশাক বেচে কলকাতা ফিরতে হবে। আমাকে তুমি ছেড়ে দাও। আমি নিজে থেকে জবাব দিচ্ছি।

উঠে বসল মঞ্জরী। উৎকণ্ঠিত হয়ে বললে—কে কি করলে? কি হল?

গোপাল বললে—নায়ক পক্ষ নেমন্তন্ন করে খাওয়াচ্ছে। দলের লোকের খাওয়া নিয়ে কথা। রাত্রে গোটা দলের রান্নায় অনেক হাঙ্গামা—তা ছাড়া এত রাত্রে সকলের ভাত সহ্য হয় না—কেউ রুটি খায়, কেউ লুচি, কেউ চিড়ে, কেউ মুড়ি—যার যা রুচি খাবে বলে জলপানি দেওয়া। না কি বল তুমি?

মুখের দিকে তাকিয়ে মঞ্জরী বললে—ওরা আজকেও জলপানি দাবি করছে বুঝি?

—ওরা করলে সে বোঝাপড়া আমি করব। করতে পারি। যাত্রার দলে ম্যানেজারি করছি পঁয়ত্রিশ বছর; মাথার চুল সফেদ হয়ে গেল—ওসব ম্যানেজ করতে জানি, পারি। ওদের সঙ্গে মালিক যোগ দিলে আমি কি করতে পারি?

—মানে? পরমুহূর্তেই বুঝে নিয়ে মঞ্জরী বললে—উনি বলছেন নাকি'

—তা নইলে তোমার কাছে আসব কেন?

—রীতুবাবুর সঙ্গে খুব চলেছে বুঝি!

—রীতুবাবু, বাবলু বোস, নাটুবাবু কে নয়? খুব উল্লাস সব। ছ-ছ'খানা মেডেল। সায়েবরা খুশী হয়ে মেডেল দেবে। তুমি চলে এলে তার ওপর। আর কি? এসে সেই সাজঘরেই বসে গেলেন। ফাঁক বুঝে পুন্টে চাকী, সুবি মিত্তির, চনা সাঁতরা যত চুনোপুঁটির দল ধুয়ো তুললে—এ খাওয়া নেমতন্ন করে খাওয়াচ্ছেন নায়কেরা—

তা বলে দলের খোরাকি কেটে নিচ্ছে না; সেখানে দলই বা আমাদের জলপানি কাটবে কেন? বুদ্ধিতে একেবারে চাণক্য-বুদ্ধি! ওই অলি চৌধুরী—ওকে ডেকে, ওকে মুখপাত করে একেবারে কর্তার কাছে। একে অলি চৌধুরী, তার উপর নেচে তুরুপ মেরেছে। মুখ হাঁড়ি করে আছে, তুমি বকেছ সেও গিয়ে বললে—এটা কি রকম অবিচার! ব্যাস। না আমাকে ডাকলেন—গোপালবাবু, এদের সব যার যা জলপানি দিয়ে দিন। কথা তো ঠিক বলেছে। আমি কি বলব! একটু চুপ করে থেকে বললাম—বেশ, মঞ্জরী-মাকে জিজ্ঞাসা করি একবার। তা বাবলু বোস মদের গেলাসটা রেখে আমাকে বললে—গোপালবাবু, আর ইউ এ, একটি জিরাফ। বললাম—মানে? তো বলে—গোরাবাবু পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি উঁচু—খাঁটি উচ্চৈঃশ্রবা হর্স। এই হর্স ডিঙিয়ে আপনি মঞ্জরী দেবীর ফুটের গোড়ায় ঘাস খাবেন তাই সাফ জিজ্ঞাসা করছি—আপনি কি জিরাফ? গলদেশটি কি অষ্ট ফুট লম্বা? মা মঞ্জরী, আমি গোপাল ঘোষ, পঁয়ত্রিশ বছর যাত্রার দলে অনেক জন্তু দেখলাম—নিয়ে কারবার করলাম—বাবলু বোস কালকের ছেলে—চ্যাংড়া নয় চিংড়ি—তাও গলদা বাগদা নয়, চিংড়িহাটার চিংড়ি—ওকে আমি শেখাতে পারতাম, কিন্তু গোরাবাবু খোদ হাজির—কিছু বলি নি আমি। ওঁর মুখের দিকেই তাকিয়েছিলাম, কিন্তু উনি হেসে ওর মাথায় একটা আদরের চাঁটি মেরে বললেন—ফাজিলটা কোথাকার! ফাজলামি ছাড়া কথা নেই। তারপর আমাকে বললেন—সে যা বলবার আমি বলব তাকে—আপনি দিয়ে দিন জলপানি। আজ যা সব গেয়েছে, দলের যা নাম হয়েছে, তাতে আজ ওরা যা বলছে তাই সই করে দিন। আমি উঠে এসেছি; এখন কি করব তুমি বল। তবে—

একটু চুপ করে থেকে আবার বললে—তবে এই দিয়ে এরপর দল চালাতে আমি পারব না।

মঞ্জরী মেঝের দিকে তাকিয়ে কথা শুনছিল। শুনতে শুনতে

ইচ্ছে করছিল চীৎকার করে ওঠে। ক্লান্ত এবং তিক্ত বিরক্ত মন তার যেন বোশেখের রোদে শুকনো খড়ের গাদার মত অসহনীয় অস্বস্তিকর উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। গোপাল ঘোষ চুপ করবার পরও সে চুপ করে রইল।

গোরাবাবু, অলকা চৌধুরী, বাবলু বোস! গোরাবাবুর সঙ্গে হবে বোঝাপড়া, নতুন নয়, আগেও হয়েছে, এবারও হবে। অলকা এবং বাবুল বোসকে আজই দল থেকে তাড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কালই সন্ধ্যায় আসর পড়বে—এখান থেকে বিশ মাইল দূরে কাচ্ছিদের কলিয়ারীতে। অলকা দলের কুমারী হিরোইন—বাবলু বোস প্রধান কমিক অ্যাক্টর। সব পালাতেই আছে। তা ছাড়া এগ্রিমেণ্ট আছে—আট মাসের এগ্রিমেণ্ট। যাত্রাদলের বিধিবিধান আছে। কি করবে সে? যাত্রার দল—বিচিত্র-চরিত্র মানুষের দল নিয়ে কারবার, এদের নাম অ্যাক্টর নয়, দলের খাতায় এদের নাম আসামী। এরা ঘর থাকতে ভবঘুরে, ভাতও আছে কারুর কারুর, তবু এরা হাভাতে। রাত্রি এদের দিন, দিন এদের রাত্রি, জীবনে নাটক নেই, নাটক করে এরা জীবনের দিন কাটায়। এরা কে কি করে দেখেও দেখতে নেই, কে কি বলে শুনেও শুনতে নেই। দল তার নিজের—রাগ করবার তার উপায় নেই। ওই অলকা চৌধুরী—যে নাচে নগ্ন হয়ে যাবার অভিনয় করলে তার মধ্যে সে নাটকের অভিনয় নয়, জীবনের নাটক দেখতে পেয়েছে, সে বাইরে থেকে লক্ষ্য করেছে প্রবীর বেশে গোরাবাবুর চোখের দৃষ্টির ক্ষুধা, মোহিনীমায়া বেশে অলকার শুধু দৃষ্টি নয়, ঠোঁটের বক্র হাসিতেও সে দেখেছে জীবনের ইঙ্গিত। এ কি যন্ত্রণা! কি বাধ্যবাধকতা! এও তাকে সহ্য করতে হবে!

গোপাল ডাকলে—বল মা, কি বলছ?

মঞ্জরী মুখ তুললে—তার চোখ মুখ চাপা রাগে বিরক্তিতে যন্ত্রণায় নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে বলে মনে হল গোপালের। পরক্ষণেই মনে হল—

না, নিষ্ঠুর তো নয়—মঞ্জরীর চোখ ফেটে বুঝি জল বেরিয়ে আসবে এখনি। মঞ্জরী আবার মুখ নামালে—মুখ নামিয়ে বললে—কি বলব? বাবুল বোস, অলি চৌধুরীকে আমার নিতে ইচ্ছে ছিল না—নিলেন আপনারা।

গোপাল স্বীকার করলে—হ্যাঁ, তা নিয়েছি মা। ভুল হয়েছে। বুঝতে পারি নি।

—আমি পেরেছিলাম। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

—নেবার আগ্রহ গোরাবাবুর বেশী ছিল। আমি সায় পুরেছি বটে।

—সো তো থাকবেই গো গোপাল দাদা। চীৎপুর রোডে তুমার জীবন কাটলো, মাইয়া যাত্রা পার্টিতে এতনা দিন মনেজারী করলে—সো তুমহি বুঝলে না। গোরাবাবু পুরা জোয়ান—বড়া নাম—মদ খায়—হিরো সাজে—এইসা চমৎকার কুমারী হিরোইন—ভদ্দর ঘরের লিখাপড়ি জানা ছোকরী বাবা—

কথাটা বলছিল শিউনন্দন। কিন্তু কথা তাকে শেষ করতে দিলে না মঞ্জরী—সে ধমক দিয়ে উঠল—শিউনন্দন!

শিউনন্দন এতক্ষণ মঞ্জরীর খাবার যোগাড় করছিল। একটু আলু ছেঁচকি আর খানকয়েক লুচি করে দেবে। মঞ্জরীদের বাড়িতে সে বুড়ো হয়ে এল—ওদের তিন থাক সে দেখছে—মঞ্জরীর দিদিমা, তারপর মা, তারপর মঞ্জরী। মঞ্জরীর দিদিমা ছিল বিখ্যাত কীর্তনউলী। তার মেয়েও কীর্তন গাইত, সেই ছিল তাদের মূল এবং একমাত্র পেশা; তারা মাছ খেতো কিন্তু মাংস পেঁয়াজ ডিম খেতো না—তাদের নিজেদের রান্নাঘরে ঢুকত না। মঞ্জরীরও ছেলেবেলা থেকে তাই অভ্যাস—মাংস পেঁয়াজের গন্ধে সে খেতে পারে না। নিমন্ত্রণের আসরে মাংস পেঁয়াজে সব মাখামাখি—মঞ্জরী সেখানে যাবে না, খাবে না—উপোস করে থাকবে—এ সে দেখতে পারবে না। শরীর খারাপ মঞ্জরীর একটা অজুহাত, আসলে মন খারাপ হয়েছে—সে তা

বুঝেছে। কারণও সে জানে। জেনেও এতক্ষণ চুপ করেই ছিল—ওদের কথাবার্তার মধ্যে সে এক কোণে বসে আলু কাটছিল ছুরি দিয়ে। জলপানির কথায় কথা বলে নি, কিন্তু অলকার কথা উঠতেই সে আর চুপ করে থাকতে পারলে না। অলকাকে দলে নেওয়ার সময় সেও খুঁতখুঁত করেছিল—মঞ্জরীকেই বলেছিল। তার আপত্তি ছিল—"এ কি করছ—এ গিরস্তি মেয়ে, তার উপর সাদী ভি হয় নাই—ই ছোকরী লিয়ে—" সেদিনও মঞ্জরী তাকে থামিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল—এসবে কথা বলিস নে শিউনন্দন—উনি, গোপাল মামা যখন বলছেন দলের ভাল হবে, নাম হবে, তখন দেখাই যাক না। আসছে বছর না নিলেই হবে। আজও সে ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিলে। কিন্তু আজ শিউনন্দন থামল না; বললে—হামাকে ধমকালে কি হোবে রে বাবা—ধমক ওহি লোককে মারো। আপনা কর্তাকে টাইট করো—তুমি উনকে সাদী কিয়া—আচ্ছা বাত, ধরমকে বাত—লেকেন উ আদমী আপনা স্বামী বেধরম না করে ই দেখা তো ভি তুমার ধরম আছে গো—

মঞ্জরী মাথা নীচু করে ভাবছিল—কি করবে সে। গোপাল ঘোষের কথা নিয়েই ভাবছিল। জলপানি চেয়ে তারা অন্যায় করে নি। যুক্তি তাদের ঠিকই বটে—খাওয়াচ্ছে যারা বায়না করে নিয়ে এসেছে নায়ক পক্ষ তারা; এ খাওয়ানো সমাদরের, এর মধ্যে তাদের বায়না অনুযায়ী পাওনার কিছু কাটা যাবে না। জলপানির টাকাটা পাওনার মধ্যেই আছে। সে জলপানির টাকা দলের লোকেদের না দিতে হলে মালিকের পাওনা হবে। সেটাই হবে অন্যায় পাওনা। কিন্তু যে ভাবে দাবিটা তারা ওই অলিকে সামনে রেখে এনেছে সেইটে আপত্তির কথা। অলকা আজ যে ভাবে আপন ইচ্ছে অনুযায়ী নেচেছে তা আবার এর চেয়েও মারাত্মক। দর্শকদের মধ্যে দিয়ে আসরে যাওয়া-আসার সময় দর্শকদের কিছু মন্তব্য তার কানে এসেছে। ওই নৃত্য এবং নর্তকী সম্পর্কে তারা অশ্লীল উল্লাস প্রকাশ

করেছে। সাজঘরে বসে দলের লোকেরাও করেছে এমন মন্তব্য। গোরাবাবু করেছে। তার পাশের চেয়ারে বসে পরম উল্লাসে প্রায় অশ্লীল মন্তব্য করেছে। মদের নেশায় এবং উল্লাসের আতিশয্যের মধ্যে ভুলে গিয়েছিল যে সে তার পাশে বসে আছে। চতুর গোরাবাবু পরক্ষণেই সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে শুধরে নিতে চেষ্টা করেছে। বলেছে—মানে, বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে মেয়েটা—মানে,হাজার হলেও ছেলেমানুষ তো—তবে হ্যাঁ, জমিয়ে দিয়েছে—আগুন হয়ে গেছে। মঞ্জরীর ক্ষুব্ধ মনের মধ্যে এলোমেলো ভাবে এই চিন্তাগুলি কতকগুলো সাপের মত যেন একটা গভীর গর্তের মধ্যে একসঙ্গে জড়িয়ে এঁকে-বেঁকে পাক খাচ্ছিল। শিউনন্দনের কথাগুলি সে শুনেও শুনছিল না। যেন উপর থেকে ছোঁড়া লক্ষ্যভ্রষ্ট ঢেলার মত এদিকে ওদিকে পড়ছিল, কিন্তু শেষ কথাটা যেন তাকে আঘাত করলে—সে প্রায় চমকে উঠেই মুখ তুললে—ক্রুদ্ধ স্বরেই বলে উঠল—আমাকে তোকে ধরম শেখাতে হবে না শিউনন্দন। তুই যেমন মানুষ তেমনি থাক্। যা করছিস তাই কর্। ওসব কি হচ্ছে তোর? কি করছিস?

—তুমার লেগে খাবার করছি, আর কি করব?

—না। করতে হবে না বলি নি তোকে?

—সো হোবে না, কুছু খাতে তুমাকে জরুর হোবে।

—না না না—

বলেই সে উঠে দাঁড়াল। তার চোখের দৃষ্টিতে যেন ছুরির ধার খেলে যাচ্ছে। হঠাৎ সে যেন আসল সত্যটাকে বুঝতে পেরেছে। আপনা-আপনি যেন বেরিয়ে পড়েছে। লেখাপড়া জানা ভদ্রঘরের মেয়ে—এই বাঁকা পথে, অপমানের তিরস্কারের শোধ নিতে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছে। হুঁ! গোপাল ঘোষকে বললে—চলুন, আমি যাচ্ছি। যা হয় আমি করব গিয়ে। চলুন।

বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে। যা হোক এধার-ওধার সে করে আসবেই। তাকে বলবে—। কি বলবে? বলবে—দল তুমি

নাও। চালাও। সে ফিরে যাচ্ছে কলকাতা। কাল ভোরে বা সকালে। প্রথম ট্রেনেই। তোমার জন্যেই আমার দল করা। আমার জন্যে নয়। তুমি নাও।

চার

গোরাবাবু প্রমত্ত হয়ে অলিকেই সমর্থন করেছে। গোপাল বলেছে—মাকে জিজ্ঞাসা করবে তাও তার সয় নি। সেটা মানতে হলে অলির সামনে মানতে হত যে প্রোপ্রাইট্রেস তার থেকে বড়। তাই না হয় হল। মঞ্জরী তো তোমার অনুগত অনুগামিনী হয়েই আছে গো! কিন্তু দল? দলটার দিকেও তাকালে না? দলটাই যে তোমার জন্যে। মঞ্জরী তো বেশ্যাকন্যা হলেও তোমার রক্ষিতা নয়। তুমি তাকে স্ত্রী বলে মান চাই না মান, সে তো জানে তুমিই তার স্বামী।

বাসা থেকে বেরিয়ে পথে নেমে কথা কটি মনে হল তার। শিউনন্দন বাসায় তালা দিচ্ছে। বিপিন চাকর রয়েছে বারান্দায়, ঘুমুচ্ছে। ঘরটার ভেতর শুধু জিনিসপত্রই নেই, ট্রাঙ্কের ভিতর ক্যাশবাক্সে দলের টাকা আছে। চারিদিক সব অন্ধকার। শুক্লপক্ষের বোধ হয় ষষ্ঠী সপ্তমী হবে। কিন্তু চাঁদ ডুবে গেছে। ঘন অন্ধকার, আকাশে নক্ষত্রের ঝিকিমিকি; কিন্তু তাতে আলো হয় না। কলিয়ারীর এখানে ওখানে ইলেকট্রিক লাইট জ্বলছে—তাতেও অন্ধকার থমথম করছে। মঞ্জরীর মনের ভিতরেও রাগ বা ক্ষোভ বা দুঃখ একটা কিছু থমথম করছে।

এই যাত্রার দল সত্যিই সে গোরাবাবুর জন্যে করেছিল। তারই জন্যে। গোরাবাবু তার সত্যিই স্বামী। ভগবান সাক্ষী করে অনুষ্ঠান করে তাদের বিবাহ হয়েছে। লোকে হাসে, ব্যঙ্গ করে—হয়তো

গোরাবাবুও মনে মনে ব্যঙ্গ করে বলে—দেহব্যবসায়িনীর কন্যা—তার সঙ্গে শাস্ত্রমতে বিবাহ! আগে কখনও মনে হয় নি তার এ কথা। আজ মনে হচ্ছে গোরাবাবু হয়তো মনে মনে নিজেকে বলে এমন কথা। বলুক। সে বলে না। তার মাও বলত না। গোরাবাবুকে মঞ্জরী ভালবেসেছিল—ভালবেসেছিল তার কৈশোরে। অনাঘ্রাত পুষ্পের মতই সে তখন কিশোরী—যৌবনে সবে পা দিয়েছে।

মঞ্জরীর মায়ের নাম ছিল তুলসী। তার মা—মঞ্জরীর দিদিমা ছিল বিখ্যাত কীর্তনওয়ালী, রেকর্ডেও তার গান ছিল। ব্রাহ্মণের মেয়ে, বালবিধবা। রূপসী মেয়ে। বাপ ছিল গাইয়ে। কীর্তনের দলের মুলগায়েন—অধিকারী। ওই দলেরই এক তরুণ দোহারের মোহে পদস্খলন হয়েছিল। ফলে মঞ্জরীর মা এল গর্ভে। সে কালের সমাজ। একদা পালাল ঘর থেকে। কিছুদিন দোহার তরুণটি তার সঙ্গে ঘর বাঁধবার চেষ্টা করেছিল, তার দায়িত্ব পালন করেছিল। কিন্তু সে তার নিজের গ্রামে নয় বা কোন গ্রামের সমাজে নয়। শহরে এসেছিল। কিছু অর্থ ছেলেটির ছিল—কিছু রাধারাণীও নিয়ে এসেছিল। মাস কয়েক তাতে চলেছিল। যতদিন চলেছিল ততদিন মঞ্জরীর মাতামহ ছিল। তারপর সে হল নিরুদ্দেশ। গান গেয়ে উপার্জনের চেষ্টা করেও কিছু হয় নি—সার হয়েছিল গাঁজার নেশা। সে নিরুদ্দেশ হলে রাধারাণী দাঁড়াল পথে। তখন সে আসন্নপ্রসবা। পথ থেকে তাকে ঘরে নিয়ে গিয়েছিল এক দেহব্যবসায়িনী পাড়ার বাড়িওয়ালী মাসী। চন্দননগরে গঙ্গার ঘাটে তখন রাধারাণী ঘোমটা টেনে বসে থাকত হাত পেতে—সামনে বিছিয়ে রাখত একখানি গামছা। তাতে গঙ্গাস্নান পুণ্যকামীরা কেউ চাল, কেউ পয়সা দিয়ে যেত। মাসীর নজর পড়েছিল তার রূপ দেখে। তার সঙ্গে মিষ্ট কথা বলে, দুঃখের কথা জেনে নিয়ে ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় তাকে ঘরে এনে তুলেছিল। প্রথমটায় সব অবশ্য রাধারাণী বলে নি। বলতে পারে নি। কিন্তু মাসীর বাড়িতে এসে সবই সে বলেছিল, গোপন কিছু

করে নি। সেই বাড়িতেই মঞ্জরীর মা তুলসীর জন্ম। তারপর জীবনে এক পঙ্কিল অধ্যায়; দিদিমা বলত—পাপের প্রায়শ্চিত্ত, নরকভোগ। কিন্তু তার বাপের নাম-কীর্তনের পুণ্য আর তার নিজের যৌবনকাল পর্যন্ত গোবিন্দসেবা, গোবিন্দানুরাগের সুকৃতির ফল—অকস্মাৎ নরকের বন্ধ দুয়ার খুলল।

শিউনন্দন চাবি দিয়ে তালা টেনে দেখে নেমে এল, বলল—চল।

গোপাল সামনে—মঞ্জরী মাঝখানে—পিছনে শিউনন্দন। গোপাল বললে—দেখে আসবেন মা। বড় পাথুরে জায়গা, তার উপর কয়লার খাদ।

শিউনন্দন বললে—হমি পিছেসে টর্চ ফেলছি—

মঞ্জরী কিছু বললে না। সে তার ক্ষুব্ধ মনের মধ্যে ওই চিন্তাই যেন তার বাস্তব লজ্জার চারিপাশে একটা অবরণ দিয়ে রেখেছে। পথ চললেও চলছিল গোপালের টানে—শিউনার ঠেলায়। চোখও ছিল না পথের উপর। চোখ খোলাই ছিল—কিন্তু দৃষ্টি সেই কতকাল আগে চলে গেছে! তার মা এসব কথা তাকে বলত—সে শুনত। মা বলত তার মায়ের কথা।

মা বলত—মা, গোবিন্দের নাম করতাম ওই পাপ জীবনে—নরককুণ্ডে, পাপ করতে করতে। কিন্তু তার ফলও পেলাম।

প্রায় চল্লিশ বছর আগের চন্দননগরের দেহব্যবসায়িনী পল্লী—তখন সেখানে কারবার প্রায় নিছক দেহ নিয়ে। এরই মধ্যে একদিন সেখানে এসেছিল কলকাতার এক ধনী। কলকাতা থেকে তার রূপযৌবনের কথা শুনেই গিয়েছিল। রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে অকস্মাৎ প্রশ্ন করেছিল—নাচগান জান না? এমন রূপ!

রাধারাণী মুখ নীচু করে বসেছিল—হাঁ না কিছুই বলে নি। তারপর পীড়াপীড়িতে বলেছিল—নাচ জানি না, একটু-আধটু গান পারি—তাও কীর্তনের গান।

—জান? গাও তো শুনি।

গেয়েছিল সে মৃত্তস্বরে। রূপই নয়, কণ্ঠস্বরটিও ছিল অতি সুন্দর; উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল। শুধু স্বর নয়, কীর্তনীয়া বাপের কন্যা পদাবলী কীর্তন গাইতে গিয়ে কেঁদেছিল—

কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী সুখ দুঃখ দুটি ভাই—
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি দুখ যায় তারই ঠাঁই।

ওই গানেই সে-দিন সে ওখান থেকে পেল মুক্তি! ওই ধনী লোকটিই তাকে এনেছিল কলকাতায়। প্রথমটা গাঢ় অনুরাগে তাকে অনেক কিছু দিয়েছিল। তারপর আবার ছুটেছিল নতুনের সন্ধানে। রাধারাণীকে আবার নামতে হয়েছে নরকে। কিন্তু তবুও সে অবস্থা চন্দননগরের মত নয়। আবার এসেছিল একজন। সে লোকটিও ধনী এবং প্রৌঢ়। স্ত্রীবিয়োগের পর রাধারাণীর মতই একজনকে যেন খুঁজছিল। সে তাকে বলেছিল—তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করো না—আমি তোমাকে ফেলে দেব না। রাধারাণী বিশ্বাস রেখেছিল, সেও তার কথা রেখেছিল। সেই রাধারাণীকে বলেছিল কীর্তনের দল করতে। বলেছিল—এমন তোমার গলা—এমন তোমার ভক্তি—তুমি কীর্তনের দল কর। জীবনে তোমাকে কারুর ওপর ভরসা করতে হবে না। সেই লোকই তাকে তুলে ধরেছিল। নিজের বাড়িতে প্রথম আসর বসিয়ে কলকাতার বিশিষ্ট লোকেদের গান শুনিয়েছিল। এবং তাতেই হয়েছিল নাম খ্যাতি। ক্রমে বাড়ি হয়েছিল নিজের। শুধু গাইয়ে বলে নয়, ভক্তিমতী শুদ্ধাচারিণী বলে বিশেষ সমাদর পেয়েছিল। তাই থেকেই মেয়ের নাম রেখেছিল তুলসী। এই ধনী রক্ষকটি মারা গেলে মা সেজেছিল বিধবা। বিধবার আচারও পালন করেছে দিদিমা সারাজীবন। মেয়েকেও কীর্তন গান শিখিয়ে দলের উত্তরাধিকারিণী করেছিল। তার নিজের জীবনের কথা মনে রেখে নিজের মতই মেয়েকেও একজনের রক্ষণাধীনে রাখবার চেষ্টার আর অন্ত রাখে নি।

তা ছাড়া উপায় কি ছিল। নিজেদের একটা সমাজ অবশ্যই ছিল, কিন্তু সে সমাজে তখন ছেলের থেকে মেয়ের আদর ছিল বেশী। মেয়ে ছিল ভবিষ্যৎ-জীবনের ভরসা সম্বল সব কিছু; ছেলেরা হত মূর্খ বকাটে। সাধারণ শিক্ষালয়ে ওদের ঠাঁই হত না। কেউ হত তবলা-বাজিয়ে, কেউ হারমোনিয়ম-বাজিয়ে, কেউ করত পানের দোকান—তার সঙ্গে বিক্রী করত বে-আইনী মদ, কেউ বেচত কোকেন—কেউ হত গুণ্ডা—নেশাখোর হত সবাই। কেউ কেউ যারা গাইতে বাজাতে পারত তারা হত শখের থিয়েটারে ভাড়া-খাটিয়ে ড্যান্সিং ব্যাচের সখী অথবা যাত্রাদলের সখী—বড় হয়েও যাদের গানের গলা থাকত, চেহারায় লাবণ্য থাকত, তারা হত প্রথম ওই কুমারী হিরোইন—তারপর হিরোইন—নইলে করত ছোটখাটো পার্ট। জীবনে বয়স হলে হয় হত ভিক্ষাজীবী, নয় জোচ্চোর।

পতিতা বলে যারা চিহ্নিত হত তাদের পুত্রসন্তানদের ভাগ্যে ছিল অন্ধকারলোকে চিরনির্বাসন। জন্মমাত্রেই যে কত ছেলে ডাস্টবিনে ময়লা চাপা পড়ে নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে মরেছে তার হিসেব নেই। একালে তবু কিছুটা যেন পথ হচ্ছে—কিন্তু সেকালে পতিতার পুত্রের ভাগ্যের চেয়ে মন্দ ভাগ্য কারুর ছিল না।

তাই কন্যার জন্য যারা ভদ্র, শান্ত, নিরাপদ জীবন খুঁজত তারা খুঁজত কোন ধনীর সন্তানকে, যে তাকে নিজস্ব সামগ্রী বলে মনে করবে। কিন্তু তাও জুটেও জুটত না। নিত্য নব মধুপিপাসু ধনী সন্তানেরা কেউ কয়েক মাস, কেউ দু-একবছর, কেউ আরও কিছুদিন আপনার সামগ্রী বলে রেখে একদিন অকস্মাৎ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যেত নূতনের কাছে। যখন তারা নিজের বলে গ্রহণ করত তখন বাড়ি ভাড়া করত, দারোয়ান রাখত, আসবাব দিত—কাপড় গহনা অনেক দিত—হতভাগিনীরা নিজেদের সৌভাগ্যবতী মনে করত, তারপর যেদিন বিদায় দিত সেদিন ম্লানমুখে ফিরে এসে আপনাদের পল্লীতে একখানি ঘরে আসর পাতত। দেহব্যবসায়ে প্রহরে প্রহরে নববাসর

সাজিয়ে রাত্রি কাটাত। অবশ্য মেয়েদের অনেকেই ছেলেবেলা থেকে দেখে শিখে নিজের কামিনীত্বটুকুকে নিক্তির ওজনে কাঞ্চনমূল্য বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়ের পদ্ধতি শিখত—মনটাও তেমনি তৈরী হত। প্রবঞ্চনা ছলনা করে মোহগ্রস্ত রূপান্ধ পুরুষকে সর্বস্বান্ত করে দিত, এবং আজও দেয়। সেকালে আরও দিত। তাই সেকালে রাধারাণী মেয়ে তুলসীর জন্য অনেক আগ্রহে এমনি একজনের সন্ধান করেছিল, যে তাকে পায়ে রাখবে—ঠেলবে না—পুরনো হলেও ঠেলবে না। আর মেয়েকে কীর্তন শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে শিখিয়েছিল, মানুষকে মানুষ পায়ে ঠেলে ফেললেও একজন থাকে। সে কখনও পায়ে ঠেলে না। বলেছিল—আমার দুর্ভাগ্য তোকে নিয়েই। তুই পেটে এলি—বাপের আশ্রয় আমার উড়ে গেল। তারপর তোর বাপ আমাকে ফেলে পালাল। এর পর সে চরম দুর্ভোগ তুলসীর—সাক্ষাৎ নরক! নিষ্ঠুর বিভীষিকা! চরম যন্ত্রণা! সে যন্ত্রণা, সে নরক থেকে উদ্ধার পেলাম গান গাওয়ার ছলে তাঁকে ডেকে। ছল বইকি! গান গেয়েছিলাম মানুষের মন রাখতে। গানে ছিল, তাই ডাকা হয়ে গিয়েছিল।

ছেলেবেলা থেকেই এমনই কথা সে মেয়েকে বলত, তার নিজের জীবনও ছিল সংযত। যতদিন সেই প্রৌঢ় বাবুটির অনুগৃহীত ছিল ততদিন তার ভাড়া করা বাড়িতে থাকত। সেখানে অন্য কেউ থাকত না। তারপর নিজের বাড়িতে এসেছিল; সে বাড়িতে ভাড়াটে ছিল, কিন্তু তারা ছিল সকলেই কারুর-না-কারুর অনুগৃহীতা। কানে যা শুনত তুলসী, চোখে তার উলটো কিছু দেখে নি।

মঞ্জরীর মনে পড়ছে—মা তার বলত—সে বড় হলে তার কাছে একান্তে সখীর মতই মনের কথার ভাণ্ডার খুলে দিত। কখনও তার চুল বাঁধতে বসে, কখনও রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে তাকে বলত—মঞ্জরী, জাতে ব্রাহ্মণ, ধর্মে বৈষ্ণব বাপের মেয়ে, আমার মা নিজের বাড়ি গহনা অর্থ এত নাম নিয়েও কাঁদত। বলত—একটা অপরাধের কি

এত বড় দণ্ড সারা জীবনেও যার মকুব নেই, মাফ নেই! তা না থাক—ভোগ করব সে দণ্ড, কিন্তু অপরাধ আর বাড়াব না। তাঁকে ভুলব না। তোর নাম রেখেছি তুলসী—কতজন বলেছে নাম যা দিয়েছ দিয়েছ, ডাকনাম একটা দাও—আঙুর বেদানা ডালিম—এমনি কিছু। ধনীর ছেলে যাদের খোঁজ তারা তো ম্যালেরিয়ার রোগী নয় যে তুলসীপাতার রস খুঁজবে! আমি তা দিই নি। তুলসীপাতা—সে নইলে তাঁর পুজো হয় না! ওই নাম শুনে যে আসবে সে হয়তো সেই। তোর নাম দিয়েছি তুলসী—তোর মেয়ে হলে নাম রাখব তুলসীমঞ্জরী।

সে শুধু মঞ্জরী নয়—তার নাম তুলসীমঞ্জরী—সে নাম তার দিদিমাই রেখে গেছে। দিদিমাকে মনে পড়ে মঞ্জরীর। দিদিমা তার মেয়ের জন্য প্রায় পণ ধরে বসেছিল।

দিদিমায়ের আশা বিফল হয় নি, পণ তার পূর্ণ হয়েছিল—একদিন লোক এল মনের মত একটি ভদ্র ধনীর ছেলের প্রস্তাব নিয়ে।

মা বলত—লোক মানে দালাল তখন আসছে রকমারি প্রস্তাব নিয়ে। কলকাতার ধনীর ছেলে—জুড়িগাড়ি—বিশ-পঁচিশখানা বাড়ি; জমিদারের ছেলে; মাড়োয়ারী শেঠ—তার সঙ্গে টাকা গহনার ফর্দ। কিন্তু মায়ের অনেক শর্ত। মেয়েকে গান্ধর্বমতে বিয়ে করতে হবে। মেয়ে কারুর বাড়িতে যাবে না নিজের বাড়ি ছেড়ে। দরকার হয় একতলা বাড়ি দোতলা করে দোতলায় থাক। মেয়ে মদ খাবে না। মাংস খাবে না। নাচবে না। ওদিকে আমার নাম তখন এ বাজারে ছড়িয়েছে। বয়সে ষোল পার হয়েছি। মায়ের সঙ্গে কীর্তনের আসরে যাই, বসে থাকি, সুরে সুর মেলাই। দেখেছেও অনেকে। কিন্তু মায়ের শর্তে সবাই পেছোয়। একদিন শেষে লোক এল। সে এসে বললে—প্রায় সব শর্তে রাজী মা—আপনার মেয়েকে দেখে পাগল হয়েছে। ভাল ঘরের ভাল মানুষের ছেলে, ভাল মানুষ; এ যদি পছন্দ না হয় মা, তবে আপনার মেয়েকে জগন্নাথে গিয়ে দাসী করে দিয়ে আসুন। মানুষ দিয়ে হবে না।

মঞ্জরীর বাপ এই ভাল ঘরের ভাল মানুষের ছেলে।

লোহার কারবার আছে লোহাপটিতে। বাড়ি বর্ধমান জেলায়। দেশে বড় জোত, জমিদারি। কলকাতার ব্যবসা তখন খুব লাভের। প্রথম যুদ্ধের বাজারে লাভ করেছে তিন চার লাখ টাকা। রাজী সে সব শর্তেই, তবে কয়েকটা কথা পরিষ্কার করে নিতে চায়। প্রথম কথা—রাধারাণী বলেছে তার মেয়ে মদ খাবে না কিন্তু সে মদ খেতে পাবে তো? দ্বিতীয় কথা—গান্ধর্বমতে বিবাহ। মালাবদল ছাড়া আর কি? তার কথা—মালাবদল করতে সে রাজী আছে—এক বছরের মাসোহারাও সে অগ্রিম দিতে রাজী আছে—এ ছাড়া মাস মাস মাসোহারা সে দিয়ে যাবে কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। ছেলেপুলে হলে তারা তার উত্তরাধিকারী হবে না। এতে রাজী হলে বাকী সবে সেও রাজী। ঘর সে দোতলা করে দেবে।

মঞ্জরীর দিদিমা রাধারাণীকে এতেই রাজী হতে হয়েছিল। এর বেশীও প্রত্যাশা করে নি সে। তখন একদিন এসেছিল মঞ্জরীর বাপ। বছর পঁচিশেক বয়স—শ্যামবর্ণ শক্তসমর্থ মানুষ, পোশাকে পরিচ্ছদে খুব বাবু। নিজের কম্পাস গাড়ি মানে এক-ঘোড়ার গাড়ি চড়ে এসেছিল।

দিদিমা রাধারাণী প্রথমেই তাকে বলেছিল—একটা কথা জিজ্ঞেস করব বাবা, কিছু মনে করবে না তো?

মানুষটি সপ্রতিভ মানুষ—হেসে উত্তর দিয়েছিল—একটা কেন, পাঁচটা করুন না।

—তোমার বিয়ে হয়েছে তো? ঘরে বউ মানে মা-লক্ষ্মী আছেন তো?

—তা আছেন। নিশ্চয় আছেন। লক্ষ্মীও বলতে পারেন। আমার বিয়েও হল, যুদ্ধও লাগল। লোহা কেনা ছিল আগে—লাভ প্রচুর হল। লোকেও বলে, তাই বউকে—

—তা হলে?

—তা হলে আসছি কেন? হেসে পাকা ব্যবসায়ী রামকৃষ্ণ চৌধুরী উত্তর দিয়েছিল—তা তো ঠিক বলতে পারব না। তবে আসি। মানে আমি ঘুরে বেড়াই। তাতেও ঠিক শান্তি বা সুখ যা বলেন পাই না। হঠাৎ আপনার মেয়েকে দেখলাম মল্লিকদের বাড়ি কেত্তনের আসরে আপনার সঙ্গে। মনটা খুব উতলা হল। খোঁজ করলাম—আপনার পরিচয় পেলাম—শর্ত শুনলাম—ভাল লাগল। ভাবলাম, দেখি না যদি এখানে যা খুঁজি তা পাই। তবে বিয়ে আর আমার মদ খাওয়ার ব্যাপারে আমার কথা আমি বলেছি। তাতে আপনি রাজী তো? ছেলেপুলের দায়—

রাধারাণী জিভ কেটে বলেছিল—না না বাবা, তা আমি বলি নি—কথাটা মনেও হয় নি। এ তো তোমার ন্যায্য কথা। একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—বাবা, আমি নিজে ব্রাহ্মণের মেয়ে, ভক্ত ব্রাহ্মণের মেয়ে, আমি তো জানি—জাত কি? ও তো কেউ কাউকে দিতে পারে না বাবা। এক ভুলে হারিয়েছি—সারা জীবন প্রভুর নাম গাইলাম, তবু তো ফিরল না! আমি মেয়ের জন্যে জাত খুঁজি নি, ধর্ম খুঁজেছি; তোমাকে ভজে যদি ও ধর্মটা রাখতে পারে। তা দু মাস পর ছেড়ে চলে যাবে না তো?

চৌধুরী বলেছিল—ধরুন, দু মাস পরে আমি মরেই যাই!

—ষাট ষাঠ বাবা, ও কথা বলো না।

—না না, আমি যদির কথা বলছি। সংসারে আশ্চর্য তো কিছু নেই!

—তা নেই।

—তা হলে আপনার মেয়ে কি করবে?

—তুমিই বল।

—দেখুন—সে বলবে ও। ইচ্ছে হয় আমাকে মনে ভজেও থাকতে পারে। না হলে বিধবা বিয়ে তো হয়—তেমনি ভেবেও অন্যকে ভজতে পারে। আবার—মানে যা ইচ্ছে ওর। যেমন

পারবে ও তাই করবে। সারাজীবন আমি ওঁকে নিয়ে থাকব তা তো বলতে পারব না। সেইজন্যে এক বছরের মাসোহারা ছ হাজার টাকা আগাম গচ্ছিত রাখছি। যেন পেটের দায়ে বাধ্য হয়ে যা চায় না তাই করতে না হয়।

একটু চুপ করে থেকে রাধারাণী বলেছিল—বেশ বাবা, আমি রাজী হলাম। তুমি বাবা সোজা সাফ কথার মানুষ। এখন মেয়ের ভাগ্য, আর তোমার দয়া। তবে মেয়ে আমার দলে আমার সঙ্গে যাবে। মানে—তুমি যা বললে তাতে পরে যদি ওকে পেটের ভাবনা ভাবতে হয় তবে ওই দল রেখেই আমার মত খেতে পারবে। গলাও ওর মন্দ নয়।

তাতেও চৌধুরী রাজী হয়েছিল।

তারপর তিন বছর।

মঞ্জরীর মনে পড়ছে—মা তার এ তিন বছরের কথা খুব খুলে বলত না। শুধু বলত—সংসারে বোধ হয় হিসেবী মানুষদের, স্পষ্ট কথার মানুষদের দয়ামায়া ভালবাসা ঠিক থাকে না মঞ্জরী। নিজে মদ খাওয়ার কথা বলেছিল, কিন্তু এমনই খেতো যে আমার লাঞ্ছনার সীমা থাকত না। প্রথম মাস কয়েক কেটেছিল ভাল। তার পরই—। শুরু করলে—মায়ের সঙ্গে কীর্তন গাও বেশ কথা, কিন্তু ওস্তাদ রেখে দিচ্ছি—অন্য গান শেখ। শুধু কেত্তনে কি চলে? ওস্তাদ এল, দু'একজন বন্ধুও মাঝে মাঝে আসত। তারপর তুই হলি; তুই হওয়ার পর আমার অসুখ হল। ডাক্তার বললে চেঞ্জে যেতে। চেঞ্জে সেই পাঠালে। চেঞ্জ থেকে ফিরে শুনলাম সে তখন অন্য জায়গায় যেতে আরম্ভ করেছে। মা বললে—ও নিয়ে গোল করিস নে তুলসী; ও তো বাড়িতে স্ত্রী ফেলে তোর এখানে আসে—সে তো বলে না তোমার সঙ্গে ঘর করব না। চোখ বুজে সইলাম। শেষে একদিন সন্ধ্যের সময় ওর লোক এল বিলিতী খানা আর মদ নিয়ে; খবর পাঠিয়েছে কোন এক কোম্পানির সায়েব ম্যানেজার না কাকে এখানে

গান শোনাতে আনবে। আমি ভয় পেলাম। বললাম—না। সে হবে না—বাবুকে গিয়ে বল। ঘণ্টাখানেক পরে নিজে এল অগ্নিমূর্তি হয়ে। অকথা-কুকথার বাকী রাখলে না। শেষ আমার গালে এক চড় মারলে। আমি বললাম—শিউনন্দনকে ডাকব আমি। তার আগে বলছি তুমি বেরিয়ে যাও। সেই সে বেরিয়ে গেল আর আসে নি। তখন মা আমার সন্থ মারা গেছে। মঞ্জরীর মা তুলসী বলত—ওরে, সে চলে গেলে মাথা খুঁড়েছিলাম, কেঁদেছিলাম। সাতদিন বিছানা থেকে উঠি নি। তিনদিন খাই নি। তারপর উঠেছিলাম, উঠতে হয়েছিল। মনে মনে একটা সংকল্প নিয়ে উঠেছিলাম। সতী হয়েই থাকব আমি।

মঞ্জরীর মা এরপর কীর্তনের দল নিয়েই থাকবার সংকল্প করেছিল। ছিলও কিছুদিন। কিন্তু তা পারে নি মা। জীবনে তার নতুন মানুষ এসেছিল। মা রাধারাণী যা বলেছিল, তুলসী নিজে যা মনে মনে ভেবেছিল, সংকল্প করেছিল, তা রাখতে পারে নি। মঞ্জরী যখন বিয়ে করে গোরাবাবুকে, তখনই তুলসী মেয়েকে কথাটা বলেছিল—আমাদের জাতের ওপর অভিসম্পাত আছে মঞ্জরী। আমি পারি নি। তোর বাপ চলে গেলে কিছুদিন শক্ত হয়েই ছিলাম। তারপর পারলাম না। বয়স তখন তো বেশী নয়—চব্বিশ পঁচিশ। একজনের রূপে আর কথায় ভুললাম। পয়সার জন্যে নয়—তখন পয়সা আমার কমে নি—আমাদের জাতের মন তো—লোকটিকে ভালবেসে ফেললাম। পয়সা তার ছিল না ; বললাম—পয়সা তোমাকে লাগবে না—তুমি এসো। ওই চৌধুরীরই বন্ধু—গাইয়ে লোক। বছর চারেক পর তার ধরল ব্যাধি। ওই ব্যাধি নিত্য নতুনের ব্যাধি। আমাকে নিয়ে আর তার ভাল লাগল না। কি করব? অনেক কেঁদেছিলাম—তার পায়ে ধরেছি, ঝগড়া করেছি, কিন্তু ফেরাতে বাঁধতে তাকে পারলাম না। আমাদের দেখে লোকে ভোলে—ঘর দোর ভুলে ছুটে এসে বলে—ভালবাসি। ভালবাসা না ছাই মঞ্জরী,

আমাদের মধ্যেই ভুলো রোগের ছোঁয়াচ আছে—সেই রোগের ঝোঁকেই আমাকে ভুলে ওর কাছে—ওকে ভুলে তার কাছে—এই ভুলে ভুলেই সারা জীবন ছুটে বেড়ায়।

মঞ্জরী জানে—তার মনে আছে—এরপর একজন এসেছিল মায়ের জীবনে। একজন মাড়োয়ারী। তার কোন ঝঞ্ঝাট ছিল না। মাছ মাংস মদ এসব না—খেতো ফল মিঠাই; নেশা ছিল ভাঙ; আর শুনত হিন্দুস্থানী ভজন। কীর্তন শুনে তারিফ করত, খুশী হত না।

কিন্তু—। ভাবতেও মঞ্জরীর শরীর ঘিন ঘিন করে—লোকটা মাতালের চেয়েও বীভৎস ছিল। এই লোককে গ্রহণ করতে হয়েছিল তুলসীকে টাকার জন্য। কীর্তনের দল খুব ভাল চলত না। সঞ্চিত অর্থ ভেঙে খেতে হত। তাই যেদিন মাসে আড়াইশো টাকা দিয়ে এই দেহকামীটি প্রবেশাধিকার চাইলে তখন তুলসী সসম্মানে দরজা খুলে দিয়েছিল।

দীর্ঘদিন ছিল সে। মঞ্জরীর বারো তেরো বছর বয়স পর্যন্ত নিত্য তাকে আসতে দেখেছে। তাদের জীবনের অর্থও তখন সে বুঝেছে। মা নিজেও তাকে নিজেদের কথা বলতে শুরু করেছে। তাদের নিজেদের জীবন ও জাত সম্পর্কেও সে অনেক জেনেছে। তখন তারা বাড়ির ওপর তলায় থাকে, নিচের তলাটা ভাড়া দেওয়া ছিল। তিন-খানা ঘরে থাকত তিনজন। তাদের সকলকেই মঞ্জরী বলত মাসী। রাজলক্ষ্মী মাসী, তুনিয়া মাসী আর একজন ছিল অঞ্জলি মাসী। এরা সবাই চেষ্টা করেছে, সুযোগ পেয়েছে একজনের সঙ্গে ঘর বাঁধবার। দিদিমা রাধারাণীর আমল থেকেই এই ধরনের ভাড়াটে ছাড়া বাড়িতে ঘর ভাড়া দেওয়া হয় না। গান বাজনা হয়, মদও খায়, কিন্তু তার মধ্যে হুল্লোড় বা দাপাদাপি নেই কোন কালেই। বাড়িটাও তাদের জাতের পাড়ার মোড়ে, গেরস্ত পল্লী ঘেঁষে। হুল্লোড় দাপাদাপি হলে পুলিসের ভয় আছে—গেরস্তরা দরখাস্ত করে দেবে। সেণ্ট্রাল

অ্যাভেন্থ থেকে বাড়িখানা খুব কাছে। একটা ছোট রাস্তায় ছুখানা বাড়ির পর।

তার মা তুলসী, নিজের মা রাধারাণীর মত মেয়েকে জাত ধর্মের কথা ঠিক শোনায় নি। তাকে কীর্তনের দলেও নেয় নি; তাকে গান শেখার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়াও শেখাতে চেয়েছিল। অনেক ভেবে ঠিক করেছিল তাকে থিয়েটারে দেবে। ওই একটা পথ সে পেয়েছিল—যে পথ সমাজের রাজপথে তাকে পৌঁছে দিতে পারবে। তাদের পাড়ায় তারাসুন্দরী মাসী, ছোট সুশীলাদি, চারুশীলাদি, নীহারবালাদি, এদের সঙ্গে তুলসীর পরিচয় আছে—ছ'একজনের সঙ্গে ভালবাসা বড় কথা, মানসম্মান আছে। কলকাতার বড় রাস্তার উপরের কত বাড়ির দেওয়ালে এদের নাম মোটা মোটা অক্ষরে লেখা পোস্টারে ঝলমল করে। মা একবার তারাসুন্দরী মাসীর কাছে গিয়েছিল মঞ্জরীকে নিয়ে। মঞ্জরীর মনে আছে তারাসুন্দরীর চেহারা। চেহারা খারাপ ছিল না, ভালই ছিল—কিন্তু তাঁর সে কি কথা বলবার ভঙ্গি—কি সুন্দর হাত নাড়া!

মা বলেছিল—আমি রাধারাণী কীর্তনওয়ালীর মেয়ে তুলসী, মাসীমা।

বড় বড় চোখ বিস্ফারিত করে তারাসুন্দরী বলেছিলেন—ও! এস এস এস। বস। কি অ—পূ—র্ব কীর্তন গাইতেন রাধা দিদি। গাইতেন, "স—ই কেবা শুনাইল শ্যাম না—ম!" মনে হত সাক্ষাৎ রা—ধা ভাবে বি—ভোর হয়েই গাইছেন বুঝি। তেমনি ছিল রূপ! তা—তুমি? তুমি পার?

—পারি কিছু। কিন্তু সে কিছু না।

—তবে? রাধারাণীদির মেয়ের ভাগ্যেও শেষে ধনীজন মনোরঞ্জন। রৌপ্যের বিনিময়ে রূপ?

—না। কীর্তন নিয়েই আছি। তবে হয় না কিছু, কষ্টেই চলে।

—বেশ। এটি—এটি কে? মেয়ে? আপন?

—হ্যাঁ। ওর জন্যেই আসা। ওকে থিয়েটারে দিতে চাই। তাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি আপনাকে।

অবাক হয়ে গিয়েছিল মঞ্জরী ; তারাসুন্দরী কথাটা শুনেই উঠে দাঁড়িয়ে হাত দুখানা দুপাশে মেলে দিয়ে যেন বক্তৃতা করে উঠেছিলেন, থিয়েটার ? অভিনয় ?

লোকে কহে অভিনয়—অভিনয় কভু নিন্দনীয় নয়।

নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতা অভিনেত্রীগণ।

হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—তবু স্বাদ আছে, রূপ আছে—একটা আশ্চর্য নেশা আছে। যদি পার তবে তুমি আগুনের মত জ্বলবে—বহ্নিশিখার মত। দলে দলে পতঙ্গ এসে দেবে ঝাঁপ। পুড়বে। তারপর তোমার শিখা নিভবে, কিছুদিন জ্বলন্ত অঙ্গার, তারপর পড়বে ছাই ; তারপর নিভে গিয়ে শুধুই অঙ্গার ! এ কণ্টকভরা সিংহাসন।

বক্তৃতার ভঙ্গি বদলে এবার সহজ কথা বলার ভঙ্গিতে বলেছিলেন, তখন ঝাঁট দিয়ে ফেলে দেবে পৃথিবী।

মঞ্জরী কথার মানে প্রায় সব বুঝেছিল কিন্তু সে মানের ওজন সেদিন বোঝে নি। কিন্তু অপূর্ব লেগেছিল নাট্য-সম্রাজ্ঞীকে। ওই বিশেষণ থাকত থিয়েটারের পোস্টারে।

মা তুলসী বলেছিল—সবেই তাই মাসীমা। কিসে নয় বলুন। আমার কথাটা ভাবুন। কোথায় আর তো কেউ ডাকেই না। বছরে কটা বায়না পাই ? তাই তো মেয়েকে আর ঢপওয়ালী করব না।

তারাসুন্দরী বলেছিলেন—অভি—নে—ত্রী করবে মেয়েকে ! বেশ। যার যা প্রাক্তন। তাহলে মেয়েকে লেখাপড়া শেখাও কিছু। কিছু না, বেশ কিছু। আবৃত্তি শেখাও। কবিতা-পদ্য সুর করে বলতে শেখাও। গান পারে ? পারা উচিত। রাধারাণীদির নাতনী। নাচ শেখাও। অভিনয় কলা-বিদ্যা। হাসতে বললেই

হাসতে পারা চাই। পার হাসতে? খুকী, এই দেখ, আমি হাসছি। বলে অট্টহাসি হেসে উঠেছিলেন—হা—হা—হা। হা—হা—হা। হা—হা—হা।

হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিলেন তারাসুন্দরী। ঘরের জানালা ধরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন কিছুক্ষণ। তারপর আবার হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—আছে আছে, আর একটা মহাতত্ত্ব মহাশিক্ষা আছে। তা যদি ধরতে পার, বুঝতে পার, তবে পৃথিবীর সব বুঝতে পারবে। স—ব সো—জা হয়ে যাবে। জান, এক একটি অভিনয়-রাত্রি এক একটি জন্ম। আজ অভিনয়ে এই জন্মে যে তোমার স্বামী, কাল অভিনয়ে পরজন্মে সেই তোমার হয়তো পিতা কিংবা পুত্র কিংবা ভ্রাতা। এ অভিনয় জন্মে যে তোমার শত্রু, কাল অভিনয় পরজন্মে সেই তোমার মিত্র। কি বি—চি—ত্র বল তো! এ "মায়া প্রপঞ্চ মায়া ভবের রঙ্গমঞ্চ মাঝে, রঙ্গের নটবর হরি যারে যা সাজান সেই তা সাজে।" তবু—তবু অবোধ মানুষ জন্মজন্মান্তর ধরে করে যায় প্রেমের তপস্যা। সী—তা পাতাল প্রবেশের সময় বলে যায় জন্ম-জন্মান্তরে যেন রামকে পাই। রা—ধা বলে— "মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব—কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব।" আবার হা—হা শব্দে অট্ট হেসে উঠেছিলেন।—এই—এই—অভি—নয়! পৃথিবীর সব অভিনয়!

আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল মঞ্জরী। ইচ্ছে হয়েছিল জিজ্ঞেস করে—কেমন করে হাসছেন আপনি? কিন্তু ভয়ে পারে নি। মা বরং বলেছিল—অবাক লাগে মাসীমা—কেমন করে পারেন! থিয়েটারে কম যাই—কিছুকাল ঘনঘন গিয়েছিলাম। তখন আপনার পার্ট দেখেছি— দুর্গেশনন্দিনীতে আয়েষা।

—হ্যাঁ। 'এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর!'

—তারপর রিজিয়া—

—থাক ওসব কথা। সেকাল চলে গেছে। হেসে বলেছিলেন—

অগ্নিশিখা নির্বাপিতপ্রায়। নূতন কাল এসেছে নূতন ঢং নিয়ে। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় আর একবার—একবার জ্বলে উঠি। যাক, শোন—মেয়েকে অভিনেত্রী করবে সে ভাল কথা। লেখাপড়া নাচ গান শেখাও। অভিনয় দেখাও।

—সখীর দলে ওকে এখন থেকে দেব মাসীমা?

—না। সখীর দল থেকে অভিনেত্রী হয়ে ওঠা সহজ নয়। পেরেছে দু'চারজন—নীহার, রাণী এরা পেরেছে—কিন্তু সহজ নয়।

মা বলেছিল খুব বিনয় করে—মধ্যে মধ্যে আনব ওকে মাসীমা আপনার কাছে? একটু-আধটু দেখিয়ে টেখিয়ে দেবেন?

হঠাৎ তারাসুন্দরী যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন—দেওয়ালের একখানা ছবির দিকে চেয়ে রইলেন।

—মাসীমা!

এক পা এক পা করে ছবিটার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি—যেতে যেতেই বললেন—আমি তো এখানে বড় থাকি নে আর। খোকার মৃত্যুর পর—। ছবির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—জীবনের সব আগুন ওরই শোকে চোখের জলে নিভে গেছে। আমি এখন অঙ্গার। নিজেরই শিখা নেই, কি করে শিখা জ্বালাব ওর প্রদীপে! থাকতেও পারি নে এখানে। ভুবনেশ্বর চলে যাই। জানি এ মায়া প্রপঞ্চমায়া; ও এ জন্মে ছেলে সেজে এসেছিল—কেউ নয় আমার। তবু—তবু অশ্রুজলে সব বহ্নি নিভে গেল। গত জন্মে শত্রু ছিল হয়তো! তবে—

একটু থেমে বললেন—একটা সাধ সে পুরিয়ে গেছে। একটা সম্মান দিয়ে গেছে। শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে জনা করেছি। তিনকড়ি করেছিল জনার পার্ট। ও পার্ট আমি করি নি, করতে সাহস করি নি। খোকার মৃত্যুর পর ওর শোক বুকে নিয়ে পুত্রশোকাতুরা জনার পার্ট করে অভিনয়ের সাধ মিটিয়েছি।

ছবির ধারে দাঁড়িয়ে বললেন—যাও তোমরা, আর নয়। আর

সহ্য করতে পারব না। যাও। না—একটু দাঁড়াও। শেষ কথা বলে দি। থিয়েটার স্টেজ রঙ্গমঞ্চ অভিনয় ছলনার রাজ্য। সেখানে ছলনার মায়াজাল বিস্তার করে ভোলাতে হয়, ভুলতে নেই। আর মনে রেখো পৃথিবীও রঙ্গমঞ্চ, কিন্তু সে জীবনের রাজ্য—ছলনার নয়। সেখানে ছলনা করো না। যাও—তোমরা যাও।

*　　　　*

ছলনা তো সে করে নি জীবনে। সে তো গোরাবাবুকে ছলনায় ভোলায় নি। সেই-ই ভুলেছিল। গোরাবাবু তাকে ছলনা করেছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে মঞ্জরী। হ্যাঁ, ছলনাতেই সে ভুলেছিল। গোরাবাবুর অভিনয় দেখেই সে ভুলেছিল।

আশ্চর্য! না আশ্চর্য নয়, তার ভাগ্যের চক্রান্তে গোরাবাবুকে সে দেখেছিল থিয়েটারের স্টেজে। কিংবা হয়তো কর্মফল—তার কর্মফল নয়, তার মা বাপের কর্মফল; অথবা মা বাবার কর্মফল এবং তার ভাগ্য দুইই। বিচিত্রভাবে ঘটল। বয়স তখন তার সতের। মিনার্ভা থিয়েটারে কাজ পেয়েছে। ওর মায়ের ইচ্ছা ছিল শিশিরবাবুর থিয়েটার কিংবা আর্ট থিয়েটারে দেয়। কিন্তু সেখানে নাচের সখীর দলে ছাড়া কোন পার্টে তাকে নিতে চায় নি। হয়তো তাতেই মা রাজী হত, কিন্তু তার রূপের কথা ও গলার কথা শুনে মিনার্ভা থিয়েটার থেকে লোক এসে তাকে ডেকে কাজ দিয়েছিল। তাদের প্রয়োজন ছিল রোমান্সের নায়িকার পার্টের জন্য একটি সুস্বর রূপসী তরুণীর। মা এ সুযোগ ছাড়ে নি। মিনার্ভার তখন পড়তি অবস্থা—তবুও সে ওখানেই তাকে দিয়েছিল। তরুণী রাজকন্যা—তাকে নিয়ে নাটকের জটিলতা, তবে পার্ট তার বেশী নয়—খানতিনেক গান আর অল্প কিছু পার্ট। কিন্তু একটু গণ্ডগোল বাধল। গানের সুকণ্ঠ এবং পার্টে মোটামুটি পারঙ্গমতা এবং অল্প বয়স সত্ত্বেও পরিচালকদের মনে হল এ পার্টে মঞ্জরা যেন ভারী হবে—ঠিক যেমনটি হলে ভাল হয় তেমনটি হবে না। মঞ্জরীর মা দিদিমা রূপসী ছিল, কিন্তু দেহের কাঠামো ভারী

ছিল—মঞ্জরীর তাই। সে নূতন যৌবনেই বেশী বেড়ে উঠেছে, স্বাস্থ্যে ভরে উঠেছে. একটু হালকা দেহ, একটু ওর থেকে খাটো অর্থাৎ তন্বী তরুণী হলে যেমন এ পার্টটিতে খোলে, তা হবে না। তখন সে ভূমিকার জন্য মঞ্জরী থেকে বেশী বয়সের একটি নামকরা তন্বীগড়নের মেয়েকে এনে মঞ্জরীকে দেওয়া হল রাজ্যলক্ষ্মীর ভূমিকায়। মানবী নয়, দেবী। এতে পার্ট ছিল, গান ছিল না। রাজকুমারের ঘুমন্ত অবস্থায় দেবী আসেন—আশীর্বাদ করে যান। আদেশ করে যান। রাজকুমার স্বপ্নঘোরে সে আদেশ শোনে, ঘুম ভেঙে ওঠে—তখন দেবী অদৃশ্য হয়েছেন। রাজকুমারীর পার্ট থেকে পার্ট কিছু বেশী। তার সঙ্গে পরিচালক গান জুড়ে দিলেন। রাজকুমারীর পার্টের নামকরা মেয়েটির গলা ভাল নয়—তার একখানা গান রেখে গান বাদ দেওয়া হল। মঞ্জরী একটু দুঃখিত হল। বড় পার্ট পেয়েও মন খুঁতখুঁত করল তার। রাজকুমারীর পার্টে তাকে ঘিরে যে একটি প্রেমমধুর রোমাঞ্চের সাতরঙা আবরণ আছে, দুঃখ তার সেইটুকুর জন্যে। ডিরেক্টার বললেন—এ পার্ট তোমার অনেক ভাল হবে দেখবে। তুমি দেখবে আর ক'বছর বাদে মূল হিরোইনের পার্ট করবে। রোমান্টিক হিরোইন হতে তুমি জন্মাও নি।

পার্ট তার খুব ভাল হল না। তবু খারাপ হল না। বই কিছুদিন চলে চলল না। নতুন বই পড়ল রিহারশ্যালে—তাতে ওর পার্ট পছন্দ হল না। মঞ্জরী ছেড়ে দিলে থিয়েটার। তখন তার বিজ্ঞাপন হয়ে গেছে। মায়ের কাছে তার দাম নিয়ে দর চলছে। মা বলেছে—আমার মায়ের বারণ আছে। আমিও ঠিক করি নি। আজ কীর্তন গাই। মেয়েকে এ পথে নামাতে ইচ্ছে নেই। যদি নামাতেই হয় তবে বাছবিচার করব বইকি। টাকা, মানুষ—সব দেখব।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন একখানা গাড়ি এসে দাঁড়াল তাদের

দোরে। শিউনন্দন খবর দিলে—ঢপকীর্তন বায়নার লিয়ে এক বাবু আসিয়েছেন।

মঞ্জরী পাশের ঘরে গিয়ে বসেছিল। হঠাৎ মা তাকে ডেকেছিল—মঞ্জরী, শোন্, এ ঘরে আয়।

মঞ্জরী ঘরে ঢুকতেই মা বলেছিল—প্রণাম কর্। তোর কাকা।

বিস্ময়বোধ করেছিল বইকি। তার কাকা! সে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়েছিল সেই বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে। মা বলেছিল—হ্যাঁ রে, তোর বাপের ভাই—আপন ছোট ভাই। হরেকৃষ্ণ চৌধুরী। নে প্রণাম কর্।

সে প্রণাম করেছিল ভূমিষ্ঠ হয়ে। কাকা হরেকৃষ্ণ বলেছিল—বাঃ! ভাল মেয়ে, চমৎকার মেয়ে। তা ওকেও নিয়ে যাবেন। হ্যাঁ, দেখে আসবে। দাদাকে দেখবে—দাদাও দেখবেন। হ্যাঁ।

মা বলেছিল—না না বাবু, সেখানে কে কি বলবে—

—ওই দেখুন, বাবু কেন? ঠাকুরপো বলুন না।

মা হেসে মুখ নামিয়েছিল সলজ্জভাবে।

কাকা বলেছিল—নির্ভাবনায় নিয়ে যাবেন। কেউ কোন কথা বলবে না। জানেও না কেউ এসব কথা। এক জানে বউদি; তা সে মাটির মানুষ। আমিও জানতাম না ঠিক। আবছা আবছা জেনেছিলাম এখানে—মানে এই পাড়াতে আর আমাদের অফিসের পুরনো চাপরাসীর কাছে। তাছাড়া এ পাড়াতেও—

—এ পাড়ায় আসা-যাওয়া বুঝি আপনারও আছে?

হেসে কাকা বলেছিল—আগলাঙলের পিছনে পিছলাঙল; তা আছে।

—কার বাড়িতে আসেন?

—সে থিয়েটারের সুরমার বাড়ি। আমি বইটই লিখি। নাটক। তাই ওদের সঙ্গে আলাপ বেশী। তা নিয়ে যাবেন ওকে। মানে দাদার ইচ্ছে তাই। কথাটা খুলেই বলি আপনাকে। আপনার

সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়ে দাদা কিছুদিন বড় বেহেড হয়েছিলেন। তার ফলও পেয়েছিলেন। বাগানবাড়ি করতে গিয়ে মারামারি হয়ে গিয়েছিল একটা, তাতে পুলিস কেস। সে বহু টাকা খরচ করে চাপাচুপো দেওয়া হল তো এক খোরপোশের মামলা। মামলা অবিশ্যি হয় নি—অ্যাটর্নির নোটিস পর্যন্ত হয়েছিল। অবিশ্যি মূলে ছিল আমাদেরই ব্যবসাদারদের একজন—দাদার বন্ধুও বটে, ব্যবসায় প্রতিদ্বন্দ্বীও বটে। দাদাকে জব্দ করবার জন্য সেই-ই এটা করিয়েছিল। সেও টাকা দিতে হয়েছিল। মোটা অঙ্ক। তাতেও দাদার চৈতন্য হয় নি। শেষ হল কি জানেন—একটা ঘরে মারামারি হল। দাদা যাচ্ছিলেন তখন কার ঘরে—তার ঘরে অনেক আগে থেকে আসত-যেত কলকাতার এক পড়ন্ত ঘরের বাবু। ঘর পড়ন্ত যত হয় তত দাপে দুরন্ত হয় এটা নিয়ম। দাদার টাকার জোর, কাজেই খাতির বেশী। সেটা তার সহ্য হবে কেন? একদিন দাদা ঘরে আছেন—গান হচ্ছে—মদও বেশ খেয়েছেন দাদা—এমন সময় গুণ্ডা ঢুকল। দাদাকে বললে—উঠতে হবে এখান থেকে। এই নিয়ে মারামারি। দাদাকে সিঁড়ি থেকে দিলে ঠেলে ফেলে। দাদার পা ভাঙল। তবু ভাগ্য বলতে হবে মাথায় চোট লাগে নি। তারপর কোনক্রমে বাসা। তারপর হাসপাতাল। পাখানা দারুণ জখম হয়েছিল। আড়াই মাস হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। এখনও ড়িয়ে চলেন। কিন্তু সেই বদলে গেলেন। ব্যবসা মেজ ভাইকে দেখতে দিতে দেশে গেলেন। মদ ছাড়লেন। একেবারে বৈষ্ণব হয়ে গেলেন।

মঞ্জরী অবাক হয়ে শুনছিল। পাশের ঘরে এসে সে শ্বাসরুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছিল। তার বাবা—তার কাকা—যত ক্ষীণ সম্পর্কই হোক তাদের সঙ্গে, না থাক এতটুকু দাবি তাদের উপর, তবুও তার বুকের ভিতরটা কেমন করছিল, গলার মধ্যে একটা কিছু যেন ঠেলে উঠছিল। এসব কথা তাদের জাতের মধ্যে কিছু লজ্জার

হলেও ঘেন্নার ঠিক নয়। প্রতিদিন ঘটে তাদের পাড়ায়। একটি দুটি নয়—পাঁচ সাতটা, দশটাও হয়। তবুও এ কথায় তার যেন কান্না পাচ্ছিল সেদিন। তার বাবা যে!

তার মা হঠাৎ বলে উঠেছিল—বোধ হয় আত্মসংবরণ করতে পারে নি—মঞ্জরী দেখতে না পেলেও ঠিক বুঝেছিল—মা তার গালে হাত দিয়েই বলেছিল—ও মা! এত কাণ্ড!

—হ্যাঁ, কাণ্ড অনেক। তবে তারপর যা ঘটল সে আরও আশ্চর্য। দেশে গিয়ে সেই যে দীক্ষা নিয়ে বৈষ্ণব হলেন তারপর একেবারে উলটো মানুষ। কলকাতা আর আসেন নি। চাষবাস জমিদারি নিয়ে মাতলেন। জমিদারি বাড়িয়েছেন। চাষ করেছেন বিরাট। বাড়ির এটা ভাঙা ওটা গড়া লেগেই আছে। ঠাকুরসেবা বাড়িতে ছিল। তার সেবায় ধুমধাম লাগালেন। আমাদের বাড়ি শাক্ত বাড়ি। শক্তিপূজা আছে। শালগ্রামসেবা নিত্যসেবা। উনি বৈষ্ণব হয়েছেন—বললেন—রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করব। মেজদা আপত্তি করলেন—সেবা আর বাড়াব না। একটু ঝগড়াও হয়ে গেল। তাতেই স্থগিত হল তখন। কিন্তু তারপরই মেজদা হার্ট-ফেল করে মারা গেলেন। সকলেরই মনে খটকা লাগল একটা। গতবার প্রতিষ্ঠা হল বিগ্রহসেবা। মেজদার মৃত্যুর পর ধুমধাম বিশেষ হয় নি। তারপরই দাদার অসুখ হল। খুব অসুখ। অসুখের ঘোরে বলতে লাগলেন—আমাকে আনলি কেন? ধুমধাম নেই—আনন্দ নেই—আমাকে আনলি কেন? তাই এবার দোলে ধুমধাম হবে। থিয়েটার হবে। আমাদের গ্রামের—মানে বলতে গেলে সেটা আমারই শখের একরকম—আর আমার দাদার জামাইয়ের। দাদার একটি মাত্র মেয়ে। বিয়ে দিয়ে জামাইকে ঘরেই রেখেছেন। চমৎকার থিয়েটার করে। সেও নাটক লেখে। থিয়েটার হবে তিন দিন। আর কীর্তন। ঠিক মুখ ফুটে বলতে পারছিলেন না আপনার কথা। একদিন বললেন—কীর্তন তো এখানে হয়, কিন্তু ঢপের কীর্তন

হয় না। হলে কেমন হয় হরেকৃষ্ণ? আমি জানতাম। বুঝলাম আপনাকে আনবার ইচ্ছে। বললাম—বেশ তো। সে ভাল হবে। খুব ভাল হবে। ভাল ঢপের কথাও জানি—বিখ্যাত রাধারাণীর মেয়ে তুলসী—তিনিও খুব ভাল গান করেন। তখন বললেন—তা হলে তাই বায়না কর। আমি শুনেছি তার গান কলকাতায়। ওর একটি মেয়েও আছে। আমি ইদানীং—বুঝেছ—কার কাছে ঠিক মনে পড়ছে না—শুনেছি। সেও নাকি চমৎকার গায়। তুলসীকে বলো না কেন মেয়েকে সুদ্ধ সঙ্গে আনবে। দোয়ারকি করবে। বুঝেছেন না—ওকে ওঁর দেখার ইচ্ছা আর কি।

মা একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল—বেশ, তাই হবে। যাবে মঞ্জরী। ওর ভাগ্য। সৌভাগ্য। সেই ওর দু'বছর বয়সে গেছেন তিনি, ওর তো মনে নেই; দেখবে।

বাবাকে দেখতে গিয়ে মঞ্জরী দেখলে গোরাবাবুকে। ওখানে গিয়ে বাপের ঐশ্বর্য দেখে বিস্মিত হল মঞ্জরী। তিনমহলা বাড়ি—অন্দর বাড়ি, কাছারী বাড়ি, ঠাকুর বাড়ি। সুন্দর বাগান। প্রকাণ্ড বাঁধানো ঘাট, দীঘির মতই পুকুর। ঘোড়ার গাড়ি, মোটর। স্টেশন থেকে কয়েক মাইল যেতে হয়। মোটর এসেছিল ওদের নিতে। মা তুলসী উজ্জ্বল মুখে বলেছিল তাকে—দেখেছিস, মোটর পাঠিয়েছেন। তোর জন্যে।

মঞ্জরীর মনে আছে মুখে তার হাসি ফুটেছিল—চোখে জল এসেছিল। সে কিন্তু বলে নি—তোমার জন্যেও বটে।

পাঁচ

একটা কিছুতে মঞ্জরীর কাপড়ের আঁচল বেধে আটকে গেল। থমকে দাঁড়াল সে। কি? কিসে আটকাল?

শিউনন্দন বললে—আরে, একঠো কাঁটা তারকে বোঝা পড়িয়ে আছে। গায়ে লাগলো তুমার?

সে কাপড়ের আঁচলটা ছাড়াতে লাগল।

মঞ্জরী বললে—না না, গায়ে লাগে নি। কিন্তু কাঁটা তারের বোঝা এল কোত্থেকে?

—আরে বাবা, কয়লা কোঠী; লোহা আওর লক্কড়, লক্কড় আউর লোহেকে তো কামই হিঁয়া!

—কিন্তু কোথায় যাচ্ছি আমরা?

—কেন মা—গ্রীনরুমের কাছেই নায়কদের খাবার-দাবার জায়গা—

—কিন্তু হাঁটছি সেই কখন থেকে। এত দূর তো নয়!

—না না—এই তো বেরিয়েছি বাসার বাংলো থেকে।

—এই বেরিয়েছি?

—হুঁ গো। তুমি যে চুপ করে চলিয়েছ—ওহি লিয়ে মনে হচ্ছে কি কতক্ষুণ হাঁটছি!

কথাটা সত্য। চুপচাপ ভাবতে ভাবতেই সে চলেছে। কিন্তু ভেবেছে তো তিরিশ চল্লিশ বছরের কথা। এই সময়টুকুর মধ্যে তিরিশ চল্লিশ বছর পার হয়ে গেল! তা যাক। মনে পড়ে গেল একটা পার্টের কথা। "মন তুরঙ্গমে চড়ি ভ্রমণ করিয়া এনু অনাদি অতীত কাল—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড লোক দেখিলাম, সব মিথ্যা—সত্য শুধু বিরহ বেদনা। প্রেম যেথা সত্য হয়ে ওঠে—সেখানেও মৃত্যু এসে একজনে ছিঁড়ে নিয়ে গিয়ে সত্যতর করে তোলে বিচ্ছেদ বিরহ।"

মনের তুরঙ্গম পলকে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আসে; অনাদি অতীত কাল ঘুরে আসে। তিরিশ চল্লিশ বছর তার কতটুকু অংশ!

এই তো মুহূর্তে মনে মনে সে আট বছর আগে চলে এসেছে।

হ্যাঁ, আট বছর।

আট বছর আগে দোলের দিন ভোর বেলায় রঙের ভয়ে গাড়ি বন্ধ করে তারা রওনা হয়েছিল হাওড়া। ভোর কেন, একটু রাত্রিই

ছিল। কথা হয়েছিল—স্টেশনে গিয়ে বরং বসে থাকবে। ট্রেনও সকাল সকাল, সাতটা ক মিনিটে। ওখানকার স্টেশনে গিয়ে নেমেছিল বেলা সাড়ে এগারটা নাগাদ। লোক ছিল স্টেশনে। শুধু চৌধুরী-বাড়ির লোক নয়; আরও অনেক লোক জমেছিল কলকাতার ঢপওয়ালিদের দেখতে। মা খুব সাদাসিদে পোশাক করে কপালে তিলক কেটেই এসেছিল। সঙ্গের মেয়েটিও তাই। মঞ্জরীও খুব ভদ্র পোশাক করে এসেছিল।

কর্মচারীটি বলেছিল—পথ কোশ দেড়েক হবে। তবে মোটর আছে। এই আধ ঘণ্টা লাগবে।

—মোটর!

—হ্যাঁ, বাবু বললেন—মোটর যাক, নইলে পৌঁছুতে দেরী হবে।

মা মঞ্জরীর দিকে তাকিয়ে হেসে মৃদুস্বরে বলেছিল—এ সব তোর জন্যে রে।

মঞ্জরী প্রতিবাদ করে বলে নি যে তোমার জন্যেও বটে। মনে আছে—এটুকু ভাবতে তারও ভাল লেগেছিল। সত্যও মনে হয়েছিল। না হলে তার মা তো তার বাবাকে মনে করে দিদিমার মত থাকে নি! একমাত্র দাবী বলতে গেলে তো একলা তারই।

মোটরে সে হাসিমুখেই সর্বাগ্রে উঠে বসেছিল। একটি আশ্চর্য খুশী-খুশীতে সে একটু চপল হয়ে উঠেছিল। দলের লোকেদের জন্যে ছিল ঘোড়ার গাড়ি। কাটোয়ার ছ্যাকরা গাড়ি। সে মোটরে বসে যা দেখেছিল—তাই মাকে দেখিয়ে বলেছিল—দেখ—দেখ মা—দেখ।

মা বুঝতে পেরেছিল তার মন। সে শুধু মিষ্ট হেসেই কথার উত্তর দিয়েছিল।

হঠাৎ চোখ পড়েছিল, গাছপালার মাথায় আকাশের গায়ে আঁকা ছবির মত সাদা চিলেকোঠা। একটা নয়—তিন চারটে। সাদা ধবধব করছিল সবগুলি।

—দেখ মা—দেখ—কত বড় বাড়ি!

কর্মচারীটি বলেছিল—ওই আমাদের বাবুদের বাড়ি।

—ওই বাড়ি!

বিস্ময়ের আর সীমা ছিল না। হঠাৎ মোটরটা ডাইনে মোড় নিয়ে রাস্তাটা ছেড়ে একটি সুন্দর লাল সুরকী ঢালা রাস্তায় বাঁক ফিরে চলতে সুরু করেছিল।

চৌধুরী বাড়িতে মটরটা ঢোকে—বড় দীঘিটার দক্ষিণ দিকের পাড়ের উপর দিয়ে, গ্রামের রাস্তা থেকে খোয়া-পিটানো সুরকি-বিছানো প্রশস্ত পথ গিয়ে শেষ হয়েছে কাছারী মহলের ফটকে। কাছারী মহলের সামনেই দীঘি। চারি পাড়ে ফলফুলের বাগান—বাঁধানো ঘাট। ঘাটের মাথায় প্রশস্ত চত্বরে তখন অনেক লোক। পূর্ব পশ্চিমে লম্বা পুকুরটার দক্ষিণ পাড়ে মোটরটা পশ্চিম মুখে চলছিল মন্থর গতিতে। জানালা দিয়ে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে মঞ্জরী দেখছিল পুকুরটার উত্তর দক্ষিণ দুই পাড়ে জলের কোল ঘেঁষে দু দল খাটো কাপড়ে মালসাঁট মারা কালো কালো লোক দড়ি টেনে কলরব করতে করতে চলেছে পশ্চিম দিকে; দড়ি দিয়ে কি টানছে তা সে প্রথমটা বুঝতে পারে নি। হঠাৎ জলের বুক থেকে একটা বড় মাছ উপরে লাফ দিয়ে শূন্যলোকে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ভেসে উঠে সশব্দে জলে পড়ে ডুবে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা। দু পাড়ের লোক হৈ হৈ করে উঠল। সে মায়ের হাত ধরে টেনে বলেছিল—দেখ দেখ মা—কি মজা দেখ—কি সুন্দর মাছগুলো লাফাচ্ছে!

মা বলেছিল—মাছ ধরছে টানা জাল টেনে। ওই যে শোলার আঁটিগুলো ভাসছে জলে!

সারি সারি শোলার আঁটি ভাসছিল। দড়ির টানের সঙ্গে পশ্চিম পাড়ের দিকে চলেছিল। পশ্চিম পাড়ের কোলে উঠতে দেরিও তখন ছিল না। মাছ লাফাতে শুরু করল। সে চমৎকার দৃশ্য। রূপোর পাতের মত বর্ণ বড় বড় মাছ উঠছে লাফিয়ে শূন্যলোকে,

সেজটা একবার দুবার কাঁপছে—তারপর জলে পড়ছে। সে যেন খইয়ের খোলায় খই ফোটার মত। ওঃ, কত মাছ!

গাড়িখানা ফটকে দাঁড়াতেই একজন চাপরাসী দরজা খুলে দিলে। একজন কর্মচারী দাঁড়িয়ে ছিল। সে প্রসন্ন সম্ভাষণে আহ্বান করলে—আসুন।

মঞ্জরী নেমেই ছুটে গিয়েছিল ঘাটে। জীবন তখন তার চঞ্চল চপল। তার উপর সেদিন সে চাঞ্চল্য ও চাপল্যের স্রোতোধারার উপর স্নেহ-সমাদরের বাতাস লেগেছিল; তার বাবা—তার বাবার বাড়ি, তিনি তাদের ডেকেছেন, এ সব তার। ছুটে সে মাছ দেখতে গিয়েছিল। শুধু নিজেই যায় নি মাকেও ডেকেছিল—দেখ মা—দেখ কত মাছ!

ঘাটের চত্বরে গিয়ে সে কিন্তু দারুণ অপ্রতিভ হয়ে গেল। লজ্জার সীমা রইল না। সংকোচে যেন আপনি সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

ঘাটের চত্বরের উপর ভারী চেহারার দীর্ঘকায় এক প্রৌঢ় চেয়ারে বসে ছিলেন। তাঁর পাশের চেয়ারে বসে পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের লম্বা ছিপছিপে এক তরুণ—কাঁচা সোনার মত রঙ, বড় বড় চোখ—চোখে সোনার ফ্রেমে ফিকে নীল রঙের চশমা। সুন্দর ফরসা রঙে ভারী চমৎকার মানিয়েছিল। ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আর একজন—তিনি চেনা—তার কাকা। পিছনের লোকের সারির আড়ালের জন্যে মঞ্জরী এঁদের দেখতে পায় নি। ছোট মেয়ের মত উল্লাস প্রকাশ করে ছুটে এসে ওদের দেখে সে অপ্রতিভ হয়ে গেল।

চেয়ারে বসা প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি একটু হেসে বললেন—কত মাছ! এত মাছ তুমি কখনও দেখ নি মা?—তা বল কোন্ মাছটা তুমি নেবে? যাও দেখ—পছন্দ কর।

মঞ্জরী মাথা নীচু করে চুপ করে রইল। কি বলবে খুঁজে পেলে না। লজ্জার আর শেষ ছিল না যেন।

—কি মা, কথা বল? বল কোন্‌টা নেবে?

এবার সে বলেছিল—না। আমি তো কখনও এমন করে মাছ ধরা দেখি নি।

বলেই সে যেন ফিরে পালিয়ে এসেছিল। ফেরার পথে মা দাঁড়িয়েছিল—এগিয়ে এসেছিল সে।

মা তাকে বলেছিল—ওই উনি। তোর বাপ।

তা সে বুঝেছিল কিন্তু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে লজ্জায় সে তাঁর দিকে তাকাতে পারে নি। মায়ের কথায় সে ফিরে তাকিয়ে একবার দেখতে চাইলে। কিন্তু দেখা গেল না—গেল না নয়, হল না। এবার তাঁকে আড়াল করে ওই কাঁচা সোনার মত রঙ তরুণটি এদিকেই এগিয়ে আসছে। বেশ লম্বা পা ফেলে একরাশ মিষ্টগন্ধ ছড়িয়ে সে চলে গেল এগিয়ে। তাদের অভ্যর্থনা করছিল যে কর্মচারী তাকে কিছু বলে আবার ফিরল। শুধু সুন্দরই নয়, সুবেশ—গায়ে ফ্লানেলের ডবলকফ হাতওয়ালা সার্ট—পরনে কোঁচানো কাঁচি ধুতি— পায়ে বার্নিশ-করা চটি—গায়ে এসেন্স এবং সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ মেশানো একটি মদিরমধুর গন্ধ। তাদের পাশ দিয়ে ঘাটে ফিরে যাবার পথে একবারের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে বলেছিল—আপনাদের ঘরদোর সব ঠিক করা আছে। গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে ফেলুন—চা তৈরী হয়ে গেল বোধ হয়।

তাদের দিকে সে তাকায় নি। মঞ্জরীই তার দিকে তাকিয়েছিল। ভাল লেগেছিল। তার বেশী কিছু নয়।

বাসা হয়েছিল তাদের কাছারী মহলের সংলগ্ন গেস্ট-হাউসের পাশে রেস্ট-হাউসে। হাউস এখানে অনেক। তিন কুঠুরী খড়ো বাড়ি, পাকা মেঝে, খড়ো চাল হলেও জানালা দরজা পাকাবাড়ির মত। নিজেদের ডায়নেমো বসানো আছে—ইলেকট্রিক ফ্যান লাইট। অভাব কিছুর নেই; ছোট কম্পাউণ্ডের মধ্যেই বাথরুম, কুয়ো। দুপাশের দুই কুঠরীতে ব্যবস্থা ছিল মেয়েদের, মাঝখানের বড় হলে ব্যবস্থা পুরুষদের। সে এবং মা ছাড়া সঙ্গে গাইবার জন্য গিয়েছিল কলকাতার নামকরা গায়িকা হরিমতী আর চুনীবালা।

মা বেছে ওদেরই পছন্দ করে সঙ্গে নিয়েছিল, কীর্তন গানে ওদের নাম ছিল। মা তুলসীর ভয় ছিল পাছে গানে অখ্যাতি হয়, তাই সতর্কতার অন্ত ছিল না। চৌধুরী বাড়ির যত্নেরও অন্ত ছিল না। স্নানঘরে সুগন্ধ তেল সাবান থেকে নতুন তোয়ালেটি পর্যন্ত রাখা ছিল। খাওয়া-দাওয়া প্রচুর। দাঁড়িয়ে খাইয়েছিলেন বাড়ির ছোট কর্তা হরেকৃষ্ণবাবু নিজে। রামকৃষ্ণবাবু ব্যস্ত ছিলেন ব্রাহ্মণ ভোজনের ওখানে, তদ্বির করছিলেন। তাদের দলের খাওয়াদাওয়া বাসাতেই হয়েছিল ; ওই ব্রাহ্মণ ভোজনের পাকশালা থেকে বয়ে এনে পরিবেশন করেছিল দুজন ব্রাহ্মণে। কাকা হরেকৃষ্ণ চৌধুরী কোঁচানো কাপড় সিল্কের গেঞ্জির উপর টার্কিশ তোয়ালে জড়িয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল ; হেসে তার মাকে বলেছিল—খেতে বসুন। দোষ ত্রুটি হচ্ছে কিছু কিছু—দয়া করে ধরবেন না।

মা বলেছিল—একি বলছেন বাবু, আমাদের ওসব বললে অপরাধ হয়। যা করছেন এ রাজসমাদর। কোন অভাব নেই, সুন্দর ব্যবস্থা।

—না না; কর্তা খুঁতখুঁত করছিলেন। বললেন—আমার যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ ভোজন—এ ফেলে কি করে যাই। তা তুমি যাও হরে। বলে এস তুলসী দাসীকে যেন কিছু মনে না করেন। যাব, আমি একটু ফুরসত পেলেই যাব। আসবেন তিনি।

পাতায় তখন ভাত পড়ছিল, সে খেতে বসেছিল মায়ের পাশেই, তারপর হরিমতী মাসী, তারপর চুনী মাসী। মা কাকাকে বলেছিল—হ্যাঁ, কত কাজ! কত বড় ব্যাপার!

ঠিক এই সময় একজন পরিবেশনের লোক একটা বড় বাটিতে প্রকাণ্ড একটা মাছের মাথা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল—সঙ্গে গোরাবাবু ; গোরাবাবু তার পাতার দিকে দেখিয়ে পরিবেশুনেকে বলেছিল—এখানে দাও।

পরিবেশুনে নামিয়ে দিয়েছিল সেই বাটিটা, বাটিটাই খুব বড়,

তার চেয়েও বড় মাছের মুড়োটা। তার বিস্ময় সংকোচ লজ্জার আর সীমা ছিল না, শুধু সে বলেছিল—এ কি!

গোরাবাবু বলেছিল—কর্তা পাঠালেন। বললেন—মা-টিকে দিয়ে এস। মায়ের মাছ দেখে খুব আনন্দ হয়েছিল। বলেছেন যাবার সময় বড় মাছ ধরিয়ে সঙ্গে দেবেন।

বলেই সে চলে গিয়েছিল। যাবার সময় কাকাকে বলে গিয়েছিল—ছোটকা ওখানে আসুন। লাঠি ধরে পংক্তির মধ্যে ঘুরতে কর্তার কষ্ট হবে।

কাকা হরেকৃষ্ণ চলে গিয়েছিল মিনিট কয়েক পরেই। খেয়ে-দেয়ে তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল।

তার বাবা কিন্তু আসেন নি। তাঁকে দেখেছিল আসরে। রাত্রি দশটায় বসেছিল কীর্তনগানের আসর। তখনকার দিনে বাংলাদেশের গ্রামে শহরের মত সকাল থেকে ফাগ খেলা, রঙ খেলা ছিল না। সন্ধ্যের পর ঠাকুরবাড়িতে হত দোল; হিন্দোলায় ঠাকুর বসতেন রাধাকে নিয়ে—তারপর ফাগ। বিগ্রহের পায়ে রঙ দিয়ে নাটমন্দিরে ফাগ ছড়ানো মাখানো হত। কীর্তনের আসরে মস্ত থালায় ফাগ এনে নামিয়ে দিয়েছিল। তার বাবা চৌধুরী কর্তা সেই ফাগ মুঠো মুঠো—কয়েক মুঠো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আসরে; তারপর সেই থালা আসরময় ঘুরেছিল। ওদিকে খোল বাজছিল আস্তে আস্তে। এরই মধ্যে মা গিয়ে তাঁকে প্রণাম করেছিল। তিনি একটু হেসে বলেছিলেন—কষ্ট-টষ্ট হচ্ছে না তো আমার এখানে?

মা বলেছিল—এত বড় রাজবাড়ি—এখানে আমাদের কষ্ট কি করে হবে? নিজে ছোটবাবু খোঁজ করছেন।

মায়ের ইশারায় সে এসে প্রণাম করেছিল তাঁকে, তিনি চশমাশুদ্ধ দৃষ্টি উঁচু করে তার দিকে তাকিয়ে দেখে বলেছিলেন—মেয়ে! বাঃ বেশ মেয়ে। তাকে বলেছিলেন—মাছের মুড়ো খেয়েছ? যাবার সময় মস্ত একটা মাছ দেব সঙ্গে।

তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—আমাদের মাড়োয়ারীদের মত টাকা নেই এত, তবে এসব আছে অনেক। বুঝেছ।

মা মাথা নীচু করেছিল। ইঙ্গিতটা সেও বুঝেছিল। এর পর মা গিয়ে আসরে নিজের জায়গায় বসেছিল মাথা হেঁট করেই। ওদিকে ফাগ ছড়ানোর পালা শেষ হতেই কীর্তন পালা শুরু হয়েছিল।

কীর্তন শেষে 'ভাল ভাল, খুব ভাল' বলে তারিফ করে তিনি সর্বাগ্রে উঠে চলে গিয়েছিলেন লাঠির উপর ভর দিয়ে। তিনি বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আসরের কেউ উঠতে পায় নি পাছে কর্তার গায়ে ভিড়ের ঠেলা লাগে। মঞ্জরী অবাক হয়ে গিয়েছিল দেখে; ভয়ও করেছিল; এই তার বাবা!

আর দু'দিন গান হয়েছিল—ওই গানের আসরেই দেখেছিল তাঁকে। আলাদা তিনি দেখা করতে ডাকেনও নি, আসেনও নি। দেখা করতে যাওয়ার কথা তুলতেও সাহস হয় নি মা-মেয়ের। গানের আসর বসেছিল সকালবেলা। সাড়ে এগারটায় শেষ হয়েছিল। আসরে সেদিন একটি কথা বলেছিলেন। মাকেই ডেকে বলেছিলেন।—আমাদের এখানকার সব দেখো। বলে দিয়েছি হরেকৃষ্ণকে। সামান্যই ব্যাপার তবুও দেখে যেয়ো। পাড়াগাঁয়ের শেয়াল রাজা কথায় আছে; তা শেয়ালের গর্তটর্ত দেখে যাও, গল্প করতে পারবে।

মায়ের মুখ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল।

কথাটার পিছনে অর্থ ছিল। যেদিন ওই সায়েবকে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন তার বাবা—যা নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল—বাবার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল তার মা—সেদিন এই কথাটাই বলেছিল তাঁকে তার মা। ওই কথা বলেই দরজা বন্ধ করেছিল—"পাড়াগাঁয়ের শেয়ালেরা নিজেদের বাঘ মনে করে। ও গর্জন গ্রামে গিয়ে করো।" সেই কথাটাই মনে করে দিয়েছিলেন সেদিন।

যেটার সম্পূর্ণ অর্থ সে বোঝে নি তখন কিন্তু আভাসে অনুভব করেছিল—যে মাড়োয়ারীকে সে বাড়িতে আসতে দেখেছে তার কথা তুলে বাবা কিছু ইঙ্গিত করছেন। কিছুটা অস্বস্তি সেও অনুভব করেছিল। সারাটা দিন মা ছিল যেন কেমন ভয়ার্ত হয়ে, বিষণ্ণ হয়ে। রাত্রে হয়েছিল থিয়েটার। ছোটবাবু নিমন্ত্রণ করে গিয়েছিলেন।—যাবেন দেখতে আমাদের থিয়েটার।

মা প্রথমটা বলেছিল—কাল সকালে আবার গান আছে। রাত্রি জাগব—

ছোটবাবু বলেছিলেন—খানিকটা দেখে আসবেন। খারাপ লাগবে না। আমরা ভাল থিয়েটার করি।

মা অনিচ্ছাতেই বলেছিল—যাব। কিন্তু তারপর বলেছিল—যেন নিজেকেই বলেছিল—সেই ভাল। বুঝলি মঞ্জরী।

সে জিজ্ঞাসা করেছিল—কি মা?

—থিয়েটার দেখতেই যাব। অনেক লোকের মধ্যে থাকব। সেই ভাল।

তবুও সে বুঝতে পারে নি। অবাক হয়ে তাকিয়েছিল মায়ের মুখের দিকে। মা বলেছিল—সবাই থিয়েটার দেখতে যাবে রে—আমরা ঘুমিয়ে থাকব। যদি কেউ—

ভয় পেয়ে সে বলেছিল—চোর?

—হ্যাঁ। চোর, ডাকাত—তারা এসে যদি মেরেই দিয়ে যায়! কে রক্ষা করবে? কি করব?

মা ভয় পেয়েছিল চৌধুরী কর্তাকে। সে কথা কলকাতায় ফিরে তাকে বলেছিল। বলেছিল—মঞ্জরী, ও সব পারে রে। আমার ভয় হয়েছিল কি জানিস—আসরের ওই কথাটি শুনে আর চোখ মুখ দেখে। মনে হয়েছিল—তুই তো মেয়ে। তোকে ওর নেবারও উপায় নেই আবার আমাদের পাপ বল যা বল তাই করবে ওর মেয়ে তাও সইছে না—কিংবা ওর পাপের চিহ্ন তুই, তাও সইছে না—কে

জানে? তোকে যদি ও মেরে দেয় কি করব? নইলে তোকে কাছে ডাকলে না, কথা বললে না, অথচ যাবার কথা ছোট চৌধুরী এত করে বলেছিল কেন?

তাই সারাটা রাত মানুষের মধ্যে কাটাবার জন্য থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল। বই হচ্ছিল—ছোটবাবুর নিজের লেখা বই। পাণিপথ নাম। আমেদশা আবদালী দিল্লী লুঠে নিয়ে যাচ্ছে—পাণিপথে মারাঠারা পরাজিত হচ্ছে। এইটুকু ঐতিহাসিক ঘটনা। কজন মোগল শাহজাদীকেও নিয়ে গিয়েছিল আবদালী। তার সঙ্গে অনেক বাঁদী, অনেক হিন্দু মুসলমানের মেয়ে। তার মধ্যে ছিল এক চাষী মুসলমানের মেয়ে। তার স্বামী চাষী মুসলমান—সদানন্দময় জোয়ান ছেলে। গ্রামে তারা ছিল সুখে আনন্দে; স্বামী যেত ক্ষেতে—মেয়েটি খাবার নিয়ে গান গাইতে গাইতে যেত স্বামীকে খাওয়াতে। স্ত্রীর গানের সাড়া পেয়ে স্বামীও দূর থেকে ধরত গান। তারপর আসত সে এগিয়ে, ঝরনার ধারে বসে খাবার খেত। সুখের জীবন। আবদালী আসছে—স্বামী গেল লড়াই দিতে। বন্দী হল। স্ত্রী খবর পেয়ে বের হল তাকে মুক্ত করতে। সে বন্দিনী হল। তখন স্বামী পালিয়েছে। ঘরে স্ত্রীকে না পেয়ে সে আবার বের হল। ঢুকল সে রাত্রে আফগান তাঁবুতে। স্ত্রীর হাতের বাঁধন খুলে তার হাতে দিল একটা ছোরা। পালাতে না পারলে এই রইল—একে বললেই এ তোকে মুক্তি দেবে। তারপর পথে হল লড়াই। স্বামী হল জখম—স্ত্রী বুকে বসাল ছোরা। মরবার সময় পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললে—এত সুখ মরণে! এত সুখ! এয় আল্লা, এয় খোদা—জন্মে জন্মে যেন সকল দুঃখ জয় করে এমনি করে দুজনে একসঙ্গে মরি। খেদ নেই—কোন খেদ নেই। হাসান ডাকলে—লুৎফা! লুৎফা ডাকলে—প্রিয়তম! শেষ হয়ে গেল তাদের।

তারা মরলে হেসে—দর্শকেরা কেঁদে হল সারা। মঞ্জরী বোধ হয় সব থেকে বেশী কাঁদল। কি সুন্দর, কি সুখের দুটি জীবন! কি

সুন্দর ওরা! কি মানিয়েছে দুজনকে! চাষীর ছেলে সেজেছিল গোরাবাবু। সে যখন 'লুৎফা' 'লুৎফা' বলে প্রান্তরের বুক দিয়ে ছুটে চলেছে তখন তার সে ডাকের মধ্যে কি কান্না! আশ্চর্য রোমাঞ্চকর মমতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল দর্শকের আসর। মুহূর্তে ওই চাষীর ছেলে হয়ে উঠল সারা আসরের দর্শকের প্রাণের প্রিয়তম জন।

থিয়েটার শেষ হয়ে গেলেও তার কানে বাজছিল—লুৎফা! হাসান! প্রিয়তম! হঠাৎ মনে হয়েছিল এই বইখানা যদি মিনার্ভায় হয় আর সে যদি লুৎফার পার্টটি পায়! হাসান? হাসান কে? এই, এই যদি হাসান সাজে!

বাকী রাত্রিটা ঘুমের মধ্যেও একটি বিষণ্ণ বেদনায় সে আচ্ছন্ন হয়েছিল। স্বপ্ন দেখেছিল। একক হাসানকে নয়—লুৎফা হাসান দুজনকেই।

পরের দিন সকালবেলা তখন সবে তারা উঠেছে মা আর মেয়েতে, অন্য সকলের ঘুম ভাঙে নি, ভাঙলেও যে যার ঘরেই আছে। ছোট চৌধুরী এসেছিলেন তাদের সুখসুবিধার কথা জিজ্ঞাসা করতে। থিয়েটারে তিনি নিজেও সেজেছিলেন—সেজেছিলেন আমেদশা আবদালী। ভাল পার্ট করেছিলেন। সত্যিই বাদশার মত।

হেসে তার মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কেমন দেখলেন আমাদের থিয়েটার?

মা স্তিমিত নিরুৎসাহ হয়েই ছিল—তবুও হেসে খানিকটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেই বলেছিল—খুব ভাল। সুন্দর থিয়েটার আপনাদের। আর কি বই লিখেছেন? খাসা বই।

—তবু দেখুন কলকাতার থিয়েটারওলারা এসব বই নেবে না। তারপর তাকে বলেছিলেন—তোমার কেমন লাগল গো মেয়ে? তুমি তো থিয়েটার কর। অ্যাঁ?

—খুব ভাল।

—তোমাদের থিয়েটারের ম্যানেজারকে গিয়ে বলো না কেন বইটা করুন।

—আমি তো এখন ছেড়ে দিয়েছি।

—ও! তারপর কার পার্ট ভাল লাগল?

—আপনার খুব ভাল হয়েছে।

—হ্যাঁ। শিশিরবাবুর 'নাদির শা'র অনুকরণ বলে এখানে কেউ কেউ, কিন্তু তা আমি করি নি। অনেক তফাত আছে।

—আমি দেখি নি ওঁর নাদির শা।

—হলে দেখো। হাসান লুৎফা কেমন লাগল?

—অপূর্ব! বড় সুন্দর!

—হাসান অপূর্ব। ওটি দাদার জামাই।

মা বলেছিল—বড় সুন্দর ছেলে। জামাই খুব ভাল করেছেন বড়বাবু। একটু থেমে হঠাৎ বলেছিল মা—বলতে তো সাহস হয় না, দুটো কথা বলতাম। কাল এসে একবার দাঁড়িয়ে বড়বাবুর পাঠানো মাছের বাটিটার কথা বলেই চলে গেলেন। দাঁড়ালেন না। খুব গম্ভীর।

হেসে ছোট চৌধুরী বলেছিলেন—না না, আনন্দময় ছেলে। কিন্তু—

একটু থেমে গলা নামিয়ে চুপিচুপি বলার মত বলেছিলেন—আমার ভাইঝির ভয়ানক কড়া শাসন। একটু বেশী বেশী। বাপকেই কটূ কটূ করে কথা বলে। বলে, তোমাদের জানতে বাকী নেই বাবা। কিছু মনে করো না। ছেলেবেলা হলেও মনে আছে আমার মায়ের সেকালের দুঃখ। দাদার মত সিংহরাশির পুরুষ—তাঁকে চুপ করে থাকতে হয়। জামাইটি গরীবের ছেলে, ভাল ছেলে, আই-এ পড়তে পড়তে বিয়ে হল, আই-এ পাস করলে—ওই ভাইঝির জন্যে আর পড়া হল না। কলকাতায় পড়লেই খারাপ হবে। আমাকেও ছাড়ে না, মুখের সামনে না বললেও বলে, ছোটকাকারও সব জানি—সবাই জানে। দাদা বলেছিলেন, তুই

গিয়ে থাক। কিন্তু তাও না, সে যাবে না। বাড়ির ঠাকুর ছেড়ে কোথাও যাবে না। ছেলেবেলা থেকে ঠাকুরে খুব ভক্তি। ওর ধারণা ও চলে গেলে ঠাকুরের সেবা ঠিক হবে না। শুধু তাই নয়, ঠাকুর অসন্তুষ্ট হবেন। তা ছাড়াও বলে, তাতেই বা কে আটকাবে কলকাতা শহরে। ওই তো ছোটকাকী, থেকে আটকাতে পারে ছোটকাকাকে? শয়তান, ওরা স-ব শয়তান। বুঝেছেন না—ও এক ব্যাধি। দাদা যে দেখা করতে পারছে না, আসছে না—সেও ওই মেয়ের জন্যে।

মা চুপ করে ছিল। সে নিজে কেমন অস্বস্তি অনুভব করেছিল। একটু ভয়ও হয়েছিল। ছোট চৌধুরী—তার কাকা চলে গেলে সে বলেছিল—যেন হঠাৎ বলে উঠেছিল—আপনা থেকে কথাটা বেরিয়ে এসেছিল—কেন এখানে এলে মা?

মা বলেছিল—হ্যাঁ। না এলেই ভাল হত। ঠিক বুঝতে পারি নি রে। যাক—আর একবেলা। ওবেলা তো চলেই যাচ্ছি।

একটা বেলা সময় অল্পই বটে। কিন্তু স্থান আর পাত্রের সমাবেশে ওই অল্পকালের মধ্যেই বিপর্যয় ঘটে যায়। শান্ত সমুদ্রে অকস্মাৎ এক টুকরো মেঘ উঠে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঝড় তুফান তুলে নৌকো ডিঙি জাহাজ অতলের বুকে ডুবিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে যায়। তাই হল।

সেদিনও সকালবেলায় কীর্তনের পালাগান ছিল। গান খুব ভাল জমে নি। শ্রোতাও বেশী হয় নি। রাত্রে থিয়েটার দেখে লোকে বোধ হয় ক্লান্ত ছিল। গানের শেষে তারা বাসায় এসে যাবার গোছগাছে ব্যস্ত, এমন সময় ছোট চৌধুরী এসে বলেছিলেন—চলুন একবার।

—কোথায়?

—ঠাকুরবাড়িতে। বড় বউদি বসে আছেন।

সভয়ে মা বলেছিল—তিনি—

—বড়দা ব্যবস্থা করেছেন। বউদি আপনাকে বিদেয় করবেন। মানে গরদের শাড়ি দেবেন। মেয়ের জন্যে বড়দা একখানা গয়না দিয়েছেন—সেটাও আপনার হাতে দেবেন। চলুন।

—গোলমাল হবে না তো? মানে—মেয়ে—

—না না, এতে সে কি বলবে? সেই জন্যে অন্দরেও ডাকা হয় নি, ঠাকুরবাড়িতে ব্যবস্থা হয়েছে। বউদির হাত দিয়ে বিদেয় হচ্ছে। চলুন। তা ছাড়া কাল রাত্রি থেকে দাদার মেজাজ খারাপ হয়ে আছে। এখন আর কিছু হবে না। আসুন। এসো মেয়ে, তুমিও এসো। ওঁদের ডাকুন।

চৌধুরীবাড়ির বড়গিন্নী মোটাসোটা মানুষ—একখানা দামী গরদের শাড়ি পরে ঠাকুর-মন্দিরের বারান্দায় একখানা কার্পেটের আসনে বসেছিলেন। রঙটি কালো, দেখতেও সুশ্রী নন, কিন্তু একটি প্রসন্নতা আছে মুখে-চোখে। নাকে এবং কানে হীরের নাকছাবি ও ফুল—নাকের হীরেটা ঝকমক করছিল। সামনে একখানা নতুন শতরঞ্জি বিছানো ছিল। তাদের নিয়ে ছোট চৌধুরী শতরঞ্জিখানা দেখিয়ে বলেছিলেন—বসুন এখানে; ইনি আমার বউদি। চৌধুরী-বাড়ির গিন্নী। আপনাদের গান শুনে খুব খুশী হয়েছেন। সামান্য বিদেয় দেবেন যাতে মনে থাকবে চৌধুরীবাড়ি এসেছিলেন।

গিন্নী বলেছিলেন—বস ভাই, বস। ভারী ভাল লেগেছে তোমাদের গান।

মা বলেছিল—আপনাকে প্রণাম করি—

ফিক করে হেসে গিন্নী বলেছিলেন—পেনাম করবে? তা কর।

মা হেঁট হয়ে প্রণাম করে হাত বাড়িয়ে পায়ের ধুলো নিয়েছিল। মার মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন—বেঁচে থাক, সুখে থাক। বলতে বলতে সাদাসিধে সেকেলে মানুষটি বলেছিলেন—তোমাকে ভাই, দেখতে ইচ্ছে আমার ছিল। তা—বলতে হয়—রূপ গুণ দুই ছিল

তোমার। এই মেয়ে? এই গয়নাখানি মেয়েকে দিয়ো আর তোমাদের এই বিদেয়।

হঠাৎ পিছন থেকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে কেউ বলেছিল—ছি! ছি! ছি মা, ছি! বিদেয় করছ বিদেয় কর, কিন্তু কি বলছ এসব তুমি! মুখে বাধছে না?

ছোট চৌধুরী বলে উঠেছিলেন—কমলা! কি বলছিস তুই?

এবার ঠাকুরঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল মোটাসোটা একটি মেয়ে, তার থেকে কিছু বড় হবে, তার রঙও কালো—মুখে চোখে অপরিসীম রুক্ষতা; বলেছিল—যা বলছি আমার মাকে বলছি, তোমাকে বলি নি ছোটকাকা। তবে বলছি তোমাদের সংসারের মঙ্গলের জন্যে। ঘরের মধ্যে দেবতা রয়েছেন—তাঁরা এ অনাচার ক্ষমা করবেন না। তুমি স্নান করগে মা—এই ছোঁয়াছুঁয়ি করে তুমি ঠাকুর দেবতার কাজে হাত দিয়ো না।

বলেই সে হনহন করে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল।

তাদের প্রত্যেকের মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল—বুকের ভিতরটায় যেন নিষ্ঠুর প্রহার চলেছিল,—আকস্মিক ভয়ে আতঙ্কে হৃদপিণ্ড যেমন আছাড় খায় তেমনি ভাবে আছাড় খেতে শুরু করেছিল। হাত পায়ে যেন বল ছিল না। ঘামতে শুরু করেছিল হাত পায়ের তলা। কথা কইবারও শক্তি ছিল না কারুর।

প্রথম কথা বলেছিলেন ছোট চৌধুরী, বলেছিলেন—ওর মাথার একটু গোলমাল আছে। কিছু মনে করবেন না আপনারা। আমি মাফ চাচ্ছি।

গিন্নী যেন সূত্র ধরে বলে উঠেছিলেন—আমি হাতজোড় করছি ভাই।

তারা কি বলে গোটা পর্বটায় যবনিকা টেনেছিল তা মঞ্জরীর মনে নেই। মনে আছে সে থরথর করে কেঁপেছিল। কোনমতে ফিরে এসেছিল বাসায়। বাসায় এসে কলহ শুরু হয়েছিল—হরিমতী আর

চুনী সাপের মত গর্জে উঠে মাকে বলেছিল—এ অপমান খাওয়াতে তুমি কেন এনেছিলে বলতে পার? এ জুতো তুমি খেতে খেতে, আমাদের খাওয়ালে কেন?

চুনী বলেছিল কুৎসিত অশ্লীল কথা।

মা চুপ করে মাথা হেঁট করে বসেছিল। সে উপুড় হয়ে শুয়ে কেঁদেছিল। কলকাতায় ফিরে হরিমতী আর চুনী তাদের সমাজে জুতো মারার কথাই রটিয়েছিল। তুলসী কীর্তনওয়ালীকে বায়না করে নিয়ে গিয়ে তার যৌবনের ভালবাসার বাবু নিজের মেয়েকে দিয়ে জুতো মারিয়েছে। মা চুপ করেই ছিল।

মাসখানেক যেতে-না-যেতে এলেন ছোট চৌধুরী। গাড়ি এসে দাঁড়াল। শিউনন্দন এসে বললে—ওই ছোটা চৌধুরীবাবু আর সেই জামাইবাবু এসেছে।

মা হঠাৎ আজ ক্ষেপে উঠেছিল; বলেছিল—না। বাড়ি ঢুকতে দিস নে।

—উন লোকের বাড়িতে কে মরেছে। চৌধুরীবাবুর খালি পা—গায়ে জামা নাই, চাদর।

—মরেছে! মরুক। বল গে বায়না নিতে আমি পারব না।

ততক্ষণে ওঁরা বাড়ি ঢুকেছেন। কথাটা বোধ হয় কানেও গিয়েছিল। কারণ কথা ধরেই বললেন—বলবার মুখ নেই। সেও বলব না। দাদা হঠাৎ মারা গেলেন।

—মারা গেলেন!

—হ্যাঁ। অ্যাপোপ্লেক্সি হল। সন্ন্যাসরোগ যাকে বলে।

—বসুন বসুন।

—না বসব না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলে যাই।

—একেবারে হঠাৎ! ওঃ!

—একেবারে হঠাৎ নয়। ওই আপনাদের ব্যাপার নিয়েই; রাগটা মেয়ের উপর চাপা ছিল। হঠাৎ একদিন একটা ছুতো ধরেই

কথা-কাটাকাটি। ভাইঝিকে তো দেখেছেন। বাবার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করতে করতে ছুটে গিয়ে ঠাকুরঘরের ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে বললে—পাপ কি অপরাধ যদি কিছু হয়ে থাকে ঠাকুর, পাপীকে পাপী বলা যদি পাপ হয় তবে আমাকে শাস্তি দাও ঠাকুর। আমার একমাত্র সন্তান, তার মাথায়—। দাদা চীৎকার করে উঠলেন—কমলা! ওই সব কথাটাও মুখ থেকে বেরুল না। পড়ে গেলেন ধড়াস করে। শ্রাদ্ধের বাজার করতে এসেছি। বউদি বলেছিলেন—ঠাকুরপো, তুমি তো ভাই যাও আস ওসব পাড়ায়—তা তুলসীকে বলে এস সে যেন মনে কোন দুঃখ না রাখে। দুঃখ সে পেয়েছে। বাবাজী এসেছেন। আমি আসছি শুনে বললেন, আমায় নিয়ে যাবেন ছোটকাকা? বললাম, কেন? বললেন, কমলা আমার স্ত্রী, তার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাওয়াটা আমার কাজ। হলামই বা ঘরজামাই।

মা বলেছিল—তুমি কেন এলে বাবা। এ খবর তার কানে গেলে তো একটা ভীষণ কাণ্ড হবে।

গোরাবাবু এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। এবার সে বলেছিল—হলে সে সইতে হবে আমাকে। তারপর হাতজোড় করে বলেছিল—বলুন আপনি—

—না না বাবা। আমরা ঘেন্নার জাতই বটে। তবুও তুমি আমার সম্মানের স্নেহের জন। আমার নিজের পেটের মেয়ে মঞ্জরী যদি এমন হত—কি করতাম? তুমি এমন করে হাত জোড় করলে আমাকে বড্ড ছোট হতে হবে।

ছোটবাবু আবার বললেন—আর একটি কথা। দাদা আপনাকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর একটা গোপন ইচ্ছা ছিল। যে দিন ওই কাণ্ড ঘটল আপনারা চলে এলেন, সেই দিন রাত্রে তিনি আমাকে ডেকে বলেছিলেন, এত বড় অন্যায়টা হয়ে গেল হরি, তাও মুখ বুজে সইতে হল আমাকে কেলেঙ্কারির ভয়ে। আগে বুঝতে পারলে

তুলসীকে আনতে বলতাম না। তোমাকে খুলে বলি, আমার ইচ্ছে ছিল, আজও আছে, ওই মেয়েটিকে কিছু দিতে। বুঝেছ—আমার মেয়ে। তিন বছর পর্যন্ত কমলার চেয়েও বেশী আদর করেছি। ইচ্ছে ছিল কিছু টাকা, ধর, পাঁচ হাজার দিয়ে তুলসীকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেব ওকে একটি সুপাত্র দেখে বিয়ে দিয়ে সংসারী করবে। বাড়ি তুলসীর নিজেরই আছে। একতলা বাড়ি আমি দোতলা করে দিয়েছি। কালও এখন পালটেছে। পাত্র চেষ্টা করলে পাওয়া যায়। একখানা মোটা খাম তাকিয়ার তলা থেকে বের করে আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, এই দেখ টাকাটা পর্যন্ত ঠিক করে রেখেছিলাম হে। তা এটা তুমি গিয়ে তুলসীর হাতে দিতে পারবে? আমি কথা দিয়েছিলাম। সেটা যদি—

মা অনেকক্ষণ চুপ করে ভেবেছিল। তারপর বলেছিল—প্রতিজ্ঞা যদি না রাখতে পারি ছোটবাবু? আমাদের ঘরেও বিয়ে হয়। আজকাল আবার থিয়েটারে অ্যাক্টর অ্যাক্‌ট্রেসে বিয়ে হচ্ছে। কিন্তু শেষ তো রক্ষে হয় না। আমারও তো বিয়ে হয়েছিল মালাবদল করে!

আর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলেছিল—না ছোটবাবু। কাজ নেই। বড়বাবু যদি আমাদের দুঃখে দুঃখ পেয়ে মারা না যেতেন এমন করে তবে হয়তো নিতাম। ভাবতাম, সে যখন কথা দিয়ে কথা আমার কাছে রাখে নি তখন আমি তার কাছে দেওয়া কথা না রাখলেই বা পাপ কিসের। কিন্তু এরপর তো আর তা পারব না।

গোরাবাবু এবার বলেছিল—আমি বলেছিলাম, আপনি নেবেন না।

ছোটবাবু বলেছিলেন—তাঁর আত্মা শান্তি পেতেন আর কি।

মঞ্জরী ঘরের কোণে বসেছিল, পানের সরঞ্জাম পেতে পান সাজছিল। এবার সে উঠে এসে দাঁড়িয়েছিল। হাত পেতে বলেছিল—

দিন, আমাকে দিন। আমার বাবা আমাকে দিয়ে গেছেন—আমি নিচ্ছি।

সে অসংকোচেই ছোটকাকার মুখের দিকে চেয়ে হাত পেতেছিল। ছোটকাকাও তার মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করেছিলেন আর একজনের বিস্মিত দৃষ্টি নিষ্পলক হয়ে তার মুখের উপর নিবদ্ধ হয়েছে। সে একবার ফিরে তাকিয়েছিল। চোখে চোখ মেলতেই একমুহূর্তে কান দুটি গরম হয়ে উঠেছিল, একটি গাঢ় লজ্জার ভারে সে দৃষ্টি আনত হয়ে আবদ্ধ হয়েছিল মেঝের বুকে। কানে শুনেছিল—বাঃ! চমৎকার বলেছেন। আপনার বাপের দেওয়া টাকা আপনি নেবেন। নিন—ধরুন।

হাতের পোর্টফোলিয়ো ব্যাগ থেকে একটি খাম বের করে তার হাতে দিয়েছিল এই গোরাবাবু। ওরা চলে গেলে মা বলেছিল—টাকাটা নিলি মঞ্জরী, কিন্তু কি দায় নিলি বুঝতে পারছিস?

সে বলেছিল—বুঝেছি মা। চেষ্টা কর তুমি—

মা বলেছিল—আমি চেষ্টা করে কি করব? তুই থিয়েটারে যাবি, তুই যদি নিজে ডাকিস কাউকে—

—সে আমি কথা দিচ্ছি মা। থিয়েটার ছেড়েছি, আর না হয় যাবই না।

সেই দিন তখন থেকেই এর পূর্বে তার মা তাকে নিয়ে যে সব কল্পনা করেছিল তাতে ছেদ পড়ে গিয়েছিল। আর থিয়েটারে না। খোঁজ শুরু করেছিল তার পাত্রের। পাত্র তাদের সমাজেও মেলে। বড় উকীল বড় ডাক্তার দু'চারজন ধনীর ছেলে মেয়ে—যাদের মা সমাজের মতে বিয়ে করা স্ত্রী নয়, কিন্তু সৌভাগ্যবশে বাপের স্নেহ পেয়েছে ছেলে মেয়ের মত, তাদের সত্য সত্য বিবাহ হয়। তাদের মধ্যে শিক্ষিত ভাল ছেলে মেলে। মা তেমনি ছেলের খোঁজ করতে আরম্ভ করেছিল। টাকাটার একটি পয়সা খরচ করে নি—ব্যাঙ্কে রেখেছিল। কিন্তু সুবিধে খুব হয় নি, খুঁত দাঁড়িয়েছিল তার মায়ের।

এই সব ছেলে মেয়ের মায়েদের বাজারের পরিচয় থাকে না। তার মায়ের ছিল। সে ছিল কীর্তনওয়ালীর মেয়ে কীর্তনওয়ালী। একজন ডাক্তারের এমনি নার্স স্ত্রীর ছেলের সঙ্গে কথা অনেকটা চলেছিল। ছেলেটি ভাল ছিল। ছোট একটি ওষুধের দোকান করে দিয়েছিল বাপ। দোকান চালাত, ম্যাট্রিক পাসও বটে। কিন্তু তার মা ডাক্তারের মৃত্যুর পর একজন ধনী মুসলমানের সংস্রবে এসে তার কাছে থাকত। তার মায়ের এই খুঁতের জন্যেই ভেঙে গেল। এমনি এক উকীলের ছেলেকে তার মায়ের পছন্দ হয় নি। বাপের সাহায্যে আদালতের আশেপাশে ঘুরত, রোজগারও মন্দ করত না, কিন্তু তাদের বাড়ির সংলগ্ন পাড়ায় তার বদনাম ছিল।

ছয়

অন্ধকারের মধ্যে চলতে চলতে হাসলে মঞ্জরী। নিঃশব্দে হাসলে। হায়, হায়, হায়!

এতকাল পরে কথাটা মনে পড়ে হাসি এল মঞ্জরীর। বিয়ের কথায় তারাও চরিত্র দেখে! কিন্তু তাতে কি আটকানো যায় পুরুষকে? মেয়েকে? তাও যায় না। তবে কম আর বেশী। গোরাবাবুর সঙ্গে তারও বিয়ে হয়েছে। যখন বিয়ে হয় তখন দুজনে দুজনকে ভাল বেসেছে; সেও তখনও শুদ্ধ; গোরাবাবুরও তখন চরিত্র নির্মল। সে ব্যভিচারের প্রস্তাব নিয়ে আসে নি—টাকা দিয়ে তার দেহ কিনতে আসে নি—এসেছিল বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে—পায়ে হেঁটে আধময়লা জামাকাপড় পরে এসেছিল নিজেকে তার কাছে বিলিয়ে দিতে।

সেই গোরাবাবু আর এই গোরাবাবু!

গোরাবাবুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়েছিল মিনার্ভা থিয়েটারে। ছ'মাস পর বিয়ের প্রস্তাবে ছেদ পড়েছিল। সে কাজ পেয়েছিল—থিয়েটারের কর্তারা তাকে ডেকে কাজ দিয়েছিল। এবার থিয়েটারের

মালিকদের একজন অংশীদার হয়েছেন চৌধুরীবাড়ীর ছোটবাবু। বই তাঁর। ওই নাটক। নামটা নতুন দেওয়া হয়েছে। নতুন নাম 'হজরত বেগম'। বাদশা মহম্মদ শাহের অপূর্ব সুন্দরী কন্যা হজরত বেগমকে আমেদশা দিল্লীর মসনদ ফিরিয়ে দেওয়ার দামস্বরূপ বিয়ে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই পার্টের জন্য তাকে ডেকেছিলেন ছোটবাবু—তার কাকা। তাঁরই হাতের চিঠি নিয়ে এসেছিল—না হলে সে যেত না হয়তো। তখনও তাদের মা মেয়ে দুজনেরই প্রতিজ্ঞারক্ষার উদ্যম ভেঙে পড়ে নি। হয়তো আর কিছুদিনেই পড়ত ভেঙে। চুরি মানুষ করে—অভাবেও করে, স্বভাবেও করে। তাদের ক্ষেত্রে অভাব আর স্বভাব দুটোয় মিলে যে জোড়া ঘোড়ার মত ছুটিয়ে নিয়ে চলে এ ব্যাপারে। হয়তো আর কিছুদিন পরেই প্রতিজ্ঞায় জলাঞ্জলি দিত তার মা। বলত—ওসব ভুলে যা মঞ্জরী। ও আমাদের হবার নয়। টাকা নিয়েছিস—তাতে কোন অপরাধ তোর হয় নি; এ টাকা আমি মামলা করলে তোর খোরপোশের জন্যে পেতাম। সেও হয়তো মেনে নিত। তার পূর্বেই এল এই ডাক।

বড় চৌধুরী তার বাবা—তাঁর মৃত্যুর পর ছোটবাবুর কর্তৃত্ব অবাধ হয়েছে। তিনি মিনার্ভা থিয়েটারের খারাপ অবস্থায় টাকা দিয়ে অংশীদার হয়ে নাটক খুলবেন—নাটক তাঁরই নাটক। তিনি নিজে তাকে পছন্দ করেছেন হজরত বেগমের পার্টের জন্য। এখানকার লোকেরা তার সেই রাজ্যলক্ষ্মীর পার্টের কথা বলেছে। বলেছে—পার্ট সে ভাল করেছিল। হজরত বেগমের পার্টও অনেকটা সেই ধরনের, চপল নয় ধীর, কিন্তু সকরুণ বিষণ্ণ। গানও দুখানি যোগ করা হয়েছে।

সন্ধ্যায় ছোট চৌধুরী মায়ের কাছে এসেছিলেন। মা বলেছিল—আমি ওর পাত্র খুঁজছি ছোটবাবু—কথা দিয়ে আমি তা ভুলি নি। থিয়েটারে পর্যন্ত দিই নি। আপনার চিঠি না পেলে আমি ফিরিয়েই দিতাম।

—হ্যাঁ, আমি সেইজন্যে নিজেই এসেছি। যতদিন বিয়ে না হয় ততদিন পার্ট করুক। আমি রইলাম এখানে, নজর রাখব। এবং এতে আপনার কথার খেলাপ হবে না। এ আমি আপনাকে বলছি। পার্ট করুক। আমি ওরই মধ্যে দেখে ভাল ছেলে দেখব। মানে— অ্যাক্‌টরদের মধ্যে এখন দু'চারজন বেশ প্রগ্রেসিভ হয়েছে।

নাম করেছিলেন তিনি দু'একজনের।

মা বলেছিল—আপনি বলছেন যখন তখন তাই হবে। আপনি তো কাকা ওর। কিন্তু, এ কি করলেন বলুন তো? থিয়েটার ঘাড়ে করলেন? পড়তি থিয়েটার!

—পড়তিকে আমি ওঠাবো, দেখবেন আপনি। বাড়িতে ঝগড়া অনেক হয়েছে। আমিও হিসেব করেছি মনে মনে কাগজপত্রে। ভাইঝি তো ভিন্ন হয়ে গেল।

—ভিন্ন হয়ে গেল?

—হ্যাঁ। প্রথমে রুখে দাঁড়াল। কখনও হতে দেব না। ওসব আমি জানি। ব্যবসা হয় না—মদ মেয়ে নিয়ে বেলাল্লাগিরি হয়। টাকা লোকসান শুধু হয় না, সংসারের পুণ্য ক্ষয় হয়। ও হতে দেব না আমি। আমার রাগ হয়েছিল—তা চেপেই আমি বললাম— কমলা, তুই ভুল করছিস একটু; এ কারবারের সঙ্গে সম্পর্ক একা আমার; আর কারুর সঙ্গে নয়। তা বললে—সে তো টাকার কথা। পুণ্যের কথা নয়। পাপ অর্শাবে যে সংসারে। বললাম—না, তাও অর্শাবে না। ভগবান যিনি পাপপুণ্যের মালিক তিনি তো সব জানছেন। মেজাজ ওর কত খারাপ তা তো দেখেছেন। আমার এক বড় দিদি ছিলেন—বালবিধবা, তাঁর এইসব বাই ছিল। অত্যন্ত দুর্মুখ ছিলেন, তাঁর কাছে মানুষ হয়ে সেই স্বভাব পেয়েছে। দাদার যেদিন পা ভাঙে সেদিন তিনি নিজের কপালে নোড়া ঠুকে কপাল ফাটিয়েছিলেন। ঠিক বলতে গেলে দাদা নিজে ঘরে ঢোকেন নি— ঢুকিয়েছিলেন তিনি। এ মেয়ে সেই স্বভাব পেয়েছে। আমাকে

বলে বসল—তা হলে এক কাজ কর—একত্রে আর নয়, পৃথক হয়ে যা হয় কর। কাগজে-পত্রে পৃথক্ক আমরা অনেক দিন। দাদা বড় বিষয়ী লোক ছিলেন। তিনি কাগজে পত্রে সব আলাদা করে রেখেছিলেন। অন্নটা আর বাসটা একত্র ছিল। হয়ে গেলাম পৃথক।

মা জিজ্ঞাসা করেছিল—জামাইটি! সে কি করছে ছোটবাবু? সে কেমন আছে?

মা কথাটা বলবামাত্র তার বুকের ভিতরটায় একটা ঘা পড়েছিল। হৃদ্‌পিণ্ড আছাড় খেয়ে পড়েছিল। তার কথা মনে পড়েছিল ছোট-কাকা বাড়ি ঢুকবামাত্র। কিন্তু জিজ্ঞাসা সে করতে পারে নি—তিনি কেমন আছেন? তবে ভালোও সে তখনও বাসে নি। ওর সঙ্গে জীবনে যদি আর দেখা না হত তবে যে সে সারাজীবন বিষণ্ণ হয়ে থাকত—ব্যর্থতা অনুভব করত সব কিছুতে তা নয়। তবে কখনও কোন সময় মনে পড়ত। থিয়েটারে প্রেমিক-প্রেমিকার ভাল অভিনয় দেখলে নিশ্চয় পড়ত।

তার মায়ের প্রশ্নে ছোটবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন, বলেছিলেন—গোরার জন্যে আমার কষ্ট হয়। ভারী ভাল ছেলে। গুণী ছেলে। লেখাপড়া করলে বি-এ এম-এ পাস করত। থিয়েটার কেমন করে সে তো দেখেছেন। কমলার সঙ্গে বিয়ে হয়েই বেচারার জীবনটা বিষময় হয়ে গেল। আমার সঙ্গে মেলামেশা বারণ হয়ে গেছে। দেশেই থাকে—সেখানকার সব দেখে। সেইটে আবার তার আরও যন্ত্রণা। বাইরে সর্বময় কর্তা কিন্তু রোজ রাত্রে ঘরে এসে স্ত্রীকে হিসেব বুঝিয়ে ক্যাশ দিতে হয়—কমলা নিজে সিন্দুক খুলে বন্ধ করে। অথচ জানেন, সকালে উঠে গোরাকে মাথার শিয়রে রাখা একটা রূপোর বাটির জলে পায়ের বুড়ো আঙুল ডুবিয়ে পাদোদক রাখতে হয়; কমলা সেটা খেয়ে তবে চা খায়। গোরা ম্যানেজার হিসেবে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে পায়। সে টাকা কমলার হাতে দিতে হবে। সিগারেট সে আনাবে। একটা টাকা দরকার

হলে কি করবে বলে নিতে হবে। ঐ টাকা থেকে তার পান দোক্তা হবে। বলে—বিয়ে করেছ, পান দোক্তা কে যোগাবে। বাবার সম্পত্তি তার দৌহিত্র পাবে। আমরা সম্পত্তি দেখাশুনা করি বলে খাওয়া-দাওয়া কাপড়চোপড় পাই। আমার পান দোক্তা, তোমার সিগারেট এসব পাবার কথা নয়।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—ওর ছেলে তো সম্পত্তির মালিক—তা নাবালক ছেলের গার্জেন হয়েছে নিজে। গোরাকে হতে দেয় নি। কলকাতার ব্যবসার অংশ বেচে দেবে বেচে দেবে করছে। কিনতে আমাদেরই হবে—মানে আমাকে আর আমার মেজদার ছেলেকে। সে অবিশ্যি আমার খুব অনুগত। যাক, উঠি। এখন তো দেখা হবেই। আপনিও যাবেন মঞ্জরীর সঙ্গে রিহারশ্যালে। হ্যাঁ। সেটা ভালও হবে।

আরও মাস ছয়েক পর মিনার্ভা থিয়েটারে গোরাবাবুর সঙ্গে দেখা। আধময়লা কাপড়, আধময়লা জামা—মুখে চোখে দুঃখকষ্টের ছাপ, সোনার মত রঙটা পর্যন্ত মলিন। গোরাবাবু সামনের সিটে বসে থিয়েটার দেখছিল। সে চমকে উঠেছিল। সিন শেষ করে গ্রীনরুমে নিজের জায়গায় কেমন অভিভূতের মত বসেছিল। বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ড আজ অধীর ভাবে আছাড় খেয়েই চলেছিল। সেই সুন্দর সুবেশ—আর সে কি একটি পরিচ্ছন্ন লাবণ্য, তার কিছুই যেন নেই। সেই গোরাবাবু এমন হয়ে গেছেন! কেন? কি হল? কিছুতেই সে আত্মসংবরণ করতে পারে নি, গিয়েছিল ডিরেকটারদের বসবার ঘরে। ছোট চৌধুরী বসেছিলেন আরও ক'জনের সঙ্গে। তাকে দেখেই বলেছিলেন—কি রে বাবা, কি খবর?

ছোট চৌধুরী ক' মাসেই পাকা থিয়েটারওয়ালা হয়ে গেছলেন। তাকেও বলতে শুরু করেছিলেন—বাবা। প্রথম বলেছিলেন—মেয়ে, তাঁদের গ্রামে। তারপর বলেছিলেন—মা, সে তাদের বাড়িতে।

এখন থিয়েটারের কর্তা হয়ে ধরেছেন—বাবা। এখানে মেয়েরাও শ্রদ্ধার জনকে বলে—বাবা। তাঁরাও মেয়েদের স্নেহ করে বলেন—বাবা। সেও তাঁকে তখন বাবাই বলে। সে বলেছিল—একটু কথা ছিল বাবা।

উঠে এসেছিলেন ছোটকাকা।—এক ফালি গলিপথে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি মঞ্জরী ?

—উনি, মানে জামাইবাবু এসেছেন কাকা ? এমন চেহারা ? কি হয়েছে ? অসুখ ?

একটু চুপ করে থেকে ছোটকাকা বলেছিলেন—সে অনেক কথা মা। গোরা চলে এসেছে ও বাড়ি থেকে।

—চলে এসেছেন ?

—আজ তিন মাসের ওপর।

কি প্রশ্ন করবে বুঝতে পারে নি মঞ্জরী। চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। কাকাই বলেছিলেন—নিজের বাড়ি চলে গিয়েছিল। সেখানে বাপ মা তো নেই, দুই ভাই আছে—অবস্থাও ভাল নয়; সেখানেই বা থাকবে কোন্ লজ্জায়। সম্ভবত তারাও কিছু বলেছিল। হঠাৎ কলকাতার শ্রীগোপাল ভাণ্ডারীর যাত্রার দলে চাকরি নিয়ে কলকাতায় এসেছে। আমিই অনেক করে বলে থিয়েটার দেখতে নেমন্তন্ন করে আনিয়েছি। বইখানা তো ওর খুব শখের। কিছু কিছু লেখা ওর আছে। ওই হাসান লুৎফার ব্যাপারটা বলতে গেলে ওরই কল্পনা। ডায়লগও ওরই। দেখি যদি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

সে ফিরে এসেছিল। তার ছোটকাকা—ছোট চৌধুরীর ঘর থেকে। তাঁর খবরে অত্যন্ত রূঢ় আঘাত পেয়েছিল সে। তার ইচ্ছে হয়েছিল বলে—ওঁকে থিয়েটারে নেন না। কিন্তু পারে নি বলতে। মনে মনে বুঝতে পারছিল—তা হয় না। গৃহবিবাদ বাধবে। এবং ছোট চৌধুরীর কাছে কাজও গোরাবাবু করবে না। পরের যে সিনে ওর পার্ট ছিল সেই সিনে গিয়ে মঞ্জরী ওর দিকেই চেয়েছিল। চোখে

চোখও পড়েছিল। একটু হেসেছিল গোরাবাবু। সিন থেকে বেরিয়ে সে থাকতে পারে নি—একজন স্টেজের লোককে ডেকে একটা স্লিপ লিখে তার কাছে পাঠিয়েছিল। লিখেছিল—একবার ভিতরে আসবেন। ভিতরে এসেছিল গোরাবাবু। সে প্রণাম করে সামনে দাঁড়িয়ে তার মুখের দিকে সেদিন অসংকোচেই তাকিয়েছিল—একটি গভীর মমতার আবেগে লজ্জা সংকোচ সব যেন ভাসিয়ে মুছে দিয়েছিল; কোন কথা কিন্তু বলতে পারে নি। কথা গোরাবাবুই বলেছিল—হেসে বলেছিল—ভালো আছেন?

এবার সে কোনরকমে বলেছিল। বলেছিল—এমন হয়ে গেছেন আপনি?

হেসেই গোরাবাবু বলেছিল—বিচিত্র ভাগ্যচক্র! যাত্রাদলে চাকরি করছি।

সে তাড়াতাড়ি কথাটায় ছেদ টেনে দিয়েছিল স্টেজের লোকেদের সামনে—একবার আমাদের বাড়িতে আসবেন? কাল?

তারপরই সে চলে গিয়েছিল—আমার পার্ট এসেছে, যাই।

পরের দিনই গোরাবাবু এসেছিল। সকাল থেকেই তার অধীরতার শেষ ছিল না। থিয়েটার থেকে রাত্রে ফিরেও সে ঘুমোয় নি। মাকে সব বলে বলেছিল—মা, তুমি ওঁকে এখানে থাকতে বলবে? উনি বড় কষ্টে আছেন। খাওয়াদাওয়াও বোধ হয় ভালো হয় না।

মা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—সে কি ভালো হবে মঞ্জরী? কমলা যেমন হোক তোর দিদি। তোর বাপের জামাই।

সে বলেছিল—আমি সে ভাবে বলি নি মা।

—তাহলে যে আরও ক্ষতি হবে। সে যে মেয়ে—আমাদের এখানে উঠলে—

—তবে থাক মা।

সে সব সংকল্প ভেসে গেল। গোরাবাবু দুপুরে এসে সন্ধ্যের সময় যাবার জন্যে উঠল। বললে—রিহারস্যাল বসবে, যাই।

অনেক কথা হয়ে গেছে তখন। তবে গোরাবাবু কমলার সঙ্গে কি হয়েছে তার একটি কথাও বলে নি। শুধু বলেছে—যা হয়েছে সে শুনে কি হবে? তবে সেখানে আমি আর ফিরব না। ওখানকার বাতাস, অন্ন-জল, মানুষ—কিছু সহ্য হবে না আমার।

যাত্রার দলে একশো টাকা মাইনে হয়েছে। দলের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। পরিচয় হয়েছিল চৌধুরীবাড়িতেই। তারা যাত্রা করতে গিয়েছিল। কয়েকবারই গিয়েছে। তারা ওখানকার থিয়েটারে গোরাবাবুর পার্টও দেখেছে। এবার ওরা গিয়েছিল অভিনয় করতে বর্ধমান। গোরাবাবু বর্ধমানে এসে ওদের সঙ্গে দেখা করে বলেছিল—আমাকে দলে নেবেন? আমি চাকরি করব। এগ্রিমেণ্ট করে দেব যতদিন সিজন চলবে ছেড়ে যাব না।

ওরা নিয়েছে—খুশী হয়েই নিয়েছে।

থিয়েটারেই ঢুকত সে কিন্তু ঢুকতে চেষ্টা করে নি, ছোটকাকা বাধা দিতেন। কিংবা তাঁকেই দোষী হতে হত বাড়িতে ভাইঝির কাছে। কাল রাত্রে এসব অনেক কথা হয়েছে ছোটকাকার সঙ্গে। ছোটকাকা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছেন—থাক। তুমিই ঠিক বলেছ। তবে অভাব হলে আমাকে বলো। কথা শেষ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল—অভাব আমার অন্নবস্ত্রের নয়। আমি পুরুষ মানুষ, জোয়ান বয়স—ও আমি খেটে সংগ্রহ করব। অভাব আমার জীবনে শান্তির, সুখের। সে কে মেটাবে? কি করে মিটবে?

তার বুকের ভিতরে একটা কথা কোলাহল করে উঠেছিল কিন্তু মুখ দিয়ে বের হয় নি। বের হল অকস্মাৎ বিদায় দেবার মুহূর্তে। সে বললে—তাহলে যাই।

সে কথা বলতে পারলে না। বুকের ভিতর তখন তোলপাড় করছে। তার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। গোরাবাবু উত্তরের প্রতীক্ষা করে না পেয়ে শুধু একটি 'আচ্ছা' বলে যাবার জন্যে পিছন ফিরলে। পিছন ফেরাটাই

মঞ্জরীকে যেন সচেতন করে তুললে—না; পিছন ফিরতে দেবে না সে তাকে। তার জামাটা ধরে টেনে সে বলে উঠল—না। যেয়ো না।

স্থির হয়ে গোরাবাবুও দাঁড়িয়ে রইল। মঞ্জরী আবার বল হারিয়ে ফেলেছিল—তবুও কোনরকমে বলেছিল—এখানে থাক।

—আজ, না চিরদিন?

—চিরদিন—চিরদিন।

—থাকব মঞ্জরী। আমি তোমাকে ভালবাসি। প্রথম দিন থেকে আমায় তুমি শান্তি দিলে।

মুহূর্তে কুণ্ঠাসংকোচহীন উল্লসিত মঞ্জরী তার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সকল বাক্য তার নিঃশেষে ফুরিয়ে গিয়েছিল।

গোরাবাবু বলেছিল—এমনভাবে নয় মঞ্জরী। দুজনে দুজনকে বেঁধে থাকব। যেন কেউ আমাদের টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে না পারে।

সে উপায় গোরাবাবুই বের করেছিল। রেজেস্ট্রী করে বিয়ের উপায় ছিল না। কমলার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে হিন্দুমতে। হিন্দুমতেও বিবাহ সিদ্ধ হত না। মঞ্জরী তো তার মা-বাপের বৈধ বিবাহের সন্তান নয়। বৈষ্ণবমতে। নবদ্বীপ গিয়ে তারা বৈষ্ণবশাস্ত্রমতে বৈষ্ণব হয়ে মালাচন্দন দিয়ে পরস্পরকে বরণ করেছিল। জাত কুল মান বিসর্জন দিতে গোরাবাবু একবারের জন্যও বিষণ্ণ হয় নি। বরং উল্লসিত হয়েছিল। সমাদর করে মঞ্জরীকে বলেছিল—তোমার মালা আমার মুক্তির মালা। তিলকের চন্দন আমার শান্তির প্রলেপ।

দু'বছর পর দুজনে পরামর্শ করে গড়েছিল মঞ্জরী অপেরা। থিয়েটার সে ছেড়েছিল বিয়ের পরই। গোরাবাবু বলেছিল—চৌধুরীদের জান না। ছোটকাকা খুব ভালবাসেন আমাকে। কিন্তু এটা সইতে পারবেন কিনা আমি জানি না। হয়তো তিনি নিজেও জানেন না। আমাকে তিনি বলেছিলেন সেদিন—তুমি নতুন বিয়ে

করে ঘরসংসার কর, চাকরি কর, ব্যবসা কর—কিন্তু যাত্রার দলে ঘুরে বেড়াবে এ কি কথা! কিন্তু তোমাকে বিয়ে! সে হয়তো সইবে না। তুমি থিয়েটার ছেড়ে দাও।

সে দ্বিধা করে নি। ছেড়ে দিয়েছিল। ছোট চৌধুরী নিজে এসেছিলেন কিন্তু দেখা পান নি। তারা চলে গিয়েছিল নবদ্বীপ। মা প্রবল আপত্তি তুলেও কিছু করতে পারে নি। মঞ্জরী কোন কথা শোনে নি—শুনতে চায় নি। সে তখন মরতেও প্রস্তুত ছিল গোরাবাবুর জন্যে। মা কথাটা জানাতে চেয়েছিল ছোট চৌধুরীকে—মঞ্জরী শুনে সত্যিই বলেছিল—তা হলে আমি বিষ খাব, নয় গলায় দড়ি দেব। শেষে একদিন ঝগড়া করে চলে গিয়েছিল গঙ্গার ঘাটে। মা পিছন পিছন গিয়ে ফিরিয়ে এনে বলেছিল—যা তোর খুশি কর্, আমি আর কিছু বলব না। এর পরই পরামর্শ করে ঘরে চাবি দিয়ে চলে গিয়েছিল নবদ্বীপ। ছোটবাবুকে চিঠি লিখে গিয়েছিল—দল নিয়ে আমি নবদ্বীপ যাচ্ছি। মঞ্জরীকেও নিয়ে যাচ্ছি। ও এর পর থেকে কীর্তনই গাইবে। থিয়েটার করা হবে না। এ একরকম ভগবানের নির্দেশ। আপনি নিজ গুণে ক্ষমা করবেন।

ছোটবাবু বাড়িতে এসেছিলেন। কিন্তু তাদের বাড়ি বন্ধ দেখে ফিরে গিয়েছিলেন। গরজও তাঁর খুব ছিল না। বই তার আগেই মার খেয়েছে। তিনি তখন ভাবছিলেন আবার নতুন বই ধরে দেখবেন। না, শখ মেটানো হয়েছে, এবার ছেড়ে দিয়ে আপনাদের কাজে মন দেবেন।

মাসখানেক পর যখন ওরা ফিরল তখন ছোটবাবু থিয়েটার ছেড়ে নিজেদের কাজেই ফিরে গেছেন। খবরটা গোরাবাবুই আন্দাজ করে নিয়েছিল খবরের কাগজ থেকে। পর পর দু'সপ্তাহ কাগজে থিয়েটারের বিজ্ঞাপন না দেখে সে বলেছিল—থিয়েটার উঠে গেছে। বিজ্ঞাপন নেই।

কলকাতায় ফিরে সে গিয়েছিল যাত্রার দলে—মঞ্জরী মায়ের

কীর্তনের দলকে নতুন করে গড়তে চেষ্টা করেছিল। অন্য থিয়েটার থেকে লোক এসেছিল তার কাছে কিন্তু সে যায় নি। গোরাবাবু বলেছিল—ওতে তুমি যেয়ো না মঞ্জু—তাহলে আমার শান্তি চলে যাবে। আমি সইতে পারব না। তা ছাড়া ছোট চৌধুরীকে আমি ভয় করি। থিয়েটার মহলে তিনি পরিচিত লোক। খাতিরের মানুষ। কোথা দিয়ে কি করবে কেউ বলতে পারে না। কীর্তনের দল নিয়েই থাক। কলকাতার বাইরে যেয়ো না। নইলে বাইরে গিয়ে আমি উৎকণ্ঠা ভোগ করব। ছোট চৌধুরী লোক পাঠিয়েছিলেন চিঠি দিয়ে, বলি নি তোমাকে।

চমকে উঠেছিল সে—কই চিঠি?

হেসে গোরাবাবু বলেছিল—ভয়-দেখানো চিঠি। সে কি আমার হাতে দিয়েছে? পড়ে শুনিয়ে নিয়ে চলে গেছে।

—কি লিখেছিল চিঠিতে?

—কি আর? তোমাকে ভালবাসতাম। আমি নিজে তোমাকে বিয়ে করতে বলেছিলাম। কিন্তু সে কি বেশ্যার মেয়েকে? জাত ধর্ম বিসর্জন দিয়ে? ছি—ছি! কমলা তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে। তার নিন্দা করেছি। এমন কি তোমাকে বলেছি—তুমি নতুন বিবাহ করে সুখী হও। এ তুমি আত্মহত্যা করেছ। আমার চোখে তুমি মৃত। মরা মানুষকে কটু কথা বলে কি লাভ। কমলা এ-সংবাদ শুনে তোমার কুশপুত্তলী দাহ করে বিধবা সাজতে চেয়েছিল। বহু কষ্টে নিবারণ করেছি। বিধবা সে সাজে নি তবে গেরুয়া ধরেছে—সন্ন্যাসিনী সেজেছে। তোমাকে একটি কথা বলি—তুমি কখনও আমাদের ওই অঞ্চলে, অন্ততঃ বর্ধমানের ও অঞ্চলে যাত্রা করতে এসো না। এবং মঞ্জরী বা তার মাও যেন কীর্তন গাইতে না আসে। প্রেত-হত্যায় প্রেতিনী-হত্যায় পাপ নেই। এবং আমাদের হাত নরক পর্যন্ত পৌঁছুবার মত লম্বা।

মঞ্জরী আতঙ্কিত চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল—তুমি?

—আমি ছোট কাকার কথা মানব। বর্ধমানের কাটোয়া সাবডিভিশনে আমি যাব না। দুঃখ দিতেও যাব না, দুঃখ পেতেও যাব না।

এবার তার ব্যতিক্রম করে ঝুলনে বায়না নিয়েছিল। রথের দিন এল বায়নাটা। দলের লোকের আগ্রহ; সত্যটাও প্রকাশ করা গেল না। পাচুন্দিতে—

হঠাৎ মঞ্জরীর মনে হল, হয়তো ওই অলি চৌধুরীর আসার অশুভ ফলটাও এ সবের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে। তখন থেকেই বিপদ অন্ততঃ অশুভ কিছু ঘনিয়ে উঠছে। গোরাবাবুর দাদু এই আঘাতেই মারা গেলেন।

দ্বিতীয় বছরটাও কেটেছিল এই ভাবেই। তাদের কীর্তনের দল নামে থাকলেও চলে নি ভাল, কিন্তু গোরাবাবুর যাত্রার দলে খাতির বেড়েছিল—নাম ছড়িয়েছিল। দু বছর পর মা তুলসী গেল মারা। হঠাৎ একদিন গোরাবাবুই বললে—তাই তো মঞ্জু, আবার তো আমার ভাবনা বাড়ল। আমি বাইরে ঘুরব। বলতে গেলে আশ্বিন থেকে বোশেখ পর্যন্ত আট মাস। তুমি একলা থাকবে।

সে হেসে বলেছিল—আমাকে বিশ্বাস কর না?

—তোমাকে বিশ্বাস করি। কিন্তু মানুষকে করি না। তা ছাড়া শরীর আছে, অসুখবিসুখ আছে। এতদিন মা ছিল—আমার এ চিন্তাগুলো হত না।

সে বলেছিল—তা হলে অন্য কিছু কর। দোকান-টোকান। পাঁচ হাজার টাকা তো রয়েছে।

গোরাবাবু বলেছিল—উঁহু। ও আমার দ্বারা হবে না। লোকসান হয়ে যাবে।

কয়েকদিন পর এসে বলেছিল—মঞ্জু, যাত্রার দল করি আমরা। তুমি আমি মিলে।

—তুমি আমি মিলে যাত্রার দল? কি বলছ?

হ্যাঁ। মেয়ে যাত্রার দল শোন নি? ত্রৈলোক্যতারিণীর দল ছিল, রাধাবিনোদিনীর দল ছিল। মালিক ছিল মেয়েরা। মেয়েদের পার্ট করত মেয়েরা। তাতে চলবে ভাল। মেয়েরা মেয়েদের পার্ট করলে নিশ্চয় ভাল চলবে।

—তা চলবে।

—কথাটা বললে আমাকে গোপাল ঘোষ। জান তাকে—তাকে তো মামা বল। সে ত্রৈলোক্যতারিণীর দলে হাতেখড়ি নিয়েছিল। বহু দলে ম্যানেজারি করেছে। পাকা লোক। আমাকে আজ বললে—গোরাবাবু, আপনার এমন সুবিধে রয়েছে—স্বামী স্ত্রী আপনারা দুজনে পার্ট করবেন। করুন না নিজেদের যাত্রার দল। দরকার তো চার পাঁচটা পেয়ারের। তা আমি যোগাড় করে দেব। বহুজনের নাড়ীনক্ষত্র তো আমার জানা। মুখে মুখেই বলছি—ধরুন না কেন, ড্যান্সিং মাস্টার—আপনার সঙ্গে ভাণ্ডারীর দলে ছিল নান্টু মাস্টারের ছাত্র বংশী ঘোষ—ওর সঙ্গে নাট্যমহলের সখীর ব্যাচের আশার একরকম ঘরসংসার। পেটের দায়—ও যাত্রার দলে ঘোরে—আশা থিয়েটারে কত আর মাইনে পায়—চালায় একরকমে। যাত্রার সিজন শেষ হলে ক'মাস ওর ওখানেই থাকে। দুজনে যদি চাকরি পায় এখুনি আসবে। আশাও নাচে, গানও গায়। ধরুন ডুয়েট-টুয়েটের কাজ ভাল চলবে দুজনকে দিয়ে। বাকী সখীর ব্যাচ, ও ছেলে নিয়েই চলবে। তারপর ধরুন—বুড়ো হিরো—রীতুবাবু আছে। ভাল অ্যাক্টর। ওরও সংসার একটা মেয়েকে নিয়ে—ভাল নাচে। ভাল গায়। যাত্রার দলে রীতুবাবুর বদনাম—মধ্যে মধ্যে ফাঁক পেলেই কলকাতা চলে আসে। সে ওই জন্যে। ওর মেয়েছেলেটার নাম পটলী। ছিপছিপে পাতলা—বয়স একটু হয়েছে—তা পেন্ট করলে ধরাই যায় না। এখনও খেমটা নাচে। বায়না পায়। ওকে দিয়ে দিব্যি কুমারী হিরোইন চলবে। আর আপনার মোহন অপেরায় রুক্মাঙ্গদের হরিবাসরে সেই 'হরিনামে পরিণামে

পাবে কত মজা, ভবপারে চলে যাবে উড়াইয়ে ধ্বজা' বলে ভক্তের পার্ট করে। বুড়ো লোক—তার মেয়েছেলেটির বয়স হয়েছে—খুব বেশী নয়—থিয়েটারে সেও পার্ট করত—তাদের পাওয়া যাবে এক্ষুনি। কাল আমার কাছে বুড়ো এসে খুব দুঃখ করেছিল—সুশীলার কাজকর্ম নেই। আর দু পেয়ার কাল পেয়ে যাবেন। বাকীর তো ভাবনা নেই। দেখুন, পারেন তো করুন।

মন্দ লাগে নি মঞ্জরীর। ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যে পর্যন্ত ভালই লেগেছিল। বেশ একটি সুন্দর স্বপ্নরাজ্য গড়ে তুলেছিল মনে মনে। দেশদেশান্তরে, ট্রেনে, বাসে, গরুর গাড়িতে ঘোরা। তারপর বাসা। তারপর আসর। দর্শকের হাততালি। তারা দুজনে এক ঘরে থাকবে। একসঙ্গে থাকবে। সকল লোকের কাছে সে প্রোপ্রাইট্রেস। তার মায়ের কীর্তনের দলের মূল গায়িকার খাতির মনে আছে। শিউনন্দন যেত সঙ্গে পানের মাজা ঝকঝকে বাটা নিয়ে—তার উপর একখানি সুন্দর তোয়ালে। তেমনি তারও যাবে। থিয়েটারে সে করত ছোট পার্ট। এখানে সেই হবে হিরোইন—গোরাবাবু হবে হিরো। নেশা লেগেছিল তার। বলেছিল—তাই কর। টাকাও তো রয়েছে। নাম কি হবে?

গোরাবাবু বলেছিল—'মঞ্জরী অপেরা'। প্রোপ্রাইট্রেস—মঞ্জরী দাসী। ম্যানেজার—বিজয় (দাস) মজুমদার।

প্রথম নাটক এই প্রবীরপতন। গোরাবাবুই গিরীশচন্দ্রের জনা নাটক থেকে প্রবীরপতন তৈরি করেছিল। জনা—মঞ্জরী দাসী, প্রবীর—গোরা মজুমদার, শিখিধ্বজ—রীতু ঘোষ, বিদূষক—হরিনামে রসিক নাড়ু দেব ওরফে গোবিন্দ দেব, মোহিনীমায়া—পটলীচারু, গঙ্গা—শোভারাণী, মদনমঞ্জরী—গোপালীবালা, অর্জুন—নাটুবাবু, (নরেন মিত্তির), ডুয়েট নৃত্যগীতে—বংশী মাস্টার ও আশা।

১৯৪০ সালে দলের প্রথম বায়না কলকাতাতেই বিশ্বকর্মা পুজোয় মানিকতলায় খালের ধারের কারখানায়। বংশী, আশা, নাড়ুবাবু

শোভা, রীতু ঘোষ, পটলীচারু, নাটুবাবু, গোপালীবালা, ননীবালা, হারু ঘোষাল আর তারা ছটি পতিত দম্পতি—তার সঙ্গে আরও পঁয়তাল্লিশটি লোক নিয়ে মঞ্জরী অপেরা শুরু হয়েছিল। তার মধ্যে পটলীচারু মরেছে। ননীবালা চলে গেছে। হারুও গেছে। ছাড়াছাড়ি হয়েছে তাদের। তারপর হারু বেশী মাইনের লোভে গেছে অন্য দলে। ননীর স্বপ্ন ভেঙেছে—সে ফিরে গেছে—কলকাতায়, দেহের কারবারে তার প্রত্যাশা বেশী—তার বয়স আছে—রূপ আছে। হারুর নেশায় সে এসেছিল। যাত্রাদলের কষ্টও সয়েছিল। কষ্ট অনেক। নেশা ছুটেছে—সুতরাং সে কষ্ট আর সইবে কেন? নাড়ু দেব মরেছে। শোভা আছে। তাদেরই জায়গায় এসেছে এবার বাবলু বোস—কমিক অ্যাক্টর আর অলকা চৌধুরী। অ্যামেচার থেকে এসেছে। ভদ্র গৃহস্থঘর থেকে এসেছে। এনেছে বাবুল বোস। তবে ওদের সম্বন্ধ কিচ্ছু নেই। বিপদ হয়েছে ওখানে। অলকা বে-বাগা ঘোড়া। তা ছাড়া ভদ্রঘরের লেখাপড়া জানা মেয়ে। নাকটা বড় উঁচু। সকলকে ছোট ভাবে। হ্যাঁ, তবে মেয়েটার শক্তি আছে। কিন্তু শক্তি থাকলেই তাকে উপেক্ষা করলে চলবে না। দলকে আঘাত করলে চলবে না। আরও একটা সন্দেহ হচ্ছে তার—

হঠাৎ জোরালো টর্চের আলো পড়ে চমকে উঠল মঞ্জরী। আঃ বলে চোখ ঢেকে দাঁড়িয়ে গেল।

গোপাল ঘোষ তার হাতের টর্চটা ফেলে জিজ্ঞাসা করলে—কে? কে এমন করে টর্চ ফেলছেন?

সাত

১৯৪৪ সালে কালীপুজোর বায়নায় তারা সায়েব কোম্পানির কলিয়ারীতে গান করতে এসেছে। যাত্রার দল অভিনয় করতে বের হয় না—অভিনয় করে না, গান করতে বের হয়—গাওনা করে। আজ শেষ রাত্রি, গাওনা ছিল—প্রবীরপতন পালা হল। রাত্রে আজ

বায়নাকারী কলিয়ারী যাত্রাদলের নায়কপক্ষ নিমন্ত্রণ করেছে গোটা দলকে ; ওদিকে রাত্রের খোরাকি যাত্রাদলের কথা জলপানির জন্যে দলের লোকেরা যুক্তি করে অলকা চৌধুরীকে দিয়ে মদের নেশায় দিলদরিয়া গোরাবাবুকে ধরেছে ; গোপাল ঘোষকে অপমান করেছে বাবুল বোস। কিন্তু তার থেকেও বড় তার কাছে অলি চৌধুরীর ওই মোহিনীমায়ার ভূমিকায় ওই নাচ। সে এসে শুয়েছিল বাসায়। কিন্তু শুয়ে থাকলে তো তার চলবে না। উঠে চলতে হচ্ছে—গিয়ে দাঁড়াতে হবে ; নইলে তো চলবে না। কিন্তু পথে এমনভাবে টর্চ ফেলছে কে মুখের উপর ?

গোপাল ঘোষ তার টর্চটা ফেলে জিজ্ঞাসা করলে—কে ? কে এমন করে টর্চ ফেলছেন ?

—তোমরা কে ? অ্যাঁ ! এদিকে ? মেয়েছেলে নিয়ে ?

—আমরা যাত্রাদলের।

—যাত্রাদলের ? মোহিনীমায়া বুঝি ? প্রবীরকে ভুলিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছ নাকি ? অ্যাঁ ?

—এই এই—কি যা তা বলছিস ? যারা টর্চ ফেলেছিল তাদের একজন বললে।

—অন্যায় কি বলেছি রে শালা ? এদিকে ওরা যাবে কোথা ? ওই তো শ্মশান ! ঠিক ও সেই। দূর—টিপছিস কেন—ধ্যার্ !

একজন উঠে এল এগিয়ে। টর্চ জ্বেলেই এসেছিল। মঞ্জরীকে দেখে সে জিভ কেটে বললে—আপনি ! আপনি তো জনা সেজেছিলেন। আপনিই তো প্রোপ্রাইটেস। কিন্তু এদিকে কোথায় যাবেন ? এই তো একটু আগেই নদী, শ্মশান !

গোপাল ঘোষ বললে—ওই তো আলো ঝলমল করছে। আমরা প্যাণ্ডেলে, মানে আসরে সাজঘরে যাব।

—ও আলো নদীর ধারে কলিয়ারীতে কয়লা কাটা হচ্ছে তার আলো। দিন রাত্রি কাজ চলছে, যুদ্ধের অর্ডার তো ! আপনারা

পথ ভুলে চলে এসেছেন। রাস্তাটা বাঁয়ে ঘুরেছে—সেখানে না ঘুরে ডাইনে এসেছেন। চলুন, আমি পথ ধরিয়ে দি।

মঞ্জরীর তুই কানের পাশ তুটো ঝাঁঝাঁ করছিল। মেয়েযাত্রার দল, এ সংসারে ব্যভিচারলোলুপ পুরুষ অনেক; জীব-জীবনের অভিশাপ হয়তো; শুনতে অনেক কথা হয়। কিন্তু মনের ঠিক এমন অবস্থায় আজকের কথাগুলি সমস্ত কিছুকে যেন বিষিয়ে দিল।

—আ, আপনি জনা! ওঃ, অপরাধ হয়ে গিয়েছে। ওঃ, আপনার পার্ট দেখে কেঁদেছি। কিন্তু মোহিনীমায়া নেশা লাগিয়ে দিয়েছে। কিছু মনে করবেন না।

মদ খেয়ে লোকটি টলছে। তবু সে উঠে এসেছে। মাফ চাইতে এসেছে। মঞ্জরী বললে—না। কিছু মনে করি নি। যান আপনি।

—মা কালীর দিব্যি। আপনার কথা মনে হয় নাই। ওই—ওইটাই মনে হয়ে গেল।

—তুই যা। এই বিশে, যা। চলুন আপনারা।

সে সাজঘর পর্যন্ত এসে পৌঁছে দিলে। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছিল জনকয়েক চেয়ারে জটলা করে বসে আছে—গোরাবাবু রাঁতুবাবু বাবুল বোস—অর্জুনের পার্টের নতুন অ্যাক্টর রমণী নাগ—আরও কে কে যেন। হঠাৎ মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল মঞ্জরীর। চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হল।

কই, কই ডিরেকটার ম্যানেজার? আসুন—আসুন আপনার মোহিনীমায়াকে নিয়ে, শুনে আসুন কি বলছে। কি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। মেডেলের চেয়ে অনেক—অনেক—অনেক দামী। ছি—ছি—ছি! আরও বলতে ইচ্ছে হল—দল আমি এইখান থেকে ভেঙে দিলাম। আর চালাব না। ইচ্ছে হয় আপনারা চালাতে পারেন। কিন্তু আমি চালাব না। রাত্রি তুটোর পর খোরাকি দাবী নিয়ে জটলা মিটিংএ কৈফিয়ত দিতে পারব না। মীমাংসা করতে পারব না। বলবার জন্য মনকে বেঁধে দাঁড়াল সেখানে। কিন্তু বলা হল না।

উজ্জ্বল আলোয় তাকে দেখেছিল সবাই, সবার দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ। সবার মুখে হাসি। সবার দৃষ্টিতে আগ্রহ। • সকলে খুশী হয়ে উঠেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে গোরাবাবু বক্তৃতার ভঙ্গিতে তার দীর্ঘ হাতখানি বাড়িয়ে বললে—এই নিন। এসে গেছেন উনি। ওই!

গোরাবাবুর মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

গোরাবাবু ওইটুকু বলেই ক্ষান্ত হল না, দু পা এগিয়ে এসে বললে—নায়ক পক্ষের কত্তারা এসেছেন—তোমার সঙ্গে দেখা করবেন। তোমার আজকের পার্ট দেখে বলছেন—অপূর্ব। এমন দেখেন নি ওঁরা। তুমি বাসায় চলে গেছ শুনে বাসায় যেতে চাচ্ছিলেন। বলছেন—উনি খাবেন না এ কি হয়। ওঁরা আলাদা লুচি ভাজিয়ে দেবেন—তরকারি করে দেবেন। কই, নেপাকে পাঠালাম যে—সে কই?

কথা আর বলা হল না মঞ্জরীর। সামনে কলিয়ারীর পূজো কমিটির বাবুরা দাঁড়িয়ে আছে। তিনজনকে সে চেনে। আজ পর পর ক'বছর এখানে আসছে, কলিয়ারীর বড়বাবু পূজো কমিটির কর্তা সুরেনবাবু। বুড়ো মানুষ, ষাটের উপর বয়স, ধবধবে চুল—তেমনি গোঁফ—সাদা শক্ত কফওয়ালা সার্ট পরে দাঁড়িয়ে আছেন। পিছনে শিবেনবাবু কমিটির সেক্রেটারী, তাঁর পাশে স্টাফ ক্লাবের থিয়েটারের বড় অ্যাক্‌টর শ্রীশবাবু। সুরেনবাবু হেসে বললেন—আসুন মা। কি বলে, আমি আশীর্বাদ করব বলে দাঁড়িয়ে আছি। আজ কি বলে, মেডেল দিয়েছে কমিটি ম্যানেজার—সায়েবসুবো; কি বলে, সে ভাল। গুণের আদর হবে বইকি। কিন্তু, কি বলে, আজ যা চোখের জলে বুক ভাসিয়েছেন আপনি, কি বলে, তাতে বামুনের ছেলে—আশীর্বাদ না করলে মন ভরছে না।

সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতেই কথাগুলি শুনে মঞ্জরীর সব ক্ষোভ গ্লানির গুমোট যেন একটি বর্ষণস্নিগ্ধ ঠাণ্ডা বাতাসের প্রবাহের মধ্যে পড়ে নিঃশেষে জুড়িয়ে গেল। সলজ্জ প্রসন্ন হাসিতে তার মুখখানিও

কোমল ও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বারান্দায় উঠেই সে হেঁট হয়ে পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।

—সেই কথাই বলছিলাম গোরাবাবুকে রীতুবাবুকে। এঁকে—কি নামটি যেন—পোস্টারে আছে, তিন দিন শুনছি—কি বলে, আই অ্যাম সরি—

—বাবুল বোস আমার নাম স্যার। ছোট্ট নাম কিনা—আলপিন বোতাম-ফোতামের মত হারিয়ে যায়—দোষ নেই আপনার।

হা-হা করে হেসে উঠলেন সুরেনবাবু। বললেন—ওয়াণ্ডারফুল। বড় কমিক অ্যাক্টর হবেন উনি। কি বলে, দেখে নেবেন। আপনারা যেবার প্রথম আসেন সেবারও জনা করেছিলেন। কি বলে, আপনিই জনা। ভাল হয়েছিল। সেবারও কেঁদেছিলাম। কিন্তু এবার কি বলে, অদ্ভুত অপূর্ব—কি বলে, মনে হল দুনিয়া উদাস হয়ে গেছে। কি বলে, তার কারণ কি? তখন আপনার বয়স কম ছিল, এখন বেড়েছেন—কি বলে, ইউ হ্যাভ গ্রোন। গোরাবাবু, গোরাবাবুও তাই। কি বলে, হি হ্যাজ গ্রোন। আপনার গোটা দলটা এবার গ্রো করেছে, কি বলে, খুব ভাল অ্যাডিশন হয়েছে। আমাদের কি বলে, ইনি—আলপিনের মত ছোট নামটি কি, কি বলে, আলপিন বোসই বলছি—ভাল—

পায়ের ধুলো নিয়ে বাবুল বোস বললে—আমার আলপিনে আমাকেই গাঁথলেন স্যার! রসিক লোক আপনি।

তার পিঠে হাত দিয়ে সুরেনবাবু বললেন—ভাল বিদূষক করেছেন। সুন্দর।

এখানকার থিয়েটারের অ্যাক্টর শ্রীশবাবু বললেন—মডার্ন অ্যাক্টিং—সুন্দর! মোহিনীমায়ার নাচটাও খুব মডার্ন। কনসেপসনটি চমৎকার।

—একটু গরমিল হল হে শ্রীশ। আলট্রা মডার্ন। কি বলে, খুব

ভাল ট্যালেন্ট—তা বলছি, তবে কি বলে বাপু, একটু বাড়াবাড়ি, মানে কি বলে—যাকে বলে ওভারডুইং হয়েছে।

—তা কেন বলছেন বড়বাবু?

বাবুল বোস বলে উঠল—কেন বলছেন বলব স্যার? ওঁর চুল গোঁফ ধবধব করছে পেকে—অল্ হোয়াইট—আর আপনার অল ব্ল্যাক।

—গুড গুড! কি বলে, বেড়ে বলেছেন আপনি আলপিন ভায়া। তবে একটা কথা আলপিন ভায়া যে যদি এই মঞ্জরী মা—ওই নেকেড ড্যান্সের পর ওইভাবে বুক চাপড়ে কাঁদতে না পারতেন, যদি কি বলে, অগ্নিশিখার মত জ্বলতে না পারতেন, তবে কি বলে, ওই মোহিনীমায়ার ছবিই প্রজাপতির মত প্যাখনা মেলে উড়ে বেড়াত। প্রবীর মরলে বলত ঘরে গিয়ে মরগে। মোহিনীমায়াকে ডেকে দে, আর একবার নেচে যাক।

—বলেন কি স্যার?

—নিশ্চয়। তবে কি বলে, আমি রাইট। তা না হলে সায়েব তুটো জনার পার্টে ক্ল্যাপ দেয়! কি বলে, জনার অ্যাক্‌টিং দেখে হতভম্ব। বলে—ছেলের শোকে টার্নড ম্যাড। ও গড! ফোঁসফোঁসও কিছুটা করেছে ব্যাটারা।

—বড়বাবু! গেঞ্জীর উপর গামছা বেঁধে একজন এসে দাঁড়াল—খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

—ও। তা হলে চলুন সব। মা—আপনিও আসুন। আপনার খাবার আলাদা করে দেবে। আপনি খাবেন না তা হয়!

মৃত্তুকণ্ঠে মঞ্জরী বললে—চলুন। তু মিনিট পরে যাচ্ছি আমরা। একটু কাজ আছে। তুটো কথা বলে নেব।

—বেশ বেশ। এস হে।

ওঁরা চলে গেলেন। গোপাল ঘোষ এগিয়ে এসে দাঁড়াল—বললে, থাক মা। এখন থাক। খেয়ে দেয়ে বলবেন বাসায়।

—না। এখুনি বলে দেওয়া ভাল।

গোরাবাবু এগিয়ে এল—কি কথা? জলপানির? গোপালবাবু গিয়ে বলেছে তোমাকে?

—হ্যাঁ। অবিশ্যি নিজে থেকে বলেন নি। উনি ক্যাশ রেখেছিলেন আমাদের ঘরে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—এই রাত্রে ক্যাশ? আজ তো সব খাবার নেমন্তন্ন। উনি বললেন তোমার নাম করে যে তুমি দিতে বলেছ।

—বলেছি। ওদের এটা প্রাপ্য। হ্যাঁ, পাওয়া উচিত।

—কি আশ্চর্য—আমি কি বলছি সেটা আগে শোন।

গোরাবাবু তবু থামলে না, বললে—তুমি প্রোপ্রাইট্রেস, মেন অ্যাকট্রেস—আজ দুখানা মেডেল পেয়ে গরীবদের সামান্য কথায় মাথা খারাপ হয়েছে তোমার। ভাবছ তোমাদের দাম আছে আর কারুর নেই।

এক মুহূর্তে গোরাবাবু যেন অন্য গোরাবাবু হয়ে গেল। এমন কখনও দেখে নি মঞ্জরী। সে স্তব্ধ হয়ে রইল।

প্রসন্ন মন আবার তিক্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে—তবুও সে যথাসাধ্য মিষ্টি করে বললে—কি বিপদ তোমাকে নিয়ে। মালিক একা আমি? তুমি কেউ না? কি বলেছে সে কথা? তা ছাড়া মেডেল আমি দুখানা পেয়েছি—তুমিও একখানা পেয়েছ; অলি দুখানা পেয়েছে। লোকেদের দাম নেই একথাও বলি নি।

—তবে কি বলছ কি?

—বলছি, জলপানি পাওয়া উচিত। সে তুমি বলে দিয়ে ঠিকই করেছ। কিন্তু এই রাত্রে সেটা না নিলে কি চলত না? পেতো না তারা? কাল সকালে নিত।

মঞ্জরী আর দাঁড়াল না। সে কথা ক'টি বলে চলে গেল মেয়েদের সাজঘরের দিকে। তাদের ডাকতে হবে।

বাবুল বোস তার নিজের ঢঙে বলে উঠল—লং লিভ মঞ্জরী দেবী। অল রাইট। কাল সকালেই সব নেবে। এখন চল হে, সব খেতে

চল। গরম লুচি। দালদার গন্ধ ছুটেছে। বেলিতে ফায়ার। মেক হেস্ট। গোপালবাবু, আঃ, আপনার ফাদার মাদার সর্বজ্ঞ ছিলেন মশায়। তাঁরা জানতেন যাত্রাদলের পালকে আপনাকে চরাতে হবে। দেখুন কোন্‌টা কোন্‌ দিকে গেল। বাছুরগুলো দেখুন—কে কোণে পড়ে ঘুমুচ্ছে।

রীতুবাবু মধ্যে মধ্যে গম্ভীর হয়ে যায়। অভিনেত্রী পটলীচারু মরে গিয়ে অবধি এইটে হয়েছে। বেশই থাকে তবে হঠাৎ পটলী-চারুকে মনে পড়লে, বিশেষ করে নেশার মধ্যে মনে পড়লে মদ খেয়ে ভাম হয়ে থাকে। চোখ দুটি বড় বড়। নেশায় রাঙা চোখ মেলে বসে শুধু সব দেখে আর লম্বা চুলগুলিকে হাতের নখ দিয়ে পিছনে ঠেলে দেয়। এতক্ষণে রীতুবাবু কথা বললে—তুমি বড় বক বাবুল।

—বকি? আমি?

—হ্যাঁ বেশী বক। বড্ড বেশী।

—আর আপনি যে ভাবেন?

—ভাবি। এবং ভাবছি।

—কি ভাবছেন?

—আগুন কি শুধু পেটেই? তুমি বললে এখুনি।

—যাঃ বাবা! কে বললে তা? আগুন উনোনেও আছে।

—উঁহু, আরও আছে।

—হ্যাঁ ,আছে। মদে আছে। খাবেন আর এক ডোজ?

—বলেছ ঠিক। আরও আছে।

—আরও আছে? কোথায়? মগজে?

—না। মনে।

—রাইট ও! ঠিক বলেছেন। নিন, আর এক ডোজ নিন।

—দাও, গোরাবাবুকে দাও।

গোরাবাবু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার সামনে গ্লাসটা ধরে বাবুল বললে—নিন স্যার।

চমকে উঠল গোরাবাবু। তাকিয়ে দেখে গ্লাসটা ঠেলে দিয়ে বললে—না।

রীতুবাবু বললে—খান খান। মনে আগুন লেগেছে, নেশা বেশী না হলে ঘুম হবে না।

—না।

বলে গোরাবাবু চলে গেল হনহন করে। হাঁকতে হাঁকতে গেল—করছ কি সব? আরে, রাত্রি হয়ে যাচ্ছে যে! গোপালবাবু!

হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা টেনে নিলে রীতুবাবু—দাও। আমাকে দাও।

খেয়ে হু-হু, হু-হু শব্দে হেসে উঠল। রাতুবাবুর আজ পটলীচারুকে মনে পড়ে নি। সে একটা কিছু দেখেছে, বুঝেছে। ভাবছে। সেই ভাবনার মধ্যেই কৌতুককর কিছু পেয়ে এমন ভাবে হেসে উঠল।

নিজের জন্য মদ ঢালতে ঢালতে বাবুল বললে—ওটা কি? হাসি?

—হ্যাঁ।

—ও রকম হাসি কি করে হাসা যায় বলুন তো?

—গভীরভাবে চিন্তা করলে।

—মাই গড! তা হলে তো আমার হল না।

—আর এক কাজ করলে পার। শকুনির হাসি হাসতে পার?

—শকুনির হাসি? মাই আল্লা! শৎরবাবুর বইয়ে শকুনির কান্না পড়েছি। হাসি—

—রাবিশ। কর্ণার্জুনে নরেশবাবুর শকুনির হাসি দেখ নি? শোন নি?

—বাট—সে তো অন্য রকম বিগ ব্রাদার!

—আমার এইরকম। মানে শকুনির মত যার তীক্ষ্ণদৃষ্টি সে অনেক উপর থেকে সব দেখে এইরকম হাসে। নরেশবাবু যেমন হাসে—তাও হাসতে পারে। আমি যে রকম হাসলাম তাও হয়।

—হেড়ে তো ঢুকল না!

—প্রয়োজন নেই। ওঠ।

—উঠব?

—ওঠ ওঠ। রাখ বোতলটা। পিল পিল করে বেরুচ্ছে দেখ।

সত্যিই দলের লোক বেরিয়ে আসছে। বাবুল বললে—ইয়েস, লেডিজও বেরিয়েছে।

—অলি? তোমার ফ্রেণ্ড অলকা চৌধুরী?

—ওই যে!

—তা হলে ঝড় উঠল না? আমি ভেবেছিলাম—

বাবুল বোস হেসে বললে—এত ভাববেন না স্যার, এত ভাববেন না।

রীতুবাবু বললে—তুমি জান না। লক্ষ্য কর নি।

—জানি। লক্ষ্য করেছি। সব—সব—সব। বাট—আপনি অলকাকে জানেন না। সে খাবার সময় রাগ করে না। পয়সা দিলে না বলে না। অ্যাণ্ড লিপস্টিক মাখতে ভোলে না। চলুন—সব জা।ন আমি।

গোপাল ঘোষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, সে হাঁকছে—নিতু! এই—এই! এ রে! এই নিতু!

রীতুবাবু বললে—আহা-হা! নিতুর পাল্লায় পড়েছে গোপাল! ঘুমুলে ওটা আর উঠবে না। কাটলেও না। গোপাল কিন্তু কখনও হ্যাঁচকা টান দেবে না।

বাবুল বোস হঠাৎ হ্যাক শব্দ করে খানিকটা থুথু ফেললে। বললে—জঘন্য!

রীতুবাবু শুধু একটু হাসলে।

এই মুহূর্তেই মঞ্জরী গোরাবাবু মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে সিঁড়িতে পা দিয়ে দাঁড়াল।

আসুন রীতুবাবু!

মঞ্জরী মাঝখানে—একপাশে অলকা, একপাশে গোরাবাবু। পিছনে অন্য মেয়েরা। রীতুবাবু আপন মনেই বললে—গুড!

* * *

খাওয়াদাওয়ার পর বাসায় এসে শুয়ে পড়ল সবাই। গোলমাল আজ বিশেষ আর হল না। খাওয়াটা আজ ভারী হয়ে গেছে। চোখ জড়িয়ে আসছিল সবারই। অন্যদিন অন্ততঃ তুটো চারটে তকরারও হয়ে থাকে—শোবার জায়গা নিয়ে। আজ তাও হয় নি। শুধু বিড়ি সিগারেট নিয়ে কথা উঠেছিল। দল থেকে প্রতিজনের বিড়ি সিগারেট বরাদ্দ আছে। সে সকলকেই বিলি হয়েছে। এটা খাবার পর নায়ক পক্ষ পান বিড়ি সিগারেট নামিয়ে দিয়েছিল ট্রেতে সাজিয়ে, ট্রেটা গোপাল ঘোষ ছোঁ মেরে নিয়ে জনে জনে বিলি করেছে; সিগারেটের লোককে সিগারেট, বিড়ির আসামীকে বিড়ি। একটা গোটা প্যাকেট নিজে হাতে তুলে দিয়েছে গোরাবাবুর হাতে; বাবুল বোস হাত মুচড়ে প্রায় একটা প্যাকেট ছিনিয়ে নিয়েছে। গোপাল কিছু বলবার আগেই বলেছে—মুখ বুজে; চুপচাপ। গো।

রীতুবাবুকে গোপাল নিজে থেকেই বলেছিল—আপনি এ কটা নিন।

—না। একটাই দাও।

গোপাল জনকতককে বিড়ি বেশী দিয়েছে। দিয়েও সিগারেট তু তিন বাক্স ছিল। বিড়িও ছিল। পান জর্দার বেলায়ও তাই; গোপাল উদ্বৃত্ত যা কিছু নিজের কাছে রেখেছে। গোপেন সাঁই খটমেজাজি লোক; সেই বকবক করেছিল—নায়ক পক্ষের দেওয়া জিনিস—ম্যানেজার ঘরে ভরবে কেন? যত সব! কি হে, কিছু কেউ বল না যে! ভাগ করে দিক আমাদের।

আফিংখোর ভূদেব বলেছে—নে বাবা, শুয়ে পড়্। কানের কাছে বকবক করিস নি।

—তাই বলে—

—হ্যাঁ রে বাবা, শুয়ে পড়্। ঘুম এসেছে সব। মিছে চেঁচাচ্ছিস, জমবে না। করিস তো দূতের পার্ট। পাস তো বিড়ি। তা নিবি, কাল সকালে নিবি। কাল ভোরে আবার তল্পি তোলার পাট আছে।

গজগজ করেই শুয়ে পড়েছে গোপেন সাঁই। শোবার কিছুক্ষণ পরেই নাক ডেকেছে তার।

গোপাল ঘোষের জায়গাও ওই ঘরেই। তার কাছেই নিতু। তার পাশে বিপিন মানে বিপিন ধর—সে দলের সরকারও বটে, আসরের চাকরও বটে। গোপালের সঙ্গে আছে অনেক দিন, সঙ্গে সঙ্গে অনেক দলই ঘুরেছে। আসরের কাজে ওর মত এক্সপার্ট সহজে মেলে না। কোন্ সিনে কোন্ কোন্ জিনিস লাগবে—কার হাতে কোন্‌টি দিতে হবে সে ওর নখদর্পণে। ভীম দুঃশাসনের রক্তপান করে আসরে ঢুকবে, বিপিন ঠিক লাল রঙের পাত্রটি হাতে সাজঘর আর আসরের পথে দাঁড়িয়ে আছে। কোন পার্টে কোন মেয়ে খাঁড়া নেবে—ঠিক খাঁড়াটি ধরিয়ে দেয়। মালা ফুল যা যখন চাই। আবার সব ফিরিয়ে নিয়ে গুছিয়ে রাখে। গোপালের মতই তারও কেউ নেই, জীবনের আকর্ষণ গাঁজা আর বাবা তারকেশ্বর। অবসর পেলেই ছুটে যায় সেখানে। টাকা ফুরুলেই গোপালের কাছে এসে হাজির হয়।

সমস্ত ঘরটা তখন প্রায় নিস্তব্ধ; দু' চারজনের নাকও ডাকছে। গোপাল সব দেখে শুনে এসে ঘরে ঢুকল। সাজঘরে বেশকারীদের, ওপাশের বারান্দায় রান্নার লোকেদের, ওঘরে বাবুদের মানে বড় অ্যাক্টরদের, মেয়েদের ঘরে মেয়েদের, গিন্নী কর্তার ঘরে তাঁদের, সব একবার দেখে এসেছে। বিপিন তখনও জেগে। অন্ধকারে বসেই গাঁজা টিপছে। হাতের টর্চটা একবার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়ে দেখে গোপাল বিছানায় বসল। সেকেণ্ড কয়েক চুপ করে বসে রইল, তারপর বললে—সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। এবং যেন নিজেকে ছেড়ে দিলে বিছানার উপর। তারপর সেকেণ্ড কয়েক পর বললে—হল! হয়ে গেল! বুঝলি বিপিন!

—কি ?

—বারোটা বাজল বলে ! দেরি নেই ।

—মাল খেয়েছ না কি !

—দূর । কতদিন ছেড়েছি—তুই জানিস নে নাকি ?

—তবে ? বারোটা কখন বেজেছে ঠিক আছে !

—তুই আরও গাঁজা খা ।

—তুমি বরং খাও—তা হলে এ মতিভ্রম ঘুচবে, চোখে পরিষ্কার দেখবে হাতঘড়িতে ছুটো বাজছে । বলে বারোটা !

—ঘড়ি নয় গাধা—ঘড়ি নয়, দলের !

চমকে উঠল বিপিন—কেন ?

—প্রথম নম্বর—কেউ জেগে নেই তো! থাকে থাকুক, শুনুক ।

—হ্যাঁ, বল ।

—না । চল, বাইরে যাই ।

বাইরে এসে ব্যারাকটার সিঁড়িতে বসে বললে—প্রথম নম্বর—জলপানি নিয়ে যে নজীর হল আজ তাতে লাভ শূন্য । ছু নম্বর—ওই নতুন মেয়েটা অলকা । তিন নম্বরও বলতে পারিস—ছু নম্বরের ফঁ্যাকড়াও বলতে পারিস—কত্তা গিন্নীর ঘর দেখলাম চুপচাপ । হাসেও না, ফোঁসফোঁসও করে না—মানে কান্নাও না । নিস্তব্ধ । ঝড়ের পূর্বলক্ষণ ।

—তা হলে ?

—তা হলে আর কি ! আমাদের তো বে-বাসা পক্ষীর জীবন—গাছের ডালে রাত কাটাই, এক গাছ ঝড়ে পড়লে অন্য গাছে গিয়ে বসি । তবে আর চাকরি আমি করব না । ড্যাং ড্যাং করে বেরিয়ে পড়ব ।

বিপিন বলে উঠল—হরি বল মন বোম বিশ্বনাথ ! আমাকে সঙ্গে নিয়ো ।

একটু চুপ করে থেকে গোপাল বললে—যেতাম অনেক দিন রে। বুঝলি। তা ওই নিতুটাকে নিয়ে—

—তুমি থাম, তুমি থাম। লজ্জা হায়া তোমার কিছু নেই। এই বয়সে—ছি! লোকে ছি ছি করে। আমিও করি।

—তুইও করিস?

—করি না? আলবৎ করি। কোথা থেকে গেল বছর থেকে ওটাকে ঘাড়ে চাপালে! ছি!

হেসে গোপাল বললে—দেখ্, আর যেই করুক তুই করিস নে। তোকে বলি। যাত্রার দল—বাচ্চা ছেলে নিয়ে কেলেঙ্কারি আছে। যাত্রাদলে ওটা প্রায় পেটের ময়লার মত। তবে হ্যাঁ, কমে আসছে। অনেক আগের কাল দেখিস নি! লোকে আমাকে বলছে—আমি সয়ে যাই। বলবার আমার উপায় নেই। তোকে পর্যন্ত বলি নি। আমার বুড়োবয়সে বিয়ের কথা তোর মনে আছে? পনের বছর আগে? গণেশ অপেরায় থাকি তখন!

—এই দেখ। চুলে কলপ ধরেছিলে, গোঁফ কামিয়েছিলে—কাপড় জামার শখ হয়েছিল; মনে নেই? গণেশ অপেরার হিরো তোমাকে জ্বালাত! বাসা করেছিলে আহিরীটোলায়। তখন তোমার সঙ্গে দহরম মহরম ছিল না, তবু হু' চারদিন গিয়েছি সেখানে। তুমি আগলে বসে থাকতে বউকে। তার হাত আর পায়ের চেটো ছাড়া মুখ আমি দেখি নি।

—হ্যাঁ। তা হঠাৎ দেশে গিয়ে কলেরা হয়ে মারা গেল।

—হ্যাঁ। তারপর থেকেই তুমি এই মানুষ। মদ ছাড়লে। শখ ছাড়লে।

—সে মরে নি। বুঝলি? দেশে শ্বশুরবাড়িতে রেখে এলাম—সেখান থেকে তাকে নিয়ে পালাল ওরই গাঁয়ের একটা ছেলে। আমার চেহারা তো ভাল; আর বাবুও ছিলাম; রোজগারও মন্দ করতাম না। চুল সকালে পেকেছে আমার, নইলে বয়স এমন বেশী

নয়। এখন ষাট—পনের বছর আগে পঁয়তাল্লিশ। তাকে আদরও খুব করেছিলাম। তবু পালিয়ে গেল। মেয়েটাকে ভালবেসেছিলাম। বলতে পারি নি কারুকে লজ্জায়। ভারী লজ্জা হয়েছিল। জানিস, প্রথম ঢুকেছিলাম ত্রৈলোক্যতারিণীর দলে—তখন আমার রূপ কি! চেহারা কি! দলে ছোকরা গাইয়ে ছিল তানি মিত্তির। ভাল তান মারত—তাই নামই হয়ে গিয়েছিল তানি। কলকাতারই ছেলে। তানির ভালবাসার মেয়ে ছিল নাচিয়ে ডালিম। সে আমাকে দেখে পাগল। আমিও ঝুঁকেছিলাম। তানির সঙ্গে ঝগড়া হল। তানি আমাকে চাকু মেরেছিল—হাতে লেগেছিল—অল্পই অবিশ্যি। তাতে জিত হয়েছিল আমার। ডালিম বড় কেঁদেছিল যখন আমি বিয়ে করি। সে যাক। বছর তিনেক আগে হঠাৎ বর্ধমানে সেই বউয়ের সঙ্গে দেখা। ঝি-গিরি করে খেত। আমাকে চিনেছিল, দলের বাসার কাছে এসে একজনকে ধরে দেখা করলে। পায় ধরে অনেক কাঁদলে। দুঃখদুর্দশার শেষ নেই। সে অনেককাল পালিয়েছে। ওর হাঁপানি ধরেছে। তারই এই ছেলে। কি করব? ওকে টাকা দিতে আমি পারি নি। বুঝলি—ইজ্জতে বাধে। ছেলেটা ফুটফুটে। বলেছিল—তোমারই ছেলে। বয়স হিসেব করে দেখ। মিছে কথা জানি। তবু মায়া হল। নিয়ে এসে কত্তা গিন্নীকে বললাম—একে নিন। চেহারা আছে, তৈরি করে দোব আমি। মায়া ছেদ্দা করি। লোকে ভাবে অন্যরকম। তা ভাবুক। সর্বাঙ্গে তো কলঙ্কের কালি—তার উপর আর এক পোঁচ; তাই দে।

ঢং ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা বাজল তিনটে। কলিয়ারীর অফিসে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘড়ি পেটে। তিনটে বাজল। ব্যস্ত হয়ে গোপাল বললে—নে নে, ওঠ্। তিনটে বেজে গেল। কাল আবার সাড়ে সাতটায় রওনা। পলাশবাড়ির লরী আসবে আটটায়।

—দেশলাইটা মেরে দাও। তোমার কথা শুনতে শুনতে টানতেই ভুলে গেছি।

গোপাল কাঠিটা ধরিয়ে দিলে।

বিপিন টান মারলে সজোরে।

গোপাল মুহূর্তে সব দুঃখ ভুলে হেসে বললে—বাপ্‌স্‌। একটানে কল্কেটা জ্বলে উঠেছে দপ্‌ করে!

আট

কলিয়ারীর পেটা ঘড়িতে ছটা বাজল। কার্তিক মাস—দিন বেশ ছোট হয়েছে, সূর্য ওঠে নি, তার উপর চারিদিকে একটা পাতলা ধোঁয়ার রেশ সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে; কয়লার ধুলো আর ধোঁয়া। কুলিদের ধাওড়ার সামনে চাঙ চাঙ কাঁচা কয়লার গাদা পোড়ে। বাবুদের বাসায় মেসে টিনের উনোনে এই কয়লায় আঁচ পড়ে, বয়লারের চোঙার মুখে ধোঁয়া বের হয়। কাঁচা কয়লার ধোঁয়া বেশী। শীতের সকালে শিশিরের ভারে ধোঁয়া আকাশে উঠে যায় না। মাটির বুক ঘেঁষে ছড়ায়। নদীর ওপারে সাদা মেঘের মত ধোঁয়ার পুঞ্জ উঠছে মাঝে মাঝে। মঞ্জরী শুনেছে নদীর ওপাশের কলিয়ারীতে নীচু ধরনের কয়লা থেকে ওগুলো পোড়া কয়লা তৈরী হয়।

ওদের ঘরের জানালাটা খুলে মঞ্জরী দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। কাল রাত্রে তার ঘুম হয় নি। খেয়ে ফিরে গোরাবাবু বিছানায় যেন আছড়ে পড়ে চোখ বুজতে বুজতে বলেছিল—বাবাঃ! দাও, আলো নিভিয়ে দাও। টলছে দুনিয়া।

তাকে শুতেও বলে নি।

আলো নিভিয়ে দিয়ে সে বলেছিল—এত মদ খেলে কেন?

উত্তর দিয়েছিল—এ কথার উত্তর নেই। হয় না।

—মাথা ধোবে?

—না।

—আরাম পাবে।

—আঃ! না।

বিরক্ত হয়ে বলেছিল গোরাবাবু। সে বোধ হয় আর পারছিল না। অথবা তার সঙ্গে আরও কিছু ছিল। যেটা কিছুক্ষণ আগেই ওই জলপানির প্রসঙ্গ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। যেটাকে যথাসাধ্য নত হয়ে গোরাবাবুকেই মালিক স্বীকার করে মঞ্জরী মুছে দিতে চেয়েছিল। গোরাবাবুর কথাই সে বাহাল রেখেছিল। এর সঙ্গে মোহিনীমায়ার মোহ কিছু আছে না কি? থাকা অবশ্য বিচিত্র নয়। পুরুষ! তাদের স্বভাবই ওই। রাম যুধিষ্ঠির রামায়ণ মহাভারতেই আছে। তা থেকে নাটক করে তারা অভিনয় করে সেটাও ঠিক, কিন্তু সংসারে নেই। তার উপর তাদের সংসার, যাত্রাদলের সাজঘর গ্রীনরুম। সেখানে পুরুষে মেয়েতে আলাদা ঘরে সাজলেও লজ্জা রাখলে চলে না—লজ্জার হয়তো জায়গাই নেই। বুকের কাঁচুলিটা পরে হয়তো পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে পুরুষকে বলতে হয়—এঁটে দাও তো। বুকের আধখানা খোলা, হঠাৎ পুরুষ এসে ডাকে, দাঁড়ায় সামনে, কোনরকমে কাপড় আড়াল দিয়েই কথা বলতে হয়। কাপড় পরবার আগেই সায়া ব্লাউজ পরেই বেরিয়ে আসতে হয়। এখানে কটাক্ষে দোষ নেই, রঙ্গরসে শ্লীলতার বাঁধন নেই—এখানে ওই সব নাচিয়ে বাজিয়ে অতৃপ্ত বাসনাগুলো প্রেত হয়ে মানুষের বুকের মধ্যে নাচে।

দোষ সে দিতে পারবে না গোরা চক্রবর্তীকে। তার সঙ্গে জীবনে জীবন বেঁধে এ পর্যন্ত ছলনা করে নি—প্রতারণার পথে হাঁটে নি। কিন্তু আজ যদি—। প্রবীর—সেও তো মদনমঞ্জরীর প্রেমে ডুবে ছিল, জনার মত মায়ের সন্তান সে, মাথার উপরে তার মরণবাঁচন প্রশ্ন—সে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মায়ের কাছে ফিরে যাবে। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে। পরের দিন শেষ যুদ্ধ—ব্রহ্মচর্য পালন করে থেকে পরদিন সকালে স্নান করে মায়ের আশীর্বাদ নেবার সঙ্গে সঙ্গে পাবে দেবী জাহ্নবীর কাছে মহাস্ত্র। তাতে অর্জুন নিধন হবেই। সমগ্র

ভারতবর্ষে তার নাম ঘোষিত হবে—কুরুক্ষেত্র-সিংহ পাশুপত বাণের অধিকারী—অর্জুন-বিজয়ী বিশ্ববিজয়ী প্রবীরকুমার। সব ভুলে গেল সে মোহিনীমায়ার কুহকে। নারী কুহকিনী। তার কটাক্ষে শিব বিচলিত হন। ব্রহ্মার মোহ জাগে কন্যাকে দেখে। কুহক আছে নারীর রূপে। সেই রূপ সে যখন আবরণ উন্মোচন করে পুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে কটাক্ষ হেনে তাকে আহ্বান করে—তখন তার সাধ্য কি যে আত্মসম্বরণ করে? নাটক করে করে সে পুরাণ যেমন শিখেছে এই যাত্রার সাজঘরে বসে সে তেমনি চিনেছে পুরুষের দৃষ্টিকে; মেয়েদের এখানে দৃষ্টি অহরহই মদির বিলোল কটাক্ষ এখানে তাদের পোশাকের ঝুটো মুক্তোর মালার মত ছিঁড়ে গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে—কিন্তু তারই মধ্যে আসল মুক্তো যখন কানের টাপ থেকে কি নাকের নাকছাবি থেকে আলোর ছটায় ঝিকমিকিয়ে ওঠে তখন যার চোখে তার ছটা বাজে শুধু—সেই শুধু বুঝতে পারে না—এরা সবাই বুঝতে পারে—ধরতে পারে। অলকার চোখে কাল দুটো আশ্চর্য কালো মুক্তো কিংবা ঝকঝকে দুখানা নীলার ছটার খেলা সে দেখেছে। গোরাবাবুর চোখে মোহও সে দেখেছে। এত বড় ঘাঘী অ্যাক্‌টর গোরাবাবু—সে কয়েক মুহূর্তের জন্যে যেন পার্ট ভুলে গেল! তারপর এত আনন্দ। এত মদ খেলে। অলির কথায় দলের মান-অপমান না দেখে তাতেই সায় দিলে? এতকাল পর বলে—'তুমি প্রোপ্রাইট্রেস, তুমি হিরোইন দলের, দু দুখানা মেডেল পেয়েছ, ভাবছ তোমারই দাম আছে—এই গরীবগুলোর নেই?' হায় হায় হায়! কি করে বললে? যতদিন দল হয়েছে প্রথম দিন থেকে কার কথায় দল চলেছে? মঞ্জরীর, না বিজয় চক্রবর্তীর? কাল রাত্রে খাবার আগে ওখানে তোমার কথাতেই সে সায় দেয় নি? বলে নি—দল আমার, না তোমার? সাজঘরে মেয়েদের কাছে গিয়েও সে অলকাকেও কিছু বলে নি। যা বলেছিল সে প্লের সময়েই বলেছিল। খাবার আগে সে তাকে শুধু বুঝিয়েছিল। তুমি তাও শুনতে

এসেছিলে। ম্যানেজার অথার ডিরেকটার সেজে এসেছিলে—কিন্তু আসলে তোমার ভিতরের আসল খোদ মানুষটি এসেছিল। অথচ—

জানালায় দাঁড়িয়ে ভাবছিল মঞ্জরী কালকের রাত্রের কথা। কাল তার সমস্ত দেখেশুনে এবং তার উপরেও আর যেন কিছুর গন্ধ পেয়ে অসহনীয় দৃশ্যে এবং অসহনীয় উগ্র কিছুর ঝাঁজে সে প্রায় জ্ঞান হারাতে বসেছিল। অভিনয়ের সময়ে বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করেছিল। আত্মসম্বরণের একটা আশ্রয়ও সে পেয়ে গিয়েছিল; বোধ হয় বিধাতা জুগিয়ে দিয়েছিলেন তাকে। সে তার পার্টটা পেয়েছিল—সব ক্ষোভ সব জ্বালা ঢেলে দিয়েছিল পার্টে। শুধু লোকে স্তম্ভিত হয় নি—সে নিজেও কালকের অভিনয়ের কথা ভাবতে ভাবতে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছে। তাতেও তার ক্ষোভ শেষ হয় নি। সে যা কখনও করে না—তাই করেছিল, গোরাবাবুকে ফেলেই চলে এসেছিল। রাত্রে যে নায়কপক্ষ কোম্পানীর ওখানে সকলের খাবার নিমন্ত্রণ ছিল সে কথাও ভুলে গিয়েছিল। গোপাল মামা এসে ওই জলপানির দাবির কথা বলে খুঁচে দিলে নিভে আসা আগুনে। সেখানেও সেই অলকা চৌধুরী আর তাকে সমর্থন করেছে গোরাবাবু। তুমি এতকাল তার প্রাণঢালা আত্মদান ভুলে গেলে—মঞ্জরীর বিরুদ্ধে অলকাকে সমর্থন করলে! মঞ্জরী তবু আত্মসম্বরণ করে তোমার মতকেই বড় করেছে; তোমাকে মালিক বলেছে। তাতেও তুমি মঞ্জরীর পক্ষে হও নি, তার চেয়েও বড় হয়েছিল অলকা। মঞ্জরী মেয়েদের সাজঘরে ঢুকেছিল। সকলের মুগ্ধ প্রশংসায় এবং অলকার নাচ সম্পর্কে তার মতের সঙ্গে ওই কোম্পানীর বড়বাবুর মতের মিল হওয়ায় মনটা তার খুশীই হয়ে উঠেছিল। জ্বলে ওঠা আগুনটা নিভেই গিয়েছিল। মেয়েদের সাজঘরে ঢুকে সে অলকাকে মিষ্ট কথাই বলছিল।

আর কথা না বাড়িয়ে মঞ্জরী বলেছিল—পৌরাণিক নাটক তো!

এতে ধর্মভাবটা বড় করতে হয়। ওরকম হালফ্যাশানের ঢঙে ব্যাঘাত হয়। হয় না?

উত্তরে অলকা এবার একটু হেসেই বলেছিল—কি বলব? আপনার দল, আপনি যখন বলছেন তখন হয়। তবে তর্ক করলে বলব—সেও তো দেবতাদের পাঠানো মোহিনীমায়া, সে রূপে ছলায় ভোলাতে এসেছে প্রবীরের মত পত্নীগতপ্রাণ মাতৃভক্ত বীরকে। প্রবীর একটুতেই ভুলে যাবে? মায়া সেখানে—একেবারে মানে—নগ্ন হয়ে দাঁড়াল।

মঞ্জরী মনে মনে তারিফ করেছিল—লেখাপড়া জানা মেয়ে তো! চমৎকার বলেছে; আর কেমন কথাটি ব্যবহার করলে! নগ্ন! বাঃ!

ঠিক সেই সময়েই কর্তা ঘরে ঢুকেছিল সাড়া দিয়ে—বলি কি গো—তোমাদের হচ্ছে কি? অ্যাঁ? খাবার যে জুড়িয়ে যাচ্ছে!

ঘরে ঢুকে বলেছিল—এত আলাপ কিসের? কাউকে মানে কেউ রাগটাগ করলে না কি? না তুমি কারুর উপর রাগলে! প্রোপ্রাইট্রেস মানুষ! আশ্চর্য তো নয়!

মঞ্জরী বক্র ভাবেই বলেছিল—না। প্রোপ্রাইট্রেস প্রশংসা করছে

—কার?

—সকলের। তোমার পর্যন্ত। আজ পার্ট সকলের ভাল হয়েছে। গোপালী চমৎকার করেছে মদনমঞ্জরী। শোভাদির গঙ্গাও খাসা। আশার ডুয়েট নাচ। তবে টেক্কা দিয়েছে অলকা। যা মোহিনীমায়ার খেলা দেখালে!

গোরাবাবু বলে উঠেছিল—হ্যাঁ। নিশ্চয় একখানা খেলা। কি গো অলকা, বলি নি আমি? আমি আসর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় বললাম—বহুৎ আচ্ছা। তা ও বললে—মঞ্জরীদি বলেন তবে তো! আমি বললাম—নিশ্চয়ই বলবে।

—হ্যাঁ। তবে খারাপ যেটুকু লেগেছে বললাম। ওই নগ্ন

হয়ে দাঁড়ানো ভাবটা। ওটা বিশ্রী হয়েছে। আসরে আমি যখন ঢুকলাম তখন দু'চারজন চ্যাংড়া যা বিশ্রী কথা বলছিল! রাগ হয়ে গিয়েছিল আমার তখন। ওই তো, বড়বাবুরাও তো তাই বললেন। হবে, ওসব কথা কাল হবে। চল—এখন খেতে চল।

অলকার হাত ধরে টেনে নিজের পাশেপাশেই রেখেছিল তাকে। এপাশে গোরাবাবু।

খাওয়ার আসরে আরও সহজ হয়ে এসেছিল সব কিছু।

তবে ?

ঘরে এসেই গোরাবাবু পালটে গেল ? কেন ? আজও পর্যন্ত কোন দিন তাকে সমাদর না করে সে শোয় নি। মাথায় হাত দিয়ে অথবা চিবুকে হাত দিয়ে, কিংবা হাতখানি ধরে তার পার্টের প্রশংসা করেছে। সে হেসে বলত—মাস্টারমশাই তো তুমি। কোন কোন দিন সে আগে প্রশংসা করেছে—দাঁড়ান মাস্টারমশাই, প্রণাম করি একটা। খুব ভাল পার্ট হয়েছে।

এটা তাদের জীবনে যাত্রার আসর ভাঙার পর ঘরের আসরের বাঁধা-ধরা কনসার্ট বা ডুয়েট নাচের মত ব্যাপার। এটুকু শেষ না করে তারা কখনও শোয় নি। মদ খেয়েও বহুবার এমন অসহায় বা বে-এক্তার হয়েছে গোরাবাবু। ঘরে এসে বলেছে—ধর, মাথা ধুয়ে দাও। সে মাথা ধুয়ে দিয়েছে। কতবার বমি করেছে। সে নিজে ধুয়ে মুছে দিয়েছে। আজও ফেরার পথে—ওই বাঁধা-ধরা ব্যাপারটার সঙ্গে আরও একটু নতুন পালা জুড়ে দেবার জন্যে নিজের মনে মনেই তৈরি করে রেখেছিল। সে ঠিক করে রেখেছিল ঘরে এসে তাকে হেসে বলবে, মাস্টারমশাই বলবে না আজ, আজ যাত্রার ভাষায় বলবে—হাতজোড় করেই বলবে—প্রভু, স্বামী—অধিনী অপরাধিনী। তুমি ক্ষমা কর মোরে।

সেও মিটমিট করে চেয়ে তুষ্ট হাসি হেসে বুঝতে চেষ্টা করবে ব্যাপারটা।

—ক্ষমা করিবে না

সে নতজানু হবে।

সে এরপর বলবে—না, ক্ষমা করিব না। শাস্তি দিব সুকঠিন বাহুর বন্ধনে বন্দিনী করিয়া তোরে। বলে হয়তো—কিন্তু বাসায় ফেরবার সময় থেকে আবার কেমন হতে লাগল। বাসায় এসে শুয়ে পড়ল দরজা বন্ধের আগেই। পা টলছে—শরীর বইছে না বলে শুয়ে পড়ল। সে অনুযোগ করে বললে—এত মদ খেলে কেন? উত্তর হল—এ কথার উত্তর হয় না। সে বললে—মাথা ধোবে? উত্তর দিলে—না। তার মধ্যে থেকে রূঢ়তা আচমকা এসে গায়ে-পড়া আগুনের কণার মত তাকে ছ্যাঁকা দিয়ে দিলে।

মনে আগুন জ্বলছে—তারই কণা ছিটকে বেরিয়ে এসেছে 'না' কথাটির সঙ্গে।

ঠিক সচেতন ভাবে সুইচটা বন্ধ করে নি—কথাটার ছ্যাঁকায় তার চমকের সঙ্গে সঙ্গে হাতটার ধাক্কায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আরও মিনিটখানেক দুঃখে অভিমানে স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে থেকে নিজের বিছানায় এসে শুয়েছিল।—এ কি? কেন? কি হল?

মেডেল! বিচিত্র জগৎ যাত্রার দল! একজন পার্ট হাততালি পেলে অন্যজন নিজে পায় নি বলে দুঃখিতই হয় না—রাগ করে, আক্রোশ জন্মায়; মেডেল পেলে সে-দুঃখ সে-আক্রোশ কালবৈশাখী মেঘের টুকরোর মত মনে বিদ্যুৎ হানে। গোরাবাবুর কাছেই তার যাত্রার অ্যাক্‌টিং শিক্ষা। প্রথম প্রথম গোরাবাবুই মেডেল পেত, সে পেত না। সেও বিষণ্ণ হত। যেন অকারণে বিষণ্ণ হয়ে পড়ত হঠাৎ। অকারণে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ত, মনে হত আর যেন পারছে না, মনে হত—দূর ছাই, এই নাকি জীবন! বাসায় এসে গোরাবাবু তাকে হেসে বলত—মেডেলটা কিন্তু আমার প্রাপ্য নয়।

তোমার। ওরা বুঝতে পারলে পার্টে তুমি কত সংযম দেখালে। এ তো আমি চেঁচিয়ে মেরে দিলাম। ছেলেভোলানো কাণ্ড।

আজও কি তাই? কিন্তু সেও তো পেয়েছে। দুটো আর একটা। সে তো অলকাও দুটো পেয়েছে।

অলকা! অলি চৌধুরীর জন্যে তো অনেক দরদ তার!

ভাবতে ভাবতে কাল রাত্রে মঞ্জরী উঠে বসেছিল বিছানায়। শুয়ে ভাবতেও যেন অস্বস্তি বোধ করছিল। বসেও ভাল লাগে নি। উঠে এসে জানালায় দাঁড়িয়েছিল। একটু খুলেও দিয়েছিল। বাইরে পাম্পের শব্দ উঠছিল। মধ্যে মধ্যে ঠং ঠং ঘণ্টা। পিটছেড়ে বাজে ঘণ্টা, এখানে অনেকবার এসে এগুলো জানা হয়ে গেছে। তার সঙ্গে দুটো চারটে এ—ই! হো! হাঁ হো—এমনি হাঁক। অন্ধকারে শূন্যে ইলেকট্রিক আলোগুলো যেন ভাসছে। এসব কিছুই তাকে আকর্ষণ করে নি। ক্লান্ত বেদনার্ত মনে আবার বিছানায় ফিরে এসে বসেছে। পাশের তক্তাপোশের উপর নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে সে। মদের নেশা। কিছুক্ষণ পর আবার শুয়েছিল। ঘুমুতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ঘুম আসে নি।

কেন? কি করেছে সে? কি হল?

ওদিকে কলিয়ারীর আপিসে পেটা ঘড়িতে চারটে বেজেছে। তারপর হঠাৎ কখন চোখ জুড়ে এসেছিল। তার মধ্যে অজস্র এলোমেলো স্বপ্ন দেখেছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঢং ঢং করে পেটা ঘড়িতে ঘণ্টা বাজল। সে উঠে বসল। জানালার ফাঁক দিয়ে ভোরের আলো এসে পড়েছে। আঃ, আলো কি জিনিস! মনের উদ্বেগ ক্লান্তি, বুকে জমে-থাকা উদ্বেগ অন্ধকার মুছে দেওয়ার মতই মুছে দেয়। ব্যস্ত হবার, অন্য দিকে মন দেবার সুযোগ মেলে, পৃথিবীর কাজ শুরু হয়, অন্ধকারের চিন্তায় দিশাহারা মানুষও সকালের আলোয় চারটে দিকের দিকে তাকিয়ে দেখে আশ্বস্ত হয়, দিগন্ত হারায় নি, নিজের কাজ তাকে ডাকে। গৃহস্থবাড়ির কাজ ধীরে

চলে—বাঁধা কাজ বাঁধা নিয়মে চলে। কিন্তু যাত্রাদলের মানুষগুলো গৃহস্থ হয়েও গৃহস্থ নয়—বেদের মত ভবঘুরে, বাঁধনছেঁড়া এলোমেলো, কেটে-যাওয়া ঘুড়ির মত যেখানে পড়ে পড়েই থাকে; গাছে সুতো আটকে ঝোলে। বাতাসের ঠেলা দিতে হয়, নয়তো ছেঁড়া সুতো ধরে টান দিতে হয়।

কত কাজ! আজ এখানকার ডেরা উঠবে। সাড়ে আটটায় লরী আসবে। কাচ্ছি কলিয়ারীর নায়কপক্ষ বলে দিয়েছে, লরী যেন আটকে না থাকে। একটা লরীই দু-তিনটে খেপ দেবে। লরীর সঙ্গে দালাল বিধু আসবে। বিশ মাইল পথ। সাড়ে নটা পর্যন্ত রওনা হতে হবে। ষাটজনের প্রাতঃকৃত্য, চা খাওয়া, বিছানা বাঁধা। কত কাজ! কিন্তু কই, গোপালমামার সাড়া কই? ঘরের দরজা খুলে সে বারান্দায় বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। সব নিস্তব্ধ। লম্বা বারান্দাটার ওপাশে ক'জন শুয়ে, ওরা ঠাকুর চাকর। ওই একটু দূরে শিউনন্দন শুয়ে ঘুমুচ্ছে। মুখসুদ্ধ ঢাকা দিয়েছে। ওটা কে? সিঁড়িতে শুয়ে? শুয়ে, না পড়ে? কে? এই কার্তিকের হিমে শুধু সিমেন্টের উপর? কে? শুধু পিঠটা দেখা যাচ্ছে!

—শিউনন্দন! ওরে শিউনন্দন!

—উঁ—

—ওঠ্ রে—বেলা হয়েছে। ওঠ্। গোপালমামাকে ডাক্। শুনছিস্। সাড়ে ন'টায় উঠতে হবে।

—গোপালমামা উঠে নাই।

উঠে বসল সে। বললে—যোতো সব—ক্যা নাম হ্যায়—দিল্লগি কাণ্ডো!

—যা, ডেকে দে। আর দেখ্ তো সিঁড়িতে ওটা পড়ে কে?

—কোই মাতাল উতাল হোবে!

—তাও হতে পারে, আবার কারুর অসুখবিসুখ করে থাকতে পারে। দেখ্ উঠে।

মেয়েদের ঘরে এসে সে ডাকলে দরজায় ধাক্কা দিয়ে—গোপালী, শোভাদি, আশা, শুনছ!

দরজা খুলে সামনে দাঁড়াল অলকা। বললে—ওরা সব ঘুমুচ্ছে।

মনটা কেমন হয়ে গেল। সকালেই অলকার মুখ দেখলে। পয়-অপয়ের কথা নয়, মনটা তিক্ত হয়ে উঠল। বললে—ওদের সব ডেকে দাও। মুখ হাত ধুয়ে ফেলুক। চান করবে তো করুক। কতক্ষণ উঠেছ তুমি?

—অনেকক্ষণ। কাল ঘুম হয় নি আমার।

—শরীর ভাল আছে তো?

—তা আছে। ভাল লাগছে না। শুধু ভেবেছি কেন এলাম!

—সে ভাববে পরে। এখন ওদের ডেকে তুলে দাও; নিজে মুখ হাত ধোও। সাড়ে ন'টায় রওনা।

বলেই সে আর দাঁড়াল না। নিজের ঘরে গিয়ে গামছা কাপড় তেল সাবান নিয়ে চলে গেল মেয়েদের জন্য ঘিরে দেওয়া কলঘরের দিকে। মেসেরই লম্বা কলঘর এবং প্রাতঃকৃত্যের জায়গাটার খানিকটা অংশ ঘিরে পৃথক করে দিয়েছেন এঁরা। জলের ব্যবস্থা কলিয়ারীতে খুব ভাল; পাম্পে তোলা জল পাইপ বেয়ে কলের মুখে পড়ে কলকাতার মতই।

মুখে হাতে ভাল করে তেল ঘষে সাবান দিয়ে রঙ তোলা পাঁচ মিনিটে হয় না। স্নান করছে সে, এমন সময় গোপালী এসে ঢুকল। তাকে দেখে হেসে বললে—তুমি খুব সকালে উঠেছ দিদি।

—হ্যাঁ। উঠল সবাই?

—উঠছে। অলি কাল কি বলছিল জান রাত্রে?

—কেন এখানে এলাম, এই তো! সে আমাকেও বলেছে।

—না না। সে তো ছোট কথা। বলে—বাবুলদা আমাকে এই প্যাঁচে ফেললে। আমি সিনেমার জন্যে চেষ্টা করছিলাম—হয়তো গোড়াতে টাকাপয়সা পেতাম না; কিন্তু এ যে কদর্য ব্যাপার!

বাঁকা হাসিতে মঞ্জরীর ঠোঁট দুখানি মচকে উঠল। বললে—তাই নাকি? তা যেতে পারে অলকাসুন্দরী—আমি চুক্তি ছিঁড়ে ছেড়ে দিতে রাজী আছি। সিনেমা! সিনেমা থিয়েটার সব ঘুরেছেন উনি। বাবুল বোস সব বলেছে। আমার ইচ্ছে ছিল না ওকে নিতে, শুধু গোপাল—

গোপালী বললে—চুপ কর, কে যেন আসছে। সম্ভবত ধনীই আসছেন।

সত্যিই অলকা এসে ঢুকল। মঞ্জরীর স্নান শেষ হয়েছিল—সে বেরিয়ে এসে ঘরের দিকে চলে গেল।

বাসার বারান্দায় তখন দলের লোকেরা উঠে সবে বসছে। তাও দু'চারজন। বিড়ি টানছে; কিছু লোক দল বেঁধে নদীর দিকে চলেছে মুখ হাত ধুতে। বারান্দায় রাখা বড় বড় তেলের পিপে-কাটা ড্রামের জল নিয়ে মুখ ধুচ্ছে। কলরব উঠছে এতগুলি লোকের রকমারি কথার সংমিশ্রণে। শুধু একটি কথা বোঝা যাচ্ছে—চা! চা! চা!

ঘরের ভিতর কেউ গান ধরেছে। ওই একটা পাশে দুটো বাচ্চাতে মারামারি লেগেছে। কলিয়ারীর বাবুদের বাড়ির কিছু ছেলে এসে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখতে এসেছে তাদের। চিনতে এসেছে রাত্রির পরিচয় নিয়ে—এই দেখ—জনা।

—দূর, তার রঙ কত ফরসা।

—সে রঙ মেখেছিল। ওই জনা। মঞ্জরী দেবী। ওরই যাত্রার দল।

কয়েকটি তরুণও ঘুরছে। সে এসে আপনার ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। আশা তার কপালের দুই রগ ধরে বসে আছে অবসন্নের মত। মাথা ধরেছে।

মাথা ধরা ওর আছে। বংশী ড্যান্সিং মাস্টার ওর মানুষ, মদে প্রবল আসক্তি, গুণ শুধু মাতাল সে হয় না, কাজ ঠিক করে যায়। আশাকেও সে এতে সঙ্গী করেছে। মদ তাদের জাতের মেয়েরা

অধিকাংশই খায় কিন্তু মদের তেষ্টা সকলের থাকে না। আশার সেই তেষ্টার জন্ম দিয়েছে বংশী মাস্টার। প্লের সময় বংশী খায়, আশা খায় না। ভয় হয়ে গেছে। মধ্যে লুকিয়ে প্লের সময় খেতে ধরেছিল—কিন্তু একবার মদ খেয়ে নাচতে গিয়ে নাচের ঘুরপাক খেয়ে আসর থেকে বেরিয়ে সাজঘরের পথেই বমি করে ফেলেছিল। তাতেই শিখে গেছে। প্লের সময় খায় না কিন্তু প্লের পরে খাবেই আর বংশী কখন কোন্ ফাঁকে তাকে ডেকে নিয়ে খাইয়ে যাবেই। এই খাওয়া বেশী হলেই মাথা ধরে। শুধু তো মদ খাওয়াই নয় ওদের তুজনের, এর উপরে নিত্য সকলে ঘুমুলে ওদের তুজনের অভিসার আছে। সব অকাতরে ঘুমুচ্ছে, নাক ডাকছে। বংশীরও ডাকছে, হঠাৎ এক সময় নাকডাকা বন্ধ হল, চট করে ঘুম ভেঙে গেল; বংশী উঠে বসল। ঠিক সেই সময়ে আশাও পাশের ঘরে উঠে বসবে। এবং বেরিয়ে এসে তুজনে নীরবে চলে গিয়ে নির্জনে বসবে। মদ খাবে। হাসবে। কথা বলবে।

শুধু ওরা তুজনেই নয়। আরও অনেকের এ অভ্যাস আছে। সে কুৎসিত। সে কলঙ্ক। কিন্তু এখানে কুৎসিত কিছু নেই, কলঙ্ক কিছুতে হয় না। যাত্রাদলের শেষ রাত্রি যত ক্লান্তির তত নেশার। কিন্তু তাই বলে এমন নেশা করবে? ছি! ছি! ছি! পরক্ষণেই হাসল মঞ্জরী। না—এখানে ছি বলে কিছু নেই। অভিনয়ের আসরে স্বর্গে যায় তারা। সেখানে গিয়ে পুণ্যাভিনয় করে। তারপর পড়ে। আসর ভাঙে, তারা গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আকাশ থেকে খসে পড়া একঝাঁক তারার মত গভীর থেকে গভীরতর অন্ধকারের মধ্যে পড়ে। আলো থেকেও অন্ধকার ভাল। আলো-ঝলমল আসরে প্রাণপণে পরিশ্রম করে—পালা সেরে ক্লান্তিহরা অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে দেয় নিজেকে। বড় উল্লাস সেখানে।

তবুও আজ আশার অবস্থা দেখে ভ্রূকুঞ্চিত করলে—তারপর সিঁড়িতে পড়ে থাকা লোকটার দিকে তাকালে। হ্যাঁ, ওটা বংশীই

বটে। তার মুখ থেকে আপনি বেরিয়ে এল—মরণও নেই! এমনি করে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে খায় ওইগুলো!

একটা থামের আড়াল থেকে মোটা গলায়—গলা শুনেই চিনলে মঞ্জরী—সে যোগামাস্টার। যোগামাস্টারকে সে দেখে নি; যোগা-মাস্টার বললে—কাণ্ডজ্ঞান? মা, জ্ঞানের কাণ্ড তো কাণ্ড, ও মূ—ল পর্যন্ত শেষ করে দেয়—ও দব্যি এমন!

মঞ্জরী হাসলে। যোগামাস্টার যখন থামের আড়ালে বসে কথা বলছে তখন গাঁজার কল্কে ওর হাতে আছে। গাঁজা খেতে বসেছে বুড়ো।

যোগা কথা আরম্ভ করলে থামে না। বলেই গেল—কণ্ঠমাশাই বলতেন, বাবা, মদ খাবে দেবতায়, মদ খাবে অসুরে—দৈত্যে। মানুষের জন্যে মদ লয়।

মঞ্জরী যোগাবাবুর কথার উত্তর দিলে না। দেওয়ায় বিপদ আছে। কথা আর থামবে না। চলে এলে পিছন পিছন শোনাতে শোনাতে আসবে। সে আশাকে বললে—স্নান করগে যাও। মাথা ধরে বসে থাকলে মাথা ছাড়বে না।

আশা লজ্জিত ভাবেই বললে—অ্যাসপিরিন খাব—একটু চায়ের জন্যে বসে আছি।

মঞ্জরী এসে নিজের ঘরে ঢুকল। যোগাবাবু থামল না। সে বলছিল—বোয়েচ না—কণ্ঠমশায় নিজে শাক্ত ছিলেন। মা কালী বুড়ী সেজে এসে বনের মধ্যে তাঁর গান শুনে গিয়েছিলেন। কিন্তু কণ্ঠমশায় কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর। কখুনও এ সব দব্যি ছুঁতেন না।

মঞ্জরী শুনতে শুনতে এসে ঘরে ঢুকল।

তখন গোরাবাবু উঠেছে—হোমিওপ্যাথিক বাক্স নিয়ে বসেছে। সামনে বিপিন। কোণে গোপাল ঘোষ বসে ট্রাঙ্ক থেকে সিগারেট বিড়ি এবং টাকা রেজগি বের করছে। সিগারেট বিড়ি বিলি হবে, যার সঙ্গে যা কথা—কারুর দু বাক্স, কারুর এক, কারুর হাপ বাক্স আর

বিড়ি এক বাণ্ডিল। এক এক বাণ্ডিল বিড়ি সবাই পাবে—চাকর, ঠাকুর, বেশকারী থেকে বড় আসামী, বাচ্চা ছোট আসামী সব। জলপানি মানে রাত্রের খোরাকিও বিলি হবে এখুনি। মিটিয়ে রাখলেই নিশ্চিন্ত। কিন্তু ওষুধের বাক্স!

মঞ্জরী গোরাবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—ওষুধের বাক্স! কার কি হল?

গোরাবাবু হেসে বললে—চারটে বাচ্চার—নেপা টোনা গোপেশ্বর দেবুর পেট খারাপ। দাস্ত হয়েছে। বাবুলের চোঁয়া-ঢেকুর উঠছে। বংশী—

হাসলে গোরাবাবু।

মঞ্জরী নিজেকে সংবরণ করতে পারলে না। বললে—তুমি ভাল আছ তো?

গোরাবাবু এখন আর এক মানুষ; হেসে ফেলে বললে—আমাদের শরীর মহাশয়। সয়ে নেয় সব বীরের মত।

—হুঁ!

—ছোট একটি হুঁ? আর কিছু না?

—না।

বাইরে লরীর মোটরের শব্দ পাওয়া গেল। গোপাল একবার ঘাড় তুলে শুনে বললে—এল।

সে গামছায় সিগারেট বিড়ি বেঁধে টাকাপয়সার পুঁটলিটা কোঁচড়ে গুঁজে বেরিয়ে গেল। দুখানা লরী এসেছে। সে রীতুবাবুদের ঘরে গিয়ে ঢুকল। লুঙ্গি পরে আধশোয়া হয়ে পড়ে আছে রীতুবাবু। আঙুলের ফাঁকে একটা জ্বলন্ত সিগারেট। সামনে বসে মণি ঘোষ, নাটুবাবু আর দিবাকর। বাবুল বোস বুকে হাত বুলুচ্ছে। দিবাকর গাইছে চাপা গলায়—

ওই চলে রাধা নাহি মানে বা—ধা—
তটিনী সাগর গামিনী যেন— ; ও—ই!

রীতুবাবু বলছে—হল না। হল না ঠিক। সে তোমরা দেখ নি যে। আমরা দেখেছি। হল না।

—কেন, কোথা তাল যাচ্ছে বলুন?

—তাল যাচ্ছে না। ঠিক আছে। কিন্তু রঙ আসছে না। মানে গাইবার ঢঙ। ডাক যোগামাস্টারকে।

ডাকতে হল না যোগামাস্টারকে—সে গানের সুর শুনেই এসে দরজায় দাঁড়াল এবং দুই হাতের বুড়ো আঙুল দুটি নেড়ে দিয়ে বক্রহাসস্মিত মুখে বললে—হল না, হল না, হল না হে, হল না। নগর নাগর তুমি রাধা ব্রজ এল না।

—এই দেখ! গাও তো মাস্টার। সেই হাত বাড়িয়ে ঠিক তেমনি করে—

গোপাল এসে ভগ্নদূতের মত দাঁড়াল—আর গান নয় যোগা-মাস্টার। আর না। সব ওখানে গিয়ে হবে। কত্তার কড়া হুকুম।

তারপর সিগারেট বিড়ি নামিয়ে দিয়ে বললে—মাস্টারমশাই—

রীতুবাবু বললে—ঠিক আছে গোপাল—আমরা সব আপন আপন নিয়ে নেব। তুমি কম দাও নি।

—তা না। বললাম তো লরী এসে গেছে আমাদের—

বাবুল বোস খিঁচড়ে উঠল—তবে তো মাথা কিনেছে! তা হলে ওঠ এখন। গরজ তো কম নয় আপনাদের। সকাল থেকে চা নেই। লাইফ যাই যাই করছে। আর উনি খবর মানে হুকুম জারি করছেন—অ্যাটেনশন্! মার্চ! আপনি দেখছি মাইরি, হিটলার হয়ে গেলেন।

রীতুবাবু কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই ঠাকুর বড় কেৎলিতে করে চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। ওদিকে বাইরে লরীর হর্ন বাজছে। দলের দালাল বিধে নবকাত্তিকটির মত সেজেগুজে এসে হেসে দাঁড়াল। মণিবাবু দেখবামাত্র ক্ষেপে উঠল—এই বিধে শালা, বদমাশ, আমার চাদর নিয়ে গিয়েছিস কেন? আজ তোর—

রীতুবাবু তার হাত ধরে আটকে বললে—কেন সকালবেলা মুখ খারাপ করছ মণি। ও সেই বেহায়া, না হাজারবার। বিধে, চাদর তুই সাবান দিয়ে কেচে বাটিইস্ত্রি করে দিবি। না, এক কিল তোকে মারব আমি। আমার সেই ভীমের কিল।

হেসে বিধু বললে—দোব। নিশ্চয় দোব। মাইরী বলছি দোব। ওটা আমার মনে করে—

—তোর মনে করে? তোর চাদর আছে?

—মণি, চা খাও।

গোপাল ঘোষ বেরিয়ে এসে বড় ঘরে ঢুকল। এ ঘরে সবই সাধারণ অ্যাক্‌টর—ছোট আসামীর দল। বংশী মাস্টার এখানে থাকে। রাত্রে ইচ্ছেমত বেরুনো ঢোকার ব্যাঘাত হয় না। সে এরই মধ্যে তার সব অসুস্থতা কাটিয়ে স্নান পর্যন্ত সেরে আয়না সামনে রেখে টেরি কাটতে বসে গেছে। হাতের তেলো দিয়ে চেপে চেপে ঢেউ তুলছে। আজকালকার পিছনে ঠেলা ফ্যাশন তার পছন্দ নয়। ছেলেগুলো এবং ছোট অ্যাক্‌টরদের সবাই বিছানা গোটাতে ব্যস্ত। নিতু তার নিজের এবং গোপালের বিছানা বাঁধছে। তৈরী হয়ে গেছে এরা।

—নে নে বাবা, জলদি জলদি নে। ওদিকে চা হয়ে গেছে। যা, গিয়ে সব খেয়ে নে।

তারপর বংশীকে বললে—তোমার সিগারেট মাস্টার।

—রাখ।

—তোমার বাহাদুরি আছে কিন্তু।

—বাহাদুর আমি চিরকাল।

—এর মধ্যে স্নান সেরে দিব্যি সহজ মানুষ। অথচ ভোরে তো—

—হ্যাঁ। সে (৪৫) নিজেরই ঘেন্না করছিল যখন শিউনন্দন ডাকলে। শুনলাম প্রোপ্রাইট্রেস দেখে শিউনন্দনকে তুলতে বলেছে। উঠে চলে গেলাম নদীতে। চান করলাম—তারপর ব’ এক ডোজ

টেনে খোঁয়ারী ভেঙে নিলাম। বাসায় ফিরতে ফিরতে সহজ সোজা মানুষ। আশার মাথা ধরেছে শুনলাম।

—হ্যাঁ।

—চা-টা দিয়েছেন? অ্যাসপিরিন নিয়ে গেল শিউনন্দন।

—সে পাবে। ভেবো না। হাসতে লাগল গোপাল।

—হাসির কি আছে বাওয়া? ভালবাসা আমাদের আছে। তা আছে। আমার চা পাঠিয়ে দাও। আর বিছানাটা বাঁধিয়ে দিতে হবে।

গোপাল বেরিয়ে এল। লরীর হর্ন বাজছে। ঠাকুর তিনজনের দুজন বাসনটাসন চাপাচ্ছে একখানা লরীতে। বাসন আর সাজপোশাক নিয়ে বেশকারী আর ঠাকুরেরা চলে যাবে। বিপিন যাবে সঙ্গে। রান্না চাপাবে। কিছু আসামীও যেতে পারবে। বিপদ বড়দের নিয়ে—তারা সবাই বসতে চাইবে লরীর সামনের দিকে ড্রাইভারের পাশে। তাদের বিছানা বাঁধিয়ে দিতে হবে। বাপ! কতই বা দেখবে গোপাল! মনে পড়ছে শশী অধিকারী মশায়ের গল্প। এত বড় বেহালা-বাজিয়ে গুণী মানুষ, যাত্রার প্রোপ্রাইটার—তাঁর আমলে বিছানা তাঁর নিজের বিছানা চটে বাঁধা থাকত—হোল্ডঅল ছিল না। অধিকাংশই ছিল একখানা মোটা কম্বল, চটের মত চাদর আর শক্ত বালিশ। বর্ধমানে গেছেন রাজবাড়িতে। বাসা দিয়েছে মস্ত পাকা বাড়ির দালানে—সুন্দর ফরাশ—তাকিয়া সাজানো। যাত্রাদলের লোকেরা আর বিছানা খোলে নি। অধিকারী মশায়ও খোলেন নি। কি দরকার। এমন নরম তাকিয়া—এমন ধবধবে ফরাশ! কিন্তু তাতে তাঁর ঘুম আসে নি। মাঝরাতে নিজে বিছানা খুলেছিলেন। একজন বড়দরের আসামী জেগে উঠেছিল। অধিকারীকে নিজে বিছানা খুলতে দেখে বলেছিল—বাবু যে বিছানা খুলছেন? শশী অধিকারী বলেছিলেন—চট আর শক্ত বালিশ ভিন্ন ঘুম আসছে না হে!

একটা ঝনঝন শব্দ উঠল এই মুহূর্তে।

কি হল ? কোথায় কি হল ? ও। মালিকের ঘরে !

শিউনন্দন বেরিয়ে আসছে।

কি হল ? শিউনন্দন ?

সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জরীর গলা শোনা গেল—আমার উপর রাগ করে তুমি চায়ের কাপটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে !

—কই ? এই যে গোপালবাবু !

কলিয়ারীর বড়বাবু—বুড়ো সুরেনবাবু এসেছেন তাঁদের কমিটির লোকদের নিয়ে।

—আসুন স্যার, আসুন !

ব্যস্ত হয়ে উঠল গোপাল—সকালেই—মানে—

—মানে আর কি ! আপনাদের বিদেয়টা আর কি। আমরা সব ব্যস্ত হব, আজ আমাদের থিয়েটার আছে। বিদেয়ের কাজটা সেরে দি। আপনাদের প্রোপ্রাইট্রেস কোথায় ? চলুন।

গোপালের আগেই শিউনন্দন ঘরে ঢুকেছিল খবর দিতে। সঙ্গে সঙ্গেই গোরাবাবু বেরিয়ে এল—আসুন আসুন! এই যে—উনি এই ঘরেই আছেন। শরীরটা বোধ হয় ভাল নেই। তা—চলুন, বরং ও ঘরে চলুন।

তারা ও-ঘরের দিকে ফিরবার আগেই কিন্তু মঞ্জরী দরজার মুখে এসে দাঁড়াল, বললে—না না। আসুন, এ ঘরেই আসুন। তেমন কিছু হয় নি আমার।

ওদিকে প্রথম লরীটা বেরিয়ে গেল। বাসন, ড্রেসের বাক্স, ঠাকুর চাকর বেশকারী চলে গেল। বাকিখানায় ছোটখাটো আসামীরা যাবে। আর একখানা বাস আসছে। তাতে যাবে মেয়েরা আর বড় অ্যাক্টর মাস্টারমশাইদের দল।

গোপাল লরীতেই যাবে। পিছনে সবার সঙ্গেই বসবে। সামনে ড্রাইভারের পাশে নিতুকে নিতে দেবে না। তার থেকে পিছনে লরীর খাটালের মধ্যেই ভাল। যোগাবাবু তার মধ্যে তখন আসর

জাঁকিয়ে বসে কণ্ঠমশায়ের তিরোধানের বর্ণনা করছে—ওরে বাবা—মহাত্মা পুরুষ! নিজে মৃত্যুর ছ'মাস আগে মৃত্যুকালে গাইবার গান বেঁধে রেখেছিলেন—"হরির নাম লিখে দিয়ো অঙ্গে"। উৎপলা সেন রেকর্ড করেছে সে গান। হুঁ হুঁ। সুর, নিজের সুর। উৎপলা সেন ভাল গায়। তা—একটুকুন—এই জেরা সে—ইদিক উদিক করে ফেলেছে। বোয়েচ না—

সকলেই ঢুলছে। কেউ বোধ হয় শুনছে না। কিন্তু তাতে যোগামাস্টারের কিছু আসে যায় না।

বোয়েচ না—ত্রিবেণীর ঘাটে অন্তর্জলী হয়ে ছেলে কমলকে বললেন—গাও বাবা—হরির নাম লিখে দিয়ো অঙ্গে। বাস্, দেখতে দেখতে হয়ে গেল।

হাতজোড় করে সে কণ্ঠমশায়কে প্রণাম করলে।

নয়

সায়েব কোম্পানীর কলিয়ারী থেকে কাচ্ছিদের কলিয়ারী বিশ মাইলের কাছাকাছি। লরীতে বাসে সব এসে পৌঁছতে বেজে গেল সাড়ে নটা। লরীখানার প্রথম দিকেই এসে গোপাল ম্যানেজার সাধারণ আসামী অর্থাৎ অ্যাক্টরদের নিয়ে এসে বাসার ব্যবস্থায় একটু অসুবিধেয় পড়ল। মোট তিনখানা ঘর দিয়েছে। একখানা মেয়েদের—একখানা বড় অ্যাক্টরদের এবং লম্বা ঘর একখানা আর সকলের জন্যে। গিন্নী কর্তা মানে প্রোপ্রাইট্রেস আর গোরা-বাবুর জন্যে আলাদা ঘর নেই। মেয়েদের স্নান শৌচের জন্য আলাদা ঘেরা নেই। ওদিকে মঞ্জরী মা আর গোরাবাবুর রকমটা যা দেখে এসেছে তাতে ওদের ব্যবস্থা আলাদা না হলে বোঝাপড়া বা মিটমাটের বদলে ঝগড়া বাড়বে—হয়তো কখন বোমা ফাটার মত ফাটবে। বিয়াল্লিশ সালের ডিসেম্বর মাসে গ্রে স্ট্রীটে একটা জাপানী বোমা পড়েছিল—সেটা ফাটে নি, টাইম বোমা বলেছিল

লোকে ; কখন ফাটবে তার ঠিক নেই। লোকেরা কাছে আসে নি ; মিলিটারী এসে ওটাকে দড়ির বেড়ায় ঘিরে দিয়েছিল। আশপাশের বাড়িগুলো থেকে লোকেদের সব হটিয়ে দিয়েছিল। এ ব্যাপারও তাই। এখন ওদের একঘরে ঘের দিয়েই রাখতে হবে। কলিয়ারীর যে বাবুটি ওদের অভ্যর্থনা করছিল তাকে সে বললে—স্যার, এ তো ভারী অসুবিধে হবে আমাদের! চানের জায়গায় ঘেরা নেই মেয়েদের জন্যে ; মেয়েছেলে চান করবে। সাত আটজন মেয়েছেলে। তার উপর আমাদের প্রোপ্রাইট্রেস—তাঁর জন্যে ঘর নেই—

বাবুটি বললে—তাই তো! স্নানের জায়গায় ঘের!

ভুরু কুঁচকে একটুক্ষণ চুপ করে রইল সে। গোপাল বুঝল তার মনটা। সে মনে মনে ভাবছে—বাবা, যাত্রার দলের অ্যাক্‌ট্রেস—এসেছে তো সব পবিত্র স্থান থেকে—সেখানেই তো—! এখানে এসে আলাদা চানের জায়গা!

গোপাল বললে—হাজার হলেও মেয়েছেলে—এতে তারা যাই হোক। তবে আমাদের প্রোপ্রাইট্রেস, তিনি এ জাত নন। অলকা চৌধুরী—সে তো ম্যাট্রিক পাস—গভর্নমেণ্ট সারভেণ্ট তার বাপ।

অপ্রস্তুত হল বাবুটি—বললে—না না না। সে কথা কে বলছে!

—মানে—উঠতে পারে, মনে হয় অনেকের।

—একখানা চাটাই দিয়ে অর্ধেক অর্ধেক করে দি।

—ঘিরে দিতে হবে। মেয়েদের দিকটা।

—তাও না হয় দিচ্ছি। কিন্তু আলাদা ঘর চাচ্ছেন, সেইটেই মুশকিল। তা—উনি মেয়েদের সঙ্গে একঘরে থাকুন। তাতে ওঁর আপত্তি কি?

—আপত্তি নেই, করবেনই বা কেন? তবে অসুবিধে হয়। ধরুন, ক্যাশট্যাশ থাকে। অন্য মেয়েরা হাসতেখুসতে আড়ষ্ট হয়। তবে

তাও থাকেন। এবার কিন্তু ওঁর শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়েছে। বলে দিয়েছেন তিনি। বিশ্রাম দরকার। না হলে হয়তো প্লেতে নামতে পারবেন না।

—ফ্যাসাদ করলেন মশাই! ঘরই তো মুশকিল! দেখি—মানে আমার হাতে তো কিছু নেই। যেতে হবে কমিটির সেকেটারী পেসিডেনের কাছে।

গোপাল মনে মনে বললে—পণ্ডিত মশায় আমার! দিগ্‌গজ রে! 'র'ফলা জিভে বের হয় না। হাসি সংবরণ করে সে বললে—তা হলে তাই গিয়ে বলুন। বুঝেছেন! বায়নার সময় এসব বলা আছে।

লোকটি বললে—আজ্ঞে, না বলা থাকলে এমন হবে ক্যানে? এই আপনাদের দালাল সেই বিধুবাবু সব দেখেশুনে বললে—ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। যাত্রার দল—কত জায়গায় গোয়ালঘরে শুতে হয়। এই ঠিক আছে।

গোপালের মাথা গরম হয়ে উঠল। তা হলে এ হারামজাদা বিধের কাণ্ড! বিধে সেই জন্যেই লরীতে ওখানে গিয়ে সঙ্গে আর ফিরল না! এখন বোধ হয় ওখান থেকেই খসবে অন্য জায়গার বায়নার যোগাড়ে। তবুও সে ছাড়লে না। বললে—আপনি গিয়ে বলুন—তাহলে বড় অ্যাক্‌টর অ্যাক্‌ট্রেস কেউ এখানে আসবেন না। আমরা ডুপ্লিকেট দিয়ে প্লে করব। যান।

কথা শেষ হবার পূর্বেই ওদিকে বাসার লম্বা বড় ঘরটা হলঘরে গোলমাল উঠল—উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল যোগাবাবু—তাও একেবারে হিন্দীতে—কভি নেহি। কভি নেহি ছোড়ে গা।

কি হল! যা হয়েছে আন্দাজ করেও ছুটে গেল গোপাল। যা ভেবেছে তাই। যোগামাস্টার দেওয়ালের ধার ঘেঁষে বিছানা পেতেছে, সেই বিছানা ধরে টানছে তবলা-বাজিয়ে হরিপদ গুঁই। যোগাবাবু প্রচণ্ড ক্রোধে চীৎকার করছে—কভি নেহি! কভি নেহি ছোড়ে গা!

হরিপদ বলছে তখন—আলবৎ ছাড়তে হোগা। চালাকি না কি! টেনে ফেলে দেব তোমারা বিস্তারা।

হরিপদ জোয়ান। তার কণ্ঠস্বরে ক্রোধের সঙ্গে কৌতুকের তাচ্ছিল্য। গোপাল ঘোষ এসে দাঁড়াল কাছে—কি? কি? আরে থাম হরিপদ।

হরিপদ বিছানা টানা বন্ধ করলে কিন্তু ছেড়ে দিলে না। বললে—কেন থামব মশাই? লরী থেকে নামবার সময় হাতের কাছে বিছানাটা পেলাম না। গাদার নীচে পড়েছিল। আমি সর্বাগ্রে ঘরে ঢুকে এই জায়গায় পা দিয়ে আমার বলে হেঁকে বাইরে বিছানা আনতে গিয়েছি—এসে দেখি যোগামাস্টার বিছানা পেতে বসে আছে। ছাড়ব না আমি জায়গা। ওর কভি নেহি বলে চেঁচানিকে আমি ভয় করি না।

যোগাবাবু চীৎকার করে উঠল—তোমার জায়গা আমি মানব কেন?

—আমি 'পা' দিয়ে চীৎকার করে বলে তবে গেছি।

—মানব কেন আমি। চিহ্ন কই?

—খড়ি নেই যে দাগ দেব। বাঁশ নেই যে গেড়ে যাব। চিহ্ন পাব কোথায়?

—তুমি থুথু ফেলে গেল না কেন? কি একটা পাটকেল রাখ নি কেন? উনি তো ম্যানেজার। কই, বলুক উনি! বল না হে ম্যানেজার—ক্যাবলাকান্তের মত দাঁড়িয়ে রইলে যে!

—বেশ তো, বলুক না গোপালবাবু। কি মশাই?

মুখের দিকে তাকালে গুঁই। কি বিপদ! কি বলবে গোপাল! নিয়ম যা তাতে হরিপদও ঠিক, যোগাবাবুও ঠিক। যাত্রা পার্টির নিয়ম—ঘরে ঢুকে জায়গায় পা দিয়ে আমার বলা চাই। যোগাবাবু ঠিক বলছে—থুথু ফেলেও চিহ্ন রেখে যেতে পারত হরিপদ। সে

সকলের আগে ঘরে ঢুকেছে। কোন্ জায়গায় পা দিয়েছে কেউ দেখে নি। সে হিসেবে যে জায়গা সে বলবে তাই তার হতে পারে।

—বলুন মশাই !

—কি ম্যানেজার ? বল ?

গোপাল হাত জোড় করে বললে—হরিপদ, আমি তোমার কাছে হাতজোড় করছি। উনি বৃদ্ধ লোক।

চেঁচিয়ে উঠল যোগামাস্টার—বৃদ্ধ কি হে ? বৃদ্ধ ! বৃদ্ধ দেখালেই বৃদ্ধ। চুলপাকা দাঁতভাঙার বয়স আছে। আমার মত তান কে মারতে পারে—কার দম আছে ? যখন গাঁয়ের পথে পথে হাঁটতে হয় তখন কজন পারে আমার সঙ্গে হাঁটতে ? বৃদ্ধ ! আমি বৃদ্ধ, উনি ছোকরা !

বলতে বলতে হঠাৎ যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল যোগামাস্টার। ধড়মড় করে উঠে বিছানা টানতে শুরু করে বললে—যা, নেহি মাংতা হ্যায় জায়গা। বারান্দায় যায়েগা নেহি তো গাছতলায়—

—মাস্টারমশাই ! যোগাদা ! জোড়হাত করছি। পায়ে ধরছি— থামুন। হরিপদ ভাই, তোমাকে আমি ভাল জায়গা দিচ্ছি। উনি পুজো করবেন।

—চলুন, তাই চলুন। আপনি বলছেন। কোথায় যাব বলুন।

—আমার পাশে চল। ওদিকের দেওয়ালের ধারে। চল। দেওয়ালের ধারই দেব তোমাকে।

বিপিন চাকর সর্বত্রই আগে আসে—সে সর্বত্রই একটা দেওয়ালের ধার দখল করে প্রথমেই। পাশাপাশি দুজন, নিতু গোপাল। কাছেই দরজা জুড়ে বা পায়ের তলায় থাকে নিজে। হরিপদ বিছানা বিছিয়ে ফেলছে এমন সময় ঠাকুর কুড়ামণি ডাকলে—ম্যানেজারবাবু ! ম্যানেজারবাবু !

—কি ? তোমার আবার কি ?

—কি রাঁধিবো করব বলুনো আপুনি। তখন সব চীৎকার করিবে। বিপিন কুছু আনিল না। আলু সে তো বিচিবিচি—তেমনি আঙ্‌লের মত মূলা। একো গাদা কচু আনিছে। বাবুলঅ-বাবু ঠিক ছুঁড়ি ফেলি দিব—বলিবে—কচু খাইব তো পোড়া খাইব। মাছ কুচো চিংড়ী। বাজারে বলিছে মাছঅ নাই। ইলিশঅ আছে—সে মাছঅ অগ্নিমুল্য আছি। আমি পারিব না। আপুনি দেখ।

ক্লান্তিবোধটা বোধ হয় জীবন থেকে সয়ে সয়ে খেটে খেটে চলেই গেছে গোপালের। গরুর ঘাঁটা-পড়া কাঁধের মত গোটা দেহে মনেই ঘাঁটা পড়ে গেছে। সে বললে—চল, দেখি।

সত্যিই বলেছে ঠাকুর। বিপিনও সত্যি বলেছে। নেই কিছু বাজারে। অন্তত তাদের টাকায় কুলোয় এমন ভাল মাছ তরকারি নেই। আছে—বাজারে ইলিশ আছে—সে অগ্নিমূল্য—দু টাকা সের ; ফুলকপি আছে—একমুঠোর থেকে বড় নয়—তার দাম তিন আনা একটা (১৯৪৪ সাল)। তা সে কিনতেও পারে নি—টাকাও ছিল না। নতুন আলুও উঠেছে—আট আনা সের।

গোপাল চিন্তায় পড়ল। সত্যিই চিন্তার কথা। ভেবে-চিন্তে সে আবার একখানা নোট হাতে দিয়ে বললে—যা বাবা, মাছটা অন্তত নিয়ে আয়। বাবুদিগে দোষই বা দিই কি করে। খাওয়া বলতে গেলে তো একবেলা। রাত্রে যে যা খায় আপন আপন করে কম্মে—সে জলখাবারের সামিল। পেট ভরে খেলে শরীরেই সয় না। কাল রাত্রে নেমন্তন্ন ছিল—খেয়ে তো আট দশ জন পড়েছে। হেউ হেউ ঢেকুর তো প্রায় সবারই।

বিপিন বললে—তা এ বেলাটা আধা উপোস হোক না।

—না না। তুই যা।

বিপিনকে পাঠিয়ে বাইরে এসে সে আবার হারানো সুতোর সন্ধানে ছুটল। মেয়েদের চানের জায়গা আর প্রোপ্রাইট্রেসের ঘর। চানের ঘরটা হচ্ছে। হ্যাঁ, এতেই চলে যাবে। বাঁশ পুঁতে চট দিয়ে

ঘেরা হচ্ছে। বাবুটি দাঁড়িয়ে আছে। সে বললে—এতে হবে তো? দেখুন।

গোপাল হেসে বললে—চালিয়ে নিতে হবে। কি আর করা যাবে। কিন্তু ঘর? প্রোপ্রাইট্রেসের জন্যে ঘরের কথা বলছি।

—ঘর হবে। তবে একটু তফাতে হচ্ছে। ব্যারাকে লাগাও ঘর হবে না। ওই দেখুন, ওই ঘরটা খালি করে দিচ্ছে।

কাছেই ঘরখানা, ব্যারাকের সঙ্গে পৃথক। তবে ঘরখানা ছবির মত। গোপাল বললে—বাঃ, চমৎকার হবে। সুন্দর হবে। খাসা ঘর। ঘর নেই বলছিলেন যে! আপনাদের বৃহৎ ব্যাপার—আপনাদের আবার ঘরের অভাব!

—আরে মশাই, ওটা আমাদের বাবুদের, মানে কর্মচারীদের গেস্ট রুম। আমাদেরও গেস্টটেস্ট আসে তো। মেসের পাশে ওটা আমরা করিয়ে নিয়েছি—ওখানেই থাকে। মেসের মধ্যে ঘর তো সব বোঝাই। ঘরে জায়গা দিতে অসুবিধে হয়। তা ছাড়া আমরা আড্ডাটাড্ডাও দিই ওখানে। ছিমছাম করে রাখি। তা ওটাই দিলাম।

ঘরের বারান্দায় গোপাল গিয়ে চারিপাশটা দেখলে। সুন্দর ঘর, চারখানা তক্তাপোশ। চারটে টেবিল। ঘরের চারিপাশে বারান্দা—তার চারিপাশে বাগানের কেয়ারি, কিন্তু গাছ নেই। বাথরুমও আছে। চমৎকার হবে। এখানে নিরিবিলির মধ্যে হয়তো ওদের মিটমাট হয়ে যাবে। বাঃ!

বাসখানা এসে দাঁড়াল। এসে গেছে সব। কিন্তু কর্তা-গিন্নীর গাড়ি কই! ওদের জন্য গোপাল বুদ্ধি করে একখানা ট্যাক্সি ভাড়ার ব্যবস্থা করে এসেছে। রীতুবাবুকেও বলে এসেছে—মাস্টারমশাই, আমি বলে গেলাম। বরাকর থেকে ট্যাক্সি আসবে, ফোন করে দেবেন বড়বাবু। ওঁরা ট্যাক্সিতে আসুন। গোলমালটা মিটে যাক।

রীতুবাবু হেসে বলেছে—আমি আঁচ করেছিলাম। তা বেশ, আমি করব ব্যবস্থা।

কিন্তু ট্যাক্সি কই! ট্যাক্সির তো আগে আসবার কথা! বাস চলে গেল, ট্যাক্সি কই! বাস থেকে নামছে ড্রাইভারের পাশ থেকে রীতুবাবু, নাটুবাবু, মণিবাবু। সেকেণ্ড ক্লাস থেকে নামছে মেয়েরা; ও কি! প্রথমেই প্রোপ্রাইট্রেস! মঞ্জরী নামল! সে কি! তা হলে ট্যাক্সি পায় নি! আশা, গোপালী, শোভা, অলি চৌধুরী কই! ধাঁধা লাগল গোপালের। বুকটা একবার ধড়াস করে উঠল। আরে, গোরাবাবু কই! তার তো রীতুবাবুর সঙ্গেই নামা উচিত ছিল। বাবুল বোস? সেই বা কই?

গোপাল দ্রুতপদে এগিয়ে গেল। মঞ্জরী তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—অলকার ওখানে হঠাৎ ফিট হয়েছে।

—ফিট!

—হ্যাঁ। রীতুবাবু বললে—ফিট। হঠাৎ পড়ে গেল 'কর্তিত কদলীবৃক্ষ সম'।

—হঠাৎ?

—হ্যাঁ। হঠাৎ অকস্মাৎ। উইদাউট এনি নোটিস। অল অন এ সাডেন্!

স্বল্পভাষী নাটবাবু বললে—রাগে। রাগে। কত্তা গিন্নীর জন্যে ট্যাক্সি আসছে শুনে রাগ হয়েছে। গোপালীর কাছে শুনো সব।

রীতুবাবু বললে—না ব্রাদার। সবটা হিস্টিরিয়া নয়। মেয়েটার নার্ভ দুর্বল। তার উপর কাল সারারাত ঘুমোয় নি।

—আপনি জানলেন কি করে?

—জানলাম। আমারও ঘুম হয় নি। কাল সারারাত জনার দুটো ডাক—প্রবীর! প্রবীর রে! আমাকে হণ্ট করেছে। ও বাবুলকে এসে জানালা থেকে ডাকলে। বাবুল ঘুমিয়েছিল, আমিই তাকে ডেকে দিলাম। তোমায় ডাকছে বাবুল। অলি ডাকছে। বাবুল উঠে গেল। ফিরল ভোরে। বাবুলের চোঁয়া-ঢেকুরও ওই জন্যে। বেচারা এসে শুল—বলতে বলতে শুল—ঝকমারি করেছি বাবা।

মেয়েদের সঙ্গে সেভেন কেন ফরটিনাইন খাটের দড়ির সম্পর্ক রাখতে নেই। অভাব—সিনেমায় নেয় না, থিয়েটারের চাকরিতে পঞ্চাশ ষাটের বেশী মিলল না ; আমি বাবা প্রেমে নেই, মায়ায় নেই, স্রেফ দয়া করে এখানে ঢোকালাম—এখন বলে কিনা তুমি দায়ী ! ভাগ। রাম কহো বাবা। দেখ তো ঝঞ্ঝাট। শেষ রাত্রে কেঁদে রিভার গ্যাঞ্জেস বইয়ে দিলে বাবা। আমি চুপ করেই রইলাম। তারপর সকালে স্নানটান করে-টরে আসবার সময় হঠাৎ একেবারে ধড়াস করে পড়ে গেল। ডাক্তার এল। ডাক্তার বললে হিস্টিরিয়া নয়। খুব পরিশ্রম, তার উপর ভাল নারিশমেণ্টের অভাব হয়েছে। ঘুমোয় নি সারারাত। নাড়ীও খুব দুর্বল রয়েছে।

বাসখানা হর্ন দিয়ে উঠল—জিনিসপত্র নেমে গেছে। লোকজনও নেমেছে। বংশী মাস্টার আর আশা এগিয়ে গেছে ব্যারাকের দিকে। গোপালী বললে—কোন্‌টা আমাদের মুসাফেরখানা গোপালমামা ?

—ওই—ওই একদম টেরেরটা পশ্চিমদিকে।

—ওমা ! এটা পশ্চিম নাকি ! উত্তর নয় ?

রীতুবাবু বললে—নাটু, গোপালীর দিক্‌ভ্রম হয়েছে। সাবধান।

শোভা বললে—ও ম্যানেজার তোমার মঞ্জরী মায়ের কোন্‌টা গো ?

—ওঁর এই দিকে—এই একলাটা। আপনাদের পূব দিকেরটা মাস্টারমশাই। বেশ বড় ঘর। মা, আপনি আসুন এদিকে। শিউনন্দন, ওই ঘরে চল জিনিসপত্র নিয়ে।

মঞ্জরী নীরবেই পথ চলছিল, গোপালও প্রশ্ন করতে সাহস করে নি। হঠাৎ মঞ্জরীই বললে—এখানে কোন গোলমাল হয় নি তো ?

—একটু সে। যোগামাস্টার আর বাজিয়ে হরিতে জায়গা নিয়ে ঝগড়া। অবিশ্যি আমি এসে পড়েছিলাম। নইলে মারপিট হয়ে যেত।

—হয় নি তো ?

—না।

—তা হলে সেই ভাগ্যি। যখন দল করি তখন একদিন রাধাবিনোদিনীর কাছে গিয়েছিলাম। বলেছিলাম দল করব মনে করেছি। আপনি অনেকদিন দল চালিয়েছেন তাই জানতে এসেছি। বিনোদিনী মাসী বলেছিল—দল! রামায়ণ পড়েছ? বলেছিলাম—তা পড়েছি বইকি। উনি বললেন—মেয়েযাত্রার দল আর রামায়ণের অরণ্যকাণ্ড এক মা। মেয়েযাত্রা, মেয়েদের ঘরের চারিদিকে লক্ষ্মণের গণ্ডি টেনেও রক্ষে নেই; রাবণরা সোনার হরিণ ছেড়েও সীতাহরণের পালা করে। তারপর বানর কটকের দাপাদাপি। মধুবনে মধু খেতে গিয়ে বন ভেঙে তছনছ করবে। সেতুবন্ধে কাঠবেড়ালী মারবে। আবার বড়রা হনুমানের মতন পাহাড় এনে নল নীলকে চাপা দিতে চাইবে। কি অপরাধ? না—তার আনা পাথর নল নীল বাঁ হাতে ধরে। রামচন্দ্র না থাকলে এ সামলানো যায় না মা। কিন্তু বরাত এমনি—রামচন্দ্র তো এ অরণ্যে পা দেয় না।

চুপ করলে মঞ্জরী। গোপালের মনে মঞ্জরীর শেষ কথাটা ঘুরছিল—রামচন্দ্র তো এ পাপ-অরণ্যে পা দেন না। মেয়েটিকে সে স্নেহ করে। গুণের জন্য শ্রদ্ধাও করে। বড় ভাল পার্ট করে মঞ্জরী।

—বাঃ! এ যে চমৎকার জায়গা গোপালমামা!

—হ্যাঁ। ওরা তোমার জায়গা করেছিল মেয়েদের সঙ্গে, কত্তার রীতুবাবুদের সঙ্গে। আমি বললাম—তা হবে না। তা ওঁকে রেখে এলে কেন? অর্থাৎ গোরাবাবুকে?

—থাকতে হল বাধ্য হয়ে। কি করব?

—তুমিও থাকলে পারতে। এতে ঝঞ্ঝাট বাড়বে মা।

মুখটা খানিকটা রাঙা হল মঞ্জরীর। কিন্তু সে কুলবধূ নয়—লজ্জায় সে ভেঙে পড়ে না। বনের অরণ্যলতার মত সে শক্ত। লজ্জাকে ঠেলে ফেলেই সে বললে—সে সব মিটে গেছে। ভাববেন না। উনি আমাকে বললেন—তুমিও না হয় থাক। ওদের ফেলে তো যাওয়া

হবে না। ভালও দেখাবে না। আর ওরা যদি ওখান থেকে কলকাতাই চলে যায়, তা হলে যে এখানে বিপদ হবে। আবার এখানে দল আসছে—এখানে যদি অরণ্যকাণ্ড পার হয়ে লঙ্কাকাণ্ড হয় তখন কি করব। ওঁকে রেখে আমি এলাম। ওঁরা ট্যাক্সিতে আসবেন। অলকার জ্ঞান হয়েছে। কলিয়ারীর ডাক্তারও এসেছিল। বলেছে—অলকা যেন আজ না নামে।

শিউনন্দন জিনিসপত্র সব গোছগাছ করে এসে দাঁড়াল। বললে—তবভি তুমি আর থোড়া সমঝোতা করিয়ে লাও। আজকাল দারু বহুত পি-তে লেগেছে। হাঁ!

মঞ্জরী রূঢ় স্বরে বললে—আজকাল তুই বড় দালালি করছিস নন্দন! করিস নে। ভাল হবে না।

—সো তুমি হামাকে যো বোলো বাবা সো বোলো—হামি বলবে।

বাইরে মোটরের হর্ন বেজে উঠল। গোপাল উঁকি মেরে বললে—ট্যাক্সি এসে গেছে।

মঞ্জরীও বেরিয়ে এল। হ্যাঁ, ওরা এসে গেছে। বাবুল বোস নেমে তার পাজামা পাঞ্জাবির ধুলো ঝাড়ছে। ধুলো লেগেছে—কয়লার দেশের কালো ধুলো। সে নামল সামনের সিট থেকে। পিছনের দরজা খুলে নামল গোরাবাবু; হাত বাড়ালে সে—হাত ধরে নামল অলকা। ক্লান্ত দেখাচ্ছে অলকাকে।

—গোপালবাবু, বাসা কোথায়?

গোপাল ছুটে এল—আপনার ওখানে। আর মেয়েদের বাসা ও-ঘরে।

বাবুল বোস হনহন করে ব্যারাকটার দিকে এগিয়ে গেল—কোথায়? রীতুবাবু—মাস্টারমশাই?

হঠাৎ দাঁড়িয়ে বললে—ও ছোট্ট কটেজটি তো বেশ! ওখানে—। ঠিক আছে। প্রোপ্রাইট্রেস—গুড! তা আমার বিছানা ভেজে দিন কাউকে দিয়ে।

গোরাবাবু বিব্রত হয়ে বললে—অলকার রেস্টের প্রয়োজন। ও ঘরে—। মঞ্জরী!

মঞ্জরী এগিয়ে এল—অলকাকে দেখে বললে—বাঃ, অনেকটা ভাল দেখাচ্ছে।

—ওর একটু রেস্টের দরকার। ও ঘরে সকলকে একটু বলতে হবে। বুঝেছ? সেটা তুমি বললে ভাল হয়। ভাল দেখাচ্ছে—ডাক্তার ওকে স্টিমুলেণ্ট দিয়েছে। বলে নিউট্রিশনের অভাব—তার উপর খুব মানসিক উত্তেজনা। একটা বেলা বেশ করে ঘুমুলে ওটা কেটে যাবে।

—এস, আমার সঙ্গে এস। আমার ঘরেই শোও এখন। ওখানে গোলমাল হবেই। তুমি তাহলে রীতুবাবুদের ঘরে যাও এখন। কিন্তু দোহাই তোমার—

—না না না। খাব না, খাব না। হল তো। শিউনন্দনকে দিয়ে বিছানাটা আমার পাঠিয়ে দাও। না হয় আমাকে এই বারান্দায় দাও না। তাহলে তো হবে।

নীরবে দাঁড়িয়েছিল অলকা। অনেকটা অপরাধিনীর মত। সে বললে—আমাকে ওখানেই দিন না। পারব আমি ঘুমুতে ওরই মধ্যে।

—না। এস। কথা শুনতে হয়।

ঘরে ঢুকে একখানা তক্তাপোশে বসে পড়ল অলকা। আঃ বলে আরামের তৃপ্তি প্রকাশ করে বললে—আমরা বড় গরীব মঞ্জরীদি। জানেন, বাবা নিজের চাকরীর সঙ্গে একরকম নিজের জাত হারালেন তবু খরচ কমাতে পারলেন না। সমানে শেষ পর্যন্ত চাল করে গেছেন বাবা। একটু হাসলে সে—অথচ কোন আয় নেই। আমার এ রোজগারে কি হয়! ডাক্তার বললে—নিউট্রিশনের অভাব—পাব কোথায়! এ চাকরীটায় যে কি উপকার হয়েছে আমার।

আশ্চর্য মানুষের মন। বিগলিত হয়ে গেল মঞ্জরী। বললে—থাক, শুনব। তুমি শুয়ে পড়। জলদি কর্ শিউনন্দন। শোওয়ার দরকার ওর। আর বারান্দার চৌকি একখানা বের করে বাবুর বিছানা কর্। বিছানার চাদর ছুখানা পর্দার মত ঝুলিয়ে দে।

অলকা বললে—ও বেলাতে আমি চলে যেতে পারব।

গোরাবাবু ডাকলে।

—কিছু বলছ? এস না ভেতরে।

—না। তুমি বাইরে এস।

—কি?

বলে বাইরে এসেই মঞ্জরী মাথায় ঘোমটা তুলে দিলে। কয়েকজন কলিয়ারীর লোক।

গোরাবাবু বললে—নায়কপক্ষ বই সম্বন্ধে কথা বলতে এসেছেন।

—আমরা তো বইয়ের নাম বায়নার সময় বলেছি। সতীতুলসী, গন্ধর্বকন্যা, অষ্টবজ্র। এ তো ওদেরই বরাত।

—হ্যাঁ। তা কিছু বদলাতে চাই। প্রবীরপতনটা চাচ্ছি আমরা যে কোন একটা পালটে। না, সতীতুলসী রেখে বাকী ছুটোর যে কোন একটার বদলে। এবং সেটা আজই চাচ্ছেন ওঁরা। তা কেমন করে হয়? বেশী ঝোঁক—

থেমে গেল গোরাবাবু। নায়কপক্ষ বললে—মানে—আপনি জনা, অলি চৌধুরী মোহিনীমায়া—এইটে চাচ্ছি আমরা। বইটা কাল লায়েকডিতে খুব ভাল হয়েছে। ওটা চাচ্ছি আমরা।

—প্রবীরপতন! মুখখানা কঠিন হয়ে উঠল তার।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এবং আজকেই প্রথম দিনেই চাচ্ছি ওটা আমরা। মানে আমাদের মালিকেরা রয়েছেন। ওঁরা দেখবেন।

গোরাবাবু বললে—অসম্ভব। সে হতেই পারে না। মানে আর্টিস্ট অসুস্থ। ডাক্তার বলেছেন—

একজন বাবু বললে—কোন রকমে করতেই হবে। মালিকরা চলে যাবেন। অসুখ থাকলে ব্র্যাণ্ডিট্র্যাণ্ডি খাইয়েও করুন। আর টাকা কিছু বেশী—

বাধা দিয়ে মঞ্জরী বললে—হবে—তাই হবে। টাকা বেশী কেন লাগবে। হবে।

—কি বলছ!

—বলছি। আমি বলছি হবে। যান আপনারা।

মঞ্জরী ভিতরে ঢুকে গেল। ঘরের ভিতরে অলকা বিছানার উপর উঠে বসেছিল তখন, চোখ দুটি দীপ্ত হয়ে উঠেছে তার। সে বললে—আমি পারব। দেখবেন।

—না। তোমায় এই শরীর নিয়ে নামতে দিতে পারি না আমি। সে হবে।

গোরাবাবু ঘরে ঢুকে বললে—কাকে দিয়ে করাবে? গোপালী, না আশা? লোকে মারবে।

—আমি করব।

—তুমি!

স্তম্ভিত হয়ে গেল গোরাবাবু, অবাক হয় তাকিয়ে রইল অলকা।

—জনা কে করবে?

—দুটোই আমি করব।

—তুমি পাগল হয়েছ! পরের সিনেই জনা-মদনমঞ্জরী।

—হ্যাঁ। মাঝখানে যোগাবাবুর গান ঢুকবে। চৌতালে—সেই

"কে তুমি কালো আলোর ওপারে
আঁধারে বসিয়া নিমেষহীন—"

তারপর মদনমঞ্জরী ঢুকবে—তারপর জনা—ওতেই ড্রেস চেঞ্জ হয়ে যাবে আমার। কিন্তু খবরদার, দু'চারজন ছাড়া যেন কেউ না জানে। ওরা তাহলে চেঁচামেচি করবে।

গোরাবাবু বললে—কি বলছ ! তখন যদি করে—আসবে ?

—করবে না ।

দৃঢ় কণ্ঠে মঞ্জরী বললে—তাহলে আমি আর যাত্রা কখনও করব না ।

তার চোখ মুখ দেখে অবাক হয়ে গেল গোরাবাবু। এমনই মুখ চোখ যে, সে আজ প্রথম অনুভব করলে যে মঞ্জরী যাত্রার প্রোপ্রাইট্রেস, সে মাইনে-করা লোক ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মঞ্জরী অপেরার কথায় লোকেরা চঞ্চলও হল, অবাকও হল । এ কি কাণ্ড ! প্রোপ্রাইট্রেস করবে !

বাবুল বোস উঠে বসল ধড়মড় করে—হোয়াট ? মাই ঈশ্বর, খো-দা-তা-লা ! মেয়েতে সব করতে পারে ! খুন করতে পারে !

রীতুবাবুও উঠে বসেছিল । সে কিছু বললে না । শুধু সিগারেট টানতে লাগল । হঠাৎ সিগারেট আছড়ে ফেলে [illegible] ব্যাগ খুলে বোতল বের করলে । খানিকটা খেয়ে বললে—দেখ বাবুল মাস্টার—

—Yes sir—

—গোরাবাবুকে বল, আজ ও প্রবীরটা আমাকে একদিনের মত ছেড়ে দিক ।

—মরেছেন তা হলে !

কিছু না বলে রীতুবাবু সিগারেট ধরিয়ে রিঙ ছাড়তে লাগল ।

—কি, তুমি প্রবীর করবে ?

শোভা বারান্দা দিয়ে যেতে যতে ঘরে এসে ঢুকল বললে—মরি মরি মরি ! তাহলে আমি করব মোহিনীমায়া ।

রীতুবাবু এমন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালে তার দিকে যে শোভা ভয় পেয়ে গেল । সে শুধু আ-মরণ বলে যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ চলে গেল । বকতে বকতে গেল বাবুল বোসের একটা কথা নিয়ে। আমরা খুন করতে পারি । আর তোমরা ? পুরুষরা ? ঝাড়ু মারি, ঝাড়ু মারি, ঝাড় মারি ।

বাবুল খিলখিল করে হেসে উঠল। রীতুবাবু সেই রিঙ ছেড়েই চলেছিল। বাবুল উঠে বারান্দা পর্যন্ত গেল শোভাকে দেখতে, কিন্তু ফিরে এল, বললে—বিগ ব্রাদার—

—কি ?

—যোগাদার দেখুন—

—কি ? গান ভাঁজছে তো ?

—মাই ঈশ্বর ! আপনি কি গণনাও জানেন দাদা ?

—না। আজ দেখবে সবাই ক্ষেপবে।

—মানে ?

—জেদের কম্পিটিশন পড়ে গেল আজ। এই যে বাউণ্ডুলে রসপাগলদের দলে এসেছ মাস্টার, এদের এখনও চেনো নি। এদের কি আছে আর বলো ! ওই নাম—শুধু নাম। এক একদিন এমনি করে নামের আড়াআড়ি পড়ে। সেদিন পাগল হয়ে যায় এরা। আরও আছে কিছু এর সঙ্গে।

—আবার কি ?

—সল্ট। লবণ। পটলীচারু মরে গেল, সে বলত কথাটা। নুন নইলে ভাত আর প্রেম নইলে জীবন ! বাড়তি নুন সামনে থাকলে চাখনা মানুষ দেবেই। সে অকপটে বলত। নুন বারণ রোগীর আর যোগীর। ফলমূল সার করে তারা। ওঃ, মেয়েটা একেবারে খাঁটি—মানে আসল এই জাত ছিল হে ; তবে ভালবাসত। ওতেই আমাকে বুঝেছিল—সত্যি কথাটা বলতই। এক একদিন রাত্রে ডেকে নিয়ে যেত যেমন কাল তোমাকে অলকা ডাকলে।

—দোহাই রীতুবাবু—বি-লি-ভ মি—

—করি—বিলিভ করি বাবুল ব্রাদার। কাল মুখ বুজে অন্ধকারে কাঠ মেরে পড়ে সব শুনেছি। বিলিভ তোমাকে আমি করি। এখন শোন, যা বলছি। পটলীচারুর কথা। ডেকে নিয়ে গিয়ে কাঁদত। কাঁদ কেন ? না—অন্যায় করে ফেলেছি। হঠাৎ কি ভাবে কি

হল—ভাল লাগল ওকে। সাধ ছিলও অনেক দিন থেকে। মন আর যশ—যশ আর মন—এতেই সব এখানে। এ চায় ওর মন—ও চায় তার মন। আর যশ! মাইনেতে পেট ভরে না—হাততালি দিলেই ব্যস বড়লোক হয়ে গেল—সোনার ঘড়া পেলে। আর ছিল স্বর্গ না, নরক না, কিচ্ছু না। খাবে না কি এক ডোজ? না, খেয়ো না: শেষ পর্যন্ত তাল রাখতে পারবে না। আমার কথা আলাদা। যত খাব তত পার্ট ভাল হবে।

যোগাবাবু গান ভাঁজতে ভাঁজতেই এসে দাঁড়াল রীতুবাবুর সামনে। বললে—রীতুবাবু—

—মাস্টার—

—যদি 'কে তুমি কালোর' বদলে এ মায়া প্রপঞ্চ মায়া গানখানা গাই তা হলে হয় না?

এ মায়া প্রপঞ্চ মায়া ভবের রঙ্গমঞ্চ মাঝে—
রঙ্গের নটবর হরি যারে যা সাজান সেই তা সাজে।

রীতুবাবু বললে—তা হয়। কিন্তু তা গেয়ো না। গোরাবাবু ক্ষেপে যাবে। চাকরীটিও খোয়াবে।

—তা কে তুমি কালো আলোর ওপারে—ওই ভাল।

—হ্যাঁ।

দশ

—অঘটনপটীয়সী নারী!
কিছু নাহি, কিছু নাহি অসাধ্য তোমার।
কিন্তু চিন্তামণি, তুমি অতি সুন্দর, তুমি অতি সুন্দর!

যাত্রার পালা শেষে রীতুবাবু বাসায় নিজের বিছানায় মদের গেলাস হাতে আবৃত্তি করছিল। বাবুল মদের গ্লাসটা শেষ করে সিটের ধারে জানালার ধারির উপর রেখে দিলে। বললে—নেশা হয়েছে আজ আপনার মাস্টারমশাই।

—নেশা! কই ব্রাদার, কিছু তো বুঝতে পারছি না। তোমাকে তো সেই বাবুল বোসই দেখছি। বাব্‌লি বলে তো ভ্রম হচ্ছে না।

—কি বললেন এতক্ষণ? প্রথম ছত্রটা কিসের তা জানি না। বিল্বমঙ্গলের নয়। কিন্তু শেষ ছত্রটা বিল্বমঙ্গলের। কিন্তু চিন্তামণি তুমি অতি সুন্দর। দূর দূর, আমার আবার সিরিয়াস অ্যাক্‌টিং আসেই না। সব কমিক হয়ে যায়।

মদের গ্লাসে ছোট্ট চুমুক দিয়ে নিয়ে রীতুবাবু উত্তর দিলে—অ। এই।

—এটা এই হল স্যার?

— তা ছাড়া কি? আমি কোটেশনের পরীক্ষা দিচ্ছি নে ভাই। আমি নিজের মনের কথা বলছি। যাত্রার পালাটা হল—বল না তোমার মনটা কি বলছে?

—আমার?

—হ্যাঁ, ঠিক বলবে।

—নিশ্চয় বলব। আমার মন বলছে—সেলাম। সেলাম। সেলাম।

—মানে হাজার সেলাম। এবং সেটা ওই অঘটনপটীয়সীকে।

—Yes।

—এবং সে অতি সুন্দর।

হঠাৎ উঠে সোজা হয়ে বসল রীতুবাবু এবং খুব সহজ কথা বলার সুরে বলে উঠল—দেখ, ওকে যে এমন মোহিনী দেখাতে পারে এ ধারণাই আমার ছিল না। নাটু, তুমি তো ভাই গোড়া থেকে রয়েছ। বল তো তুমি—যখন দল হয় তখন ওর বয়স বাইশ তেইশ। কখনও এমন দেখেছ?

গোপালীর প্রিয়জন নাটু, আজকে অর্জুন করেছে—ভালই করেছে। স্বল্প-ভাষী মানুষ, বিছানায় বসে স্যুটকেস খুলে সিগারেটের বাক্স গুছিয়ে গুনে রাখছিল অভ্যাসমত। রীতুবাবু বললে—আমাকে চার বাক্স দাও নাটু।

নাটু চার বাক্স সিগারেট তাকে দিয়ে বললে—এই দশ বাক্স হল মাস্টারমশাই।

—ঠিক আছে।

নাটুর আজও এক বাক্স সিগারেট কম পড়েছে। বার বার তিনবার গুনে মনে মনে হিসেব মিলিয়ে দেখছে এটা তার ভুল, না সত্যি।

রীতুবাবু বললে—নাটু, কই উত্তর দিলে না কথার?

আবার একবার গুনতে গুনতে নাটু ঘাড় নেড়ে বললে—না মাস্টারমশাই, তা দেখি নি। ওকে যে এমন দেখাতে পারে তা স্বপ্নেও মনে হয় নি। মেক-আপটাও করেছিল আশ্চর্য। মাথার চুল সামনে চূড়ো করে বেঁধে দুই কানের পাশ দিয়ে দু'গোছা চুল ফেলে কপালে অলকাবিন্দু পরে গালে তিল এঁকে যখন নীল চাদর জড়িয়ে বেরুল তখন চিনতেই পারি নি। দাঁড়িয়ে আছি অডিয়েন্সের মধ্যে মিশে—আমার পাশে বিপনে। লম্বা তো! চূড়ো বাঁধায় আরও লম্বা লাগছে। তাতে বুঝলেন না—বুকটা ছলাৎ করে উঠল। বিপনেকে ঠ্যালা দিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলাম—কে? প্রোপ্রাইট্রেস? বিপনে বললে—হ্যাঁ। বাবা—গিয়ে প্রবীরের পথ আগলে বেঁকে গালে হাত দিয়ে দাঁড়াল। চোখ দুটো নাচতে লাগল। অলকারই ভঙ্গি। কিন্তু অলকা বেঁটে—ও ফিগার কোথায় পাবে। তারপর—তাক্, তাকের পর তাক্। গানের গলাও অলকার চেয়ে ভাল। আর অলকা যা যা করেছিল সব করলে। শুধু বুকে বাঁধা কাপড়খানা খুললে না। সে ভাল করেছে। কিন্তু মেতে গেল সব। জানেন, আমি আজ অন্তত তিন ডোজ বেশী খেয়ে ফেলেছি।

নাটু চুপ করে গেল। আবার তার মন গিয়ে পড়েছে সিগারেটের প্যাকেটের হিসেবে। নাটু কৃপণ, নাটু ঘোর-সংসারী, গোপালীর কাছ থেকেও পয়সা বের করে সে বাড়িঘরের শ্রীবৃদ্ধি করে। বাড়ি গিয়ে চিঠি লেখে—কিছু টাকা পাঠাইয়া দাও। গোপালীও এমন মুগ্ধা

যে সে তাই দেয়। নাটু মদ খায় কিন্তু সিগারেট খায় না। নাটু গোপালীর বাড়িতে থাকে খায়—তার কাছ থেকে টাকা নেয়—কিন্তু আর কোন স্ত্রীলোকের দিকে তাকায় না। গোপালীর সে দোষ আছে। নাটুকে সে ছাড়তে পারে না কিন্তু গোপনে এক-দু দিনের জন্যে দু-এক দণ্ডের জন্যে লুকিয়ে অন্যের সঙ্গে হেসেখুসে প্রেম করে আনন্দ পায়। তাতে নাটুর আপত্তি নেই কিন্তু তার সিগারেট চুরি করে পরের মনস্তুষ্টিতে তার আপত্তি আছে।

রীতুবাবু বললে—রাইট। তাই আপনি বেরিয়ে গেল মুখ থেকে—অঘটনপটীয়সী নারী, কিছু নাহি অসাধ্য তোমার। ব্ল্যাঙ্ক ভার্স বলে বলে এমন হয়েছে হে বাবুলমাস্টার যে ভাব একটু ঘন হলে আপনি বেরিয়ে যায়।

মণি ঘোষ আজকে ছিল শ্রীকৃষ্ণ—সে বললে—কিন্তু মাস্টারমশায়, আজ জনা প্রবীর দুজনেই কালকের মত নয়। কালকের সে প্রবীর, প্রবীর রে ডাক—সে একেবারে যেন বুক দু' ফাঁক করে বেরিয়েছিল। প্রবীর তো যেন 'ডাল্' মেরে গেল!

—ওই মোহিনীমায়ার সিনটায়। বাবুল উঠে বসল তড়াক্ করে। বললে—একেবারে হোয়াইট মেরে গেল গোরাবাবু। মাই খোদা—যেন কাঁচপোকায় একটা আরসোলা ধরে নিয়ে গেল। তবে এফেক্টটা ভাল হয়েছিল। লোকে সিটিফিটি দিলে না, খানিকটা আঁচ করে নিলে—এ কে—প্রবীরকে নিয়ে যাচ্ছে। এরপর হবেটা কি। তবে হ্যাঁ, জনার পার্ট আজ কালকের মত নিশ্চয় নয়। বেশ তফাত হয়ে গেছে। কি স্যার, আপনার কি মত?

—ঠিকই বলেছ। কালকের মত নয়। নিশ্চয় নয়। কাল ছিল জনার পার্টে ক্ষোভ, ক্রোধ, প্রতিহিংসা। আজ একেবারে করুণ রস। একটু অবিচার হচ্ছে তোমাদের। সাধে লোকে এত কেঁদেছে। তবে কালকের মত নিশ্চয়ই নয়। তা হবার কথাও নয়। মানে এ হল এক একটা ধ্যান। পার্টে নামলে ধ্যান আসে। কিন্তু

ধ্যানেরও তো রকম আছে। ধর তুমি বউয়ের চিঠি চিঠি করছ। পিওন এল, কিন্তু বউয়ের চিঠি না—দিলে মনিঅর্ডার একটা। টাকাটা পেয়ে ভুললে বউকে। চল সিনেমার টিকিট কেটে আনি। আবার বাড়ি গেছ—সোমবার ভোরের ট্রেনে ফিরবে—টাকাপয়সা পাবার কাজ আছে—জপছ, ভোরবেলা বউ এমন ধরলে—আজ থেকে যাও। কাল যাবে। ব্যস গেলে ভুলে। হল না। যদি বা এলে চোখের জল দেখে এলে—মেজাজ খিঁচড়ে রইল যাতে বাণিজ্য হলই না। তুমিই মাটি করলে কড়া কথা বলে। মানে ধ্যানটা এল না বাণিজ্যের। এও তাই। এ সব পারে—এখন অ্যাক্‌ট্রেস তেমন দেখি নে—পারত তারাসুন্দরী। অ্যাক্‌টর দানীবাবুকে দেখেছি; শিশিরবাবু আছেন। তিনটে তিনরকমের পার্ট সমান করে যাবে। ওরা হল ধ্যানসিদ্ধ। কিন্তু এও যা করেছে—অদ্ভুত। মোহিনীমায়ার ছলাকলায় ওই সব করে আবার জনার শোকের মুড়ে যাওয়া চারডিখানি কথা নয়।

—বিগ ব্রাদার—আপনাকেও সেলাম। ওয়াণ্ডারফুল বলেছেন মাইরি। বউয়ের চোখের জল দেখে বাণিজ্য মৃত্তিকাস্যাৎ—তাই বা কেন কাদাস্যাৎ—বউয়ের চোখের জলে মৃত্তিকা কাদা!

—ভাল বলেছ। নাও এক ডোজ।

—আপনাকে কিন্তু আজ থেকে বিগ ব্রাদার বলব দাদা। মাস্টারমশাই স্যার এসবগুলো খারাপ লাগে আমার। মানে ইস্কুলে চিরকাল মাস্টারমশাইকে আড়ালে গাল দিয়েছি।

নাটুবাবু হঠাৎ উঠে দাঁড়াল—বলে উঠল—বাজে যে একটা। এরা সব করছে কি?

—এ—ক—টা! তা হলে নিশ্চয় দেরি হয়েছে। দেখ দেখ ভাই, তুমি এদিকে করিৎকর্মা আছ। মেয়েগুলো সব ঘুমোল না কি? আরে কাউকে ডাকলে না! কারুর রান্না হয় নি? শোভাকেও একটু বলো ভাই। সে বোধ হয় রাগ করে আছে।

নাটুবাবু ঘর থেকে বের হল। তখন সারা বারান্দাটায় আট দশটা দল বসে গেছে। স্টোভ তখনও জ্বলছে। বিভিন্ন দল—যাত্রাদলের নাম 'ফিলিট'—রাত্রের রান্না করে দিচ্ছে। ছুটো দল খেতে বসেছে। আপিংখোর ভূদেব বেয়ালা বাজায়—সে সিঁড়ির ধারে উবু হয়ে বসে জিলিপি খাচ্ছে। রাত্রে ও মিষ্টি খায়। যোগামাস্টারের খাওয়া হয়ে গেছে—সেও মিষ্টিটিষ্টি খায় রাত্রে; সে গাঁজা সাজছে। এইটে টেনেই সে শোবে। এখনও সে সুর ভাঁজছে—আজকের গানের সুর চৌতালে—

কে তুমি কালো আলোর ওপারে আলোয় কালোয়
খেলিছ খেলা।

দিবস মুছিয়া রাত্রি আনো নিকষ কালো
হা-হা-হা-হা—কালোরে মুছিয়া আলোক মেলা!

বেশ গেয়েছে যোগামাস্টার আজ। সত্যি সত্যি গানটা ভারী জমেছিল আর আসরখানার মধ্যে একটা অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু পরিণামের ইঙ্গিত দিয়ে একটা পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল। গলা ওর ভাল—বড় তালের পাকা গাইয়েও বটে। তবে একালে ও রেওয়াজ কমেছে বলেই ওকে বড় একটা ভাল সুযোগ দেয় না। নাটু বললে—কি, এখনও ভাঁজছেন যে!

ঘাড় তুলে নাটুকে দেখে যোগাবাবু হেসে বললে—কি রকম? আপনাদের দেবু পারত?

—না। আপনার মত পারত না। কিছুতেই না।

তিনটি আঙুল তুলে ধরলে যোগাবাবু, এবং একটুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল মুখের দিকে; তারপর বললে—তিন জন্ম—বুঝলেন? তিন জন্ম লাগবে ওর।

চলে যাচ্ছিল নাটু, যোগাবাবু ডাকলে—শুনুন। আর এট্টু কৌতুক হয়েছে—ধরতে পেরেছেন? পারেন নি। পারবেন কি—কেউ পারে নি। তুজন—তুজন বুঝেছি। যে মেরেছে আর যে মার

খেয়েছে। আমি আর গুঁয়ে—আপনাদের বাজিয়ে হরিপদ গুঁই। এই জেরা খানেক এট্টু বুয়েছেন না আগে তেহাই দিয়ে ফেললে। আমি ভুরু নাচিয়ে তেহাই মেরে একটি তুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

নাটুবাবু পা বাড়ালে যাবার জন্য, যোগাবাবু হঠাৎ বললে—আজ সব অদ্ভূত অদ্ভূত কাণ্ড।

—হ্যাঁ। বলে এগুলো নাটুবাবু—অদ্ভূতই বটে।

যোগাবাবু বললে—খেতে যাচ্ছেন? গোপালী সেরে ফেলেছে এর মধ্যে। বাহাদুর মেয়ে। তা একটা কথা শুনে যান মশাই। আজ প্রোপ্রাইট্রেস যে খেল্ দেখালেন এ আমি দেখি নি মশাই। তবে আমার ভাল লাগে নি। মানে এ ওঁর সাজে না। উনি এ পার্ট করবেন কি? গোপালী অমনি করে নাচত—

—মানে—

—মানে ও স্বভাব তো ওর নয়। যাদের এমন স্বভাব—

—গোপালীর এই স্বভাব প্রমাণ দিতে পারেন?

—আরে আপনি চটছেন কেন? গোপালী যা তা সবাই জানে। সে তো আপনার সাতপাকের পরিবার নয়:

—যোগাবাবু!

ফেটে পড়ল নাটুবাবু।

সমান জোরে চীৎকার করে উঠল যোগাবাবু—কে—ন?

—সা—ট আ—প।

নাটুবাবুর সে চীৎকার প্রায় অমানুষিক। অকস্মাৎ সব ভারসাম্য হারিয়ে গেছে তার।

সে চীৎকারে গোটা দলটাই চমকে উঠল। যে যা করছিল সব থেমে গেল। সর্বাগ্রে বেরিয়ে এল গোপালী, বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেও চীৎকার করে উঠল—কি হল?

গাইয়ে দিবাকর বললে—যোগাবাবুর সঙ্গে—

—যোগাবাবুর সঙ্গেই মরণ। যোগাবাবুর সঙ্গে ঝগড়া।

তারপরই গোপালী হাসতে শুরু করলে।—ঝগড়া করবার লোক পেলে না। যোগাবাবুর সঙ্গেই? খিল খিল করে হাসতে লাগল সে।

—নাটু?

ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এল রীতুবাবু পর্যন্ত। নাটু চীৎকার করছে। এমন ক্রোধে যা ছ বছরের মধ্যে কোনদিন শোনে নি এক যাত্রার আসরে অ্যাক্‌টিং ছাড়া।

সে চীৎকারে যোগাবাবুও হতভম্ব হয়ে গেছে। এ কথায় নাটুবাবু এমন রাগ কেন করবে সে বুঝতে পারে নি। সে হতভম্বই হয় নি, ভয়ও পেয়েছিল নাটুবাবুর মূর্তি দেখে। সে বললে—অন্যায় যদি বলে থাকি মাফ করবেন মশাই।

নাটু কোন কথা না বলে হনহন করে এগিয়ে গেল গোপালীর দিকে।

—গোপালবাবু! কি হল? গোপালবাবু!

ব্যারাকের সামনের খালি জায়গাটার ওদিকে সেই ছোট ঘরখানার বারান্দায় দাঁড়িয়ে গোরাবাবু ডাকছিল।

* * *

গোরাবাবুও চমকে উঠেছিল নাটুর চীৎকারে। ঘরের বারান্দাতেই সে শুয়েছিল। ঘরের মধ্যে মঞ্জরী নিজে হাতেই স্টোভে তরকারি তৈরি করছিল। অলকা উপুড় হয়ে চুপ করে শুয়ে আছে। গোরাবাবুর তক্তাপোশের পাশে একটা টেবিলের উপর ছিল একটা প্লেটে ডিম, একটা গ্লাসে মদ। মদ আজ বেশী খায় নি গোরাবাবু, শুয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে সিগারেট টানছিল। কিসে, কিভাবে কি হয়েছে তা সে বুঝতে পারে নি, শুধু বুঝতে পারছে—একটা আঘাত তাকে যেন সর্বাঙ্গে নাড়া দিয়ে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। মঞ্জরী। মঞ্জরীর কোন দোষ সে খুঁজে পাচ্ছে না—কোন প্রমাণ নেই—তবু মঞ্জরীই এর কারণ। কিন্তু সে স্তম্ভিত হয়ে গেছে আজ মঞ্জরীর মোহিনীমায়ার অভিনয়ে। এমন অপূর্ব অভিনয় এই ভূমিকায় মঞ্জরী করতে পারে

সে তা কোনদিন কল্পনা করতে পারে নি। অভিনয় সে বোঝে—সে বোঝে—সে জানে। সে পারে। মঞ্জরীর সেই চপলা রূপ, সেই চঞ্চল চাহনি, সেই মদির দেহভঙ্গি দেখে আসরেই সে স্তম্ভিতই শুধু হয় নি—সে ভেবে পায় নি প্রতি অভিনয়ে কোথায় তাকে কি করতে হবে—সে কি করবে। আবার একটা প্রবল বিরূপতাও তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। অভিনয়ের মধ্যে কয়েকবার মদ খেয়ে নিজেকে উত্তপ্ত করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু হয় নি। তারপর আর খায় নি মদ।

মঞ্জরীর এবং তার সাজঘর যথানিয়মে একটা ঘেরের মধ্যেই হয়েছিল। কলিয়ারীতে টেবিল চেয়ার পেয়েছিল। আসর থেকে সে অলকার মতই প্রবীরের চাদরখানা টেনে গায়ে জড়িয়ে দুজনে জড়াজড়ি করে বেরিয়ে এসেছিল। আত্মসাৎ করে মায়া প্রবীরকে নিয়ে গেল—এই ছিল ভাবটা। পথে কেউ কাউকে একটি কথাও বলে নি। সাজঘরে এসে দুজনেরই ছিল মেক-আপ বদল। মঞ্জরীর ছিল বেশী। গোরাবাবুর কম। মঞ্জরী মোহিনীমায়ার রূপসজ্জা বদলে আবার জনা সাজবে। চুল খুলে এলো করে পিঠে ফেলতে হবে। তাতে 'ঝরি' লাগাতে হবে। মঞ্জরীর চুল আছে—কম নেই, কিন্তু কোঁকড়ানো বলে খাটো, তাতে ঝরি লাগিয়ে পিঠ ভরিয়ে নিতে হয়। কাটা কাটা চুলের লম্বাগাছি ক্লিপ এঁটে পিঠের উপর ঝরি পড়ে থাকে। ধরার উপায় থাকে না যে এ চুল লাগানো চুল। মঞ্জরীর নিজের ঝরি আলাদা আছে। সে সব লাগাতে হবে। মোহিনীমায়ায় কপালের অলকাতিলকা, গালের তিল নিতে হয়েছিল, সে সব মুছে আবার এক পোঁছ পেণ্ট তুলি চালিয়ে চোখ ভুরু ঠোঁট ঠিক করে নিতে হয়েছিল। পোশাক পালটাতে হয়েছিল। অলকার মতই কাপড় খাটো করে পরেছিল। অলকার পোশাকই ব্যবহার করেছিল। অলকা মাথায় খাটো, সে লম্বা পোশাক খনিকটা খাটো হয়েছিল। কিন্তু তাতে যেন আকর্ষণীয়া হয়ে উঠেছিল সে বেশী।

কালিদাস সে পড়ে নি। তবে 'চিরকুমার সভা'র অভিনয় দেখেছে থিয়েটারে—তারপর বইও সে পড়েছে। 'চিরকুমার সভা'র রসিক ঠাকুর্দার একটি উক্তি তার হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল খাটো আঁটো পোশাকে মঞ্জরীর রূপ দেখে। শকুন্তলার সঙ্গে রাজা দুষ্মন্তের প্রথম সাক্ষাতের সময় শকুন্তলার পরনে ছিল একখানি মাত্র খাটো বল্কল—এবং সেখানি নাকি কিছু আঁটো হয়েছিল। তাতেই সে হয়েছিল পরম মনোহারিণী। প্রভেদ—শকুন্তলা হয়েছিল সংকুচিতা লজ্জিতা, আর তার যৌবন ও রূপকে নিয়ে আশ্চর্য স্বাচ্ছন্দ্যে অসংকুচিতা মঞ্জরী তার সামনে দাঁড়িয়েছিল। এ পারলে কি করে মঞ্জরী!

সাজঘরে এসে চেয়ারে বসেই মঞ্জরী বলেছিল—কেমন হল বল তো? কিন্তু তার উত্তরের অপেক্ষা করে নি। ডেকেছিল—শোভাদি! ও শোভাদি!

শোভা আসতেই বলেছিল—চুলটা এলো করে ঝরিগুলো আটকে দাও। একটু বাইরে যাও না গো; পোশাকটা পালটাবো।

বেরিয়ে এসেছিল গোরাবাবু। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পোশাক পালটে লাল বেনারসী, সেই পিসেরই লাল বডিস—মাথায় মুকুট, গলায় কয়েক ছড়া মুক্তার হার—বাহুবন্ধে মণিবন্ধে মুক্তার গহনা—পিঠে 'ঝড়ি'র রাশীকৃত চুল এলিয়ে মন্থরপদক্ষেপে বাইরে এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছিল সাজঘরের সামনের বারান্দায়। গোরাবাবু সিগারেট টানছিল—তার মুখ চোখের সেই বিস্মিত ভাব তখনও যায় নি। মঞ্জরী তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল। চমকে উঠেছিল গোরাবাবু—কে?

—আমি। মৃদু ধীর কণ্ঠে বলেছিল মঞ্জরী।

—ও। আবার প্রণাম?

—করলাম। হাসল মঞ্জরী। ভাবছি—জনা এর পর পারব তো?

—হুঁ।

—যাই। যোগাবাবুর গান শেষ হল।

কথা বলে নি গোরাবাবু। সে শুধুই ভাবছিল। একটা গভীর চিন্তাকুল নৈরাশ্যে সে যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। সে আচ্ছন্নতা কিছুতেই কাটছে না। তারপর কথার মধ্যে কথা হয়েছে মাত্র কয়েকটি। একবার যেন অকস্মাৎ—অনেকটা যেন পীড়াদায়ক নীরবতা ভঙ্গ করবার জন্যই মঞ্জরী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিল—কি হল তোমার বল তো ?

এবারও চমকে উঠেছিল গোরাবাবু। চমকে ওঠাটা সামলে নিয়ে বলেছিল—কি হবে ?

—আজ এত কম খেয়েছ কেন ? শরীর—

—না, সে সব কিছু নয়। ভাল লাগছে না খেতে। বোধ হয় কাল বেশী খাওয়ার জন্যে। এখন প্লে ওতরাক। যা করলে তুমি !

—কি করলাম ? ও—ওই মোহিনীমায়া। তা না করলে উপায় কি ছিল বল ? অলকাকে ওই শরীরে নামালে বিপদ হত।

—এটা শেষ দিন দিলেই হত।

—ওরা শুনলে না, জেদ করলে। আমার কেমন রাগ হয়ে গেল।

—হুঁ। কিন্তু এত সব ভাবলে কখন ?

—সারা দুপুর। পাশে ছোট একটা চোরকুঠরী আছে। সেখানে আয়না নিয়ে চুল বেঁধে মেক-আপ ঠিক করেছি। তারপর ভেবেছি।

—হ্যাঁ। অদ্ভুত করলে তুমি। না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না।

তারপর হঠাৎ উঠে গিয়েছিল সে। কথাবার্তা যেন হারিয়ে গেছে তার। মঞ্জরীর অপরাধ নেই ; তবু—তবু যেন তার ভাল লাগছে না। একটা রাগ হচ্ছে। প্লের শেষ পর্যন্ত এমনি ভাবেই কেটেছে দুজনের। মঞ্জরীও এরপর কেমন নীরব হয়ে ছিল। তার চোখে ফুটে উঠেছিল কেমন উদ্ধত দৃষ্টি।

প্লের শেষে নিজেদের বাসায় এসে মঞ্জরী ঘরে ঢুকেছে—সে বাইরে শুয়ে আছে। ঘরের কয়েকটা কথা কানে এসেছে। অলকার

সঙ্গে মঞ্জরীর কথা। অলকা শুয়ে জেগেই ছিল। হঠাৎ মঞ্জরী বলেছিল—শিউনন্দন বলছিল তুমি কাঁদছিলে ?

—হ্যাঁ। বুকের ভিতরটা কেমন যেন করছিল। আর নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবছিলাম। কূলকিনারা যেখানে নেই সেখানে কান্না বোধ হয় আপনি আসে।

—বাইরে গিছলে কেন ? কোথায় গিছলে ?

—আপনার সিনটা দেখতে।

—ও !

—বেশ লাগল।

—শরীর ভাল হোক—অন্য জায়গায় আবার তুমি করবে।

—না। ওটা আপনিই করবেন। ও আমি আর করব না।

মঞ্জরী কথা বলে নি। এরপর স্টোভটার শব্দ শুরু হয়েছিল। রান্না চড়েছিল। শিউনন্দন ডিম সেদ্ধ আর মদের বোতল গ্লাস রেখে গিয়েছিল। মঞ্জরী আসে নি। সেও ডাকে নি। মদ একবার খেয়ে আর খায় নি। শুয়ে ভাবছিল। কেমন একটা চিন্তাকুল নৈরাশ্যের আচ্ছন্নতা। হঠাৎ নাটুর অমানুষিক চীৎকারে 'সা—ট আপ' শুনে চকিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল! মঞ্জরীও বাইরে এসেছিল। সে উচ্চকণ্ঠে ডেকেছিল গোপালবাবুকে।

—গোপালবাবু! কি হল মশায় ?

গোপালবাবুর সাড়া মিলল না। উত্তর দিল নাটুবাবু নিজে। —কিছু না স্যার, আপনি ঘুমুন।

—নাটুবাবু ?

—হ্যাঁ। ও কিছু না। একটু রহস্য।

—বলেন কি !

—আজ্ঞে হ্যাঁ। যোগামাস্টারমশাইকে একটু গলার জোর দেখালাম। ও কিছু না।

—তবু ভাল। বাঁচালেন। আমি তো নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম।

নাটু নীরবে গিয়ে ঘরে ঢুকল। গোপালী কাউকে সিগারেট নিশ্চয় দিয়েছে। তা দিক। এর দাম সে ঠিক আদায় করে নেবে। দেনাপাওনার হিসেবের উপরেও সে যে গোপালীকে ভালবাসে সেটা গোপালীর সামনে দাঁড়িয়ে বুঝতে পেরেছে।

এবার রীতুবাবুর গলা শোনা গেল—বললে—আপনার নার্ভাস হলে চলে! কিন্তু একবারও আজ এলেন না এদিকে! কি ব্যাপার ?

—শরীরটা ভাল নেই।

—এর ওপর বাইরে শুচ্ছেন তো এই কার্তিকের মাঝামাঝি।

সে কথার উত্তর না দিয়ে গোরাবাবু বললে—গোপালবাবু কোথায় বলুন তো ? ডেকে সাড়া মিলছে না।

—জানি নে তো। দেখি নি তো তাঁকে। গোপালবাবু! গোপালবাবু! অ—গোপালবাবু! বিপিন!

অন্ধকারে একটু দূর থেকেই গোপালবাবু সাড়া দিলে—কে ? মাস্টারমশাই ? আমাকে ডাকছেন ?

—কোথায় গিছলেন মশাই ? খোদ ম্যানেজার ডাকছেন আপনাকে।

—যাই। সাজঘরে ছিলাম।

—সাজঘরে ? কেন ? এ সময়ে সাজঘরে ?

—ব্যাপার অনেক। সাজঘরে তিন চারটে ছোকরা এসে ঢুকেছিল। তারা সবাই মোহিনীমায়ার পার্ট আর জনার পার্টের জন্যে মঞ্জরী দেবীর সঙ্গে দেখা করবে—অভিনন্দন জানাবে। তাছাড়া একজন দেখবে মদনমঞ্জরীকে, একজন দেখবে ডুয়েট নাচের নর্তকীকে। এই আর কি। কিছুতেই যাবে না। আমাকে খবর পাঠিয়েছিল। আমি গিয়ে বোঝাচ্ছি। এমন সময় আর এক কাণ্ড। কালকের ওখানকার কলিয়ারীর কিছু লোক ট্রাকে করে যাত্রা শুনতে এসেছিল —ফেরার পথে একটা লোক তাদের বলে তাকে উঠিয়ে নিতে। সে

বরাকর স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরবে। যাত্রাদলের লোক, কলকাতা যাবে। তারা উঠিয়ে নিয়েছিল।

—কে হে?

—বলছি শুনুন না। তারপর পথে কথাবার্তায় তাদের সন্দেহ হয় লোকটা পালাচ্ছে। তারা ট্রাক ফিরিয়ে এনে সাজঘরে হাজির। দেখুন—আপনাদের লোক? আমাদের মনে হল পালাচ্ছে তাই ফিরিয়ে এনেছি। যদি পালিয়ে না থাকে তবে অবিশ্যি তারা নিয়ে যাবে—স্টেশনে পৌঁছে দেবে। দেখি আমাদের সাজঘরের নতুন চাকরটা। বিপিনের যেমন—ভাল করে না জেনে শুনে নিয়ে এসেছে। তা বিপিনের রাগ তো—ধরে পিঠে গমাগম কিল বসিয়েছে কি ব্যাটা বলে—মেরো না ভাই। এই নাও। বলে বের করে দিলে। এই নিন। বেশকারীরা বললে—আপনার। রাখতে দিয়েছিলেন—ওরা ফেরত দিয়েছিল, আপনি ফেলে চলে এসেছেন।

একটি নোটকেস বের করে সে ধরলে। দেখুন—সব ঠিক আছে তো।

চঞ্চল হয়ে উঠল রীতুবাবু—ব্যগ্রভাবে হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা নিয়ে খুলতে খুলতে বললে—এরকম স্মৃতিভ্রম যেখানে সেখানে আর বেশী-দিন নেই আমার। মদ তো খাচ্ছি সেই বিশ বছর বয়স থেকে। এমন ভ্রম তো হয় নি। এতে আমার—

বলতে বলতে বের করলে সে একগুচ্ছ বিবর্ণ চুল। মুখ তুলে হেসে বললে—আমার স্ত্রীর চুল। ও মরলে আমি যাত্রার দলে এসে জুটলাম। নইলে তো ভাল ছেলে ছিলাম। মিউনিসিপ্যালিটিতে কাজ করতাম, ওভারসিয়ার। চমৎকার চুল ছিল তার। এটা পটলীর আংটি। এ দুটো গ্রহের কবচ রূপোর। তা যাক—বেটা ফেলে দেয় নি এই ভাগ্যি। মারে নি তো বেশী?

হেসে গোপাল বললে—টাকা পয়সা কি ছিল দেখুন।

—আরে এতে আমি রাখি নে টাকা। ওটা আমার বেল্টের

পকেটে থাকে। কাল পকেটটা ছিঁড়ে গেল। টাকার ব্যাগ আলাদা। পকেটে যে ব্যাগ থাকে সে কখন চুরি যায় পিকপকেট হয় কে জানে। এ গেলে আমি মরে যাব। দাঁড়ান। বেটাকে তুটো টাকা দিচ্ছি। দেবেন।

—সে আপনি দেবেন। আমি দিলে নজীর খারাপ হবে।

—তাড়াবেন নাকি?

—সে পরে। রাসের পর কলকাতায় ফিরি, তখন। এখন লোক কোথায় পাব বিদেশে?

—ভাল। যান এখন, কত্তা গিন্নীর সঙ্গে দেখা করুন। ডাকছিলেন আপনাকে। কত্তার শরীর নাকি খারাপ।

—সে ছোঁড়ারা গেছে? সেই 'অবিনন্দন দেনেওয়ালা'র দল? আনলেন না কেন? বাবুল ব্রাদারকে দিতাম লেলিয়ে। ও তাদের 'অবিনন্দন' দিয়ে দিত। জিভখানি একেবারে ক্ষুর!

—কি মাস্টারমশাই, গোপালবাবুর সঙ্গে কথা হল?

—হল স্যার। যাচ্ছেন উনি।

—আমি কিন্তু সব শুনেছি।

—ভাল করেন নি স্যার। লোকের প্রাইবেট কথা! এমন গোপনে জোরে জোরে বললাম তবু শুনে ফেললেন? ছি ছি ছি!

—যাই এখন—এক ডোজ খাই গিয়ে, নইলে লজ্জা কাটবে না।

যেতে যেতে হঠাৎ আবার দাঁড়িয়ে বললে—হ্যাঁ। কাল পরশু কি কি দিচ্ছেন? কোন্‌টা বাদ দিচ্ছেন?

—বলুন আপনারাই। কাল পরামর্শ করে করা যাবে যা হয়।

কলিয়ারীর ঘড়িতে একটা বাজল। বারান্দা ঘর তখন নিষুতি।

—মাস্টারমশাই!

সকলের থেকে বয়স্কা মেয়ে শোভা এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে রীতুবাবুর।

—শোভাদি!

—মরণ আমার! দিদি কেন? দাঁড়াও, প্রণাম করি—ওতে অপরাধ হয় না? তোমার বয়স কত বেশী বল তো?

—দেখ দেখ দেখ, কি কাণ্ড!

—কাণ্ড কিসের? চল, খাবে চল। জুড়িয়ে গেল।

—আমি খাবখন তুমি যাও।

—না। ছুখানা খেয়ে ফেলে রেখে দেবে। সে হবে না। আমি তো জানি।

—চল।

শোভার সঙ্গে একসঙ্গে রাত্রের খাওয়াটা সারে রীতুবাবু। রীতুবাবু বাবুল শোভা মিলে এক 'ফ্লিট'। শোভা রান্নাটা করে—সঙ্গে যোগাড়ের জন্যে একটা ছেলেকে নিয়েছে— আরও একজন আছে, দূত প্রহরী পার্টের লোক, সে রীতুবাবুর গা টিপে দেয়।

শোভা অত্যন্ত শ্রদ্ধা খাতির করে রীতুবাবুকে। তাই বা কেন, ভক্তিও করে। আবার ঝগড়াও করে। বলে ভগ্নীপতি। মেয়েরা মুখ টিপে হাসে; পুরুষেরা হাসে—রহস্যও করে। রীতুবাবুও হাসে। অলকা চুপি চুপি শোভাকে বলে—দিদি বললে তুমি রাগ কেন? ওতেই তো সকলে জেনে গেল। চাপাচুপো গোপন থাকলে হয়তো মনে এতদিন রঙ ধরত। আপনিই দিদি বলা বন্ধ করে বলতাম—শোভে শোভে!

শোভা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে বলে—মরণ আমার!

—না না। আমার লজ্জা করে। জান?

হঠাৎ শোভা স্থির দৃষ্টিতে তাকালে রীতুবাবুর দিকে। রীতুবাবু ভুরু কুঁচকে বললে—কি হল?

শোভা বললে—দেখ রীতু, আমি বেশ্যা। তোমরা তার অধম। খাচ্ছ খাও। রঙ্গরস ছাড়া তো জীবনে কিছু নেই। করি রঙ্গরস। আর লোভও তোমার ওপর ছিল। বয়সে তোমার বউ বেঁচে থাকলে আমার থেকে বড়ই হত অন্ততঃ দশ বছরের। তুমি বুড়োই হতে

চলেছ। কিন্তু তোমরা ছেঁচড়। বুঝতে পারছ? ওদিকে দেখছি, এদিকেও দেখছি। নাও—খাচ্ছ খাও। খেয়ে নাও। আমার লজ্জা নেই। তোমার উপর লোভ আমার তবু রইল।

বলে সে উঠে চলে গেল।

রীতুবাবু চুপ করে বসে খেতেই লাগল।

কলিয়ারীর পেটা ঘড়িতে ছটো বাজল। গোপাল ম্যানেজার উঠে এসে বসল বাইরে। প্রত্যহই সে ওঠে। এটা তার একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। সেই প্রথম কাল থেকে। ত্রৈলোক্যতারিণীর দল থেকে। চেহারা তার ভাল। তারও প্রণয়িনী ছিল। ঠিক সেই জন্যে নয়। প্রণয়িনীকে ছেড়ে বিয়ে করেছিল। সে বউ যখন কিছুদিন পর তার বাপের বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হল তখন থেকে তার এই অভ্যেসটা জন্মেছে। গভীর রাত্রে দলের অধিকাংশ লোক ঘুমোয় কিন্তু কিছু অশান্তচিত্ত অতৃপ্ত মানুষ সন্তর্পণে উঠে বাইরে আসে। নিশি-পাওয়া মানুষের মত। কত পালা হয়ে যায়। মান-অভিমান, গোপন মিলনের পালা। রাত্রির অন্ধকারে মানুষগুলি যেন মানুষের ছুনিয়ার একটা যবনিকা সরিয়ে দেয়। বের হয় একটা আশ্চর্য নির্মম সত্য। মনে হয় গোটা দিনের কুলবধূ সংসারটাই রাত্রে ব্যভিচারিণীর মত মাথায় মাটির খোলায় আগুন নিয়ে তাতে ধুপ ছিটিয়ে জ্বালাতে জ্বালাতে, আলেয়ার খেলা খেলতে নেমেছে শ্মশানে। তবে দেখে দেখে সয়ে গেছে তার। তার আর হাসিও পায় না, ঘেন্নাও হয় না। অতি কদর্যপনা অতি কুৎসিতপনার মধ্যেও অকস্মাৎ কান্না পায় বিচিত্র আবিষ্কারে। মনে পড়ে গোপাল ঘোষের প্রথম আবিষ্কারের কথা। তখন সে জোয়ান। এই কুৎসিতপনার মধ্যে বসে সে তার বউয়ের উপর ঘৃণাকে জাগিয়ে রাখে—নিজের ক্ষতের যে জ্বালা তারও যেন খানিকটা উপশম হয়, সান্ত্বনা পায়। সব এই—সব এই—সব এই! ভিতরে মনটা হেসে উঠত—হি-হি-হি-হি-হি-হি—

সে এক ক্লান্তিহীন হাসি। হঠাৎ পরপর কয়েকদিন দলের ছোট বাজিয়েকে বসে থাকতে দেখেছিল, চুপ করে বসে থাকত রাত্রি জেগে। আশেপাশে যা কিছু ঘটত কোন কিছুর দিকে তাকাতো না। একদিন সে কাঁদছিল। সে তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল—কি হে ত্রিভুবন ? কি ব্যাপার বল তো ?

—আজ্ঞে বাবু—

—রোজ দেখি তুমি উঠে এসে বসে থাক। আজ কাঁদছ। কি, ব্যাপার কি ?

মনে হয়েছিল কোন কুৎসিত কারণ হবে। তুনিয়ার কুৎসিতপনা জানি না কার অভিশাপে কোন্ কারণে জড়ো হয় এমনি কতকগুলি স্থানে।

ত্রিভুবন বলেছিল—বাবু, এবার দলে বেরুবার আগে—তারপর হাইহাউ করে কেঁদে উঠেছিল সে—আমার একটাই ছেলে বাবু, বছর পাঁচেকের, জলে ডুবে মরে গেল। কি করব ? হাত তো নেই। রাত্রে, এই ভাদ্র মাসে গরমে আমি ঘরে শুতে পারি নি। বাইরে দাওয়াতে শুয়েছিলাম। ছেলেটাও কাছে শুয়েছিল। কখন মশারি ঠেলে উঠেছে ; জোছনা রাত ছিল ; উঠে নেমেছে উঠোনে। উঠোনের ধারে একটা খাল—ছোট ডোবা। বাসনটাসন মাজা হয়। সেইখানে গিয়ে পড়েছে। একহাঁটু জল—তাতেই। তা রাতে আমার শুলেই সব মনে পড়ে। কিছুতে ঘুমুতে পারি না। দিনের বেলা বেশ থাকি—মেতে থাকি দশজনার সঙ্গে। রাত্রে উঠে এসে তাকে ভাবি। কাঁদি।

কত জনকে সে দেখেছে এমন। ঠিক চিনতে পারে এসব মানুষকে। খুব কুৎসিত মানুষেরও কত এমন পালা আসে। কেউ পায়চারি করে ভ্রূক্ষেপহীন হয়ে। টাকা নেই তার। বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে—তাদের খাবার নেই। নিজের মাইনে খরচ করেছে—আগাম দাদন নিয়েছে। কি করবে ? বলতে পারছে না।

কারুর কাশির সঙ্গে রক্ত উঠেছে। বলবার উপায় নেই। রাত্রে

উঠে এক নিরালায় বসে কেশে কেশে গয়ের থুথু ফেলে দেশলাই জ্বেলে দেখে—রক্ত—কই রক্ত !

তার পায়ে ধরে কেঁদেছে—দোহাই আপনার, চাকরি গেলে মরে যাব।

এরা বিচিত্র মানুষ। আর কোন কাজ এরা পারে না। গাইতে পারে, বাজাতে পারে, নাচতে পারে, বক্তৃতা করতে পারে—আর কিছু পারে না। জমি থাকলেও চাষ করতে পারে না—মন লাগে না। খাটতে পারে না। লেখাপড়া-শেখা মানুষ—সেও লেখাপড়া অন্য কাজে লাগাতে পারে না। রীতুবাবু চাকরি করত। মণি ঘোষ পাঠশালার পণ্ডিত ছিল। হরিপদ গুঁই—তার ভাল জমি ছিল—আজও আছে। ভাগে দিয়ে চলে এসেছে যাত্রার দলে।

মণি ঘোষকেও একবার এমনই ভাবে নিশি-পাওয়া লোকের মত ঘুরতে দেখেছে। জিজ্ঞাসা করতেই ঘোষ তার হাত ধরে বলেছিল—ক'দিন বড় দুঃস্বপ্ন দেখছি গোপালবাবু—বাড়ির জন্যে মন ছটফট করছে। কিন্তু ছুটি চাওয়া তো অন্যায় হবে। সামনে বায়না। সেই আসাম পর্যন্ত।

সে তার ছুটি করে দিয়েছিল।

কার্তিক মাসে দল মফস্বল ঘোরে। কতবার কার্তিক মাসে জল ঝড় সাইক্লোন হয়েছে। গাঁয়ের আসামীরা রাত্রে দল বেঁধে মাথায় হাত দিয়ে বসেছে—পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে হা-হুতাশ করেছে।

ওটা কে ? কে ?

এখানে ওখানে আজও দুজনকে দেখেছে। আশা বংশীমাস্টার নিত্যকারের ভ্রমণকারী। আজও মিনিট কয়েকের জন্য এসেছিল। অন্যদিন প্রায় সামনে বসেই একটু পান করে, সিগারেট খায়, হাসে, কথা বলে, চলে যায়। আজ একটু দূরে একটু সরে আড়ালে বসেছিল। কত্তা গোরাবাবু আজ বাইরে শুয়ে। তারপর—

মনের চিন্তা গোপাল ঘোষের কেটে গেল। সামনের ছবিটা আড়াল করে দাঁড়াল। প্রোপ্রাইট্রেস! সামনের সেই ছোট ছবির মত ঘরখানির দরজাটি বোধ হয় খোলাই আছে। বারান্দায় গোরাবাবু শুয়ে রয়েছে। ঘরে অলকা আছে প্রোপ্রাইট্রেসের কাছে। প্রোপ্রাইট্রেস এসে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়েছেন। একটু স্মিত হাস্য গোপাল ঘোষের ঠোঁটে যেন ফুটে উঠল। কিন্তু উঠল না, মিলিয়ে গেল।

না—এ তো মাথায় ছোট প্রোপ্রাইট্রেসের চেয়ে। অলকা! অলি চৌধুরী! অসুস্থ শরীরে বাইরে এসেছে! হ্যাঁ সেই। এসে সে চুপ করে দাওয়ার উপর একটা লোহার খুঁটি ধরে দাঁড়াল। অন্ধকার রাত্রি। সাদা কাপড়ে আবছা দেখা যাচ্ছে। প্রহেলিকার মত। যাত্রাদলের বক্তৃতায় তাই বলে। কিন্তু—

গভীর রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যে ঘরের মেঝেতে একটি ছোট্ট পাথর পড়লে যেমন একটি নিটোল ছোট শব্দ হয় তেমনি একটি কথা—নিটোল শব্দে কথা—কে?

তেমনি মৃদুস্বরে অলকা বললে—আমি।

—অলকা?

—হ্যাঁ।

—বাইরে? এত রাত্রে?

উত্তর দিল না অলকা। গোরাবাবুর কথা শোনা গেল—শরীর খারাপ হয় নি তো?

আবার সব নিস্তব্ধ। একটি কথার ঢিল পড়ল আবার, গোরাবাবু বললে—কাঁদছ?

অলকা ভিতরে চলে গেল। কিছুক্ষণের পর গোরাবাবু আবার ডাকলে—অলকা?

অলকা ভিতরে। গোরাবাবু নীরব হয়ে গেল। কিন্তু গোপাল যেন স্পন্দনহীন হয়ে পড়েছে, দীর্ঘক্ষণ মোহমুগ্ধের মত বসে রইল সে

সেইখানেই। দৃষ্টি তার সেই ওইদিকেই আটকে রয়েছে, সরাতে পারছে না। কতক্ষণ তা কি করে বলবে? কে হিসাব রাখে? কিন্তু কিছুতেই চোখ সরাতে পারছে না।

ঢং ঢং ঢং শব্দে ঘড়ি বাজল। বাজুক।

ও কি! গোরাবাবু! বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে এসে সিগারেট ধরাচ্ছেন। ঘুরছেন। ঘুরছেন। আবার সিগারেট ধরালেন। প্রোপ্রাইট্রেস? ঘুমিয়েছে? গোরাবাবু ঘরের মধ্যে গেলেন। বেরিয়ে এলেন। মদের বোতল খুলছেন। খাচ্ছেন। চমকে উঠল গোপাল ঘোষ। দীর্ঘাঙ্গী প্রোপ্রাইট্রেসকে চিনতে ভুল হয় না, পা ফেলাও আলাদা। এসে সামনে দাঁড়ালেন। চমকে উঠলেন গোরাবাবু।

—দাও। আর খেতে পাবে না।

ছেড়ে দিল গোরাবাবু। প্রোপ্রাইট্রেস হাত ধরে আকর্ষণ করে বললে—শোবে চল।

—ঘুম আসছে না।

—মাথায় হাত বুলিয়ে দেব, চল।

গোরাবাবু বিনা প্রতিবাদে গিয়ে শুয়ে পড়ল। মাথার শিয়রে বসল মঞ্জরী। হাত বুলচ্ছে। আরও অনেকক্ষণ বসে রইল গোপাল ঘোষ, ব্যারাকের বারান্দার থামের সঙ্গে ঘেঁষে। কিন্তু আর একটি কথার লোষ্ট্রও নিস্তব্ধ রাত্রির বুকে পড়ল না। প্রোপ্রাইট্রেস উঠে দাঁড়াল, একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ভিতরে চলে গেল।

গোপাল ঘোষও উঠে শুতে গেল। নিতুর গায়ের কাপড়খানা খুলে গেছে, শেষ কার্তিক মাসের ঠাণ্ডা, শীত শীত করে একটু, ছেলেটা কুঁকড়ে শুয়ে আছে। তার গায়ে চাদরখানা ঢাকা দিয়ে সে শুয়ে পড়ল। আবার ভোরে উঠতে হবে। অনেক কাজ। বাজার হাট, কালকের বই। আজ প্রোপ্রাইট্রেস, গোরাবাবু দুজনেই বলেছে কার্তিকের মাইনেটা দিয়ে দিতে। ও কলিয়ারীর টাকাটা জমে রয়েছে। কাঁচা টাকা। দিয়ে দেওয়াই ভাল। অনেক কাজ।

এগারো

কাজও অনেক, সে অনেক কাজ পরের পর ঠিক ঠিক হয়েও যায় আপনি। তুনিয়ার ধর্মই তাই। সূর্য উঠলেই বা উঠবার আগে আকাশ ফরসা হতে পাখীরা ডাকতে শুরু করে। ঘুম ভাঙে। গোপাল ঘোষেরও তাই। যত রাত্রিই হোক শুতে ঘুম ভাঙে ঠিক ভোর বেলায়। ঘুম ভাঙায় নিতু। পাশে শোয়। ভোর বেলায় ঘুম থেকে উঠে বাইরে যায়; ছোট আসামী অর্থাৎ ছোট অ্যাক্টরেরা ভোরে উঠে বেরিয়ে গিয়ে মুখ হাত ধোওয়া সেরে নেয়। ওদের কাছে মুখ হাত ধোয়া, প্রাতঃকৃত্য সারার সমস্যাটা জটিল। বড়রা উঠলে তারা আর কল প্রভৃতির সুবিধে প্রয়োজনমত পায় না। ছেলেগুলো তাই আগে ওঠে। নিতুকে বলা আছে সে ডেকে দিয়ে যায়। অপর সকলের মত সে তাকে বাবুই বলে। সে ডাকে—বাবু, বাবু, ভোর হয়ে গিয়েছে।

সে চলে যায়, গোপাল এর পর আড়ামোড়া ছেড়ে উঠে মুখ হাত ধোওয়ার আগেই ঠাকুরদের ওখান একবার ঘুরে যায়—তারা না উঠে থাকলে ডেকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। তারপর বিপিনকে। বাস্, তা হলেই হল। দম পড়ে গেল ঘড়িতে। দম পড়লে ঘড়ি ঠিক চলবে। দলও চলে।

বিপিন বাজার ছোটে—যেখানে যেমন বাজার হাট। অবশ্য গ্রামে হলে হাটবাজারের কাজটা নায়কপক্ষ করে দেয়। ঠাকুরেরা চায়ের পর্ব সারে। তারপর রান্না। ওদিকে যে বই হবে তার ব্যবস্থা চলে। নতুন বই হলে তু'চারজনকে পার্ট বলানো হয়। বা একটা ঘরে বসে সকলেই বলে নেয়। পুরনো বইয়ে নতুন লোক হলে তাকে পাট বলানো, অ্যাকশন বোঝানো হয়। অন্যেরা অনেকে আর একদফা ঘুম লাগায়। তু'পাঁচজন পুরনো তাসের ঝাল বের করে বসে। রীতু-বাবু খায় তু'তিনবার—উপুড় হয়ে পড়েই থাকে—তার গা টিপে দেয়

গোলক দাস। দূতের প্রহরীর পার্ট করে, বেশ শক্তপোক্ত লোক। এর জন্যে তাকে রীতুবাবু খাবারটা দেয় রাত্রে। নাটুবাবু অনেকক্ষণ ধরে দাঁতনকাঠিতে দাঁত মাজে। তারপর গোপালীকে ডেকে নিয়ে একটু নিরালায় বসে গল্প করে। বাবুল বোস এবার নতুন—তার অভ্যাসটা গোপাল ঠিক ধরতে পারে নি আজও। কোন দিন ঘুরে দালালি করে বেড়ায়। কোন দিন বই নিয়ে বসে। বই আছে কয়েকখানা। শোভা পা ছড়িয়ে বসে—আশা চুল তোলে। বংশীমাস্টার দিনেরবেলা আশাকে খুব ডাকে না। সে আয়না সামনে রেখে চুল আঁচড়ায়। যোগানন্দ ঝপাঝপ ক[illegible] আ[illegible]খোর [illegible]র বেহালা পেড়ে ছড়িতে রজন মাখায়. তার সঙ্গে ক্ষীরোদও বসে। [illegible] চেপে — সুর বাঁধে। ফ্লুটওয়ালা নগেন ফ্লুট নিয়ে পোঁ পোঁ করে

কর্তা গিন্নীর ঘরে তখন আলাপ আলোচনা করে [illegible] গোপালের ডাক পড়ে। দল সম্বন্ধে কথা হয়।

— একে বলে দেবেন পার্ট ভাল হচ্ছে না। গা দেয় না যেন।

—কালকের রিপোর্ট কি পেলেন? কেমন বলছে?

—এর তো জ্বর। কাকে দেবেন ও পার্টে? রীতুবাবুকে একবার জিজ্ঞাসা করে নিন।

—এখান থেকে তো পরশু রওনা, মাঝখানে তিন দিন খালি—তারপর জগদ্ধাত্রী পূজোয় বাঁকড়ো। বংশীকে পাঠান একবার রানীগঞ্জে, ওখান হয়েই তো যেতে হবে বাঁকড়ো—বায়না যদি পাওয়া যায় দু'দিন।

বংশীমাস্টার বায়না যোগাড়ে সিদ্ধহস্ত। সে যোগাড় করবেই। কিন্তু তার বায়না সইতে হয়। বংশীমাস্টার ওই আশার বাঁধনেই আছে বাঁধা, নইলে ফকীর। ফকীর না হোক বাউণ্ডুলে। তার থাকবার মধ্যে আছে ছোট স্যুটকেসে একটা পাঞ্জাবি, একটা গেঞ্জি, একখানা লুঙি, একখানা সুতী গায়ের চাদর। বাকী সবই আজ আসে, কাল বা পরশু বা পাঁচদিন পর চলে যায়। মদের পয়সার জন্যে

বিক্রী করে দেয়। বায়নার জন্যে যেতে হলেই তাকে পাঞ্জাবি, ধুতি, আলোয়ান—এমন কি ছড়ি পর্যন্ত দিতে হবে। বায়না যোগাড় করে ফিরবে কিন্তু সেই সনাতন পোশাকে—ময়লা গেঞ্জির উপর নিজের পুরনো পাঞ্জাবিটা আর লুঙি। আর একটা জিনিস সে ফেলে না—সেটা তার সেলুলয়েড ফ্রেমের ব্যাঙের চোখের মত চশমা। বংশী-মাস্টারকে পরশু পাঠাতে হবে রানীগঞ্জ। নইলে দল বসে যাবে দু'দিন।

গোপাল ঘোষ আজ সকাল থেকে মাইনের হিসেব নিয়ে ব্যস্ত ছিল। বসে খাতা খুলে কার কত অ্যাডভান্স নেওয়া আছে, দাদন কত দেখে পাওনা ঠিক করছিল একখানা কাগজে। চশমাটা ঢিলে হয়ে গিয়েছে—নাকের উপর থেকে পিছলে পিছলে পড়ে। বাঁ হাত দিয়ে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছিল—মধ্যে মধ্যে ছোট নোটবুকখানা খুলছিল—সেদিন যেন স্টেশনে ক'টা টাকা নিয়েছিল মণি ঘোষ।

রীতুবাবু এসে দাড়াল—কি ? আজ আপনার হল কি গোপালবাবু ? আজ বই— ? ওসব করছেন কি ? ও ! হিসেব ? তা মাস তো এখনও ফুরোয় নি !

—কাল রাত্রে বলে দিয়েছেন লায়েকডির টাকাটায় মাইনে মিটিয়ে ফেলুন।

—বেশ। আমার তো সব নেওয়া হয়ে গেছে। অ্যাডভান্স দেবেন। ব্যাগ ফাঁক। ধার হয়ে গেছে নাটুর কাছে। ও তো মাইনে পেলেই বাড়ি পাঠাবে, চাইবে টাকা। দেবেন পঞ্চাশটা টাকা ?

—নেবেন !

—নাঃ, সে দিক দিয়ে কসুর নেই, বুঝেছেন। কিন্তু বই কি হবে ?

—কত্তা তো উঠে বসেছেন, প্রোপ্রাইট্রেসেরও বোধ হয় স্নানটান হয়ে গেছে। এইবার জানা যাবে। কাল রাত্রে বলেছিলেন রীতুবাবুকে জিজ্ঞাসা করো।

—সকালে যান নি ?

—না। হিসেবটা করে নিয়ে যাব। আর সকালে ডাক না দিলে যাই নে নিজে থেকে। ওটা শিখিয়েছিলেন আমাকে কত্তা শশী অধিকারী মশায়। বলেছিলেন—গোপাল, কক্ষনো সকালে কাজকর্মের হিসেব বা এটা চাই ওটা চাই ফর্দ নিয়ে এসো না। জান—নিজের মন বুঝে বলছি—এক রাত্রি জাগার ব্যবসা—শরীরের জুত বেজুত আছে, তার উপর সকালে উঠে রাত্রের প্লে নিয়ে নানান কথা ফেরে মনে। প্লে ভাল হয়েছে—তবু মন এমনি—যত খুঁত তাই মনে পড়বে। কি জানি চামড়ার মুখ—কখন কি কড়া কথা বের হয় কে জানে। সকালে কেন যেচে এসে সেটা শুনবে। ডাকলে এসো। তখন শুনতে হলে কি করবে। ভালও বলবে না, মন্দও বলবে না। চুপ করে এসে দাঁড়াবে। আমি যাই নি। ডাকেন নি এখনও। বোধ হয়—

—কি ? মন মেজাজ ভাল নেই কত্তার ?

—তুজনেরই।

—কি ব্যাপার ? বিরহ ?

—হতে পারে।

—অলিকে আজ ঘর থেকে সরিয়ে দিন। কপোত-কপোতীর মত থাকে ওরা বাপু। মন-খারাপেরই কথা।

—দেব। সে বলতে হবে না। শিউনন্দন আসছে। ডাক পড়েছে।

রীতুবাবু ফিরে দেখলে সত্যিই শিউনন্দন ওদিক থেকে এদিকেই আসছে। গোরাবাবু চুপ করে বসে সিগারেট টানছে।

শিউনন্দন এসে রীতুবাবুকে বললে—পরনাম বাবু।

রীতুবাবু হাত তুলে বললে—জিতা রহো বাবা! তোর তরিবতটি বড় ভাল। কি খবর ? গোপালবাবুকে তলব ?

—আপনাকে ভি সেলাম দিলেন।

—আসুন গোপালবাবু।

—চলুন আপনি মাস্টারমশাই, কাগজগুলো তুলে নিই। শিউনন্দন ধর্ তো বাবা। এই খুচরো কাগজগুলো নে তো। দাঁড়া। আর একখানা খাতা আনি বাক্স থেকে।

রীতুবাবু এগিয়ে গেল। গোপাল ঘোষ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়িতে পা দিয়ে মৃদুস্বরে শিউনন্দনকে বললে—কাল তুই কোথা শুয়েছিলি রে? রাত্রের ব্যাপার কিছু জানিস?

—জানি না। তবে কিছু হইয়েছে। হামি উদিকের বারাণ্ডায় শুলাম। ইদিকে শুলাম তো কত্তার হুকুম হলো তু উধারে যা। বহুত নাক ডাকে তোর। হামার নিদ হোবে না। উনার ভি ডাকে হামি জানি। ভাল হোল—হামার ভি তো নিদ টুটে যাবে। খুব ঘুমাইয়েছি। পুবের বারাণ্ডায় ঠাণ্ডা ছিল, হাওয়া ছিল।

—হুঁ। চল্।

শিউনন্দন বললে—কিছু হইল নাকি? আসরকে হুঁয়াসেই তো গড়বড় লটঘট লাগল। বাপরে বাপ—মঞ্জরীকেই পার্ট তাজ্জব লাগাইলো ঘোষবাবু। নাচ উ শিখেছিল—ভাল নাচ। লেকেন সে তো কতোদিন হইল গো! দশ বরিষ! সাদী হইয়ে গেলো দশ বরিষ। উসকা পহেলে তব তো বেশী হোবে। উসকে বাদ উ ঘুঙুর ছোঁয় নি। সে কাল—আরে বাপ!

—চুপ কর্—থাক ওসব কথা।

—ওহি ছোকরীকে ঘোষবাবু—

—দোব, আজই ও ঘরে দোব।

—নেহি বাবা, দলসে হঠাও।

—বছরের কন্‌ট্রাক্ট রে। চুপ কর্।

ওরা বারান্দায় উঠতেই রীতুবাবু বললে—গোপালবাবু, কত্তা বলছেন শরীর খারাপ। বলছেন বিশ্রাম হলে ভাল হয়। কিন্তু ওঁকে বাদ দিয়ে প্লে হয়! নায়কপক্ষ মার মার করবে!

গোরাবাবু হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বললে—চা করে আন্ শিউনন্দন। মাস্টারমশাইকে চা খাওয়া। আর তোর খোকীকে ডাক্। দেখ্ প্রণাম ট্রনাম হল কি না।

গোপাল মৃদুস্বরেই জিজ্ঞাসা করলে—জ্বরটর হয় নি তো? কলিয়ারীর ডাক্তারকে ডাকব নাকি?

—নাঃ। জ্বর না—ডাক্তারও ডাকতে হবে না। শরীরটা কেমন যেন—ব্যথা। জোর পাচ্ছি নে।

রীতুবাবু বলে উঠল—তার কারণ আছে। কাল ডোজ একেবারে কম করে দিয়েছিলেন। পরিশ্রম হয়েছে বেশী। কাল প্লের শেষের দিকে যেন বেশ স্ট্রেন হচ্ছিল আপনার। আমরা অবিশ্যি হাসাহাসি করছিলাম মোহিনীমায়া মোহে আচ্ছন্ন হয়ে গেছেন। তা না—স্ট্রেন তা হলে সেটা।

একটু হাসলে গোরাবাবু। তাও ক্লান্ত হাসি। শিউনন্দন চা নিয়ে বেরিয়ে এল—তার পিছন পিছন মঞ্জরী। তার স্নান হয়ে গেছে, প্রণামও হয়ে গেছে। লালপেড়ে গরদের শাড়ি পরেছে, আধভিজে কোঁকড়া খাটো চুলগুলি কানের পাশ দিয়ে সামনে ঝুলানো। মাথায় আধঘোমটা, গলায় আঁচলটি টানা—চাবির ভারে গলাটি বেড়ে রয়েছে। শিউনন্দন চায়ের কাপ তুলে দিল হাতে হাতে। সে সরে যেতেই মঞ্জরী এগিয়ে এল—বললে—ডাক্তারকে একবার ডাকুন গোপাল মামা।

—না না। ডাক্তার দরকার হবে না।

—হবে।

—কি বিপদ!

—বিপদ না। ডাক্তারকে তো ডাকতে হবেই। অলকাকে দেখাতে হবে একবার। রোজ তো ওর পার্ট আমার দ্বারা হবে না। কাল ঘুমোয় নি। প্লে দেখতে গিয়েছিল। আমার মোহিনীমায়ার সময়। ফিরে এলাম—তখন ও জেগে। তারপর ও

উঠেছে—শুয়েছে। একবার কি দুবার বাইরে এসেছে। কেঁদেছে। আমি আর জিজ্ঞেস করি নি রাত্রে কি কষ্ট হচ্ছে। ডাক্তারকে একবার ডাকতে হবেই। আসবে যখন তখন ওঁকেও দেখুক।

অলকা বেরিয়ে এল ঘর থেকে, সেও স্নান সেরে ফেলেছে। সাদা জমি সরুপাড় একখানা তাঁতের শাড়ি আধুনিক ধাঁচে ঘুরিয়ে পরেছে—গায়ে একটি সাদা ব্লাউজ—মুখে একটু একটু পাউডারের হালকা প্রলেপ, চুল দু ভাগ করে দুটো গিঁঠে ঘুরিয়ে সামনে ফেলেছে। কপালে একটু কুমকুমের টিপ। মেয়েটির রঙ শ্যামলা—মুখে, নাকে, ঠিক ভ্রূর নীচেই একটা খাঁজ আছে, তাতেই যেন আকর্ষণ একটু বেড়েছে ওর। সাবান ও পাউডারের একটু মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছে; সকালের বারান্দাটি যেন প্রফুল্ল হয়ে উঠল। বললে—আমি ভাল আছি। স্নান করে শরীরটা হালকা হয়ে গেল—বেশ সুস্থ মনে হচ্ছে। ডাক্তার ডাকতে হবে না। পার্টও করতে পারব।

মঞ্জরী বললে—ডাক্তার না দেখিয়ে তোমাকে পার্টে নামাতে পারব না।

—না। আমার শরীর আমি বুঝতে পারছি।

—শিউনন্দন, তুই একবার বাবুল মাস্টারমশাইকে ডাক্। তিনি অলকাকে এনেছেন—তিনি কি বলেন শুনতে হবে।

—ডাকবেন, ডাকুন। তিনি আমার গার্জেন নন। কোন সম্পর্কও নেই। একসঙ্গে অ্যামেচারে পার্ট করতাম। সংসারে অভাব। সিনেমা থিয়েটারে চেষ্টা করলাম; হল না। সিনেমায় ফটো ফেস পছন্দ হল না, তার ওপর মাথায় খাটো। থিয়েটারে সখীর দলে নিতে চাইলে—তাও মাইনে সামান্য। তখন বাবুলদা একদিন বললেন—যাত্রায় ঢুকবে? আমি ঢুকেছি। দলে আরও মেয়ে রয়েছে। মেয়ে প্রোপ্রাইটার। মাইনেও শতখানেক টাকা হবেই। রাত্রে জলপানি আছে। থেমে একটু হাসলে সে, তারপর জের টেনে বললে—অনেক আশা করে এসেছি।

তার কথার সুরে সব যেন বিষণ্ণ হয়ে গেল।

রীতুবাবু বললে—তা তোমার প্রসপেক্ট আছে। সেদিন ভাল নেচেছ।

—কাল উনি আমার থেকে অনেক ভাল করেছেন।

—সেটা ওঁর সংযমটুকুর জন্যে। ক্রমশঃ সব বুঝতে পারবে।

গোরাবাবু এবার বললে—এই! ক্রমশঃ জ্ঞান হবে। তখন এসব পার্টে তোমার কাছে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। যেমন ওঁর জনা। সতী তুলসী। দেখবে সতী তুলসীর পার্ট! তা হোক না, আজ সতী তুলসী হোক। ওতে অলকার তো শ্রীকৃষ্ণ। নাচ নেই। পরিশ্রম কম। কম রিস্ক। কি রীতুবাবু?

—তা হোক না।

—তুমি কি বল? মালিক! কি গো!

—তাই হোক। একান্ত নিস্পৃহ ভাবেই বললে মঞ্জরী। তারপর বললে—কিন্তু তোমার শরীর ভাল নেই বলছ। সতী তুলসীতে তোমার খাটনি বেশী। শঙ্খচূড়, ছদ্মবেশী শঙ্খচূড়। তোমার সইবে তো?

—শিউনন্দন, দে তো বাবা মিল্ক অব ম্যাগ্নেসিয়াটা। গ্যাসটা গেলেই ঠিক হয়ে যাবে। তা ছাড়া যাত্রার আসরে ঢোল বাজলেই যুদ্ধাশ্বের মত সতেজ হয়ে উঠব। তার সঙ্গে ডোজ আছে। হয়ে যাবে। এর তো তা না। কাল বরং রেস্ট আমার—অষ্টবজ্র বা কর্ণ হবে। আমার ছোট পার্ট। এতেও অর্জুন, ওতেও অর্জুন। মাস্টার-মশাই আর তুমি চালাবে। ভীম সুভদ্রা, নয়, কর্ণ পদ্মা! অলকার খাটনি কাল পিছিয়ে যাবে। দেখাও যাবে ওর এলেম। উর্বশী—নয় 'ব্রহ্মশাপ'! কি?

—বেশ। যা বলবেন সকলে তাই হবে। বলেই মঞ্জরী উঠে ভেতরে চলে গেল।

গোপাল বললে—একটু দাঁড়াও মা। বাবুলবাবু এসে পড়েছেন। ওঁকে ডেকেছিলে।

—চা খাওয়ান ওঁকে। আর তো জিজ্ঞাসার কিছু নেই।

বাবুল তার স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলে উঠল—খো—দা—তা—লা হে! হে ভগবান! এমনি কপাল—আমি এলাম আর জিজ্ঞাসা ফুরিয়ে গেল!

হাসলে সকলেই। মঞ্জরীও হেসে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—মিছে কষ্ট দিলাম আপনাকে। অলকার সম্বন্ধে একটা কথা জিজ্ঞাসার ছিল, তা অলকা বললে তার দরকার নেই। অলকা বললে ও নিজেই নিজের মালিক।

—রাইট, রাইট, রাইট। অলকার পার্সিং হল—সিংগল পারসন, সিঙ্গুলার নাম্বার, অলওয়েজ কর্ত্রী—অর্থাৎ নমিনেটিভ কেস টু অল ভার্বস—মানে ইন্ অল হার ক্রিয়াজ অ্যাণ্ড কর্মজ অব হার লাইফ। কিন্তু শুধু চা তো খাব না ম্যাডাম। কাল যা পার্ট করেছেন তাতে অনেক অভিনন্দন আপনার প্রাপ্য এবং আমাদের তার বদলে কিছু সলটি জিনিস প্রাপ্য। যাতে করে চিরকাল গুণ গাই। ওঃ—তুটো উলটোমুখী ঘোড়া সমান ফোর্সে চালিয়ে দিলেন!

মঞ্জরী হেসে বললে—ভাল লেগেছে? ওরে শিউনন্দন, মাস্টার-মশাইদের ভাল করে সিঙাড়া ভেজে দে বাবা।

মিল্ক অব ম্যাগ্নেসিয়া খেতে খেতে গোরাবাবু গ্লাসটা মুখ থেকে নামিয়ে বললে—আজ আবার দেখবেন সতী তুলসীতে ওঁর পার্ট।

মঞ্জরী হেসে বললে—নিজের কথা বলছ না। ওঁর আজ ডবল রোল। দেখবেন। আসল শঙ্খচূড় আর ছদ্মবেশী শঙ্খচূড়!

রীতুবাবু বললে—কি লড়াইটাই হয় তুজনে। ওঃ! আমি তো ও সিনটিতে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। যতবার প্লে হয়েছে দেখেছি। কে জেতে কে হারে! কে হারে কে জেতে!

মঞ্জরী দাঁড়িয়েই ছিল, সে এমন আলোচনাটি ছেড়ে যেতে পারে নি। সে একটু হেসে বললে—হারি আমি।

রীতুবাবু বললে—না না না।

গোরাবাবু হেসে বললে—বিনয় হচ্ছে বুঝছেন মাস্টারমশাই !

—তা বলছ কেন। মঞ্জরী এক বিচিত্র হাসি হাসলে—জীবনের সব হারালে তুলসী—ফকীর হয়ে গেল—সে কি জেতা !

—সেটা বই-উপাখ্যান। তা ছাড়া তুমি তুলসী নও।

—তখন তা মনে থাকে না আমার।

বলতে বলতে সে হঠাৎ ফিরে ঘরে ঢুকে গেল। লঘু হাস্য পরিহাস এবং প্রসন্ন আলোচনার আসরটি যেন ম্লান বিষণ্ণ হয়ে গেল।

*　　　*　　　*

রাধার সখী তুলসী। গোপকন্যা রাধা নয়, চিরন্তনী গোলোক-বিহারিণী রাধা। ব্রজলীলায় তখনও মর্ত্যধামে আবির্ভূত হন নি। সুন্দরী তুলসী, শ্রীকৃষ্ণ তার সঙ্গে পরিহাস করছিলেন—তুলসীও সানুরাগে তাঁর দিকে তাকিয়েছিল। রাধা তাকে অভিশাপ দিলেন—মর্ত্যভূমে গিয়ে তুমি মানবী হয়ে জন্ম-মৃত্যুর দুঃখ ভোগ কর।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—যাও সখী—সেখানে গিয়ে তুমি আমার অংশ-সম্ভূত, আমারই সখা সুদামের স্ত্রীরূপে আমাকে লাভ করবে।

তার অঙ্গ থেকে সুদাম আবির্ভূত হল। প্রবেশ করলে সে।

তুলসী বললে—অংশ পেয়ে আমার তৃপ্তি হবে না প্রভু, পূর্ণ তোমাকে আমার কামনা।

—হবে সখি। তাই হবে।

নাটকের এটি প্রস্তাবনা।

আরম্ভ হল নাটক। রাজা ধর্মধ্বজের কন্যা তপস্বিনীর মত দিন যাপন করছেন পিতৃগৃহে। বৃন্দাবনে কৃষ্ণসখা কৃষ্ণ-অংশসম্ভূত সুদামের সঙ্গে। সুদামও অভিশপ্ত হল ব্রজবিলাসিনী রাধা কর্তৃক। দৈববাণী হল তুলসীর প্রতি—সুদাম দৈত্যরূপে জন্মগ্রহণ করবে শঙ্খচূড় নামে—সে তোমাকে এসে বরণ করবে। তোমার অঙ্গে কালের স্পর্শ লাগবে না। তুমি এমনি তরুণী থাকবে। তুমি তার পত্নী হয়ে জীবনলীলায় শাপমুক্ত হবে—তোমার সকল বাসনা পূর্ণ হবে।

তুলসী মঞ্জরী, শ্রীকৃষ্ণ অলকা, রাধা গোপালী, সুদাম ও শঙ্খচূড় গোরাবাবু।

প্রস্তাবনায় শ্রীকৃষ্ণ তুলসীকে অনুসরণ করে ঢুকলেন—যেন তার অঞ্চলখানি ধরবার চেষ্টা করছেন—তুলসী পালাতে চাচ্ছে—পিছন ফিরে তাকিয়ে বলছে—

না না সখা, না। ছাড়—ছাড়—

অথচ পিছন ফিরে সানুরাগে তাকাচ্ছে।—

কি কর সুন্দর শ্যাম চঞ্চল চপল,
কিশোরীর প্রাণবঁধু—হে চির কিশোর—
মোর প্রতি অনুরাগ—ছি ছি ছি,
হে মুরলী বয়ান, এ কি আচরণ!
আমি দাসী শ্রীমতীর, দাসী সখি—
মোর প্রতি অনুরাগ সাজে না তোমার!
সামান্যা, নিতান্ত সামান্যা নারী—দাসী!

কৃষ্ণ বললেন—

তুমি অসামান্যা—তুমি অপরূপা—
রাধা আর তুমি কভু ভিন্ন নহ সখি!
রাধা শতদল—তুমি তার মধুগন্ধ
রাধা সে অমৃত দীপ—তুমি তার আলো—
এই—এই ধরিয়াছি আমি!

তুলসী এলিয়ে পড়ল সে স্পর্শে। হেসে কৃষ্ণ বললেন—

এ কি সখি—স্পর্শমাত্রে
পড়িলে এলায়ে—এত প্রেম!

তুলসী এবার স্বীকার করলে—

হ্যাঁ গো। এত প্রেম! ওই স্পর্শ
জীবনের একমাত্র কামনা আমার—

বুকে মোরে তুলে লও, তুলে লও
ওগো প্রিয়—

অলকাকে সুন্দর মানিয়েছে কৃষ্ণ। পার্টও সে সুন্দর করে গেল। গোপালী এল, অভিশাপ দিলে।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

জন্মান্তরে মিটিবে বাসনা। যাও তুমি
জন্ম লও ধর্মধ্বজ রাজগৃহে কন্যারূপে।
সুদাম আমার সখা—মোর অংশ হতে
হবে উদ্ভব তাহার। তার পত্নীরূপে
জীবন আরম্ভ কর।

সুদামরূপে প্রবেশ করল গোরাবাবু। সে হাত বাড়িয়ে বললে— ধর মোর হাত সখি।

তুলসী বললে—

অংশে খণ্ডে তৃপ্তি মোর হবে নাকো।
পূর্ণ—পূর্ণ রূপে তোমারে যে পাবার বাসনা!

কৃষ্ণ বললেন—তাও হবে।

তুলসী কাঁদল।

কৃষ্ণ তার চিবুক ধরে গাইলেন—

কাঁ—দো, কাঁ—দো, সখি তুমি কাঁদো—
অশ্রু মুকুতা দিয়ে বেদনার মণিহার গাঁথিয়া
আমারে পরায়ে দাও, পাকে পাকে,
শতপাকে বাঁধো। কাঁ—দো—ও!
সৃষ্টির সরোবরে তোমার নয়নজল
লীলার কমল হয়ে ফুটিবে সে ঢল ঢল—
সৌরভ আবেদনে ভৃঙ্গ হইতে মোরে সাধো।
কাঁদো—ও—ও!

তুলসী কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে পিছন হটে আসর থেকে

বেরিয়ে এল—তার পিঠের দিকে সুদাম। কৃষ্ণ তার হাত ধরে সামনে হেঁটে বেরিয়ে এলেন—যেন তুলসীকে স্বর্গধাম থেকে মর্ত্যলোকে বিদায় দিতে বৈকুণ্ঠের প্রান্তসীমা পর্যন্ত এলেন। গান শেষ হল আসরের শেষ পর্যন্ত এসে।

মুহূর্তে স্তব্ধ আসর করতালিতে মুখরিত হয়ে উঠল।

গোরাবাবু বলে উঠল—সাধু সাধু সাধু! গান জমে গেছে অলকা সাবাস!

তুলসীর মুখখানিও প্রদীপ্ত হয়ে উঠল—বললে—খুব ভালো গেয়েছ। খুব ভালো।

সে চোখ মুছলে। সত্যিই চোখে জল এসেছিল।

আসরের করতালি হরিধ্বনি সাজঘরে সকলের মনে সুর বাঁধে। উৎসাহে চঞ্চল হয়ে উঠল সাজঘর। বাবুল বোস টেবিলে একটা চাপড় মেরে বলে উঠল—God is good and kind to me—আমার চন্দ্রবদন সেভ্ড। আসর ফায়ার। দিন একটা সিগারেট—ধরিয়ে নিই এই বেলা। মাই বাক্স ফাঁক! বিগ ব্রাদার—আপনি দিন।

রীতুবাবু মদ ঢালছিল—গ্লাসটা হাতে দিয়ে বাঁ হাতে সিগারেট দেশলাই এগিয়ে দিয়ে বললে—নাও। হর্স হুইপ হুই। দাঁড়াও, আমি ঢেলে নি। অলকার সাক্‌সেসে পান করব। নাঃ, মেয়েটার ট্যালেণ্ট আছে।

নাটুবাবু ইন্দ্র সাজবে। ড্রেসার তার কপালে দেবতিলক আঁকছিল। বেশকারীর হাতটা সরিয়ে দিয়ে সে বললে—প্রত্যেক লোকটি ভাল করেছে স্যার, নইলে—

টেবিলে ফের চাপড় মেরে বাবুল বললে—সারটেনলি, হাণ্ড্রেড টাইমস সারটেনলি। এভরিবডি—বিগিনিং ফ্রম রাধা—

যোগাবাবুর আজ পার্ট নেই। সে ওদিকে বসেছিল—দেখছিল

বসে বসে—সে বলে উঠল—গোপালীবালা, রাধা হল গোপালীবালা। রাধা না থাকলে কেষ্ট এমন গান গাইতে পারে! সব রাধার জন্যে। হুঁ হুঁ বাবা!

নাটুবাবু একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই ক্ষান্ত হল। বলতে কিছু পারলে না। বেশকারীরাও বললে—তিলকটা সেরে দি বাবু—আপনার পার্টের দেরি নেই। ওসব থাক এখন।

নাটুবাবু বেশকারীকেই বললে—গাঁজা খেলে মানুষ অমন হয়? না, যে—

আর খুঁজে পেলে না কথা। ছেড়ে দিয়ে বললে—নাও, জলদি সারো। আবার হঠাৎ বললে—দাঁড়াও। তারপর বললে—তুলসীর চোখের জলটা কেউ দেখেছ? চোখের জল? শুধুই হাততালি পড়ে। নাও, সারো।

বাইরে সাজঘরের বারান্দায় ঝুনঝুন শব্দে ঘুঙুর-পরা কেউ পা নাচাচ্ছে। সখীর দলের ছেলে।

বাবুল বললে—কে রে? অন্ধকারে খ্যামটা জুড়লি কে?

—মাটি করে দিলে। স্রেফ জল ঢেলে দিলে গরম আসরটায়। ঘরে এসে ঢুকল বংশীমাস্টার।

—কি হল?

—কি হবে? যা চিরকাল এ বইয়ে হয়—এই সিনের পর—ধর্মধ্বজ আর নারদ।

রীতুবাবু বললে—ও একটু মিইয়ে যাবেই। বরাবর দেখে আসছি। ওর উপায় নেই।

সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটটা চায়ের ভাঁড়ে গুঁজে দিয়ে উঠে দাঁড়াল—কই রে, ভেসলিন একটু দে তো মুখে, বুলিয়ে নি। আর সাদা পেণ্ট দে। ওঃ, শিব সাজার এ এক পানিশমেণ্ট।

বাবুল চঞ্চল হল। বললে—ঝুলিয়ে দিলে প্লেটা?

—একদম। ঝোলা নয় স্যার, ধপাস করে পড়ে গেল। কে

বলে উঠল—বাড়ি যাও হে, ভাত খেয়ে গায়ে জোর করে এস। মাস্টারমশাই যা বললেন তা সত্যি। কিন্তু ফার্স্ট সিন এমন জমা জমে না। আজ যখন জমল তখন ঝুললে লাগবে অডিয়েন্সের।

—কি আছে বাবা ওতে? প্রস্তাবনার পরে ঘটনাটা বলে দেয়। নারদ এলেন রাজা ধর্মধ্বজের কাছে। মহারাজ, তোমার অপূর্ব কন্যার কথা শুনে দেখতে এসেছি। তার স্বামী নাকি দেহত্যাগ করেছে—সে তপস্যা করছে আজ দীর্ঘকাল, তার স্বামী নবজন্মে পূর্বরূপ আকার নিয়ে ফিরে আসবে। এদিকে তোমার কন্যার এতকালেও বয়স বাড়ল না, সে ষোড়শী হয়েই আছে। স্বর্গলোকে দেবতারা তার কথা বলছে। বিস্ময় সঞ্চারিত হয়েছে দেবলোকে। আমি তাকে দেখতে এসেছি। জানতে এসেছি এ কথা সত্য অথবা লোক-রটনা। ধর্মধ্বজ বলবে—সত্য দেবর্ষি। কন্যার নাম আমার তুলসী। কুমারীকালে সে তপস্যা করেছিল নারায়ণকে পতিরূপে পাবার জন্য। ব্রহ্মা এসে বললেন—কৃষ্ণ অংশে সুদামের জন্ম। তুমি তার গলে বরমাল্য দাও। সুদামের সঙ্গে তাকে বিবাহ দিলাম। সুদাম শ্রীমতী রাধার শাপগ্রস্ত হয়ে দেহত্যাগ করলে—তাকে দৈত্য হয়ে জন্ম নিতে হবে। তুলসী চিতারোহণ করতে গেল, দৈববাণী হল—তুলসী, তুমি সহমৃতা হয়ো না। তপস্যা কর। সুদাম দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করবে কিন্তু তার আকার, অবয়ব, রূপ সবই সেই সুদামের মত হবে। দেখবামাত্র তুমি তাঁকে চিনবে। তোমারও বয়ঃবৃদ্ধি হবে না। সে এলে সেও তোমাকে চিনবে। তার গলায় দেবে বরমাল্য। তারপর তোমার জন্মজন্মান্তরের নারায়ণ লাভের কামনা পূর্ণ হবে। সেই অবধি সে তপস্যা করছে। বিবরণ তো এইটুকু। ওরা করবেই বা কি? তলোয়ার খেলবে না লম্পঝম্প করবে? না ডুয়েট গান করবে? তার ওপর নামে ছুটো বুড়ো। দেখ না—এইবার দেখ না। এইবার তুলসীর সঙ্গে শঙ্খচূড়ের দেখা, বরমাল্য দান। প্রোপ্রাইট্রেস আর কর্তা। ওই—ওই ঢুকছে

প্রোপ্রাইট্রেস। ওই বিপিন মালা দিচ্ছে হাতে। ওই। গেরুয়া পরে সন্ন্যাসিনী তুলসী। দেখ না কি রকম রোমান্টিক সিন হয়। কিন্তু তুমি সাজ শেষ কর বাবুলমাস্টার। এ সিনের পরই তোমার আসছে।

বাবুল বললে—হুঁ হুঁ। আমি কিন্তু ওতে অনুস্বার লাগাব মাস্টারমশাই। ভেবে রেখেছি।

—অনুস্বার?

—হ্যাঁ, মানে সংস্কৃতং। হলং হলং—ভো ভো দেবরাজো হলং। দেবরাজ বলবে—কি হল? বলব—শঙ্খচূড়ং ভুঁইফোড়ং দৈত্যবর্বরং ফোসং ফোসং হিঁসিং হিঁসিং শব্দং কৃত্বা ফণাং তুলেছেং। তুলসীর সঙ্গে মিলনং সমাপ্তং। আমাদের দয়ালু পিতামহ ব্রহ্মা বরও দিয়েছেন, তোমার স্ত্রীর সতীত্ব যতদিন অটুট থাকবে ততদিন তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, মহাশক্তি কারও শক্তিতে মরবে না। হলং—এইবারে আমার হলং। এইবারে শনিঠাকুরের দফা গয়া! আঃ, তোমার পরামর্শে আমি ওর তপস্যার সময় দৃষ্টি দিতে গিয়েছিলাম। হায় হায় হায়! কি রকম? করব?

—গুড। মাস্টার, ব্রেন তোমার বড় সাফ। তা সাজটা শেষ কর। চুলটা পরে নাও আর একটা গোঁফ। টাকওলা চুল আছে। আর নীল চশমাটা চড়িয়ে নাও। তা হলেই শনি। এই এই—সব একটু চুপ কর। ওই গোরামাস্টারের গলা—। গলাটি বড় ভাল। শোন কেমন বলছে। বা বা বা! নাও, ফের জমে গেছে।

আসর থেকে গোরাবাবুর কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে, ভরাট মিষ্টি গলা—আবেগে একটু কাঁপছে। স্পষ্ট উচ্চারণ। শঙ্খচূড় তপস্বিনী তুলসীকে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছে, মনে হচ্ছে এ তপস্বিনী যেন কত চেনা।—কে তুমি জানি না দেবী! অপরূপা তপস্বিনী—নয়নে অমৃত দৃষ্টি—রূপে তব জ্যোৎস্নামাধুরী—অঙ্গ হতে এ কি এক দিব্যগন্ধ; আমার নিশ্বাসবায়ু ভরে দিল অপূর্ব সম্মোহে—;

সব যেন লুপ্ত হয়ে আসে—বর্তমান, স্থান, কাল। শুধু এক সূক্ষ্ম স্বচ্ছ যবনিকা কুয়াশার মত দুলিতেছে নয়ন সম্মুখে, তাহার ওপারে তুমি! যেন জন্মজন্মান্তর পার হতে আসিতেছ তুমি। কত চেনা, কত জানা, তুমি যেন কত আপনার—

টেবিলে ফের চাপড় মেরে বাবুল বলে—ফের জমে গেল। দাও হে বাবা বেশকারী, একটা আঁচিল বানিয়ে ঠিক নাকের উপর সেঁটে দাও তো!

নাটুবাবু বললে—দাঁড়ান মশাই, আমার মুক্তোর মালা বাঁধা শেষ করুক। ওয়ান বাই ওয়ান।

বিপিন ছুটে এসে ঢুকল—মাস্টারমশাই, যাচ্ছেতাই কাণ্ড হল। কি হবে? গোপালবাবু বললে আপনাকে বলতে।

—আরে হলটা কি? রাতুবাবু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

—প্রোপ্রাইট্রেস মালা ছিঁড়ে ফেলেছে। বসে তপস্যা করছিল—উঠে দাঁড়াতে গিয়ে ছিঁড়ে গেল।

—ছিঁড়ে গেল! তা—ঠিক ম্যানেজ করে দেবে প্রোপ্রাইট্রেস। গলার মুক্তার মালা—ও, মুক্তার মালা তো নেই। তপস্যা করছে।

বাবুল বোস বললে—মালা নাইবা পরালে—বরণ করছ—হাত ধরাধরি করে চলে আসবে।

—উঁহু, উঁহু। মালা না হলে হবে না। ওই মালা ছিঁড়ে পড়বে শঙ্খচূড়ের মৃত্যু দিনে। তুলসীর সতীত্ব-নাশের সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়বে। চমকে উঠবে শঙ্খচূড়। মালাই দিতে হবে। এই জলদি, আমাকে একটা মালা—বনমালা দে। আর একটা চাদর। শিবের বাঘাম্বরটা কম্বলটা—জলদি।

রাতুবাবু বাঘাম্বরটা আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে মালা হাতে বেরিয়ে গেল। বাবুল জানলায় গিয়ে দাঁড়াল। কি করবে রাতুবাবু? চালান করে দেবে?

মঞ্জরী পার্ট করছে আর সামনের দিকে তাকাচ্ছে। সে জানে

মালা আসবে হাতে হাতে, কিন্তু নেবে কি করে? এখানে আসরে জায়গা প্রশস্ত। দলের বাজনার লোকেদের কাছে গিয়ে ঘেঁষে না দাঁড়ালে নিতে পারবে না। নিতে গেলেই খারাপ হবে। অভিনয় অভিনয় হয়ে যাবে। আসরের লোকের ঘোর কেটে যাবে। তবু তাই নিতে হবে।

সে বলছিল—ওগো প্রিয়তম—তুমি মোর প্রিয়তম সৃষ্টির প্রথম লগ্ন হতে। এ কঠোর তপস্যা আমার তোমারই লাগিয়া প্রিয়তম।

—মোর লাগি? অবিশ্বাস করি না তোমারে—তবু, তবু যেন—। এ কি সূক্ষ্ম স্বচ্ছ যবনিকা যেতেছে সরিয়া মানস-নয়ন হতে—হ্যাঁ হ্যাঁ, পড়িয়াছে মনে। বৈকুণ্ঠে বসতি। রাধা তোমা অভিশাপ দিল—

—জন্মিনু তুলসী নামে কন্যা হয়ে ধর্মধ্বজ গৃহে।

—আমি জন্মিলাম বৃন্দাবনে, কৃষ্ণ অংশ হতে, সুদাম আমার নাম। তোমা সনে বাঁধিনু জীবন। রাধারানী অভিশাপ দিল মোরে, মুগ্ধ চক্ষে চেয়েছিনু। শাপ দিল—এখনি দেহান্ত হোক। চিত্তের বিকৃতি তব দৈত্যের আচার। দৈত্যবংশে জন্ম লভি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। তোমার তপস্যা ফলে জন্মিয়াছি পূর্ব রূপ পূর্ব অবয়বে—তপস্বিনী, তোমার তপস্যা ফলে। তপস্যার পুণ্যফলে কালের প্রভাব করি জয়, আজও তুমি রয়েছ ষোড়শী—

—তোমারই লাগিয়া প্রিয়—তোমারই লাগিয়া।

—এস প্রিয়া—বাহুপাশে দাও ধরা—

—তার আগে—

মঞ্জরী তাকালে চারিদিকে—কোথায় কার কাছে মালা রয়েছে! কই কারুর কাছে তো দেখছে না। কারও চোখে তো ইশারা নেই। বলছে না—এখানে! তবে—? এ কি? আসরের ঠিক প্রবেশ-পথে বাঘাম্বরে আপাদমস্তক জড়িয়ে বনমালা হাতে কে! রীতুবাবু! হ্যাঁ।

রীতুবাবু বললে—মর্ত্যের কুসুমে গাঁথা মাল্য দিয়ে নয় সতী,

স্বর্গ হতে অম্লান কুসুমে গাঁথা এই লহ বৈজয়ন্তী মালা। এই মাল্যে প্রিয়তমে করহ বরণ। পারতুষ্ট দেবতা পাঠায়ে দেছে।

মালাটি হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল রীতুবাবু। এতটুকু অস্বাভাবিক মনে হল না। শুধু তাই নয়, এমনি একটি নাটকীয় মুহূর্তের সৃষ্টি হল এতে যে দর্শকেরা করতালি দিয়ে উঠল। রীতুবাবু ঘরে এসে বসতেই বাবুল বললে—এই নিন। বসে ঢিপ করে একটা প্রণাম করে দিলে। শুধু বাবুল নয়, সারা দলটা যেন খুব একটা সার্থক, চমকদার ম্যাজিক দেখানোর পর ম্যাজিসিয়ানের জন্যে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। বাইরে যোগাবাবু বলছে—হেঁ হেঁ, এ হল রীতুবাবু! বলিহারি বলিহারি!

কয়েকটা ছেলে হাততালি দিচ্ছে। রীতুবাবু বললে—তা হলে এক ডোজ করে হয়ে যাক। বাবুল, নাটু, কি বল? ও, কে!

একটি মেয়ে ঢুকে হেঁট হয়ে পায়ে হাত দিলে। রীতুবাবু তাকিয়েই উঠে দাঁড়াল—আপনি! স্বয়ং প্রোপ্রাইট্রেস! তুলসী!

গোরাবাবু ঢুকল পিছন পিছন—আজ আমারও একটা প্রণাম নিন।

—ওরে বাপরে! ও কথা বলতে নেই স্যার—আপনি—

—না মশাই, আমি ব্রাহ্মণ আর নই। জানেন তো আমি বৈরেগী হয়েছি, জাত দিয়েছি।

রীতুবাবু বললে—দিলেন তো নিলেটা কে? আপনার জাত যায় না স্যার। আপনি অক্ষত ব্রাহ্মণ। না না না। আমরা সেকেলে লোক। না না না।

—তা হলে কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জানাই কি করে?

—এক ডোজ একসঙ্গে গ্লাসে গ্লাস ঠেকিয়ে।

বিপিন ঘরে ঢুকল—নাটু মাস্টারমশাই, বোস মাস্টারবাবু—আপনাদের।

নাটুবাবু কনসার্টের তালে তালে পা ফেলে আপন মনে ঘরের

একপাশে ঘুরছিল—হাত দুটি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে সে বের হল।

বাবুলও উঠল—জয় ভগবান—জয় বাবা!

বলে বেরিয়ে গেল সে।

নাটুবাবু ইন্দ্র, বাবুল বোস শনি।

মঞ্জরী বললে—আমার ড্রেস চেঞ্জ আছে। যাই।

রীতুবাবু বললে—খুব জমে গেছে। ফার্স্ট সিন থেকে। মেয়েটা গেয়েছে ভাল। তারপর আপনারা দুজনে—

মঞ্জরী বললে—আপনি তার ওপর ম্যাজিক করে দিলেন। হেসে সে চলে গেল। যেতে যেতে বলে গেল—তুমিও বেশী দেরি করো না। তোমাকেও টেল পরতে হবে, মুকুট নিতে হবে।

—গেলাম বলে।

রীতুবাবু গ্লাসটা হাতে দিয়ে বললে—নিন।

গ্লাসটা নিয়ে গোরাবাবু বললে—আর একটা ম্যাজিক করা যায়।

—কি বলুন তো?

—আমাদের সিনে, পুরনারীরা আসবে তো মঙ্গলঘট বরণমালা নিয়ে। গান গাইবে। ওতে।

মুখটা কাছে এনে চুপি চুপি বললে—মেয়েটাকে মানে অলকাকে নামিয়ে দিলে কি হয়? স্রেফ মালা নিয়ে একখানা নাচ। বুঝলেন, ফায়ার। হবে না?

—ভাল আইডিয়া। হ্যাঁ, ভাল হবে।

—আপনি একটু বলুন।

—আমি?

—হ্যাঁ। আমি বললেই—। দে আর অলওয়েজ জেলাস! আপনি বলুন।

—সেটা কি ভাল দেখাবে? আমি—

—তা হলে আমি আপনার নাম করে বলি।

—তা বলুন। হাসলে রীতুবাবু।

—আসুন। গ্লাসে গ্লাসে ঠেকিয়ে বললে—আজকের অসামান্ত সাফল্য কামনা করে।

—জয় কালী!

—দেখবেন, অলকা একেবারে ঘুরপাক খাইয়ে দেবে আসরকে। চৌকোস মেয়ে। হঠাৎ থেমে গেল গোরাবাবু—আর এক কাজ করলে কথাই উঠবে না। আশাকে সুদ্ধ জুড়ে দি। দুজনে হলে—কিন্তু উঁহু তা তো হবে না। আশা তো মডার্ন ডান্সে উইদাউট রিহারস্যাল মেলাতে পারবে না! তার থেকে একা অলিই ভাল। আপনার নাম করছি কিন্তু।

চলে গেল গোরাবাবু।

রীতুবাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। হ্যাঁ, লোকে হাসছে। বাবুল খুব হাসাচ্ছে। এবারকার নতুন রিক্রুট ভাল। বাবুল বোস—অলকা চৌধুরী।

অলকা চৌধুরী—অলি চৌধুরী। নামটা ভাল। পোস্টারে নামেই লোক টানে। ছবিতে ফটো ফেস ভাল নয় বলে নেয় নি। কিন্তু এমনিতে চার্ম আছে। আর জানে—রূপকে ফোটাতে জানে। খেলাতে জানে। চার্ম আছে বোধ হয় সবারই। মঞ্জরীর নতুন চার্মে সে হতবাক হয়ে গেছে। কিন্তু সে ও চার্ম ঢেকে রাখে, সেইটে আরও বড় চার্ম। ওঃ, সোজা কথা!

* * * *

সাজা শেষ করে বসেছে, বাবুল ফিরে এল পার্ট সেরে, বললে—রেখে এসেছি স্যার। প্লে সুতোতে ঝুলছে না, শেকল করে দিয়েছি। অনুস্বারে খুব হেসেছে লোকে।

—গুড। হাসি আমি বসে বসেই শুনছি। ওটা আশ্চর্য ন্যাচারাল ভাবে আসছে হে তোমার।

—তার জন্যে সব ক্রেডিট মাই লর্ডের। গন্ধর্বকন্যার যা সুতো

ধরিয়ে দিয়েছেন তা আমার জীবনে ও সমুদ্র পার হবার কাছি হয়ে গেছে।

রীতুবাবু বললে—কিন্তু মুখটা এমন বিরক্ত বিরক্ত কেন ?

—গোঁফটার জন্যে। রাবিশ! কেন রে বাবা—স্বর্গে কি ক্ষুর ছিল না ? ছিল না তো দাড়ি কামাতো কি করে ?

—ছিল, কিন্তু রেওয়াজ ছিল না মাস্টার।

—রেওয়াজ ? দূর—দূর! রেওয়াজ করলেই হয়।

বলে টেনে গোঁফটা খুলে ফেললে।

—খুললে ?

—আবার লাগাব।

—ডিসগাস্টেড হয়ে গেছি। ক্রমাগত মুখে চুল ঢুকছে।

—কি কষ্ট! একটা সিগারেট ধরিয়ে বাবুল বোস আরাম করে টানতে লাগল।

গোপাল ঘোষ ঢুকল—কর্তা আপনাকে সিনটা দেখতে বলে গেছেন মাস্টারমশাই।

—নাচছে অলকা চৌধুরী ?

—হ্যাঁ। মেক-আপ করেছে চমৎকার!

বাবুল চমকে উঠল—অলকা নাচবে! সে তো কৃষ্ণ!

—না। নর্তকী সেজে নামছে এ সিনে।

গোপাল বললে—মাস্টারমশায়ের সাজেশন।

বিচিত্র হেসে রীতুবাবু বললে—হ্যাঁ। কর্তার সঙ্গে পরামর্শ করেই করা গেল।

—ওই আরম্ভ হল—আসুন।

—এস ব্রাদার।

—নাঃ। আপনারা যান।

বাবুল বসেই রইল উদাস ভাবে। অলকার নাচ—বাবুল বোসের কমিক! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। এর বাইরে একটি দুর্লভ

দীর্ঘনিশ্বাস—চোখের জলের জগৎ আছে—তার ভিতরে অকস্মাৎ আজ ঢুকে পড়েছে। বাইরে বাজুক অলকার পায়ের ঘুঙুর—তার চোখের বিদ্যুৎ ঝকমক করুক; ঝলমল করুক; সে যাবে না। এই আধো-আলো আধো-অন্ধকার একটি নিস্তব্ধ নির্জন জীবনের বাঁক—এখানে বসে ভাল লাগছে।

রীতুবাবু এসে দাঁড়াল। ভাল নাচছে অলকা। সেজেছেও বড় ভাল। বা—বা—বা। সমস্ত দর্শকের দৃষ্টি একাগ্র, বিস্ফারিত। চুম্বক যেমন মাটিতে গাঁথা পোঁতা লোহাকে টানে তেমনি করে টানছে অলকা তার নাচের ছন্দে ছন্দে। বাঃ! কনসার্টের লোকেরাও ঠিক ঘা-টি মেরেছে!

সোমের ঘা নয়। সোমের সঙ্গে সঙ্গেই একটা ঝনঝন শব্দে যেন কিছু ভেঙে পড়ল। চমকে সিংহের মত ঘাড় সোজা করে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাচ্ছে গোরাবাবু। তাতে প্রচ্ছন্ন প্রশ্ন—কি হল? কিসের শব্দ?

হাঁপাতে হাঁপাতে এল ভগ্নদূত।

—দৈত্যরাজ! প্রভু!

—বল কি সংবাদ! এ শব্দ কিসের? কোন্ মূঢ় জন হেন শব্দে আমার আনন্দলগ্নে পত্নীসহ সিংহাসনে অভিষেক-ক্ষণে করিল ব্যাঘাত? কে? কে?

—বজ্রাঘাত হল প্রভু!

—বজ্রাঘাত?

—হাঁ মহারাজ, দৈত্যকুল কেতনদণ্ডের 'পর অকস্মাৎ মহাশব্দে হল বজ্রাঘাত। ধ্বজদণ্ড পড়িল ভাঙিয়া।

—নহে অকস্মাৎ! এ নহে প্রকৃতিলীলা! নহে ইহা অদৃষ্ট সংকেত! ক্রূরমতি অসহিষ্ণু দেবতার কাজ! ইন্দ্র—ইন্দ্র—ইন্দ্রের আদেশে বজ্রাঘাত হল দৈত্যকুল কেতনদণ্ডের 'পর, ঠিক মোর অভিষেক-ক্ষণে। ধূলায় লুটায়ে দিতে চায়। শুনহ আদেশ। ওই

ভগ্ন দণ্ড তুলে ধর। উড়াইয়া দাও ওই লাঞ্ছিত পতাকা। শুন—শুন ত্রিভুবন প্রতিজ্ঞা আমার। এ পতাকা ইন্দ্রের প্রাসাদশীর্ষে দিব উড়াইয়া। সতী তুলসীর, মহারাজ্ঞী তুলসীদেবীর দাসী হবে বন্দিনী ইন্দ্রাণী।

রণবাদ্য বেজে উঠল। তলোয়ার খুললে শঙ্খচূড়। তুলসী ডেকে উঠল—প্রিয়তম! ওগো প্রিয়তম!

শঙ্খচূড় ফিরে তার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললে—ভয়! ওরে ভীরু কপোতী আমার! তোমার সতীত্বপুণ্য অক্ষয় কবচ মোর। তবু ভয়! ধর তরবারি, ভয়ে কর জয়।

তুলসী হাতে নিল তরবারি। আবার বাজল রণবাদ্য। তুজনে বেরিয়ে এল। প্রথম অঙ্ক শেষ হল। প্রোপ্রাইট্রেস যেন কেমন এদিক ওদিক করে ফেললে। ঠিক সময়টির তু চার সেকেণ্ড দেরি হয়ে গেল। সুরটা যেন একটু ঠাণ্ডা। তবু হাততালি পড়ছে। সেদিকে ঠিক আছে। রীতুবাবুর চোখ তাদের নয়।

কি হল? এটা কি? কনসার্ট আস্তে হয়ে গেল কেন? নায়ক-পক্ষের কে একজন উঠে দাঁড়িয়েছে। কি বলছে। ও, মেডেল! রূপোর পাত গোল করে কেটে মেডেল!

—গত কাল মঞ্জরী দেবী জনা এবং মোহিনীমায়া এই তুটো বিপরীতভাবের পার্টে যা আশ্চর্য অভিনয় করেছেন তার জন্য আমাদের কর্তৃপক্ষ তাঁকে একখানি সোনার মেডেল দেবেন।

গুড—গুড—গুড। ভেরী গুড।

—আর এই দৃশ্যে বিশেষ নৃত্যের জন্য অলকা চৌধুরীকে আমরা একখানি রূপোর মেডেল দেব।

গুড। ভাল নেচেছে মেয়েটা। গোরাবাবুর সাজেশনটা ভাল ছিল।

* * * *

—কনগ্র্যাচুলেশন ম্যাডাম। উই আর অল গ্ল্যাড।

বাবুল বোস এসে দাঁড়াল মঞ্জরীর সাজবার টেবিলের সামনে।

—শুধু গ্ল্যাড নয়, ভেরী গ্ল্যাড। ভেরী ভেরী গ্ল্যাড। অত্যন্ত আনন্দিত আমরা। সোনার মেডেল বলে বেশী আনন্দ। রীতুবাবু বাবুলের পিছনে ঢুকল।

মঞ্জরী হাসিমুখে উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এসে হেঁট হল—প্রণাম করবে রীতুবাবুকে। রীতুবাবু বিব্রত হয়ে বললে—এই দেখুন! এ কি? না—না—না। দু হাত তুলে কপালে ঠেকিয়ে বললে—প্রণাম নেওয়া সহজ নয়। অপরাধে ফেলছেন আমাকে।

হেসে গোরাবাবু বললে—মঞ্জরী ভুল করে না মাস্টারমশাই ওখানে। দেখুন না আমাকেও করে নি। আপনাকে করেছে।

মঞ্জরী ঘোমটা একটু টেনে দিলে শুধু। উত্তর করলে না।

বাবুল বললে—আমাদের কিন্তু খাওয়াতে হবে। গোল্ড মেডেল একটা নয়, দুটো।

হেসে মঞ্জরী বললে—বেশ তো। কি খাবেন সব বলুন?

বাবুল বললে—প্লেন অ্যাণ্ড সিম্প্‌ল্‌—লুচি অ্যাণ্ড মাংস। এবং শুভস্য শীঘ্রং—কাল রাত্রে লাস্ট নাইটে এখানে। এখানে নায়কেরা নেমন্তন্ন করবে না—আমি খোঁজ নিয়েছি।

—তাই হবে।

গোরাবাবু হেসে বললে—আমার একটা বক্তব্য আছে।

—কি?

—এর ওপর মিষ্টি।

—তুমি দাও।

—আমি কেন। ভাল লোক রয়েছে। তিনটে মেডেল হোল্ডার। শ্রীমতী অলকা। কি গো!

পুলকিত হয়েই অলকা বললে—নিশ্চয় দেব।

—না। মঞ্জরী বললে—না, সেটা অন্যায় হবে।

—না না। আমি খুব আনন্দ পাব, এটা আমার সৌভাগ্য মনে করব।

—তুমি করবে। কিন্তু আমি তা হতে দেব না। তোমার কথা জানি আমি। তবে মিষ্টিও হবে, তোমার দেওয়াও হবে—সেটা আর কেউ দেবে। উনি দেবেন।

—আমি তোমারটা দেব—তুমি অলকার দেবে।

—না। আমারটা আমি দেব। সেটাও তোমারই দেওয়া হবে। আমি অলকারটা দিলে নাম হয়ে যাবে দলের। তার থেকে তুমি দেবে সেই ভাল। মাস্টারমশাই কি বলছেন? আজকের মেডেলটা অলকাকে তুমিই পাইয়ে দিয়েছ। সাজেশন তোমার নাচের। সুতরাং—

—সাজেশন ওঁর, আমার না। জিজ্ঞেস কর।

—তুমি তো আমাকে বলেছ। তা হলেই হল।

গোপাল ঘোষ এসে ভিড় ঠেলে ঢুকল—ওদিকে যে কনসার্ট শেষ হয়ে এল। আর একটা দিতে বলব?

রীতুবাবু হঁ-হাঁ করে উঠল—না না না। এমন কাজও করো না। জুড়িয়ে যাবে। যাও—যাও। বাবুল, তোমার—তোমার পার্ট। কালো চাদর—

দৃশ্যটা হচ্ছে—শনি দৈত্যদের ভয়ে কালো একখানা চাদর জড়িয়ে একটা ঝোপের মধ্যে বসে আছে। মশা কামড়াচ্ছে। পোকা কামড়াচ্ছে। একটা কি গায়ের ভিতরে উঠে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই সাজঘরটার চেহারা পালটালো। সব আবার ডুবল আপন আপন পার্টের মধ্যে। কেউ পোশাক বদলাচ্ছে, কেউ মুখের রঙটা ঠিক করছে, কেউ নতুন সাজছে।

গোপালী এসে দাঁড়াল—রঙটা দেখে দাও। আর কি গয়না দিয়েছ? ইন্দ্রাণীর ওই ক'ছড়া মুক্তোর মালা?

—কি করব? অলকার জন্যে লাগল যে।

—আর তো নর্তকী নেই। খুলে দিক। বল তুমি।

—সে কোথায়?

—কৃষ্ণ সাজছে আবার

বেশকারী বললে—আমি ঢুকব কি করে মেয়েদের ঘরে ?

—পর্দার এপার থেকে চাও।

—আপনি চেয়ে নিন তার চেয়ে।

—আমার কি দায় ? আমি বলতে যাব কেন ? না পাই এমনি নামব গিয়ে। এখানে আর টেঁকে থাকা যাবে না বেশ বুঝছি। সব পাগল বাবা !

রীতুবাবু জানালার ধার থেকে ফিরে দাঁড়াল। বললে—কি হল গো গোপালী ! সব পাগল হয়ে গেল ?

—গেল না ? আমাদের চোখ নেই ? দেখছি নে ?

—নাটু ? সেও হয়েছে ?

—সব মাস্টারমশাই, সব। চারটি লোক বাদে। আপনি গোপালবাবু—না থাক। কে ফ্যাসাদে পড়ে ! আসরের লোকেরা পর্যন্ত ক্ষেপছে। খাপচো মুখ দেখে। নামলেই মেডেল।

—তুমিও আজকের পাট ভাল কর না, তাহলে নির্ঘাত মেডেল পাবে। পটলীচারু প্রথম করেছিল। পেয়েছিল। শুধু ভাল মেক-আপ—বেশ ডিগনিটির সঙ্গে ঢোকা বেরুনো দাঁড়ানো—আর রাজরানীর মত বলা। বাস্ ! পার্টটি বড় ভাল। শচীকে বন্দিনী করতে এল দৈত্যেরা। বেরিয়ে এসে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়ালে—গলায় ময়ূরীর শোভা, সিংহিনীর মহিমা। বললে—

গোপালীর কাছে এসে দাঁড়াল রীতুবাবু, বুঝিয়ে বললে—তুমি বলবে—কে আমারে বন্দী করে ? বন্দী ? নাও কর। শেকল দিয়ে বাঁধতে যাবে—শেকল খুলে ভেঙে যাবে। হেসে উঠবে তুমি। বলবে—আমারে বন্দিনী করা যায় না রে মূঢ় ! সে শৃঙ্খল হয় নি রচিত। ভাল—চল্, চল্ তোর প্রভুর নিকট। চল্ দেখি—সে কে ! বেশ গৌরবের সঙ্গে বেরিয়ে আসবে। তারপর স্বর্গে সিংহাসনে বসে

আছে শঙ্খচূড়। এসে দাঁড়াবে—তুমি মুগ্ধ হয়ে গেছ। বেশ একটু টেনে ইমোশন দিয়ে বলবে—বাঃ বাঃ—কেবা তুমি বীর্যবান পুরুষ-পুঙ্গব? সিংহ-সম ক্ষীণ কটি—বক্ষপট প্রশস্ত উদার—নীলকান্ত মণি-সম দেহবর্ণচ্ছটা! চক্ষে তব বহ্নিদীপ্তি প্রশস্ত ললাট! বাঃ বাঃ! তুমি কি নূতন ইন্দ্র? বাঃ বাঃ! শঙ্খচূড় বলবে—আমি শঙ্খচূড়! সঙ্গে সঙ্গে কেড়ে নিয়ে বলবে—তুমি—তুমি শঙ্খচূড়? দৈত্য অধিপতি? গলা পালটে ফেলবে—যেন নিজেকে বলছ—দেবতারা বলেছিল, শঙ্খচূড় সর্প-সম ক্রূর—ভীষণ আকৃতি—মুখে চোখে বর্বরতা—নিষ্ঠুর প্রকৃতি—অতি হীন চরিত্র তাহার! না—না—এ তো তাহা নয়! শঙ্খচূড় বলবে—আজ আমি বাহুবলে স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়াছি। ইন্দ্র পরাজিত—ভীরু সে দেবতা, প্রাণভয়ে পলায়েছে কোথা কোন্ পর্বতকন্দরে। তবু নাহি পাইবে নিস্তার। স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে আজ অখণ্ড আমার অধিকার। কিন্তু তুমি—শচী! ইন্দ্রের মহিষী! আজ তুমি বন্দিনী আমার! তুমি হেসে উঠবে—বন্দিনী? শঙ্খচূড়, আমি কভু হই নে বন্দিনী! তারপরই এক পা একটু ঠুকে মাথাটা সোজা করে বলবে—একটি একটি করে বলবে—আমি মহেন্দ্রাণী! অনন্তযৌবনা,—আমি চিরন্তনী। শঙ্খচূড়, কালে কালে কল্পে কল্পে ইন্দ্রপাত হয়। এক ইন্দ্র যায়, নব ইন্দ্র বসে সিংহাসনে—বামপার্শ্বে আমি চিরকা—ল! ইন্দ্র পায় ইন্দ্রের মহিমা, আমার প্রভায়।

তুলসী ঢুকে বলবে—কালে কালে কল্পে কল্পে ইন্দ্রপাত হয়—নব ইন্দ্র আসে—বসে সিংহাসনে—তুমি চিরন্তনী—বসে আসিতেছ সবাকার বামভাগে—অনন্তযৌবনা তুমি—বাঃ বাঃ বাঃ!

তুমি হেসে বলবে—বড়ই দুর্বোধ্য লাগে—নয়? তুমি বুঝি দৈত্যকুলরানী?

—মানবকুলের কন্যা ধর্মধ্বজ সুতা!

—শুন লো মানবী! আমি মহেন্দ্রাণী এই তত্ত্ব তুমি বুঝিবে

না। তুমি বেশ টেনে একটু ব্যঙ্গ মিশিয়ে বলবে—হ্যাঁ। ওদিকে তুলসী সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত কটু করে বলবে—মর্ত্যভূমে এই তত্ত্বও আছে দেবী। মোরা তারে কহি বারাঙ্গনা তত্ত্ব। তুমি বারাঙ্গনা!

একবারে ঘাড় সোজা করে বলবে—চেঁচাবে না—খবরদার—বলবে—রাজশ্রী—ইন্দ্রের মহিমা আমি! নহি বারাঙ্গনা! দৈত্যকুল-রানী, ওই সিংহাসনে—তুমি যদি বামপার্শ্বে বসিব যাও, নারিবে বসিতে। আমি তব অঙ্গে যাব মিশাইয়া—রূপসী তুলসী তুমি হবে অপরূপা; শুধু অপরূপা নয়, মহিমামণ্ডিতা। তবে—তবে তুমি পারিবে বসিতে। মহেন্দ্রাণী চিরন্তনী, মহেন্দ্রাণী অনন্ত-যৌবনা, মহেন্দ্রাণী চিরশুদ্ধা, মহেন্দ্রাণী মহিমার দেবী! আমি ভোগ্যা নই। আমি সতী নই, আমি অসতীও নহি, তারও উর্ধ্বে আমি। বুঝেছ?—হ্যাঁ। দেখ, ভাল করে বলো। কি হয়—মেডেল পাও কি না দেখ। তারপর ওরা দুজনে তোমাকে বরণ করবে। ওই যা—পার্ট এসে গেল! চলি আমি। দে রে আমার ডম্বরু ত্রিশূল। দে—দে। হ্যাঁ, গোপালীর মুখে আর একবার পাফ দে। সুন্দর করে দে।

অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে রইল গোপালী। কানে বাজছে তার—আমি মহেন্দ্রাণী, আমি চিরন্তনী অনন্তযৌবনা!

—আসুন, ঠিক করে দি পাফ দিয়ে। মাথায় কোন্ মুকুট পরবেন দেখুন।

—সব থেকে ভাল মুকুটটা দাও। তুলসীর মুকুটের থেকে ভাল হওয়া চাই।

আয়নায় নিজেকে ভাল করে দেখে সে ফিরে এল নিজেদের অর্থাৎ মেয়েদের সাজঘরে।

—শোভাদি, দেখ তো।

—ভাল হয়েছে রে।

সে মঞ্জরীর ঘরে গেল। মঞ্জরীকে প্রণাম করে দাঁড়াল—দেখুন ঠিক হয়েছে?

মঞ্জরী ভাবছিল—সে মুখ তুলে শুধু বললে—বেশ।

একটু দাঁড়িয়ে রইল গোপালী। মনটা কেমন হয়ে গেল। দিদিও অলকাকে নিয়ে তাকে ভুললে! ভুলো না দিদি, ভুলো না। ঠকবে। একটি সূক্ষ্ম বক্রহাস্য তার অধরে খেলে গেল। মঞ্জরী বললে—আর কিছু বলছ?

সে বললে—উনি? উনি কোথায় গেলেন? প্রণাম করব।

—জানি নে তো। প্লে দেখছেন বোধ হয়!

গোপালী বেরিয়ে এল। সেও গিয়ে দাঁড়াল আসরে একপ্রান্তে মানুষের ছায়ার আবরণে। পার্ট করছেন রীতুবাবু, মহাদেব সেজেছেন। নাটুবাবু ইন্দ্র। অলকা রয়েছে—শ্রীকৃষ্ণ।

ওই যে গোরাবাবু! মাথায় একটা চাদর দিয়েছেন। তবু চেনা যাচ্ছে। লম্বা মানুষ। একাগ্রচিত্তে দেখছেন। দেখছে প্রায় সবাই। ওই মণি ঘোষ, বাবুল বোস—ওই গোপাল ম্যানেজার—ওই একদল বাচ্চা—ওই যোগাবাবু, ওই পাশাপাশি বংশীমাস্টার আর আশা। তার চোখও ফিরল আসরের দিকে—হা-হা করে হাসছেন মহাদেববেশী রীতুবাবু।

কৃষ্ণ বলছেন—শঙ্খচূড়ের সঙ্গে যুদ্ধ আমি করতে পারব না দেবরাজ! শঙ্খচূড় পূর্বজন্মে ছিল সুদাম। তুলসী আমার সখী। আমি যদি চক্র ছেড়ে বাঁশী ধরে বসি—কি হবে তখন?

তার উত্তরে শিব অট্ট হেসে বলছেন—হা-হা-হা-হা, হায় কৃষ্ণ, মিটে নাই প্রেমের পিপাসা! বলি ওহে কিশোর প্রেমিক! বৃন্দাবনে রাধা সনে ষোল-শো গোপিনী। রাসলীলা, দোললীলা, ঝুলনায় ঝোলা। অন্তহীন প্রেমলীলা। দ্বারকায় সহস্র মহিষী। ব্রহ্মা সাক্ষী স্বচক্ষে দেখিলা একসঙ্গে সহস্র মহিষী কক্ষে সহস্র হইয়া তুমি কর প্রেমলীলা! আরও সাধ—হা-হা-হা-হা!

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—আরও সাধ মহেশ্বর! তবে ব্রজলীলা তরে আর তৃষ্ণা নাই। সাধ মোর বলিব কি মহেশ্বর? সাধ মোর—আর একবার, সমুদ্রের বালুতটে মোহিনী হইতে—মোহিনী হইয়া আমি ত্রিভুবন ছুটিয়া বেড়াই—পাছু পাছু মোর রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রভু মহেশ্বর দু বাহু মেলিয়া প্রিয়া প্রিয়া বলি বেড়ায় ছুটিয়া। বাঘছালখানি খসে গিয়ে দিগম্বর ভোলা—। লজ্জা ক্ষোভে মহামায়া আরক্তবদনা—।

রীতুবাবু হেসে উঠল—হা-হা-হা-হা-হা-হা!

ছুটে বেরিয়ে এল শ্রীকৃষ্ণ। আসর হাততালিতে ভরে উঠেছে। অভিনয় সত্যিই ভাল হচ্ছে। বড় ভাল। রীতুবাবু আসরের শেষে পা দিয়েই বললে—হাউইয়ের মতই সোজা উঠছে স্যার। শেষটা ফাটিয়ে লাল নীল সবুজ ফুলঝুরি ফোটাবেন আপনারা দুজনে। সে ভার আপনাদের।

গোরাবাবুকে বললে। গোরাবাবু অলকাকে তারিফ করছে—বাঃ বাঃ!

গোরাবাবু আজ বেশ খেয়েছে। শেষ পর্যন্ত—

* * *

না। শেষ পর্যন্তই গোরাবাবু সমানে অভিনয় করে গেল। রীতুবাবু যা বলেছিল তাই করলে—অভিনয়ের হাউইটাকে উপরে তুলে ফাটিয়ে যেন নানা রঙের ফুলঝুরিতে আকাশে আলোর মালা ভাসিয়ে দিলে। তবে হ্যাঁ—প্রোপ্রাইট্রেস অভিনয় করলে বটে! একেবারে নতুন খেলা! রীতুবাবু পর্যন্ত বললে—আরে বাপ—করলে কি, করছে কি! একেবারে নতুন!

কথাটা ঠিক। মঞ্জরী অপেরা প্রথম দুখানি বই নিয়ে নেমেছিল, প্রবীরপতন আর সতী তুলসী। গোপালী বছর দুয়েক পর থেকেই দলে রয়েছে। প্রথম করত শুধু রাধা। তারপর বছর দুয়েক মহেন্দ্রাণীও করছে। সে বহুবার দেখেছে। অভিনয় শেষ দুটো

দৃশ্যের খুব জমাট—ভালও হয় খুব। কিন্তু এ ধারায় অভিনয় কখনও করে নি মঞ্জরী।

তুলসীর সতীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকতে শঙ্খচূড়ের বিনাশ নেই। স্বয়ং মহাদেব যুদ্ধ করে কিছু করতে পারছেন না। কৃষ্ণ বললেন—আপনি শঙ্খচূড়কে যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখুন। আমি যাচ্ছি। শঙ্খচূড়ের ছদ্মবেশে সথী তুলসীর আমাকে পূর্ণরূপে পাবার কামনা পরিপূর্ণের সময় এসেছে। তাকে সম্ভাষণ করতে চললাম। তাতেই মানবের শাস্ত্র বিচারে তার সতীত্ব ক্ষুণ্ণ হবে। শঙ্খচূড়ের বিনাশ হবে। শঙ্খচূড়ের বেশে কৃষ্ণ এসে বললেন—জয়লাভ করে এসেছি। মহাদেব পরাজিত। দেবী, তার পুরস্কার চাই। আনন্দ—আনন্দ—তোমা সাথে অপার অপার আনন্দ। হাত ধরে নিয়ে চলে গেলেন। এর পরই একটা গান। আজ গেয়েছে নবীন গায়ক দেবু। ভাল গেয়েছে। তারপরই শঙ্খচূড়বেশী নারায়ণ বেরিয়ে যাচ্ছেন—পিছন থেকে আসে তুলসী। চুল এলোমেলো—চোখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি। বলতে বলতেই ঢোকে—কে তুমি? কে তুমি? দাঁড়াও ক্ষণেক!

শঙ্খচূড়বেশী শ্রীকৃষ্ণ বলেন—এ কি তুলসী—এ কি কথা কহ? আমি শঙ্খচূড়—স্বামী তব—

তুলসী বলে—না না না। প্রতি রোমকূপ মম কহিতেছে, নহ—নহ—নহ। চাও মোর মুখপানে। এ কি, কেন তব নত হল আঁখি! কেন—কেন মোর সর্ব অঙ্গ জ্বলে যায় গরল জ্বালায়! বল—বল—বল কে তুমি? কে তুমি মায়াবী—কোন্ প্রতারক—কোন্ শঠ—কে তুমি লম্পট—নিষ্ঠুর কুটিল—আমার স্বামীর বেশে আসি সর্বনাশ করিলে আমার? কোন্ অপরাধ করেছিনু তোমার নিকটে? বল—বল—বল।

শঙ্খচূড়ের হাত ধরে সে আর্তনাদ করত আগে—যেন কান্নায় ভেঙে যেত। বলত—বুঝিতেছি সামান্য মানব নহ। তাই তো শুধাই—কেন—কেন—কেন?

আজ কিন্তু সে ঢুকল যেন জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মত। রীতুবাবু তাই বলছে—একেবারে আগুন হয়ে যেন জ্বলতে জ্বলতে ঢুকল। বাপ রে! মঞ্জরীর কণ্ঠস্বর উচ্চ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল বর্ষার ফলার মত। চোখে মুখে কি ক্রোধ! বাপ! খানিকটা জনা এসে গেল যেন। কিন্তু আশ্চর্য ফল। আসরের মানুষদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আসরের মানুষ পরের কথা, গোপালীর নিজের উঠেছিল। তাতে দস্তুরমত অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল গোরাবাবুকে। এমন পাকা অ্যাক্টর—উঁচুদরের অ্যাক্টর, যেন দু'চার সেকেণ্ড থমকে গেল। তারপর বললে। আগে সেও মিষ্টি হেসে বলত—কতকাল আগে তুমি সুন্দরী তুলসী, আমারে ডাকিয়াছিলে—চেয়েছিলে মনে মনে—এতকাল পরে সময় হয়েছে, তাই এসেছিনু—। কিন্তু কথাগুলিতে যেন পাল্টা অভিযোগ এসে গেল।

—মিথ্যা মিথ্যা। মিথ্যাবাদী তুমি। আমি ডাকি নাই—ডাকি নাই—ডাকিতে পারি না—প্রবঞ্চক মিথ্যাবাদী তুমি।

—মনে কর পূর্বজন্মকথা।

—পূর্বজন্মকথা? না—না—না।

—নয়ন মুদিয়া দেবী ক্ষণেকের তরে স্মরণ করহ। বৈকুণ্ঠ অমৃতলোক; রাধাকুঞ্জে রাধা-সহচরী তুমি অপরূপা তুলসী সুন্দরী—আর আমি—কৃষ্ণ—রাধা প্রিয়তম—

তুলসী বলে উঠল—তাই তুমি এতকাল পরে জন্মান্তরে এহেন কলঙ্ক আর সর্বস্ব হরিয়া শাস্তি দিয়ে মিটালে প্রার্থনা?

হা-হা করে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

আগে থাকত অভিমান-মেশানো অভিযোগ—মর্মান্তিক দুঃখ। আজ সে শুধু রাগই করলে। প্রথমেই রাগের সুরে আরম্ভ করে আর ফিরতে পারলে না।

নাটু রীতুবাবু বাবুল মাস্টারের পাশে সেও দাঁড়িয়ে দেখছিল। সে মৃদুস্বরে বললে—আজ আর কান্নাটা হল না কিন্তু। রীতুবাবু

মৃদুস্বরেই উত্তর দিলে—হয় না—আসে না—গোড়াতে সুরটাই অন্যরকম।

—থামুন মশাই। কানের কাছে ব্যাড়র ব্যাড়র করবেন না। শুনতে দিন।

রীতুবাবু মৃদুস্বরে কথা বললেও গলাটা ভরাট বলে চড়া হয়ে যায়। নাটু তার হাতে টিপ দিলে শুধু। চুপ থাকতে বললে।

এরপরই গান। দিবাকর গান গাইছে।—

তোমারই লীলায় কমল ফোটে, কমল ঝরে

তোমারই লীলায়—

তাহারই মাঝে জপমালা বীজ ধরে—এ—এ—এ।

তোমারই লীলায়—।

বেশ তালের মাথায় ঠিক ওরা বেরিয়ে গেল—ওদের পাশ দিয়ে গান ধরেই সে ঢুকে পড়ল। আসরের একটি মুহূর্তও যেন ফাঁকা রইল না, ফাঁক পড়ল না। পাখোয়াজ বেজে উঠল গম্ভীর ধ্বনিতে।

রীতুবাবুও বললে—বাঃ!

তাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল প্রথমে গোরাবাবু শঙ্খচূড়ের ছদ্মবেশীর পার্ট সেরে; সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছা ভেঙে তুলসী উঠে চীৎকার করে উঠল—কোথা যাবে—ভীরু পলাতক—কপট দেবতা! আমি তোমা ত্রিভুবন খুঁজিয়া ধরিব। দিব অভিশাপ—অভিশাপ—অভিশাপ! বলতে বলতে সে উন্মাদিনীর মত বেরিয়ে গেল। কেউ কোন কথা বলতে পারলে না। বলবার সময় নয়। অ্যাক্‌টর এখন ধ্যানে আছে। বাবুলমাস্টার বলে মুড। তার উপর মেক-আপ নেবে—চোখের কোলে কালি। আসর স্তব্ধ। যাত্রার দলের লোকদের বুকের ভিতরটা বাজনার সঙ্গে যেন নাচছে, অভিনয় দেখার আনন্দের সঙ্গে ওদের নিজেদের সাফল্যের আনন্দ ফুলের সঙ্গে ফলের মত একসঙ্গে ধরে উঠেছে। হয়তো সাধারণ অ্যাকৃটরের এ সাফল্যে অনেকের একটু আধটু হিংসে হত কিন্তু প্রোপ্রাইট্রেস আর তার কর্তার ক্ষেত্রে

তা হয় না, হবার নয়। ওই কাতরাতে কাতরাতে ছিন্ন সেই মালা—তুলসীর দেওয়া সেই মালা—যেটা তুলসীর সতীত্বনাশের মুহূর্তেই ছিঁড়ে গেছে সেইটে হাতে করে শিবের শূলে আহত শঙ্খচূড় ঢুকছে—হায় তুলসী—হায় সর্বনাশী, কি করিলি—কি করেছিস তুই? কার, কার মোহে আমারে ভুলিয়া—

সে বসে পড়ল আসরে—পিছনে ঢুকল কৃষ্ণ। ডাকলে—মোর মোহে সখা, মোর মোহে।

—তুমি?

—হ্যাঁ, আমিই তো তুমি! তুমি খণ্ড—আমি পূর্ণ। খণ্ড আজ পূর্ণে হবে লীন—তাই তুলসীরে পূর্ণের আস্বাদ পেতে হল।

শঙ্খচূড় আনন্দে দীপ্ত হয়ে করজোড়ে স্তব করতে লাগল—গীতার শ্লোক—ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্। আবৃত্তি চমৎকার করে গোরাবাবু। রীতুবাবু বললে—আহা—হা, সকলেই বলছে। একে গীতার শ্লোক তার উপর নাটকীয় মুহূর্তে এমন আবৃত্তি! তার আগে হয়ে গেছে গোটা নাটকটা। মানুষ অভিভূত হয়ে গেছে। আ! তুলসীবেশী মঞ্জরী ঠিক এসে দাঁড়িয়েছে মূল আসরের মুখে কৃষ্ণের পিছনে। কৃষ্ণ শঙ্খচূড়ের সামনে। দুজনেই দেখতে পাচ্ছে না। একেবারে স্থির মূর্তির মত দাঁড়িয়ে। শ্লোক আবৃত্তি শেষ হওয়ামাত্র সে বিষণ্ণকণ্ঠে বলে উঠল—আমি তোমা স্তব করিব না। আমি তোমা দিব অভিশাপ।

কৃষ্ণ ঘুরলেন। শঙ্খচূড় দেখলে—বলে উঠল—তুলসী, না না!

কৃষ্ণ হেসে বললেন—দেবী, ক্ষমা করিবে না? এত আয়োজন তোমারে ফিরায়ে নিতে বৈকুণ্ঠ নিলয়ে।

তুলসী বিষণ্ণভাবে ঘাড় নেড়ে বললে—না। গৌরব হারায়ে সর্বরিক্ত হয়ে তুলসী যাবে না আর বৈকুণ্ঠে তোমার। আমি রব মর্ত্যধামে। অশান্ত প্রেতাত্মা মম ঘুরিবে হেথায়। তুমি রবে—তোমারে থাকিতে হবে। মোর অভিশাপে—

ক্রোধে রণ রণ করে উঠল তুলসীর কণ্ঠ—তুমি নিষ্ঠুর পাষাণ সম আচরণ করিয়াছ। মোর অভিশাপ—হস্তপদ অবয়বহীন হৃদয়বর্জিত শিলাখণ্ড হয়ে তুমি রবে ধরণীতে। পাথর পাথর—হইবে পাথর!

কৃষ্ণ হেসে বললেন—তাই হবে দেবী। আমি রব তব সাথে এই ধরণীতে শিলারূপী হয়ে। তুমি চাও রহিতে ধরায়—তুমি রবে হেথা শুচি গন্ধময়ী বৃক্ষরূপা হয়ে। তব নামে হবে তার নাম; তুলসী—তুলসীবৃক্ষ! শিলারূপী মোর একমাত্র তৃপ্তি হবে তুলসীর পত্র শিরে ধরি। শিলারূপে বক্ষে শিরে আমি তোমা করিনু ধারণ।

তুলসী এল শঙ্খচূড়ের কাছে—বল প্রভু, বল তুমি—অপরাধ নাহি মোর। আমি নই কুলটা অসতী!

শঙ্খচূড় বললে—তুমি সতী—তুমি সতী—সতীকুলশিরোমণি তুমি। নারায়ণ প্রিয়তমা—

—না না না। শঙ্খচূড় প্রিয়তমা আমি। এই দেহে বিষ জ্বালা, চিতায় জ্বলিতে তবে জুড়াইবে জ্বালা। জ্বাল—জ্বাল চিতা। সহমৃতা হব।

ছুটে বেরিয়ে গেল তুলসী। গ্র্যাণ্ড সাকসেস! গ্র্যাণ্ড! চল। সকলে ছুটে এল সাজঘরে। গোপালী রীতুবাবু বাবুল সর্বাগ্রে ছুটে গেল মঞ্জরীদের সাজঘরে।

এ কি! ঘরের মধ্যে গোরাবাবু কঠিন রূঢ় কণ্ঠে বলছে—এর মানে আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার? এই ভাবে হঠাৎ পার্টের রকম-সকম বদলে—

—না। সমান কঠিন কণ্ঠে উত্তর দিল মঞ্জরী।

—না?

—শিউনন্দন, বাতি নে। আমি বাসায় যাব। আমার শরীর খুব খারাপ। শিউনন্দন—

গোরাবাবু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মঞ্জরী বেরিয়ে এল। রীতুবাবু বললে—কি হয়েছে? মাথাধরা?

—না। শিউনন্দন—

—এই যে হামি দাঁড়াইয়ে আছি।

—চল্।

—জিনিসপত্তর—

—থাক, থাক। গোপালবাবুকে বল্। নিয়ে যাবেন। চল্।

চলে গেল মঞ্জরী। দলের এত বড় সাফল্যের আনন্দ যেন কেমন হয়ে গেল মুহূর্তে। রীতুবাবু ফিরে নিজেদের সাজঘরে এসে বসে মদের গ্লাস পরিপূর্ণ করতে করতে বললে—বি—চি—ত্র এ নরলীলা! সৃষ্টি সরোবরে সুরভিত শতদল এ লীলাকমল! অফুরন্ত মধু! অনন্ত সৌরভ! স্রষ্টা নিজে লুব্ধ হয়ে মধুপান তরে ভৃঙ্গ হয়ে আসে। জীবনে জীবনে, হৃদয়ে হৃদয়ে যত পাবার কামনা, তত তার প্রচণ্ড বিদ্বেষ। যত কান্না তত হাসি।

বাবুল ঘরে ঢুকল উত্তেজিত হয়ে—স্যার!

ভুরু তুলে ইঙ্গিতে বললে—কি? প্রশ্নটা করেও রীতুবাবু বলে গেল—তবু হেথা শুধুই আনন্দ। হাসিতে আনন্দ যত, অশ্রুজলে আনন্দ তেমনি।

—কি বলছেন?

—তুমি কি বলছ?

—গোরাবাবু পোশাক খুলছিল—মালা, জামা, চাদর, চুল খুলে কাপড় ছাড়তে গিয়ে না ছেড়ে টর্চটা তুলে নিয়ে হনহন করে বেরিয়ে গেল। বললাম—কোথায় যাচ্ছেন? বললেন—বাসায়। আমার কাপড়খানা বেশকারীদের দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন গোপালবাবু। মনে হল দুজনে—

—হুঁ, সেইজন্যে—

—কি? অভিনয়ের আড়াল দিয়ে অভিনয় হয়ে গেল। সতী তুলসী কাঁদল না। জ্বললই শুধু।

—ইয়েস! কজ? কারণ? স্যার—

—মদ খাও।

—অলকা!

—চুপ কর।

—রীতুবাবু মাস্টারমশাই, গোপাল ঘোষ ঘরে ঢুকল—কণ্ঠস্বর তার শঙ্কিত উৎকণ্ঠাভরা।

—কি গোপালবাবু?

—কর্তা চেঁচাচ্ছিলেন বাসায়।

—চেঁচাচ্ছেন? মদের গ্লাস হাতে করেই এল রীতবাবু বাইরে। হ্যাঁ—শোনা যাচ্ছে শব্দ। রীতুবাবু বললে—চল—বাসায় চল।

বাসাটা এখানে কাছেই। বাসায় এসে রীতুবাবু থমকে দাঁড়াল। বাসার বারান্দায় ক্লিটে ক্লিটে রান্না হচ্ছিল—সব ছেড়ে-ছুড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, শুনছে।

গোরাবাবু উচ্চকণ্ঠে বলছে—বারান্দায় দাঁড়িয়েই বলছে—হ্যাঁ হ্যাঁ—হ্যাঁ। পাটের কথাগুলো তুলসী শঙ্খচূড়বেশী কৃষ্ণকে বলে নি।

সমান উচ্চকণ্ঠে উত্তর এল ঘর থেকে—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ। বলেছি আমি তোমাকে। বলেছি। স্বীকার করছি।

—কেন? কেন বলবে?

—সত্য বলে বলেছি।

—সত্য?

—হ্যাঁ সত্য। সে কথা চীৎকার করে বলব না। বলব রাত্রে। শিউনন্দন, অলকার বিছানাটা মেয়েদের ঘরে দিয়ে আয়।

—না। দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল গোরাবাবু।—যেমন আছে তেমনি থাকবে।

—তাহলে বলি। আজ প্লের সময় সাজঘরের পিছনে তোমার আর অলকার নিরালায় হাসি কথা আমি শুনেছি।

—প্রতিবাদ করতে পার?

—পারি কিন্তু করব না। একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে আবার বললে—কাল প্লে আছে। কাল না, পরশু সকালে এর প্রতিবাদে যা বলবার বলব।

তারপর সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। রীতুবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মদের গ্লাসটি শেষ করে বাসার বারান্দায় উঠতে উঠতে বললে—যাও। যাও সব—রান্নার কাজে লেগে পড়। রাত্রি অনেক হয়েছে। কাল গাওনা আছে।

নিজের ঘরে চুপ করে বসেই থাকল রীতুবাবু। পাশে বাবুল নাটু মণি—এরাও ভাম হয়ে বসে আছে। হঠাৎ রীতুবাবু বললে—একবার যাব নাকি?

—যান। যান।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রীতুবাবু বললে—নাঃ।

—কেন?

—দেখ, যাত্রার দলে থাকি। জীবনটাই কাটল। লজ্জা নেই। তবে মনে হচ্ছে অপরাধ হবে।

—কেন?

— বোকা বাবুলমাস্টার। তুমি বোকা।

—গিল্‌টী মাইণ্ড!

—আঃ!

বারো

পরের দিনটা একটা স্তিমিত স্তব্ধ দিন। যেন একটা বিষণ্ণ বর্ষা-বাদলের দিন। কাজ সবই চলল—কিন্তু মানুষের এবং জীবনের যে উল্লসিত প্রকাশ কর্মজগৎকে প্রগল্‌ভ মুখর করে রাখে সেইটে নেই। বাজারও হয় হাটও হয় রান্নাও হয়, মানুষ খায় কাজেও বের হয় কিন্তু ভিড় থাকে না। রাস্তা নির্জন হয়ে ওঠে; বাজারের দোকানে বসে দোকানী ঝিমোয়, হাই তোলে, তুড়ি দেয়; চায়ের দোকানে তর্ক

থাকে না—চায়ের কাপ সামনে রেখে অলস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে খদ্দের, হাতে আঙুলের ফাঁকে সিগারেটটা পুড়িয়ে চলে। কাক পর্যন্ত গাছে বসে গা ঝাড়ে মধ্যে মধ্যে। পায়রাগুলো থামের মাথায় গা ফুলিয়ে বসে থাকে—ডাকে না। তেমনি ভাবে যাত্রার দলের কাটল। কর্ণ অভিনয়ও হয়ে গেল। কিন্তু সেখানেও তাই। পালাটা জমল না ভাল। খারাপ বলা চলে না। কিন্তু প্রাণহীন। তারাও অনুভব করলে; লোকেও অনুভব করলে। বললেও সে কথা—আজ পালা ধরল না।

কর্ণের পার্টে রীতুবাবু শুধু একা যেন দুর্ধর্ষ মাঝির মত টলমল পালাটাকে টেনে কূলে ঠেকালে। যেমন গলা তেমনি পার্ট তেমনি প্রাণবন্ত আবেগ। তার সামনে পদ্মাবতী নিজে মঞ্জরী যেন আজ নিস্তেজ ক্লান্ত লতার মত ম্লান। না প্রেমের সিনে, না করুণ সিনে—কোন সিনেই যেন কাল পরশু তরশুর মঞ্জরী বলে মনে হল না। তার থেকে গোরাবাবু অর্জুনের পার্টে অনেক ভাল করলে। দ্রৌপদী গোপালীবালা যেমন করে তাই করলে। শকুনিতে বাবুল বোস, রঙ্গরস জমালে কিন্তু প্রতিহিংসার নিষ্ঠুরতা ফোটাতে পারলে না। অলকার পার্ট সব থেকে খারাপ হল। ব্রহ্ম অভিশাপ পার্টটি কর্ণার্জুনের নিয়তির ছায়া। সে পার্টে সে যেন দাঁড়াতেই পারলে না। সাজঘরে একলা একদিকে বসে রইল। কথা সে সারাদিন বলে নি—সাজঘরেও বললে না।

গোটা প্লের মধ্যে সাজঘরও ঠাণ্ডা হয়ে রইল। সকাল বেলা থেকে রাত্রে পালা শেষ পর্যন্ত, সকালবেলা ছেলেগুলো খানিকটা সহজভাবে জমতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু গোপাল ঘোষ সামান্যতেই এসে খেঁকিয়ে তাদের ঠাণ্ডা করে দিয়েছে।

বোন সকালে উঠে থেকে গোপাল ঘোষ প্রতীক্ষায় বসেছিল কখন ডাকতে আসবে শিউনন্দন, অন্ততঃ খবরটা পাবে কিন্তু শিউনন্দন আসেই না। সে দেখতে পাচ্ছে—গোরাবাবু বাইরে তক্তাপোশে

বসে সিগারেটের পর সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। মঞ্জরী ঘরের মধ্যে, বারেকের জন্য তার শাড়ির একটুকরোও দরজার মুখে দুলে উঠল না। বারান্দার সামনে একটু আড়ালে একখানা রঙীন কাপড় কি বিছানার চাদর পেতে চুপ করে বসে আছে অলকা। তার উপর রাগের আর শেষ ছিল না গোপালের।

শিউনন্দন একবার বেশকারীদের হাঁক পেড়েছিল--রবীনবাবু, অ গো রবীনবাবু, এই সাজপোশাক সব লিয়ে যাও।

কাল রাত্রে মঞ্জরী পোশাক না ছেড়েই বাসায় চলে গিয়েছিল। গোরাবাবু জামা চাদর চুল খুলে বাকি কাপড় হাতের মালা কোমরের মালা খোলে নি—চলে গিয়েছিল। রবীন সেগুলো নিয়ে এল। তাকে গোপাল জিজ্ঞাসা করেছিল—শোন রবীন?

—কি?

ভুরুর ভঙ্গিতে প্রশ্ন করে সংক্ষেপে বলেছিল—কি রকম বুঝলে বল তো?

মুখ মচকে ঘাড় নেড়ে রবীন বলেছিল—বুঝলাম না। চুপচাপ সব।

—মুখ?

—তাও বুঝতে পারলাম না ভাল। কেমন ঠাণ্ডা সব।

—ঠাণ্ডা! তা হলে—

—জানি না।

রীতুবাবুর কাছে গেল গোপাল।—মাস্টারমশাই, কি করব বলুন তো?

উপুড় হয়ে পড়ে পিঠ টেপাচ্ছিল রীতুবাবু। শুয়ে শুয়েই বললে—কিসের গোপালবাবু?

—আবার কিসের? এখনও ডাক পড়ল না।

—ডাক না পড়লে যাবেন না।

—যাব না?

—এতকাল মেয়ে-যাত্রার দলে আছেন—এ সবের মধ্যে যায় ? আপনিই বলুন না ?

—একটা কিছু করুন। নইলে এমন দলটা ভেঙে যাবে ! এত-গুলো লোক—

—দূর মশাই ! হাঘরের দল। একটা ভাঙলে আর পাঁচটা দলে জুটে যাবে। এত ভাবেন কেন ? এসব ব্যাপার আপনা আমা থেকেই মেটে ? তবে হ্যাঁ, এদের ছুটিকে ঠিক সেই চোখে দেখি নি। ভাল লাগত। মনে হত যাত্রার দলে—নতুন একটা কি বলব—রকম—

—ধারা। ধারা স্যার, ধারা !

—ওই ! মডার্ন ছেলে। ঠিক কথা বলেছে। ধারা এল। এদের জন্যে দলে ছাড়াছাড়ি জোটাজুটিও কম হয়েছে। গোপালী নাটু বংশী আশা—দেখুন। অশান্তি হয় না তা নয়। আমি পটলীচারুর কথা জানি—এদেরও দু চারটে কথা—

—মাস্টারমশাই। নাম ধরে ধরে কথায় কাজ কি বলুন। কেন অশান্তি বাড়াবেন এর ওপর ? নাটু শুয়েছিল, উঠে বসল।

—থাক তা হলে। রীতুবাবু বালিশে ভাল করে মুখটা গুঁজে বললে—থাক তা হলে গোপালবাবু। কথাটা ঠিক। নাটু ঠিক বলেছে। যা হবার হবে। দেখুন না কি হয়।

—অলকা। দ্যাট গার্লকে বলুন—ও চলে যাক। বুঝেছেন স্যার ? বাবুল উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল।

হেসে রীতুবাবু বললে—এই রে ! খোঁচা খেয়ে সাপটা বেরিয়ে পড়ল ! আমি এঁচেছিলাম।

—কি ? অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করলে বাবুল—কি এঁচেছিলেন ?

—যা সত্য তাই। জেলাসি তার প্রমাণ !

—কচুর ইংরিজী কি স্যার ?

—জানি না। সম্ভবত কাচু!

—তা হলে আপনি তাই জেনেছেন—দ্যাট কাচু! বাবুল বোস স্টাফ আলাদা। এ কথা বলছি না যে, আমি সেণ্ট! তবে কি জানেন—আমের কথা বললেন না? সব আমই আম কিন্তু আমার জিভে ল্যাংড়া ছাড়া রোচে না। বিলিভ মি—আমি খাই না।

—এ দলে ল্যাংড়া আছে নাকি?

—আছে। বাট্ সি ইজ নট অলকা। ওটা স্যার কি জাত তা জানি না!

—আরে, তুমিই তো এনেছ।

—না বলছে কে? আমি তো বলেছিলাম—সব খুলে বলেছিলাম। তবে এতটা বুঝতে পারি নি। নো মোর! আমার দিকে তাকাবে না। ব্যাস। তা ও এসেই একেবারে নৈবিদ্যির মাথার মণ্ডায় লাগবে ডেয়ো পিঁপড়ের মত তা জানি? ডেঞ্জারাস মেয়ে। মালিক ঠিক দেখেছেন। আমিও দেখেছি স্যার ওদের দুজনকে সাজঘরের পিছনে।

—পিছনে পিছনে গিয়েছিলে?

—ওদের না। মালিকের।

—মালিকের?

—হ্যাঁ। দেখলাম—ছায়ামূর্তির মত সট্ করে বেরিয়ে চলে গেলেন। আমি চমকে উঠলাম। মাই খোদা—এ কি ব্যাপার? উনি চলেছেন রহস্যময়ীর মত—কাহার সন্ধানে? মার্জনা করবেন—আমি স্যার ভেবেছিলাম—সম্ভবত স্যার—

হেসে উঠল রীতুবাবু। বললে—জগৎসিংহের পার্ট আর মিলল না ভাই। ওসমানের পার্টেই এবারকার পালা শেষ।

—ঘাবড়াচ্ছেন কেন মাস্টারমশাই। লাক্ খুলতেও তো পারে। নাটুর দাঁতের পাটি বেরিয়ে পড়ল বিচিত্র হাসিতে। কথায় বলে—পুরুষের ভাগ্য আর স্ত্রীচরিত্র—

সোজা হয়ে ঘাড় তুলে ওর দিকে তাকালে রীতুবাবু। বড় বড় চোখ দুটো দপ দপ করে উঠল। নাটু সভয়ে কি যেন বলতে গেল। রীতুবাবু থাবার মত হাতখানা বাড়িয়ে কি মনে হল গুটিয়ে নিয়ে ঘৃণার সঙ্গে বললে—রসিকতা জানিস নে যেখানে করতে যাস নে!

তারপর ঘুরে বললে—থাক এসব কথা। আপনি নিজেই যান, দেখে আসুন। কথা তো রয়েছে। আজ কি প্লে হবে?

—সে কাল বলে দিয়েছেন, রীতু মাস্টারমশাই যা ঠিক করবেন তাই হবে। আজ আপনার মেন রোল।

—আরও আছে। সকালেই আমার কাছে ত্রিভুবন—আমার গা টেপে—তোমাদের দূত—বলছিল কাল রাত্রে ওর ভাই এখানে ওর কাছে এসেছে। ঘরে গণ্ডগোল। ওর বউ চলে গেছে বাপের বাড়ি, কি-কি সব নিয়ে গেছে। বলেছে আর আসবে না। ওর টাকা চাই। দাদন নেওয়া আছে। তার উপরে চাই—ছুটি চাই। এ একটা আছে। আর আছে কাল সকালে এখান থেকে বিদায়। মাঝে তিন দিন ফাঁক। বংশীকে আজ পার্টে না রেখে রানীগঞ্জ পাঠানো হবে কি না এ কথা আছে। রাত্রে খাওয়ানোর কথাটা তুলবেন। ওঁরা বলেছেন। যা হয়ে আছে তাতে বড়রা কেউ কিছু বলবে না। তবে ছোটরা তো অনবুঝ। যান।

অত্যন্ত সংক্ষেপে এবং সহজ স্বচ্ছন্দ ভাবে প্রশ্ন কটার উত্তর পেয়ে গেল গাপাল। শান্ত ভাবে বসে আছে গোরাবাবু। প্রোপ্রাইট্রেস ঘরে। অলকাও ঘরে। রোদ্দুর উঠেছে, চড়া হয়েছে একটু, বাইরে থেকে উঠে এসে বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে। মঞ্জরী বসে কর্ণ নাটকখানা পড়ছে। শিউনন্দন স্নানের ঘরে কাপড় আছড়াচ্ছে। শব্দ উঠছে। কলে জল পড়ছে।

গোপাল বসতেই গোরাবাবু বললে—কাল রাত্রে একটু বেশী হয়ে গেছে।

গোপাল চুপ করে রইল। গোরাবাবু বললে—একটু শান্ত ভাবে হলেই ভাল হত। কিন্তু—। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—নিয়তি আমি মানি। ও যা হবার হয়, আটকানো যায় না। যাক গে। বলুন কি বলবেন। প্লে সম্বন্ধে কর্ণ হবে। ওঁর ইচ্ছে। আর অষ্টবজ্রে আমি দণ্ডী আর অলকা উর্বশী। এ করতে অলকা পারবে না। আমি—ও—মানে আমারও ভাল লাগছে না।

এতক্ষণে গোপাল কথা খুঁজে পেলে, বললে—উর্বশী গোপালী পারবে।

—না।

—তা হলে কর্ণই হবে। না, কি গা?

ভিতর থেকে মঞ্জরী উত্তর দিলে—হ্যাঁ। বলতে বলতে সে বইখানা হাতে নিয়েই বেরিয়ে এল। বললে—মাস্টারমশাইকে বলে দেবেন। আর রাত্রির জন্যে মাংস লুচি হবে। নায়কপক্ষকে বলুন দাম নিয়ে ওঁরা খাসী কাটিয়ে মাংসের ব্যবস্থা করে দেবেন। লুচির দালদা আর কিছু আলু আনান বাজার থেকে।

গোপাল খুশী হল, একটু বিস্মিতও হল—ছন্দটা এমন সহজ হবার সময় সুযোগ কি করে হল! অলকা এখনও ঘরে ঘুমুচ্ছে। কালও সে রাত্রে অনেকক্ষণ জেগে বসেছিল সেই থামটির গায়ে। অন্যদিন থাকে কিন্তু কোন কৌতূহল থাকে না। যাত্রার দলে যা ঘটে তা তার কাছে সহজ স্বাভাবিক—একান্তভাবে বৈচিত্র্যহীন। রাত্রের পৃথিবী দেখে বিধাতার যেমন কৌতূহল নেই বিস্ময় নেই আছে শুধু দেখা, তেমনি তার শুধু ওই দেখাই আছে। কিন্তু কাল কৌতূহল ছিল, উদ্বেগ ছিল। এইখানে বিধাতা বিধাতা, আর সে গোপাল ঘোষ। বেহারের ভূমিকম্পের দিন তাদের দল গিয়েছিল পূর্ণিয়া। সে দল মঞ্জরী অপেরা নয়, ভুবনবাবুর ভুবনমোহন অপেরা। ভূমিকম্পের

পর রাত্রে সেই আতঙ্কের মধ্যে সবাই ছিল জেগে বসে। হঠাৎ গাঁজাখোর গাইয়ে যোগাবাবু বলে উঠেছিল—বা—প রে! সকলেই চমকে উঠেছিল। গোপালই জিজ্ঞাসা করেছিল উৎকণ্ঠিত হয়ে—কি হল যোগাবাবু?

যোগাবাবু বলেছিল—এই ভগবানের কথা বলছি।

—ভগবানের?

—হ্যাঁ। ভগবানের।

কয়েকজনই প্রায় কোরাসে বলে উঠেছিল—গাঁজাখোর কোথাকার!

—তা বটে; গাঁজা আমি খাই। কিন্তু ভেবে দেখেছ কেউ?

ভুবনবাবু স্বয়ং এবার বলেছিলেন—কি বলুন তো ঠাকুরমশাই?

—দেখুন বাবু, এত বড় ভূমিকম্পটা হল—একেবারে চৌচির—ফুটিফাটা, ঘরবাড়ি হুমড়ি খেয়ে পড়ল। যারা মরল তারা মরল। যারা আমরা বেঁচে আছি, ধুকপুক ধুকপুক করছি। কাঁদছি, চেঁচাচ্ছি। আর ভগবানের দেখুন—প্যাট প্যাট করে চেয়ে দেখছেই, শুধু দেখছেই। হাসেও না, চোখেও জল নেই। আনন্দও নেই দুঃখও নেই। কেন? আরে ও তো হয়ই। হয়েছে। আমাদের একখানা ঘর ভাঙলে কত হায় হায়! কেন ভাঙল? ভাঙল তো গড়ব কি করে! কি আপসোস। এ বাবা যা ভাঙল তাই গড়া হল। বা—প—রে! নয়?

মধ্যে মধ্যে রাত্রে জেগে বসে দেখতে দেখতে যোগাবাবুর কথাটা তার মনে হয়। ভাবত সেও এমনি হয়ে গেছে। কিন্তু কাল বুঝেছে তা নয়। মঞ্জরী অপেরার জন্য উদ্বেগ হয়েছিল তার। চোখের দৃষ্টিতে এমন ব্যগ্রতা জমেছিল যে চোখ জ্বালা করেছিল। কিন্তু রাত্রের মধ্যে একবার কাউকে উঠতে দেখে নি সে। সুতরাং কখন এমন সহজ হল?

গোপাল বলতে গেল—মিষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে না কি? কিন্তু না—থাক। কথাটা একেবারে চাপা দিয়ে বললে—তাই হবে। আর একটা কথা বলছিলাম। ত্রিভুবন বলছে, তার বাড়িতে বিপদ—ভাই তার এখান পর্যন্ত এসেছে। তার ছুটি চাই, টাকাও চাই। মানে দাদনের ওপর।

—কত টাকা?

—যা দেবেন। দিলে তো আসছে বছর ভিন্ন শোধ হবে না। রীতুবাবুর গা টেপে, ওর কথাতে গোড়াতে দাদন দেওয়া আছে দুশো টাকা। শতখানেক দিলে তিনশো হবে। এদিকে মাসে মাসে দশ পনের দশ পনের হবে।

গোরাবাবু বললে—আমি বলি নে। আসছে বছর শোধ হবে—অন্তত এ বাজারে দেওয়া যায় না। মানে এই তো বোমার হিড়িক। কি হবে তার ঠিক কি?

—রীতুবাবু বলছিলেন—গরীব মানুষ, ঘরে বিপদ।

—দেবেন। পঞ্চাশ টাকা দেবেন। মঞ্জরী বললে—যাবে না হয় পঞ্চাশ টাকা।

—যাক্। হাসলে গোরাবাবু।

—আর একটা কথা। কাল থেকে তো তিন দিন পর বাঁকড়োয় বায়না। তা আসানসোল, রাণীগঞ্জে বংশীকে পাঠাব না কি বায়নার জন্যে? যেতে হলে দুপুরের পরই যেতে হবে তো।

মঞ্জরী গোরাবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—কি গো? যাক?

গোরাবাবু প্রশ্ন করলে—উঁ?

—বংশী যাক তা হলে?

আরও একটুক্ষণ নীরব থেকে গোরাবাবু বললে—আমি বলি আসানসোলে নেবেই তো দলকে বি. এন. আর.-এ বাঁকড়ো যেতে হবে। সেখানে নেমেই দেখা যাবে। ওখান থেকে রাণীগঞ্জ কাছেই।

থাকবে কালকের দিনটা দল বসে। বিশ্রামও তো চাই। আমার তো চাই-ই।

মঞ্জরী উঠে দাঁড়িয়ে বললে—তাই হবে। দল তা হলে এখানে খেয়েদেয়ে উঠবে।

গোপাল উঠল।—দুর্গা দুর্গা।

—ম্যানেজারবাবু!

—অ্যাঁ! সবিস্ময়ে তাকালে গোপাল। দলের মেয়েরা কেউ ম্যানেজারবাবু বলে না। মঞ্জরী বলে—মামা। শোভা বলে দাদা। গোপালীরা বলে—বাবা। গোপাল উত্তর দেয়—বাবা। এ অলকা ডাকছে। কপালের চামড়া তার কুঁচকে উঠল। সে ঘুরে দাঁড়াল, কথা বললে না। আপনি বলবে না কি বুঝতে পারলে না। অলকা বললে—মিষ্টির কত দাম পড়বে?

গোরাবাবু বললে—মিষ্টির দাম আমি দেব। মিষ্টি আনিয়ে দেবেন।

অলকা বললে—না। ওটা আমিই দিতে চাই। আমি খুশী হব।

—না। উনি দেবেন। কথা হয়ে আছে। এতে না বলো না। বলা উচিত নয়।

কোন প্রতিবাদ না করে অলকা ঘরে ঢুকে গেল; মঞ্জরী বললে—আর একটা কথা আছে। আপনারা দুজনেই রয়েছেন। অলকা আমাকে বলেছে কাল রাত্রে, আবার আজ সকালে। সে চলে যেতে চায়। মানে একেবারেই যেতে চাচ্ছে। কালই। টাকাটা—ওর তো চারশো টাকা অ্যাডভান্স নেওয়া আছে। বাবুলবাবুর কথায় দেওয়া হয়েছিল। বাড়িতে অভাবও বটে। টাকাটা বলছে এখন দিতে পারবে না। পরে শোধ দেবে। কি বলছেন আপনারা? আমি বলেছি তা কি করে হয়?

গোরাবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—আমার মতে ওকে ছেড়ে

দেওয়া উচিত। আজই উচিত ছেড়ে দেওয়া এবং ওর উচিত চলে যাওয়া। কিন্তু তা থাক। আজ গেলে ব্যাপারটা কদর্য হবে। এখানকার লোকেও নানারকম বলবে।

মঞ্জরী বললে—আমি ওকে যেতে বলছি না।

—কে বলছে আর কে বলছে না আমার সে কথা নয়। আমি বলছি উচিতের কথা। টাকার কথাটা ওঠেই না। ওরও সিজনটা যাচ্ছে।

—মেয়ে যাত্রা একটি। সিজনের কথা ওঠে কি করে? এবং টাকার কথাটাই সব নয়। আমরা এখন ওর পার্টে লোক পাব কোথায়?

—শেফালীকে আনিয়ে নাও। লোক পাঠালেই সে আসবে। মাইনে অবিশ্যি বেশী নেবে। থিয়েটার থেকে সে বসে আছে ছ মাস।

—বেশ, ও যাবে। গোপালমামা কাল কলকাতায় লোক পাঠান কি আপনি নিজে চলে যান।

বলে মঞ্জরী ঘরে ঢুকে গেল। গোরাবাবু একটা সিগারেট ধরালে। তারপর ডাকলে—শিউনন্দন, বোতলটা দে।

গোপাল খুশী হয়ে বেরিয়ে এল। যাক্। মঞ্জরী অপেরার ফাঁড়া কাটল।

পিছন থেকে গোরাবাবু হেঁকে বললে—আর শুনুন—

ফিরল গোপাল ঘোষ। গোরাবাবু বললে—আসতে হবে না, নায়কপক্ষকে বলবেন কাল সকালেই যেন ওরা একখানা ট্যাক্সি আনিয়ে দেন বরাকর থেকে। সকালেই যাওয়া সুবিধা। দিনে পৌঁছুনো যায়। ওঁরা টেলিফোনে বলে দিলেই বোধ হয় আসবে।

* * * *

খবরটা রটে যেতে দেরি হল না। গোপাল ঘোষ প্রথমেই গিয়ে রীতুবাবুকে খবরটা দিতে গেল। রীতুবাবু মোটা গলাতেই মৃদুস্বরে তুড়ি মেরে তাল দিয়ে গান ভাঁজছিল। শোনাচ্ছিল বাবুলকে।

"কমলেরও মালা গাঁথি পরো না পরো না বালা ; মৃণালে কণ্টক শত, সহিতে নারিবে জ্বালা—।" এই তাল, এই ফাঁক, এই দেখ। ফের ধর—কমলেরও মালা গাঁথি—। থেমে গেল ; বললে—গোপালবাবু সমাগত। থামলাম। গান জানি হে, গাইতেও পারি। তবে কি আজকালকার গান রোচে না গাইলে। প্রাণের কথা রসের কথা পাই নে। তারপর কি সংবাদ, বলুন গোপালবাবু ?

—সংবাদ সুসংবাদ।

—রাত্রি প্রভাতে সূর্যোদয় হয়েছে ?

—অন্ধকার কেটেছে। তবে রোদ উঠেছে বলব না। তবে কাটবে। রাহুগ্রাস মুক্তির সময় আসন্ন।

বাবুল বলে উঠল—কীপ হেঁয়ালি, প্লিজ, সোজা কথায় বলুন স্যার। মেজাজ আমার খারাপ হয়ে আছে।

হেসে গোপাল বলে—রাহু সরছে, মানে অলকা চলে যাচ্ছে।

—অলকা চলে যাচ্ছে ! মানে খসখস করে দিলেন ! ডিসমিস !

—না স্যার। ও নিজেই বলেছে ও নিজে থাকতে চায় না। ছেড়ে দিলে চলে যাবে। দাদন নেওয়া আছে তো।

—ছেড়ে দিচ্ছেন সেটা ! গুড।

বাবুল বোস উঠে দাঁড়াল—আমি একটু আসি মাস্টারমশাই।

—কি—তুমি সুদ্ধ যাবে না কি ? মরেছে রে ! রীতুবাবু হেসেই বললেন কথাটা।

—উঁহু। কনগ্র্যাচুলেট করে আসি ওকে ওর সুমতির জন্যে।

রীতুবাবু বললে—বামুনের মেয়ে, আশীর্বাদ করব না। বলো আমি খুব খুশী হয়েছি ওর মর্যাদাজ্ঞান দেখে।

—বলব। চলে গেল বাবুল।

রীতুবাবু বললে—মেয়েটা বড় ভাল নাচত হে। পার্ট—পার্টও ভাল করত। কাল শ্রীকৃষ্ণ ভাল করেছে। চমৎকার করেছে। আমার সঙ্গে কালকে পার্ট করলে, জান আমার একটা ট্রিক আছে। আর্টিস্ট

টেস্ট করবার জন্যে আমি কোন ছুতোয় প্রায় গাঁক করে গমক মেরে দিই। রিহারস্যালে নেই, হঠাৎ আমার এই গলায় একটা 'না' কথা গাঁক করে বলে দি—না—। হাসি থাকলে এমন অট্টহাস্য করি যে সাধারণ আর্টিস্ট হলে চমকে ওঠে। ভেবড়ে যায়। কাল দিয়েছিলাম এমনি হাসি। মেয়েটা দেখলাম বেশ বলে যাচ্ছে। বেশ রসিয়ে বলছে। তুলসী আমার সখী, শঙ্খচূড় ব্রজের সুদাম। আমারই অংশের হতে উদ্ভব তাহার। দেবরাজ, মোর ভয়—আমি চক্র ছেড়ে বাঁশরী খুঁজিব। আমি ফাঁক পেয়েই অট্টহাসি হেসে দিলাম। নাটু বাবুলও চমকাল একটু। আচমকা তো! মেয়েটাও চমকাল কিন্তু ওদের থেকে বেশী নয়। তারপর ষোল-শ গোপিনী দ্বারকায় সহস্র রমণীর ঠাট্টা করে আবার লম্বা অট্টহাসি। শিবের পার্ট, ক্ষ্যাপার পার্ট, ওতে তাক মাফিক নাচলেও মানায়। বুঝেছ, সে গমগম করতে লাগল। লোকে হেসে সারা। আমি দেখছি ও কি করে। এরপর মেয়ের ঠাণ্ডা গলায় রসিকতা কেমন জমায়! দেখলাম ঠিক ও যা করবার করে গেল, তেরচা চোখে আমার দিকে চেয়ে বেঁকে দাঁড়িয়ে রইল খানিকটা; আমার আওয়াজের রেশ মরল, লোকের হাসি থামল, লোকে ওর কটাক্ষ দেখে তখন মজেছে, কি বলে কেষ্ট—কি করে কেষ্ট! তখন ও আরম্ভ করলে, হায় ভোলানাথ, প্রেমের পিপাসা ব্যাধি যে আমার। শুধু কি ব্রজের প্রেমের লাগি পিপাসা আমার? তারও চেয়ে মনের কামনা মোহিনী হইতে পুনঃ। মোহিনী হইয়া ছুটি আমি ত্রিভুবন। আর তুমি দু বাহু মেলিয়া—। আমি বলি বাপ রে! লোকে খুব হাসল। জান ও ছেলে হলে কাল সাজঘরে ফিরে ওকে জড়িয়ে ধরতাম। মেয়েটা যদি কত্তা গিন্নীর মাঝে না পড়ত তবে আমি ওর পক্ষ নিতাম। বলতাম—যে জেতে প্রেমের যুদ্ধে জয়মাল্য তার। বলবার কি আছে। এখানে নালিশ কিসের? দলের ক্ষতি হবে।

—না। কাল আমি যাচ্ছি কলকাতা থেকে থিয়েটারের শেফালীকে আনব। যা নেয়।

—শেফালী! সে তো বেশ নেবে হে!

—তা নিক। হুকুম হয়ে গেছে।

নাটু স্বল্পভাষী। কিন্তু হিসেবী। সে বললে—তাতে পুরুষেরা কিছু না বলুক মেয়েরা বলবে।

—তাদের সঙ্গে তো সিজন কণ্ট্রাক্ট হয়ে আছে মশায়। বললে চলবে কেন?

রীতুবাবু বললে—না না না। সে কেউ বলবে না। দলের ভাল সবাই চায়। এমন একটা ক্ষেত্র। কেউ বলবে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই খবরটা রটে গেল।—এই অলি চৌধুরী চলে যাচ্ছে।—চলে যাচ্ছে? হ্যাঁ।—যোগাবাবু বললে—একেবারে খতম? লঘু পাপে গুরুদণ্ড হল না? মেয়েটার গুণ ছিল। হরিপদ গুঁই পাখোয়াজের চামড়ার দড়ির টানগুলি একের পর একটা টেনে বাঁধছিল। সে বললে—গুণ অনেক। আপনাকেও গুণ করেছে দেখি। আজ আর যোগামাস্টার রাগল না, হেসে বললে—দেখ গুঁয়ে, আমাকে গুণ করতে ওর গরজ হবে না সে সবাই বলবে। তবে একলা মেয়ে মেয়ে-যাত্রার দলে এলে গুণে পড়বার জন্যে সবাই উসখুস করে। অলি চৌধুরীর নাচের সময় তোর হাত যত চলেছে গা তত দুলেছে; যেন বাজনাও বাজাচ্ছিস ডুয়েটও নাচছিস। মেয়েটার গুণ সবাই মানবে। আর ও তো আমাদের কারুর সঙ্গে ব্যাভার খারাপ করে নি বাপু! বল, করেছে?

হরিপদ বললে—আজ হারলাম তোমার কাছে। তুমি রাগলে না। তা বলছ ঠিক। গুণ ছিল মেয়েটার। ওর পায়ের কাজের সঙ্গে তবলায় বোল মিলিয়ে ফুর্তি লাগত। সেদিন আড়ি মেরেছিলাম, তা ও ঠিক পেরিয়ে গেল, পেরিয়ে গিয়ে একবার ফিরে তাকিয়ে

একটু হাসলে। বাসায় এসে হেসে বলেছিল বেশ আড়িটি দিয়েছিলেন। ও না হলে জমে! রাগ করে নি। তা, গুণী মেয়ে ছিল বইকি!

—হ্যাঁ। আর যাত্রার দলেই রকম হয়। কোথা হয় না বল। জগতে সব জায়গায়। যাত্রার দলে বেশী। এ দলের কত্তা গিন্নী সত্যিই স্বামী স্ত্রীর মত থাকে। বিয়েও করেছে। বিয়ে মানেও। না হলে অন্য মেয়ে-যাত্রার দলে, না, সে বছরে একটা ছুটো কাড়া-কাড়ির মালা নির্ঘাৎ। একে ছেড়ে ও ওকে ধরলে—ব্যাস যে ছাড়া পড়ল সে কাঁদতে কাঁদতে নয়তো দেখে নেব বলে কাটল। বিনোদিনীর দলে মারপিট দেখেছি দশ বিশটা। এদের দলে এরা দুজনের ছাড়বিড় নেই বলেই অন্যেরাও সামলে চলে। তাই বলছিলাম ক্ষেমাঘেন্না করলেই হত। গেরস্ত ঘরের মেয়ে এসেছিল—গুণ ছিল। ওই—ওই আসছে।

সত্যিই বাবুলমাস্টার আর অলকা এসে এ বাসার ব্যারাকে উঠে এল। গিয়ে ঢুকল রীতুবাবুদের ঘরে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য ঘরের লোকেরা অনেকে বাইরে এল—অনেকে দরজায় দাঁড়াল। সবার মনে একটিই সুর বেজে উঠেছে—চলে যাচ্ছে! বেশ ছিল! মেয়েদের ঘর থেকেও মেয়েরা বাইরে এসেছিল। শোভা শুধু রীতুবাবুদের ঘর পর্যন্ত চলে গেল। সে ঘরে ঢুকছে—অলকা বেরিয়ে এল। একটি কথাই শুধু সেও বলে চলে এল। বেশী কথা যেন নেই। ফুরিয়ে গেছে। বলে এল—মাস্টারমশাই, আমি চলে যাচ্ছি।

—চলে যাচ্ছ? ব্যাস, রীতুবাবু আর কথা খুঁজে পেল না।

বাবুল চুপ করেই ছিল। তার কথা আগেই হয়ে গেছে। সেও বেশী কথা নয়। বলেছিল—তুমি নাকি—

অলকা বলেছিল—হ্যাঁ, চলে যাচ্ছি।

বাবুল বলেছিল—ভাল করছ। কনগ্র্যাচুলেশন।

অলকা একটু হেসেছিল।

বাবুল বলেছিল—একসঙ্গে এসেছিলাম!

—একসঙ্গে এলেই একসঙ্গে যাওয়া ঘটে না।

—ঠিক। ওয়াণ্ডারফুল বলেছ।

অলকা হাসিমুখেই চুপ করে তার দিকে তাকিয়েছিল।

বাবুল বলেছিল, চল—ওখানে বলে আসবে।

—কাল বলব যাবার সময়।

—না। এখনি চল। একটা কথাও আছে বলব। পথেই বলব।

—চলুন—চল।

ঘরে মঞ্জরী চুপ করে শুয়েছিল—ঘুমিয়েছে বা জেগে আছে তার নিশ্চয়তা ছিল না। অলকা উঠে তার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল। একটু এসে বাবুল বলেছিল—যেয়ো না। থেকে যাও।

—থেকে যাব? এর পর?

—সব পালটে যাবে।

—তাই যায়?

—যায়। আমি যদি বিয়ে করি তোমাকে! দস্তুরমত রেজেস্ট্রী করে! তারপর সব পালটে যাবে।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ঘাড় নেড়েছিল অলকা—না।

বাবুল অভ্যাসমত সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল—গুড। চল—দেখাটা সেরে আসবে। বেরিয়েছ, ফেরা ঠিক হবে না। ভাববে সকলে আমি পরামর্শ দিচ্ছি কিছু।

অলকা চলতে চলতে হঠাৎ বলেছিল—দেরি হয়ে গেছে আপনার। আর হয় না।

তখন থেকে স্তব্ধ হয়ে গেছে প্রগল্‌ভ বাবুল বোস। বাসায় ঘরে ঢুকে সে কোন কথাই বলতে পারে নি। সে ভাবছিল, কি বিচিত্র মেয়ে! অলকাই রীতুবাবুকে কথা বললে। রীতুবাবু ওই প্রশ্নাত্মক 'চলে যাচ্ছ' কথাটি বলেই স্তব্ধ হয়ে গেল। অলকা নমস্কার করে

বেরিয়ে এল। শোভা ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। সেই-ই বললে—তুমি চলে যাচ্ছ ভাই ?

—হ্যাঁ শোভাদি। কাল ভোরেই চলে যাব।

—কি বলব ভাই ? বলবার কিছু নেই। তা—। দুঃখ হচ্ছে ভাই।

—আপনাকে প্রণাম করব ?

—না না না। সভয়ে পিছিয়ে গেল শোভা—নেই, প্রণাম করতে নেই। বাপ রে !

—তা হলে আসি। গোপালীদি আশাদিকে বলবেন। নমস্কার দেবেন।

হেসে কথা শেষ করে সে চলে গেল।

সকলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। একটি বিষণ্ণতা যেন আচ্ছন্ন করে ফেললে। বিষণ্ণ স্তব্ধতা কাল রাত্রি থেকেই রয়েছে। তবে তার রকমের রূপের যেন পরিবর্তন হয়ে গেল। অস্বস্তিকর গুমোটটা কাটিয়ে রিমিঝিমি বর্ষণে সে বিষণ্ণতা যেন সজল হয়ে উঠেছে। মঞ্জরী অপেরার কর্তা গিন্নীর বিরোধ অবসান হয়েছে, গুমোট কেটেছে। অলকাই এখানে কাঁটা। কিন্তু অলকা চলে যাচ্ছে তাতেও বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে মন।

মেয়ে-যাত্রায় এমন ঘটে। নোগাবাবুর কথাটা অতিরঞ্জিত নয়, অতি বাস্তব খাঁটি সত্য। এমন ঘটে। দুটি পুরুষ একটি মেয়ে নিয়ে জটিল হয়ে ওঠে যাত্রাদলের জীবন। কলহ হয়, পুরুষে পুরুষে হাতাহাতি হয়, মারপিটও হয়; পুরুষও মেয়েকে প্রহার করে; গভীর স্তব্ধ রাত্রি অকস্মাৎ উচ্চ ক্রুদ্ধ কথাকাটাকাটিতে সচকিত হয়ে ওঠে; কিংবা হয়তো নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ চীৎকার রাত্রিতে ঘুমন্ত দলের লোকের সুপ্ত চেতনাকে তীক্ষ্ণ খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে তোলে। সেখানে একটি পুরুষকে বিদায় নিতে হয়। তবে একলা-পড়া পুরুষটির মূল্য যদি বেশী হয়, আর মেয়েটি যদি তাকে কোনমতেই

না চায় তবে তাদের তুজনকেই যেতে হয়। আবার তুজন নারী একজন পুরুষ নিয়ে যদি কলহ বাধে তবে কলহ হয় মেয়েতে মেয়েতে; নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ চীৎকার আর শাপশাপান্তের ভীষণতা হয় নিষ্ঠুরতমরূপে অসহনীয়। সেখানেও হাতাহাতি হয় তবে কম; হলে চুলোচুলি পর্যন্ত হয়ে শেষ হয়। সেখানেও একটি পুরুষ একটি নারী থাকে—একজনকে যেতে হয়। সেখানেও তার মূল্য বেশী হলে এরাই তুজনে যায়।

এ দলেও ঘটেছে। একটু রকমফের হয়েছিল। সুশীলা ছিল—তার প্রিয়জন ছিল রূপেন চক্রবর্তী। তুজনেই ভাল অ্যাক্ট্রেস অ্যাক্টর। কিন্তু রূপেন মুখ এবং মন ফেরালে অন্য একটি মেয়ের দিকে। বাইরের মেয়ে। দলে সে আসবে না। তার সংগতি আছে—এদিকেও শখ নেই। রূপেন দল ছাড়লে। সুশীলাও ছেড়ে দিলে। দলে আসার একমাত্র হেতু ছিল রূপেনকে পাওয়া। সে যখন ফস্‌কে গেল তখন দলের মোহ কাটালে সে। দলের কত জন সুশীলার মন পাওয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সে সেদিকে ফিরেও তাকায় নি। সুশীলা যাবার দিনও এমনি হয়েছিল!—যাঃ, চলে গেল! বেশ ছিল। ভারী ভাল ছিল তুটিতে।

নাড়ুদেব আর শোভা বিনোদিনীর দলের লোক। বিনোদিনীর দল উঠলে পর বসে ছিল—তারপর এখানে। সেখানে টেরা কালীদাসী ছিল খুব ভাল গাইয়ে মেয়ে। তার ভাবের মানুষ ছিল গাইয়ে শীল। কালী হঠাৎ ভালবাসলে নতুন অ্যাক্টর সুরোবাবুকে। শীল চলে গেল। যাবার সময় বলেছিল—চললাম শোভা। চললাম নাড়ুদা। তারা বলেছিল—থাক না ভাই শীল মাস্টার। শীল বলেছিল—দূর, আবার থাকা যায়!

—কেন?

—তোমাদের যেন না হয়। তবে না হলে বোঝানো যায় না। শুধু তো মনের কথা নয় শোভা—মানের কথা যে!

বিনোদিনীর দলেরও সেদিন এমনি ভিজে-ভিজে অবস্থা হয়েছিল।

রীতুবাবু স্যুটকেস থেকে তার দাবা বের করে বসেছিল। তার একসেট দাবা আছে, কখনও কখনও তার বিচিত্র মনের অবস্থায় দাবাটা বের করে। খেলা একা একা। জিজ্ঞাসা করলে বলে—মারামারি হয়ে যাবে। একা একা ভাল। মদ খাওয়াটা কমে গেছে। বাবুল তার তাস নিয়ে বসেছিল পেশেন্স খেলতে। মণি ঘোষ আয়না দেখে পাকা চুল তুলছে। নাটু গোপালীর কটা ব্লাউস ছিঁড়েছে সেলাই করছে। হিসেবী লোক—ঘরের কাজকর্ম চমৎকার করে। বাবুল হঠাৎ পেশেন্সের তাস আছড়ে ফেলে দিয়ে বললে—নুইসেন্স খেলা।

কেউ কোন উত্তর দিলে না। হঠাৎ বাবুল তার বোতল বের করে বললে—চিচিং ফাঁক! শূন্য! মাই খোদা!

রীতুবাবু নীরবে নিজের বোতলটা বাঁ হাতে করে এগিয়ে দিলে। এবং নিজের দাবার ছক ঠেলে দিয়ে ডাকলে—বংশী! বংশীমাস্টার!

বংশী ওঘর থেকে এসে দাঁড়াল—মাস্টারমশাই—

—খাবি?

সলজ্জ ভাবে বংশী বললে—এই খেয়ে আসছি স্যার। আপনার সামনে—বলবেন না।

—ঠিক আছে। একটা গান শোনা দেখি। নাচের গান না।

—তবে?

—দিবোদাস পালার গান। তোর পার্টে হাতেখড়ি—দিবোদাসের ছোট রাজপুত্র আমার মনে আছে।

—হ্যাঁ মাস্টারমশাই। আমার বয়স তখন বারো তেরো।

—আমি শুনেছি রে। অ্যাক্টর নই তখনও। অ্যামেচারে পার্ট করি, তোর সে গান আজও মধ্যে মধ্যে মনে পড়ে। সেই ছোট রাজপুত্র মরছে, বড় রাজপুত্র কাঁদছে—কেঁদো না আমারও তরে—এ।

ছোট রাজপুত্র মরবার সময় গাইলে—অশ্রুজল আর ফেলো না ফেলো না ডেকো না এমন করুণ স্বরে—এ—এ। কালস্রোতে হেথা

ভাসিয়ে ভাসিয়ে তোমায় আমায় দাদা মিলেছি আসিয়ে, আবার ভেসে ভেসে চলেছি কোন দেশে, কোন্ কূল পাব, আবার কার ভাই হব, জানি নে জানি নে কোন্ জন টানে জীবনসূত্র ধরে—এ—এ।

বংশী বললে—মাস্টারমশাই, ও গান আর আসে না। ঠুন ঠুন পেয়ালা আর এক ছুই তিন করে করে ও আর হয় না।

—তবে আমি গাই। গাইতে লাগল রীতুমাস্টার মৃদুস্বরে।

—গানগুলি কিন্তু ভাল ছিল স্যার। আজ বেশ লাগছে। আমারও লাগছে। অলকা আর আমি ঢুকেছিলাম একসঙ্গে। চলে যাচ্ছে।

—কেউ যেদিন চলে যায় না দল থেকে সেদিন এই গানটা আমি গাই। বুঝেছ।—কালস্রোতে হায় ভাসিয়ে ভাসিয়ে তোমায় আমায় হেথা মিলেছি আসিয়ে—আবার ভেসে ভেসে চলেছি কোন দেশে, জানি নে জানি নে কোন্ জন টানে জীবনসূত্র ধরে। কেঁদো না এমন করে আমারও তরে।

—ওয়াণ্ডারফুল! নাটুবাবুও দেখি ভাঁজছেন গান।

হেসে ফেললে নাটু। বললে—তা গাইছি। প্রথম বয়সে দিবোদাসের এ গান আমারও ভাল লেগেছিল।

—যাত্রার দলে প্রেমে পড়ছি মাস্টারমশাই। এখানে আশ্চর্য—সব রকমটি আছে।

—হ্যাঁ ব্রাদার—যত আলো তত অন্ধকার। গানে তাই, মানুষে তাই। খুব পাড়াগাঁয়ে কিংবা শহরে যেখানে এই বেশী মদমাতালের দল চীৎকার করছে তখন ডাক বংশীমাস্টারকে। বংশী নেমে গেল আশাকে নিয়ে—জেলে-জেলেনী। জেলেনী তোর নৌকোখানা যায় ভেসে—আমায় ধরতে দেনা হাল! আবার কালস্রোতে ভাসাও আছে। আমার মত রীতু আছে—বংশী রাগ করবে না বলে ওর নামই করছি, বংশী আছে আবার ফণিবাবুর মত নমস্য ব্যক্তিও আছেন। অপর পরে কা কথা ভাই, কণ্ঠমহাশয়ের মত সাধকও

আছেন। জান, কণ্ঠমশায় নিজে ব্যবস্থা করে ত্রিবেণীতে এসেছিলেন দেহ রাখতে। গান তৈরি করে সুর দিয়ে শিখিয়ে মৃত্যুদিন বললেন—এবার আমাকে অন্তর্জলী কর—আমার সময় হয়েছে। মালাটা দাও। আর ওই গান গাও। কণ্ঠমশায়ের গানে বাংলা দেশ পাগল হয়ে গিয়েছিল। আসরে দাঁড়িয়ে গান বেঁধে সুর দিয়ে গেয়ে যেতেন।

কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলে রীতুবাবু। বংশী নাটু মণি ঘরের সবাই প্রণাম করলে। বাবুলও প্রণাম করলে।

গোপাল ঘোষ ফিরে এল।—দেখুন সমস্যা।

—কি হল?

—নায়কপক্ষ বলে একটা বেশ কমেডি টমেডি হোক আজ। কত্তা গিন্নী বললেন—রীতুবাবুকে জিজ্ঞাসা কর—অন্যদেরও জিজ্ঞাসা কর। কমেডি তো এবার কিছু তৈরী হয় নি। সেই পুরনো—ভদ্রা, সুভদ্রাহরণ। তার তো অনেক পার্টে লোক নেই। অষ্টবজ্র মোটামুটি মিলনাত্মক বটে। ওটা হতে পারে। এতে ওতে দুইয়েই আপনার মেন রোল।

রীতুবাবু হঠাৎ রেগে গেল। উঠে বসে বললে—হবে না। আজ ট্র্যাজেডি ছাড়া চলবে না। জমবে না।

—ওঁরা বলছেন—

—না না না। কর্ণ হবে। বলে দিন গিয়ে। আর শুনুন, ওই খাওয়াটা বন্ধ করে দিন গিয়ে। মনে হচ্ছে কি জানেন? মেয়েটাকে তাড়িয়ে আমরা আনন্দে মিষ্টি খাচ্ছি। না।

খাওয়া বন্ধ হল। আপত্তি বড় কেউ করলে না। ইচ্ছে থাকলেও প্রকাশ করতে পারলে না। গোপাল ঘোষ জলপানি দেবার সময় বলে দিলে—আপন আপন স্লিটে ব্যবস্থা করো। এটা পরে হবে।

মেয়েরা খুব খুশী হল। হ্যাঁ, এটা খুব ভাল হল।

শোভা এসে রীতুবাবুকে বললে—পেনাম তো নেবেন না। একটা নমস্কার করি।

—তা কর। কিন্তু পেনাম নমস্কার! ব্যাপারটা কি? মানে নতুন কারুর সঙ্গে সম্পর্ক পাতাবে না কি?

—মরণ আমার! পটলী বোন ছিল, তার সম্পর্কে বাঁধনে তোমার সঙ্গেই বাঁধতাম। তা আমার কপাল আর তোমার সম্পর্ক। এটা ঠাট্টা-ফাট্টা নয়। এটা যা করলে তুমি খুব ভাল করলে। মেয়েরা আমরা যেন বাঁচলাম। অলকা কচি মেয়ে। বেচারা কাল চলে যাবে, আজ আমরা মিষ্টি খাব এটা যেন কেমন লাগছিল। ভারী খারাপ লাগছিল।

রীতুবাবু বললে—আমার কিন্তু ভয় ছিল মেয়েরা চটবে।

—এত ছোটলোক মেয়েরা নয়। আপনারা পুরুষ। নাম হয় আমাদের। বুঝলেন?

একটু থেমে শোভা আবার বললে—দেখ, এমন করে বাইরে দল ঘোরার সময় কেউ যায় নি। মনে পড়ে না। অসুখবিসুখ হলে যায়। এমন করে যায় না। কলকাতা থেকে গেলে এতটা লাগত না। এ যেন তাড়িয়ে দেওয়া হল, নয় তো রাগ করে চলে যাচ্ছে বউ বেটী কেউ!

তেরো

সকাল বেলায়ই সকলে উঠেছিল। ট্যাক্সিটা হর্ন দিয়েই ঢুকল। হর্ন শুনেই শোভা ডাকলে—গোপালী, আশা, অলকা যাচ্ছে। ওঠ।

গোপালী উঠে বসল। আশা বললে—আমি পারছি না দিদি, মাথা ধরেছে।

গোপাল ঘোষ উঠেই ছিল, সে বিপিনকে ডেকে নিয়ে গেল অলকার জিনিস ট্যাক্সিতে তুলে দিতে হবে। রীতুবাবু ওঠে নি। বাবুল উঠেছিল। গায়ে আলোয়ান জড়িয়ে, সেটাকে খুলে জামা

পরে নিয়ে আলোয়ানটা কাঁধে ফেললে, স্টেশন পর্যন্ত যাবে। ফেরবার সময় যা হয় করবে। বরাকর থেকে প্রায়ই ট্রাক আসা-যাওয়া করে। চড়ে বসবে একটায়। যাত্রাদলের লোককে এখানে খাতির করে। সেও এসে দাঁড়াল। মঞ্জরী উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল, সে গোপালকে ডাকলে—শুনুন।

গোপাল এসে দাঁড়াল; নীরবেই দাঁড়াল। মঞ্জরী বললে—ও তো মাইনে নিয়েছে পঞ্চাশ? কথা ছিল পঞ্চাশ নগদ নেবে, পঞ্চাশ দাদনে কাটা যাবে।

—হ্যাঁ।

—ওকে আর পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে দিন।

গোপাল টাকা বের করতে ঢুকল মঞ্জরীর ঘরে। গোরাবাবু বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। একটু আশ্চর্য হল গোপাল। কাপড়-চোপড় ছেড়ে কি ব্যাপার?

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়! নিজের স্যুটকেসটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল গোরাবাবু। গোপাল উঠে দাঁড়াল। ক্যাশ খোলা রেখেই সে বাইরে এল ছুটে। সে বুঝেছে।

মঞ্জরীর সামনে ঘুরে গোরাবাবু বললে—আমিও চললাম মঞ্জরী।

মঞ্জরী পাথর হয়ে গেছে।

গোরাবাবু বললে—ধরেছিলে তুমি ঠিকই। অলকাকে আমি ভালবেসেছি। ওকে ছেড়ে থাকতে আমি পারব না। ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ও বলেছে সে না কি ওর ভাগ্য। আমি যাচ্ছি ওর সঙ্গে। এই চেকটা ধর। তোমার নিজের সব নিজেই রাখ, আমার কাছে কিছু থাকে না। দলের টাকা ব্যাঙ্কে থাকে। আমার নামে। পাঁচ হাজার টাকা আছে। তিন হাজার টাকার চেক দিলাম, ভাঙিয়ে নিয়ো। দু হাজার আমার থাকল। দলে কাজ করে মাইনে তো কখনও নিই নি। ওটা নিলাম। এ কি, চলে যাচ্ছ কেন মঞ্জরী?

মঞ্জরী নীরবে ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

গোপালবাবু, এটা ধরুন।

গোপাল হতভম্ব হয়ে গেছে। গোরাবাবু তার হাতে চেকখানা ধরিয়ে দিলে। অলকা গাড়ির মধ্যে উঠে বসেছে।

বাবুল বোস সিঁড়ি থেকে নেমেই স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সে চীৎকার করে উঠল—রীতুবাবু, গোরাবাবু চলে যাচ্ছেন। তারপর নিজের মনেই যেন বললে—অলকার সঙ্গে।

অলকা স্থিরদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। রীতুবাবু কোন রকমে কাপড়চোপড় জড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে এল। তার সত্ত ঘুমভাঙা বড় বড় চোখ দুটো কেমন রক্তাভ, দৃষ্টি বিহ্বল। সে চীৎকার করে ডাকলে, গোরাবাবু! ওতেই—ওইটুকুর মধ্যেই ছিল অনেক প্রশ্ন।

গোরাবাবু বললে—চললাম রীতুবাবু। মুখে তার একটি বিচিত্র ক্ষীণ হাসি। রীতুবাবু বিস্মিত হল না। এ হাসি সে চেনে। দেখেছে। উন্মাদ বা মরিয়া মানুষের এ হাসি সে চেনে। তবুও বিস্ময়ের আছে। বিস্ময় যে মঞ্জরীর প্রেম!

বিহ্বলের মতই রীতুবাবু বললে—চললেন? বিশ্বাস করতে পারছি না চোখে দেখেও।

—হ্যাঁ। অলকার সঙ্গে।

—গোরাবাবু! আর্তনাদের মত শোনালো রীতুবাবুর এ ডাক।

গোরাবাবু একবার মুখ নত করে পরমুহূর্তে তুলে বললে—বলবার আমার কিছু নেই রীতুবাবু। আমি উন্মাদ বলেন—উন্মাদ। একদিন বাড়ি ঘর স্ত্রী—তাদের অনেক সম্পদ ছেড়ে এসেছিলাম। তার কারণ ছিল। বড় অপমান হত সেখানে, সহ্য হয় নি। যাত্রার দলে ঢুকেছিলাম। তারপর মঞ্জরীর সঙ্গে দেখা হল। তাকে ভাল লাগল, ভালবাসলাম। চিরকাল তাকে ভালবাসব বলে জাত খুইয়ে বোষ্টম হয়ে বিয়ে করলাম। ভালবাসতাম বলেই মনে করে এসেছি এত দিন। আজ বলছি—না। হয়তো ভালবাসাই নেই। আজ মনে

হচ্ছে অলকা সব। অলকাকেই ভালবাসি। না দেখেও তাকেই ভালবেসে এসেছি এতকাল। অলকা মনে করেই মঞ্জরীকে ভুল করেই ভালবেসেছি। যাক, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি যাচ্ছি।

গাড়িতে সে উঠে বসল। বললে—চলো।

বাবুল হনহন করে গাড়ির কাছে এগিয়ে রূঢ়কণ্ঠে বললে—অলকা!

অলকা তার কণ্ঠস্বরের রূঢ়তায় চকিত এবং বিরক্ত হয়ে তার দিকে ফিরে তাকালে, কথা বললে না। বাবুল বোস বললে—নেমে এস।

সে বললে—না।

সেল্‌ফ স্টার্টারটা ভোরবেলা কোঁ কোঁ করছে—গর্জে উঠছে না। রীতুবাবু কথা খুঁজে পেলে।

—মঞ্জরী অপেরার কি হবে বলে যান। উঠে যাবে?

গোরাবাবু বললে—মালিক রইলেন মাস্টারমশাই। তিনি বলবেন। মঞ্জরী মানে প্রোপ্রাইট্রেসকে জিজ্ঞাসা করুন।

—সামনে বাঁকড়োয় বায়না, রাসে কান্দীর রাজবাড়িতে, কদিনের মধ্যে—অন্ততঃ এগুলো পার করে দিয়ে যান।

সেই ছোট্ট ঘরটির ভিতর থেকে শক্ত গলায় উচ্চারিত একটি শব্দ ভেসে এল—না।

গোরাবাবু ড্রাইভারকে বললে—চলো। স্টার্ট নিচ্ছে না?

নিল। স্টার্ট নিয়ে গাড়িটা গর্জন করে উঠল। বারান্দায় মাঠে দলের প্রায় সব লোক এসে জমেছে। তারা সব স্তব্ধ হয়ে রইল। গাড়িটা চলে গেল।

অকস্মাৎ একটা ঝড়ে একটা বাড়ির ছাদ বা চাল উড়ে গেলে বাসিন্দারা যেমন বাক্যহীন হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, ঠিক তেমনি অবস্থা হয়ে গেল সারা দলের লোকদের। মিনিট কয়েক সব চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর তেমনি নীরবেই সব বাসার ঘরে ফিরে গিয়ে আপন আপন বিছানায় বসল। চুপচাপ। মনের মধ্যে সকলের একটা মর্মান্তিক যন্ত্রণা; সে যন্ত্রণায় একটি কথা সবার বুকেই

গর্জনহীন বর্ষণহীন মেঘের কুণ্ডলীর মত পাক খেয়ে ফিরছে। আঃ, ছি—ছি—ছি! 'আঃ'-টি বোধ হয় মঞ্জরীর জন্যে, ছি ছি ছি গোরাবাবুর জন্যে। হয়তো অলকার জন্যেও বটে। মেয়েদের ঘরে গোপালী কাঁদছে। আশা শুয়ে আছে উপরের চালের দিকে তাকিয়ে মড়ার মত, নড়াচড়ার শক্তি যেন হারিয়ে গেছে। শোভা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে এলিয়ে পড়ে গেছে। ম্যানেজার গোপাল ঘোষ বারান্দায় যে থামটার সঙ্গে গায়ে সেঁটে রাত্রি জাগছে কদিন সেইটের সঙ্গে সেঁটে বসে আছে; চিবুকটা মধ্যে মধ্যে কাঁপছে। কতকগুলো ছেলে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়াতে যেন পারছে না। বড় ঘরটার মধ্যে যোগাবাবু উবু হয়ে বসে আছে। সামনে আয়না চিরুনি পড়ে আছে—সকালে বিন্যস্ত করা চুল মুঠো করে ধরে বসে আছে বংশীমাস্টার। যুবক গাইয়ে দিবাকর পুজোর আসনে আসনপিঁড়ি হয়ে কোলের পরে হাতের উপর হাত রেখে বসে আছে—ঘাড় থেকে মাথা পর্যন্ত ঝুঁকে পড়েছে। বেহালা বাজিয়ে আফিংখোর ভূদেব আফিংয়ের কৌটোটি ধরেই রয়েছে, খেতে যেন পারছে না। তবলা-ঢোল-বাজিয়ে গুঁই ঢোলের কাপড়ের খোলের গিঁটে হাত রেখেছে, খুলতে চায় কিন্তু হাত চলছে না। ফ্লুট-বাজিয়ে নগেন খড়কে দিয়েছে দাঁতে কিন্তু খোঁটা হচ্ছে না। রীতুবাবুদের ঘরে রীতুবাবু মদের গ্লাস টেবিলে রেখে বসে আছে—খাওয়া হচ্ছে না। বাবুল বোস দুই হাতের তেলোয় মাথা রেখে শুয়ে আছে, চোখের দৃষ্টি স্থির। মণি ঘোষ কানে ফুঁপি দিয়ে স্থির হয়ে বসে আছে। অতি হিসেবী নাটু আপনার স্যুটকেস যেটার মধ্যে তার সিগারেট থাকে সেটার উপর কনুই রেখে দুই হাতে দুই রগ চেপে বসে আছে।

প্রথম স্তব্ধতা ভাঙল মাঝের বড় ঘরে। যোগাবাবু যেন কাতরে উঠল—বিরক্তি এবং যন্ত্রণায় মৃদুস্বরেই বলে উঠল—আঃ! আঃ!

গুঁই বললে—কি হল?

যোগাবাবু গাঁজা খায়, দুধ পায় না, তার বদলে মিষ্টি রাখে। সেই মিষ্টির গন্ধে ডেয়ো পিঁপড়ে কয়েকটা ঘুরছিল, তারই একটা তার পায়ের আঙুলে কামড়ে ধরেছে। সেটাকে সে মাথায় টিপে ধরে ছাড়িয়ে ফেলে দিয়ে বললে—পিঁপড়ে। রক্ত বের করে দিয়েছে। গুঁই আর কথা বললে না, অন্যেরাও বললে না, গুঁই শুধু বারকয়েক উপরের দিকে তাকালে। কি যেন ঝুরঝুর করে পড়ছে কিছুক্ষণ থেকে কিন্তু তার সাড় ছিল না এতক্ষণ, যোগাবাবুকে প্রশ্ন করতে গিয়ে সেটা ফিরে এসেছে। দেখছে কি পড়ছে। এপাশ থেকে ফ্লুট-বাজিয়ে চরণদাস বললে—ঘুণ। চাল থেকে ঘুণ পড়ছে। চুলে অনেক পড়েছে। ঝাড়ো।

গুঁই হাত দিয়ে মাথাটা ঝেড়ে নিয়ে বললে—বিশ্রী ব্যাপার।

বংশী হঠাৎ মাথার চুলের মুঠোটা ছেড়ে দিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে উঠল—হে গোবিন্দ!

আফিংখোর ভূদেব তার আফিংয়ের কৌটোটা মেঝের উপর ঠুকে আক্রোশভরে বললে—রাখ্ তোর গোবিন্দ। গোবিন্দ না কচু! গোবিন্দ থাকলে এই হয়?

কেউ প্রতিবাদ করলে না। ভূদেব বলেই গেল—ওর মা তুলসীর কীর্তনের দলে বেহালা বাজিয়েছি; তখন থেকে আমি দেখছি। গোবিন্দের নাম অনেক করেছে। তার ফল এই। গোবিন্দ!

এতেও কেউ কথা কইলে না। আধমিনিটের জন্য আবার সেই অসাড় স্তব্ধতা। আধমিনিট পর যোগাবাবু চীৎকার করে উঠল—চ—ণ্ডা—ল! চ—ণ্ডা—ল!

সে চীৎকারে সচকিত হয়ে উঠল গোটা বাসাটা।

পাশের ঘরে বাবুল উঠে বসল সে যেন কথাটার প্রতিধ্বনি তুলে বললে—এ ব্রুট—এ কৃমিন্যাল! সেকেণ্ড কয়েক স্তব্ধ থেকে বললে—পাষণ্ড একটা! বর্বর! পিশাচ—পিশাচ—পিশাচ।

রীতুবাবুর ঠোঁট দুটি ডান পাশে একটু ক্ষীণ অথচ বিচিত্র হাসিতে

ঈষৎ বেঁকে পড়ল। হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা ধরলে সে। তারপর বললে—হায় রে জীবন! মিথ্যা স্বপ্ন সব? কিছু সত্য নাই?

নাটু বলে উঠল—চা-টা হবে না? চা হবে না আজ?

রীতুবাবু সায় দিলে—হ্যাঁ। তাই তো। চা খাওয়া তো হয় নি। নাটু, দেখ ভাই। দেখ। ঠাট্টা করছি না। চা—অন্ন—এ মিথ্যা হলে হবে না। দেখ, গোপাল কোথায়। সে ভদ্রলোক হয়তো ভেঙেই পড়েছে।

নাটকীয় রীতিতেই যাত্রাদলের ম্যানেজার গোপাল ঘোষ প্রবেশ করলে এই মুহূর্তটিতেই। বললে—আজ্ঞে না। উঠেছি। উঠতে হয়েছে। হেঁটেই আপনার কাছে এলাম। বিদেয় নিয়ে নায়কপক্ষ গোলমাল করছেন।

—গোলমাল? কিসের গোলমাল? বায়না করেছেন—বায়নাপত্র অনুযায়ী টাকা দেবেন। গোলমালের কি থাকতে পারে?

—বলছেন—ওই তো বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন—ডাকি।

—দাঁড়ান। বড্ড মিইয়ে আছি। গ্লাসটা তুলে পান করে নিয়ে সিগারেট ধরিয়ে বললে রীতুবাবু—ডেকেই বা কি কাজ। মেজাজ খিঁচড়ে আছে। কোথায় কথান্তর হয়ে যাবে। বলুন না কি বলছে।

—বলছে কালকের প্লে খারাপ হয়েছে। ডু নম্বর—তারা মিলনান্ত নাটক চেয়েছিল—তা হয় নি। এই সব আজেবাজে আর কি।

—হুঁ। বায়নায় লেখা আছে মিলনান্ত একদিন করতে হবে?

—তা নেই। তবে বলেছিলেন মুখে। একদিন মিলনান্ত হলে ভাল হয়। আমি বললাম—আপনারাই তো প্রথম দিন জোর করে প্রবীরপতন নিলেন। সেই তো আমাদের সব আপসেট হয়ে গেল।

—হ্যাঁ। প্রবীরপতনেই হল বটে। ওই যদি ও কলিয়ারীতে মোহিনীমায়ার খেলাটি না হত তা হলে—

বাবুল বলে উঠল—ঠিক বলেছেন। নাগিনী সুযোগ পেল।

নাগিনীর মুখে বিষ আছে কিন্তু দংশনের সুযোগ না পেলে কিছু করতে পারে না। সেইটেই আসল।

—হ্যাঁ।

আবার গোটা ঘরটা স্তব্ধ হল। কিন্তু গোপালের স্তব্ধ হয়ে থাকবার অবকাশ ছিল না। সে বললে—তা হলে কি বলব?

—কি বলবে? যাও, গিয়ে নিয়ে নাও। কি, কম দিতে চাচ্ছে?

—শেষের দিনের পঞ্চাশ টাকা কেটে নিচ্ছে।

—নিক। নিয়ে নাও।

—আর বলছে ওবেলায় বেলা তিনটের মধ্যে ব্যারাক খালি চাই ওদের।

—আঃ। শব্দটা যেন আপনি বেরিয়ে এল রীতুবাবুর মুখ থেকে। একটি নিষ্ঠুর বাস্তব যা ঢাকা পড়েছিল—যা মনে ছিল না তাই যেন নিজে অনাবৃত হয়ে প্রত্যক্ষ হয়ে সামনে দাঁড়াল।

বাবুল রাগের সুরে বলে উঠল—তাই যাব মশাই। বলে দেবেন। তার জন্যে নোটিস কেন? তাই বা কেন, চলুন, সব এবেলাতেই উঠব। আমি বলছি সকলকে—

—থাম।

—কেন?

—প্রোপ্রাইট্রেসের কথাটা ভাব।

—Yes.

—চল, বাইরে চল।

বাইরে তখন ঘরে বারান্দায় সব মুখর হয়ে উঠেছে। স্তব্ধতার ঠিক উলটো পিঠটা যেন উলটে গিয়েছে। কুৎসিত গালাগালিতে প্রতিটি রসনা প্রখর হয়ে উঠেছে।

কয়েকটা ছোট ছেলের কথা কানে এসে ঢুকল। অশ্লীল কথা বলছে অলকা আর গোরাবাবুকে নিয়ে। বাবুল বললে—সীতারাম! তারপর রুষ্টকণ্ঠে বললে—এই!

রীতুবাবু তার হাত টিপে ইশারা করে বললে—চেপে যাও ভাই। সহ্য না হয় কানে তুলো দাও। ওরা পতিত হে। সভ্যতা শীলতা আজও যাত্রার দলে হল না। কণ্ঠমশায়ের মত সাধক মানুষ—তাঁর দলেও সম্ভবপর হয় নি। আর বলেছি তো, এ একটি ছোট্ট পৃথিবী। আলোও যেমন কালোও তেমন।

—মিছে কথা। আলোটা কোথায়? মঞ্জরী অপেরায়?

—যদি বলি নিজে মঞ্জরী।

মুখের দিকে চেয়ে রইল বাবুল, প্রতিবাদ করলে না কিন্তু হ্যাঁও বললে না। শুধু বললে—কিন্তু যাবেনটা কোথায়?

—শোভাকে ডেকে নিয়ে প্রোপ্রাইট্রেসের কাছে যাব।

—কেন? তাঁকে এখন বিরক্ত করবেন কেন?

—মঞ্জরী অপেরার জন্যে। সামনে বায়না। কিন্তু মঞ্জরী অপেরা থাকছে কি থাকছে না সেটা কে বলবে?

—হ্যাঁ। ব্যাপারটা এমন হয়েছে যে আমার থই হারিয়ে যাচ্ছে। আমি লোককে হাসিয়েছি, এখন লোকে আমাকে দেখে হাসবে। বেকুব বনে গেছি।

রীতুবাবু বললে—এতগুলি লোক ভাই। গোটা যাত্রাদলের সিজনটা সামনে। এই তো মরসুমের শুরু। এখান থেকেই দল উঠিয়ে বাড়ি গিয়ে করবে কি? খাবে কি? আর দল উঠে যাবে এটা ভাই ভারী বুকে লাগে। সিজন শেষে উঠে যায় সে আলাদা কথা। এই ঠিক বেরিয়ে পথের মধ্যে মাসখানেকের ভিতর। খারাপ লাগছে। শোভা—

এসে পড়েছিল তারা মেয়েদের ঘরের সামনে। রীতুবাবু দরজার মুখ থেকে ডাকলে—শোভা—

—অ্যাঁ।

—বাইরে এস।

বেরিয়ে এল শোভা—কি?

—চল একবার। ওখানে। ওঁর কাছে। প্রোপ্রাইট্রেসের কাছে।

—এই সময়ে! না যাওয়াই ভাল কিন্তু।

—যাত্রাদলের ভালমন্দ আছে। যন্ত্রণা হচ্ছে দেহে তোমার, পার্টে নেমে হি হি করে হাসতে হয়। যাত্রাদলের কি হবে সেটা ওঁকে যে আজই জিজ্ঞাসা করতে হবে। সামনে গাওনা রয়েছে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শোভা বললে—হ্যাঁ। সেটা মনে ছিল না। পথ চলতে চলতে বললে—দল বোধ হয় রাখবে না। রাখবার তো কারণ নেই। গোরাবাবুর জন্যে দল।

—চল, দেখি কি বলেন।

* * * *

শিউনন্দন বাইরে চুপ করে বসেছিল। চুপের ছোঁয়াচটা তাকেও লেগেছে। ইশারা করে শোভা তাকে প্রশ্ন করলে—মঞ্জরী কি কাঁদছে?

শিউনন্দন সোজা বললে—দেখেন ভিতরে, যান।

—চা-টা খেয়েছে?

—হ্যাঁ, সো তো বানাইয়ে দিলম হমি। সামনে ধরলাম।

অর্থাৎ ধরে সে দিয়েছে কিন্তু খেয়েছে কি না খেয়েছ সে জানে না। সে বাইরে বসে বসে ভাবছে কলকাতায় গিয়ে এই গোরাবাবুকে—কেমন সে গোরাবাবু একবার দেখবে। শিউনন্দন গুণ্ডা ছিল ছেলে-বয়সে। পিতৃমাতৃহীন শিউনন্দন ছুরি খেয়ে ঢুকে পড়েছিল রাধারানী কীর্তনওয়ালীর বাড়ি। রাধারানী তাকে বাঁচিয়েছিল, চিকিৎসা করিয়েছিল, সেবা করেছিল নিজে। তারপর থেকে সে তার কাছে রয়ে গিয়েছিল। চাকর হিসেবে—তারপর মা ছেলের মত। রাধারানী টাকা দিয়ে তার দেশে ঘর করিয়ে দিয়েছে, বিয়ে দিয়েছে। শিউনন্দন রাধারানীর পর তুলসীর কাছে থেকেছে, মঞ্জরীকে মানুষ করেছে। আজও মঞ্জরীকে ছেড়ে যায় নি। বৎসরান্তে একবার দেশে যায়,

দু মাস থাকব বলে যায়, মাস দেড়েক যেতে না যেতে ফেরে। গোরাবাবুকেও খুব ভালবাসত। একটা আবদেরে দুরন্ত ছেলের মত দেখত। তার জন্য দোষ দিত মঞ্জরীকে। সে প্রশ্রয় এত দেয় কেন? আজ সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। বাল্যকালের গুণ্ডাগিরির মজা আগ্নেয়গিরিটা যেন ধোঁয়াচ্ছে আজ।

শোভা দরজার গোড়ায় গলা ঝেড়ে সাড়া দিয়ে তারপর কথা বললে, ডাকলে না মঞ্জরীকে, বললে—আমি শোভা।

—এস। একটু লম্বা টানে স্বাগতটুকুকে যেন সুস্বাগত করে তুললে।

—এলাম। ভিতরে গিয়ে সামনে দাঁড়াল শোভা।

—বস। মুখ তুলে বিষণ্ণ হেসে বসতে বললে মঞ্জরী।

শোভা ডান হাতখানি দিয়ে তোলা মুখের চিবুকে হাত দিয়ে ধরলে—মুখখানি দেখছে সে। কতখানি কেঁদেছে মঞ্জরী। মঞ্জরীর চোখ মুখ রক্তাভ, একটু ফুলেছে চোখের কোল। মঞ্জরী হেসে বললে—বস বস। ও পালা অনেকক্ষণ চলেছে। তারপর মুছেও ফেলেছি। আমাদের ভাগ্যই তো এই।

শোভা বললে—ছুঁড়ির ভাগ্যে অনেক দুঃখ।

বাধা দিলে মঞ্জরী—থাক ও কথা। যার যা হবে তার তা হোক। তমালতলায় ধুলোয় শয্যা পাতাবারও সময় নেই; শাপশাপান্ত তারও নেই। মাথায় আমার আকাশ ভেঙে পড়েছে। বাঁকড়োয় বায়না চারদিনের দিন। তারপর রাসে কান্দীতে। কি করি বল তো? গোপালমামা রাতুমাস্টারমশাই কাউকে ডাকতে পারছি নে। এমন লজ্জা লাগছে শোভাদি!

—কিছু লজ্জা নেই মঞ্জরী। তোমার দিক থেকে তুমি গেরস্তঘরের পুণ্যবানের ঘরের সতী মেয়েতে যা করে তাই করেছ। মেয়ে-যাত্রার দলে ঘুরে জন্ম গেল ভাই, আমি দেখেছি মেয়ে-যাত্রার যারা অধিকারিণী তারাই এক পুরুষকে তাড়িয়ে অন্য পুরুষ এনে মালিক

করে বসায়। তারা এমন করে পুরুষের লাথি খায় না। তুমি মুখ বুজে সহ্য করলে। এর সাক্ষী আমরা রইলাম। ভগবানের খাতায় লেখা হয়ে থাকল।

—আর লেখা হয়ে থাকল! দু ফোঁটা জল অনেকটা যেন হঠাৎ বেরিয়ে এল। একটু চুপ করে থেকে আঁচলে চোখ মুছে নিয়ে মঞ্জরী বললে—বস, এখনও দাঁড়িয়ে আছ। একবার ওঁদের মানে মাস্টার-মশাইকে, বাবুলবাবুকে, গোপালমামাকে ডাকতে হবে। তুমি বস, শিউনন্দনকে বলি ওঁদের—

—ওঁরা এসে দাঁড়িয়ে আছেন বাইরে। আমি দূত হয়ে ঢুকেছি।

—ছি ছি শোভাদি, বলতে হয় সে কথা। এরপরই গলা চেপে বললে—কি বল তো তুমি? এই সব কথাগুলো শুনলেন তো ওঁরা। ছি ছি ছি!

ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হয়েও উঠল তার। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাথায় ঘোমটাটা তুলে সে সহজ কণ্ঠস্বরে ডাকলে—আসুন গোপালমামা, ভেতরে আসুন। মাস্টারমশাই, বাবুলবাবু, আসুন। শোভাদি এমন যে বলতেই ভুলে গেছেন।

ভিতরে ঢুকে গোপালমামা বললে—নিজেই সাড়া দিয়ে ঢুকি মা। আজ দরজা খোলা তবু ঢুকতে পারছি নে যে!

বাবুল বোস বললে—অপরাধ আমার। লজ্জা আমার ছিল না। আজ লজ্জায় আমি মরে যাচ্ছি। আমি মাফ চাইতে এসেছি।

—না না না। এসব কথা বলে কেন আমার অপরাধ বাড়াচ্ছেন। আপনি তো দলের ভালোর জন্যে এনেছিলেন ওকে।

—না দিদি—আজ থেকে আপনাকে দিদি বলব, রাগ করবেন না তো?

—দেখুন দিকি ভাই, সে যে আমার পরম ভাগ্য। রাগ করব?

—বাস্ বাস্। ভাই বলেছেন, ভাগ্য মেনেছেন, দিন, পায়ের ধুলো দিন।

—না। ওটি বলবেন না।

—আমি বামুন নই দিদি, আমি কায়স্থ। না, আমি তাও নই। বলব, আমি আর্টিস্ট। আপনিও আর্টিস্ট—বড় আর্টিস্ট দিদি।

বিব্রত খানিকটা, ভয়ার্তের মত খানিকটা সরে গিয়ে মঞ্জরী বললে—না। বাবুলবাবু—ভাই—না।

বাবুলের হাত ধরে আকর্ষণ করলে রীতুবাবু। আকর্ষণের মধ্যে জোরের চেয়ে ইঙ্গিত ছিল প্রধান। বাবুল তার দিকে মুখ ফেরাতেই রীতুবাবু বললে—ওঁর কথা শোন। জোর করতে নেই এতে।

তার কণ্ঠস্বর তার দৃষ্টি ও ভঙ্গির মধ্যে এমন কিছু ছিল যাতে বাবুল নিরস্ত হল। বললে—থাক তবে। কিন্তু মনে মনে করলাম। আগেই আজ সকাল থেকে বারবার করেছি। আবারও করব।

—সে প্রণাম উনি অনেক পেয়েছেন, সবার পেয়েছেন।

—এসব কেন বলছেন মাস্টারমশাই। কেন আমার ভবিষ্যতের দুঃখ বাড়াচ্ছেন। ছি, আমি সামান্য মেয়ে, পতিতের ঘরে জন্ম—

—কিন্তু আপনি পতিত নন।

—পতিত না হলে এই হয় মাস্টারমশাই?

রীতুবাবু বললে—না। আপনি পতিত নন বলেই দুঃখ পেলেন। পতিত হলে দুঃখটা পেত সে।

চোখের জল আর বাধা মানল না। চোখ ফেটে বেরিয়ে এল। নীরবে কুণ্ঠাহীন মঞ্জরী দাঁড়িয়েই রইল, লুকোতে চেষ্টা করল না।

এরাও চুপ করে রইল সকলে। কথা বলতে পারলে না। মিনিট দুয়েক পর বোধ হয় মঞ্জরী আত্মসংবরণ করে চোখ মুছে এগিয়ে এসে রীতুবাবুর পায়ে হাত দিয়ে কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করলে। রীতুবাবু বললে—মঙ্গল হোক। এবং তা হবে। আপনার অনেক গুণ।

মঞ্জরী উঠে বোধ হয় অভ্যাসবশে মাথার ঘোমটা একটু টেনে হেসে বললে—বসুন। দাঁড়িয়ে থাকলে তো হবে না। অনেক কথা আছে। শিউনন্দন, চা কর বাবা।

—থাক না। চা কেন ?

বাবুল বলে উঠল—না। চা হবে। সব একটু সহজ হোক। সকাল থেকে গলা শুকিয়ে মরুভূমি হচ্ছে, কে যেন টিপে ধরছে। চা খেয়ে চোকড্ পাইপ ক্লীয়ার হোক। চা কর শিউনন্দন। বলুন দিদি আপনার কথা। তারপর আমরা বলব।

মঞ্জরী বলতে লাগল থেমে থেমে, বোধ হয় আত্মসংবরণ করে করে বলছিল—দলের কথা। মানে—যা ঘটল তা তো দেখলেন। সামনে বায়না। বাঁকড়োতে, কান্দীতে। এই দল নিয়ে কি— ? পুরনো জায়গা, ওখানে ওর নাম আছে। কি, কি বলব সেখানে ? এ সময় বায়নায় জবাবই বা দেব কি করে ?

গোপাল বললে—তা না হয় বলা যাবে, হঠাৎ অসুখ করে কলকাতায় গেছেন।

রীতুবাবু বললে—দাঁড়ান গোপালবাবু। তার আগে ঠিক করুন দল রাখবেন কি না ? মঞ্জরী অপেরা রাখবেন না তুলে দেবেন ?

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল মঞ্জরী। তারপর বললে—যেন প্রশ্ন করলে—দল তুলে দিয়ে আমি কি করব ? কি নিয়ে থাকব ? আমার জীবন কাটবে কি নিয়ে ?

শিউনন্দন চা নিয়ে এল। চায়ের কাপ রীতুবাবুর হাতে দিয়ে বললে—আপনা বাড়ি আছে বাবা, তুমার ভাড়া মিলছে, কিসে কাটবে জীবন ! ই ঝামেলা—

তার কথা ঢেকে দিয়ে মঞ্জরী বললে—দল আমি রাখব মাস্টারমশাই। দল রাখতে চাই। যদি ভরসা আপনাদের পাই।

বাবুল বলে উঠল—দিদি বলেছি। ভাই বলেছেন আপনি। আমার কণ্ট্রাক্ট পারমেনেণ্ট। মাস্টারমশাই বলুন।

রীতুবাবু বললে—ঠিক আছে। আমার নতুন করে বলবার কিছু নেই। আমি আছি। থাকব। আমাকে জবাব না দিলে মঞ্জরী অপেরা যতদিন থাকবে থাকব।

মঞ্জরী এবার প্রশ্ন করলে—লোক তো আনতে হবে। এতে তো হবে না।

—হ্যাঁ, হবে। না আনলে নায়কপক্ষ ঝামেলা করবে।

—তা হলে গোপালমামা যান কলকাতা। কাকে আনবেন বলুন?

রীতুবাবু বললে—না, আমি যাব। হিরো আর কুমারী হিরোইন।

—আরও একজন ভাল অ্যাক্‌ট্রেস পেলে আনুন। আমাকে একটু—

—ছুটি?

—হ্যাঁ।

—না। তা হলে দল তুলে দিন। থেমে আবার বললে রীতুবাবু—তুলে দিতে হবে না। আপনিই উঠে যাবে। তা হলে আমি নেই।

—বেশ। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে মঞ্জরী—রইলাম। ছুটি নেব না। মঞ্জরী অপেরা উঠলে আমার সইবে না।

তার মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

* * *

তিনদিনের দিন রীতুবাবু ফিরল। দল বসে ছিল আসানসোলে। রীতুবাবুর সঙ্গে এসেছে শেফালী। থিয়েটারে নাচিয়ে গাইয়ে, পার্টেও নামওয়ালা মেয়ে। আর অ্যাক্‌টর এসেছে থিয়েটারেরই অ্যাক্‌টর রণেন লাহিড়ী, পোস্টারের নাম রানা লাহিড়ী। পোস্টারও ছাপিয়ে এনেছেন তিনি।—

মঞ্জরী অপেরা মঞ্জরী অপেরা

মণিকাঞ্চন সংযোজনে

নবীন দীপ্তি!

রঙ্গমঞ্চের নবীনা নায়িকা সুন্দরী শেফালী।

ও

তরুণ নায়ক বিখ্যাত অভিনেতা রানা লাহিড়ী

তৎসহ

যাত্রাজগতের তারাসুন্দরী মঞ্জরী দেবী

রীতুবাবু বাবুল বোস নাটুবাবু গোপালীবালা

আশা ও বংশী মাস্টার।

গোপাল ঘোষের ম্যানেজারি বুদ্ধি অসাধারণ। দুখানা আপ দুখানা ডাউন ট্রেনে খানকয়েক পোস্টার মারবার ব্যবস্থা সে করলে। চলে গেল পোস্টারের বার্তা আসানসোল থেকে কলকাতা। ওদিকে আসানসোল থেকে মোগলসরাই পর্যন্ত। মঞ্জরী অপেরার মণিকাঞ্চন সংযোজনে নবীন দীপ্তি।

চোদ্দ

কালস্রোতে দাদা ভাসিয়ে ভাসিয়ে—তোমায়

আমায় হেথা মিলেছি আসিয়ে—

আবার ভেসে যাব—আবার কার ভাই হব—

—যোগাবাবু এত জোরে নয়। গুনগুন করে। নয় তো মাঠে গিয়ে।

আসানসোলে মঞ্জরী অপেরার বাসায় বারান্দায় প্রায় মাঝরাত্রে যোগাবাবু গান গাইছিল আপন মনে। পাশে বসে নতুন অ্যাক্টার রানা লাহিড়ী বসে ছিল। যোগাবাবুর ভাল লেগেছে এই তরুণ ছেলেটিকে। আশ্চর্য ছেলে। ছেলে বইকি। কত আর বয়স? বছর বত্রিশেক। বেশ সবল স্বাস্থ্য-জোয়ান, রোজ ভোরে উঠে এক্‌সারসাইজ করে। দেখতে সুন্দর। গোরাবাবুর মত নয়—গোরাবাবু সত্যিই গোরাবাবু। চেহারাতে গৌরাঙ্গ—মেজাজে গোরাপল্টন। কি লম্বা! এ ছেলেটি লম্বায় ইঞ্চি চারেক কম হবে। মদ খায় না। খায় না কেন, ছোঁয় না। সিগারেট খায় না। লেখা-পড়াও জানে, বি-এ পর্যন্ত পড়েছে। চাকরীবাকরী না পেয়ে

বাবুলের মত অ্যামেচার করে বেড়াত। তারপর বিনা মাইনেতে থিয়েটারে কিছুদিন। দু' তিনটে পার্টে নাম করে মাইনেও হয়েছিল চল্লিশ টাকা। মাস কয়েক আগে একখানা নতুন বইয়ে তাকে একটি পার্ট দেওয়া হয়েছিল—হিরোর বন্ধু। রিহারস্যালও দিচ্ছিল, এবং সকলে ভালও বলেছিল। কিন্তু হঠাৎ একজন আধাতরুণ অপেক্ষাকৃত নামকরা অ্যাক্টর এসে যোগ দিলেন থিয়েটারে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ আছে, একটু আধটু অন্তরঙ্গতাও আছে; সুতরাং রানা লাহিড়ীর পার্টটা তার কাছ থেকে নিয়ে তাকে দেওয়া হল। এবং রানাকে দেওয়া হল একটা ছোট পার্ট। রানা সঙ্গে সঙ্গেই—'আমি চললাম' বলে চলে এসেছিল। কণ্ট্রাক্ট ছিল না এবং কর্তৃপক্ষের গরজও ছিল না, সুতরাং হাঙ্গামা কিছু হয় নি। মধ্যে মধ্যে ট্রিস্ট থিয়েটারের দল বের হচ্ছিল। কিছু বেকার পুরনো আমলের অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস মিলে দল করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাদের সঙ্গেই ঘুরছিল। আলাপ বাবুলের সঙ্গে ছিল। বাবুলই রীতুবাবুকে বলে দিয়েছিল রানার কথা। রীতুবাবু তাকে পাকড়াও করে বলতেই সে রাজী হয়ে এসেছে। শর্ত গোরাবাবুর পার্ট তাকে দিতে হবে এবং মাইনে একশো পঁচাত্তর।

গম্ভীর মানুষ একটু। সঙ্গে কিছু বইপত্র আছে, পড়াশুনা করে। রীতুবাবু বাবুল মণি নাটু এরা মদ খায় ও বসে থাকে। হাসে গল্প-গুজব করে, কিন্তু মদ ছোঁয় না। সিগারেট দু প্যাকেট তার প্রাপ্য, সে এক প্যাকেট নেয়, এক প্যাকেট নেয় না। যে প্যাকেটটা নেয় সেটার দশটাই সে রীতুবাবু বাবুল—মধ্যে মধ্যে বংশীকেও দিয়ে দেয়। নাটু একটু বিরক্ত হয়েছে এতে। অন্তত দৈনিক এক প্যাকেট সিগারেট বিক্রী তার কমে গেছে।

আর এসেছে শেফালী। সেই অলকার জায়গায় কুমারী হিরোইন। নাচিয়ে গাইয়ে, তন্বী গড়ন, রূপও আছে। তবে অলকার মুখে নাকের খাঁজ এবং নাকের একটু হ্রস্বতার জন্য যে

বিচিত্র কটি চটুল চটক ছিল—তা নেই। মেয়েটি পার্টও করে ভাল। বয়স একটু বেশী। মঞ্জরীর বয়স তিরিশ বত্রিশ—তার থেকেও বেশী। ছেলেবয়স থেকেই থিয়েটারে ছিল। এখন বেকার হয়ে পড়েছে। হঠাৎ থিয়েটার জগতে ভদ্রঘরের মেয়েদের পার্ট করা রেওয়াজ সুরু হয়ে তাদের কদর কমেছে। পোস্টারে বিজ্ঞাপনে নামের শেষে খেতাব দেয় মিত্র-বোস-পাল-চ্যাটার্জী-মুখার্জী। এক তারা থিয়েটারে ইন্দ্রসেন ঐতিহাসিক নাটক করছিল এবং সে এই সব ভদ্রঘরের মেয়েদের থেকে তাদের সমাজের মেয়েদের পছন্দ বেশী করত। তার ওখানেই চাকরী করছিল মাস কয়েক আগে পর্যন্ত। কিন্তু লোকসান খেয়ে খেয়ে তারা থিয়েটারের মালিক খোলনলচে সব বদল করে একেবারে হাল আমলের থিয়েটার খুলছেন। মেয়েটি একটু চপলা—একটু তরলা। লোকে আড়ালে বলে খুকী। রীতুবাবু তাকে এনেছে। আরও এনেছে থিয়েটারের দলের বাতিল দুটি বয়স হওয়া মেয়ে। সখীর দলে নাচবে। রীতুবাবুর হিসাব আছে। মেয়ে দুটি ক্ষীণাঙ্গী। সাজালে অল্পবয়সী হিসেবে চালানো যায়।

শেফালী মানুষটি ভাল। তবে রুচি অরুচি নিয়ে চালে-চলনে তার নাকটি একটু উঁচু—এবং সে ক্ষেত্রে রসনাখানি বেশ হাল্কা এবং ধারালো। অভিনেত্রী হিসেবেও সে গুণবতী। তার বড় গুণ এই যে, যা তাকে শেখানো হয় তার উপর কোন রঙ না চড়িয়ে ঠিক তেমনিটিই করে যায়। তবে তাকে স্বাধীনতা দিলে নিজের মত একটি গড়নও দিতে পারে। দোষের মধ্যে দোষ তার—সে পুরুষ শিকারী। সে শিকার কিন্তু তার দুদিনের খেলা। তিনদিনের দিন সে নিস্পৃহ। রীতুবাবু পাকা যাত্রাদলের ভেটার্ণ, সে বলতে গেলে—নিরাসক্ত বা তার এদিকে মোহও নেই, মুক্তিও নেই—এবং শিকার খেলায় নেশাও আছে। ভয় এক্ষেত্রে নাটুর, বংশীর। আর মণির। নাটু বা বংশী দুজনে প্রুফ। খুব ভয় নেই। ভয় মণিকে নিয়ে।

বুঁচী ওর সঙ্গে জুটি-জুটি করছে। যদি ভাঙাচেরা হয় তো ওখানেই হবে।

শোভা বলেছিল—কি গো, তুমি জুটবে নাকি?

রীতুবাবু বলেছিল—জোটা কি সহজ কথা শোভাদি? আমার ভাগ্যে ছোটাছুটিই সার। দেখলে তো এতদিন।

—হ্যাঁ, তুমি একটা জন্তু বটে। কিন্তু আশা গোপালী বুঁচী এদের কারুকে না তাড়ালে চলছে না?

—ডরো মৎ। নাটু বংশী ওদিকে কঠিন চিজ। বুঁচীকে যতদূর জানি মণিকে যদি বাঁধেও তবে দুদিন পর খুলে দেবে।

—হুঁ। তুমি ভাল জান। তোমার দিন কয়েকের ও-ঘরে অভিসারের কথা জানি।

—সুনাম দুর্নাম স্তব নিন্দা সমান আমার দেবী।

—হ্যাঁ, তুমি মহাদেব।

—নিশ্চয়। দরকার হলে মদনকে ভস্ম করি। আবার নারদকে পাঠাই গিরিরাজের ঘরে উমার জন্যে। আবার মোহিনীর রূপে ভুলে তার পিছু পিছু ত্রিভুবন ছুটি।

—সেইটি দেখবার জন্যে দু চোখ ড্যাবড্যাব করে মেলে চেয়ে রয়েছি।

—থাক।

শোভা যা সন্দেহ করুক বা ভয় করুক সেটা সত্য হয় নি। সত্য অন্য মুখে ছুটেছে। শেফালীর চোখ পড়েছে রানা লাহিড়ীর উপর—লোকে অনুমান করছে। আবার কেউ কেউ বলছে—বাবুল এতদিনে শেফালীকে দেখে ভুলেছে। রীতুবাবু কিছু বলে না। সে দর্শক; দেখে যায়।

যাই হোক, মঞ্জরী অপেরা প্রায় ঠিকই চলছে। গোরাবাবু এবং অলকা যাওয়াতে ক্ষতি কিছু হয়েছিল—কিন্তু কালীপূজোর পর জগদ্ধাত্রী পূজোয় বায়না ছিল বাঁকুড়ো জেলার ভারা গ্রামে।

বড় লোকের গ্রাম। কলিয়ারী প্রোপ্রাইটার আছে মস্তবড়। সেখানে এই ঘটনার পর প্রথম অভিনয়। বায়না আগে থেকেই ছিল। ঘটনাটা ঘটবার পর এ অঞ্চলে রটতে দেরী হয় নি। তারা রাণীগঞ্জের পর দামোদর পার হয়ে কয়েক মাইলের মধ্যেই। রাণীগঞ্জ এখান থেকে মাইল তিরিশ। লোকও তাদের এসেছিল। কিন্তু মঞ্জরী নিজে সে লোকের সঙ্গে দেখা করে বলেছিল—ভাল গাওনা না হয় আমরা একটি পয়সা দক্ষিণে নেব না। ভাল লাগে দেবেন। শুধু গাওনা করতে দিন। নিজে হাতে কর্তাদের কাছে চিঠিও লিখে দিয়েছিল। অসুবিধে বিশেষ কিছু হয় নি। প্রবীর পতনই করেছিল। প্রবীর করেছিল রানা লাহিড়ী—সতী তুলসীতে শঙ্খচূড় রীতুবাবু। মোহিনীমায়া জনা তুলসী করেছিল মঞ্জরী। বাদ দিয়েছিল গন্ধর্ব-কন্যা। অভিনয় ভালই হয়েছিল। তবে রানা লাহিড়ী মঞ্জরীর সামনে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। শঙ্খচূড়ে রীতুবাবুকে ঠিক মানায় নি।

রানা লাহিড়ী ওই দুটো পার্ট একসঙ্গে করা দেখে প্রায় বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল। অভিনয়ের মাঝখানেই রীতুবাবু বলেছিল—একটু নার্ভাস হচ্ছে নাকি ব্রাদার ?

—তা একটু হচ্ছি। মানে—

—মানে—এ রকমটা ঠিক কল্পনা কর নি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এ অসাধারণ অ্যাক্ট্রেস। এ স্টেজে যায় নি কেন ?

—যায় নি গোরাবাবুর জন্যে। আর—

নীরব রানা 'আর কি' শুনবার জন্য রীতুবাবুর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। রীতুবাবু বলেছিল—দেখ, প্রোপ্রাইট্রেস, মেন অ্যাক্ট্রেস দুটো একসঙ্গে—কি বলে তোমাদের কালের ভাষ্যে—সাম্রাজ্যবাদ সামন্ততন্ত্রবাদ একসঙ্গে। একসঙ্গে সম্রাজ্ঞী এবং প্রধান সেনাপতি বা পত্নী বা অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্টও বটে। যা বল। চাকরীর ধাত নয়।

—তা ঠিক বলেছেন।

—একটু নার্ভ শক্ত কর। মোহিনীমায়া দেখে ভড়কে যেয়ো না। এবার জনায় না—ও যাকে বলে আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠবে। আগ্নেয়-গিরির বুকে গোরাবাবু শূল বিদ্ধ করে গেছে। আজ সাবধান।

—দেখি।

—একটা কথা বলব?

—বলুন।

—একটু স্টিমুলেণ্ট করে নাও।

—না।

—কেন?

—ওটা খাব না, প্রতিজ্ঞা করে ঢুকেছি এ রাজ্যে।

—বল কি? কার কাছে? বিয়ে—

—না, করি নি।

—তবে? মায়ের কাছে?

—উঁহু, নিজের কাছে।

—সাবাস, তা হলে! আরও কিছু প্রতিজ্ঞা আছে নাকি? মানে প্রেম?

—তাও আছে।

—ভাল। তুমি পারবে দাঁড়াতে ওর সামনে। যাও, আসরে ঢুকবার সময় হয়েছে।

রানা লাহিড়ী প্রবীরের পার্ট এর আগে করেছিল। বইখানাও গিরীশচন্দ্রের জন্য সামনে রেখেই লেখা। কিছুটা ভাষার এদিক-ওদিক করা আছে। তাতে অসুবিধা ছিল—তবুও সে মোটামুটি দাঁড়িয়েছিল।

রাসে বায়না ছিল কাঁদীর রাজবাড়িতে। সেখানে রানা লাহিড়ী আরও কিছু উন্নতি করেছিল। রীতুবাবু, বাবুল, গোপাল সকলেই

মঞ্জরীকে বলেছিল মোহিনীমায়া শেফালীকে দিতে। কিন্তু মঞ্জরী তা দেয় নি। বলেছিল—না, ওটা এরপর থেকে আমিই করব।

শেফালী একটু মুখ ভার করে বলেছিল—তা হলে আমাকে আনলে কেন ভাই?

—কেন, তুমি তুলসীতে কৃষ্ণের পার্ট কর। অলকা মাঝখানে যে নাচটা নাচত সেটা নাচ। তারপর এই তো দলের দু মাস একরকম ছুটি বলতে গেলে—এর মধ্যে নতুন বই নামাতেই হবে। গন্ধর্বকন্যাটা বাতিল হয়ে গেল। তাতে তোমার পার্ট থাকবে।

দলে একটা কানাকানি উঠল।

বাবুল রীতুবাবুকে বললে—হার্ড (heard) বিগ ব্রাদার? গসিপ্? গুজবং গুজবং ঘোরং সর্ব লোকস্য ফিসিং ফিসিং।

রীতুবাবু হেসে বললে—গন্ধর্বকন্যায় পার্ট করে যে সংস্কৃতে ঘোর পণ্ডিতং হয়ে গেলেং তুমি।

—পার্টটা বড় ভাল ছিল দাদা!

হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—কি যে করলে মাই লর্ড আমার! অ্যাণ্ড ছ্যাট অলি!

—ওঃ, অদ্ভুত মেয়ে রে! আমাদের মত বলটা ড্রিবলিং করে গোলে ঢুকে গেল। মঞ্জরীর মত গোলকীপার হেরে গেল।

বাবুল চুপি চুপি বললে—সেই তো গুজব। প্রোপ্রাইট্রেস এবার গোলকিপিং ছেড়ে সেণ্টার ফরোয়ার্ড পজিসনে এসেছেন। গোলে বুঝি ঢুকল বল!

হেসে রীতুবাবু বললে—গোলি এবার রানা লাহিড়ী!

—ই—য়ে—স। তাই গুজব।

—তোমার লাইন ক্লীয়ার তা হলে!

—মানে?

—শেফালী—

—যাঃ! কি যে বলেন মাইরী! দূর দূর দূর। যাঃ—

রাঁতুবাবু হো-হো করে হেসে উঠল। তারপর বললে—দেখ, দিলদার না—লিটল ব্রাদার। দিলদার বলত গোরাবাবু, তাকে মানাত। আমার কাছে তোমার লিটল ব্রাদারই ভাল।

—ও-কে। ভেরী ভেরী ভেরী গুড! নাও (now), বলুন—

—এই যে প্রপঞ্চমায়া ভরা রঙ্গভূমি আমাদের, এর কাণ্ড তো দেখছ। এখন এমনি একটি প্রোপ্রাইট্রেসের বিবরণ কহি—শ্রবণ কর। আমাদের তখন নবযৌবন। কলেজে পড়ি। বুঝেছ। গিয়েছিলাম বন্ধুর সঙ্গে তাদের দেশে। রাস উৎসব। রাসে মেয়ে-যাত্রার দল আসছে। রাধাসখী অপেরা—শ্রীমতী রাধা নাম্নী অ্যাক্‌ট্রেস তার প্রোপ্রাইট্রেস। বড় মায়ের মেয়ে। বড়লোক শোষণ করার অপবাদ ছিল মায়ের। প্রথম স্বাদ পান তিনি এক বড়লোক কাপড়-ব্যবসায়ীর পুত্রের পনের হাজার টাকা গায়েব করে। ছোকরা যেতেন আসতেন। একদিন গদী থেকে বেরিয়ে কলকাতার বিভিন্ন দোকানদারের কাছে পাওনা আদায় করে পনের হাজার টাকা কোমরে বেঁধে তাঁর বাড়ি যান। রাত্রে মদ্যপান করেন প্রচুর, ফুর্তি হয় প্রচুর। তারপর অজ্ঞান প্রায়। কোনরকমে বাড়ির গাড়িতে এসে চড়ে গৃহ-প্রত্যাবর্তন করেন। সকালে তাও বেলা দশটায় জ্ঞান হলে দেখেন—পনের হাজার ফাঁক। পুলিস হাঙ্গামা হল। কিন্তু ফল কিছু হল না। প্রমাণই হল না যে পনের হাজার টাকা তাঁর সঙ্গে ছিল। যাই হোক, এই ভাবে আর না হলেও অন্য পন্থায় আরও কটি বড়লোক ঘায়েল করে অনেক টাকার গহনা বাড়ি রেখে গতাসু হলেন। রইলেন এক কন্যা শ্রীমতী রাধা। রূপসী। তাঁর জাগল প্রেম-তৃষ্ণা। জাগালে এক যাত্রাদলের অ্যাক্টর। তিনি হিরো এবং শ্রীমতী হিরোইন এই করে খুললেন রাধাসখী অপেরা। সুন্দর দল। অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। রাধার প্রেমে পড়েছিলাম ব্রাদার। মহিষাসুর বধ পালা। মহিষাসুর—যতীন পাঁজা। এখনও মনে আছে—মহিষাসুর খোলা তলোয়ার হাতে দেব-সভায় প্রবেশ করে

বলছে—মহিষাসুরের রাজ্য স্থাপনে বাধা দেয় কে রে? ওঃ, সে কি থ্রিল!

আর শ্রীমতী রাধা—দুর্গা। রাধা গান গাইত, প্রতি কলির শেষে একটি কঁরে হ্যাঁক মানে গমক দিত। আর চোখ বুজত। মনে আছে মহিষাসুর সে তো শিবের অংশোদ্ভূত। মহিষাসুর দুর্গাকে দেখে প্রেমে পড়ে প্রেম নিবেদন করলে। তার বুকের চামড়া চিরে দেখালে সেখানে দুর্গারই মূর্তি। দুর্গা সরোষে প্রত্যাখ্যান করতে গেলেন, কিন্তু রোষ এল না। মহিষাসুর ধরলে চুলের মুঠোয়। তখন ব্রাদার, ঝরির রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু কি চুলই না ছিল রাধার! সে কেশরাশি!

রুকাঙ্গদের হরিবাসর পালায়, পাঁজা রুকাঙ্গদ, শ্রীমতী তার রাণী। মানে কপোত কপোতী সম ব্যাপার।

বছর কয়েক পর—যাত্রায় ঢুকি নি ঠিক—তবে মধ্যে মধ্যে পার্ট করছি। এক জায়গায় শ্রীমতী রাধাসখীর দল দেখলাম। তখন যতীন পাঁজা আউট। পাঁজার সঙ্গ ভেঙেছে। পাঁজা ভেগেছে—তার স্থলে এক ঘোষ তরুণ নায়ক, তিনিই ম্যানেজার। অতঃপর কতিপয় বর্ষ পর—এই ঘোষ এলেন আমাদের দলে। জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার? না, রাধা তাঁর অপেক্ষা তরুণ একজনকে ম্যানেজার এবং অ্যাক্টর হিরো নিযুক্ত করেছেন। তখন রাধার নাকি সিঁথির পাশে চুলে দু-এক গাছি পাকা চুল দেখা গেছে এবং সিঁথি চওড়া হয়েছে। ওকে শেষ দেখলাম সে বড় করুণ অবস্থা। তখন আমি বীণাপাণিতে প্রায় সর্বেসর্বা। অবশ্য সবার উপর আছেন বিদ্যাবিনোদ। গিয়েছি কাতরাসগড় প্লে করতে। একজন লোক এল। পাঠিয়েছেন শ্রীমতী রাধা—যদি একবার পায়ের ধুলো দেন। ওদের সেই দিন সন্ধ্যেতে আসর। আমাদের আসর পরের দিন। আগের দিন গান শ্রীমতীর দল করেছে। সুবিধে হয় নি। বড্ড টিট্‌কিরি খেয়েছে। বিদ্যা-বিনোদ আর আমি গেলাম। রাধার বয়স তখন পঞ্চাশের উপর। চুলে কলপ পড়ে কাঁচা কসকস করছে। মুখে পাউডার।

বিদ্যেবিনোদের সামনে হাত জোড় করে বললে—আমাকে অপমান থেকে বাঁচান। দলের লোক পালিয়েছে। অ্যাক্টর গেছে, বাজিয়ে গেছে—চার পাঁচজন না বলে পালিয়েছে। একবাক্স পোশাক নিয়ে পালিয়েছে। অথচ আজ সন্ধ্যেতে গাওনা। বিদ্যেবিনোদ মশায় মহাশয় ব্যক্তি। তিনি সব দিলেন। সাজপোশাক বাজিয়ে অ্যাক্টর মায় আমাকে পর্যন্ত। কথা হল একটা জানা পুরনো বই—দু দলের করা আছে—তাই হবে। হল তাই। উর্বশী উদ্ধার। আমি দণ্ডী—ওই পঞ্চাশ বছরের বুড়ী উর্বশী। পার্ট পারলে না ভাল শ্রীমতী রাধা কিন্তু সেজেছিল বটে। টুপি খুলে সেলাম। আর সে কি কটাক্ষ! প্লে ভাঙছে—আমায় বলেছিল, আসুন না দলে—আমি আবার গড়ব তা হলে। বলা বাহুল্য, আমি যাই নি এবং রাধা-সখীর দলের সেই শেষ গাওনা।

তা—ব্রাদার, এ রঙ্গভূমে হরি যাকে যা সাজান তাই তাকে সাজতে হয় বটে কিন্তু তপস্যার শেষ নেই, এবং সে তপস্যা পুরুষ করে প্রকৃতির জন্য—প্রকৃতি করে পুরুষের জন্য। জঘন্য ভাব—বলতে পার বন্য বর্বর কাল বিরাজমান এখানে। সব জন্তু জন্তু জন্তু। আবার ভাবতে পার আরও একশো দুশো বছর পরের কালের কথা—যখন সংসারে সব নারীই নহ মাতা নহ কন্যা—নহ বধূ নহ ভগ্নী—নারী শুধু সুন্দরী রূপসী উর্বশী এবং পুরুষেরা সবাই পুরূরবা। অর্থাৎ যা হইবে তাই এখানে বিরাজমান। তুমি শেফালীকে কামনা কর, কি দোষ? কেউ যদি রানা লাহিড়ীর জন্যে মোহিনীমায়া সাজে কোঽত্র দোষঃ! এমন কি আমি যদি শোভাকে চাই তাতেও বিস্ময় বা হাস্যের কিছু নেই।

বাবুল ঢিপ করে একটা প্রণাম করেছিল রীতুবাবুকে। রীতুবাবু তাকে জোর করে ধরে তার গালে একটা চুমো খেয়েছিল। এবং বলেছিল—ছোট ভাইটি আমার। এখানে সব করো। হেসো কেঁদো

রাগও করো—কিন্তু কদাপি বিস্ময় প্রকাশ করো না। 'রঙ্গের নটবর হরি যারে যা সাজান সেই তা সাজে।'

বলতে গেলে দলের পুরনো লোকেরা যারা যাত্রাদলে অনেক দিন থেকে রয়েছে—তারা 'ঘাগী', তারা চুপচাপ চোখ মেলে শুধু দেখেই যাচ্ছে নটবর কাকে কি সাজান। চুনোপুঁটিরা ফিসফাস গুজগুজ করছে। ওদের কারুর কোন নতুন সাজে সাজবার প্রত্যাশা নেই, শুধু কৌতূহলই আছে। যারা চুপচাপ রয়েছে বাইরে—তারাও কিন্তু ভিতরে ভিতরে চঞ্চল। মনের গভীরে সে চাঞ্চল্য চাপা রেখেছে।

নাটু সন্ত্রস্ত গোপালীর দৃষ্টি রানার উপর পড়েছে কি না তাই নিয়ে। মণি চঞ্চল—বাবুল চঞ্চল শেফালীকে নিয়ে, শেফালী চঞ্চল রানার জন্য। বুঁচীও তাই।

ওদিকে সখীর দলের জন্য যে দুটি থিয়েটার বাতিল মেয়েকে আনা হয়েছে—তাদের একজনের নাম মীনা আর একজনের নাম আঙুর। রোগা চেহারা, বয়স পঁয়তাল্লিশের উপর, মুখে রেখাও পড়েছে। তবে পুরু করে পেন্ট মেখে যখন আসরে নামে—তখন তাদের কুড়ি বাইশ বছরের যুবতী মেয়ে বলে মনে হয়। সাধারণ সময়েও ওরা সস্তা স্নো মাখে। মাথার চুলও ওদের কম কিন্তু ওরা সাধারণ সময়েও নিজের কেনা চুলের ঝরি ক্লিপ দিয়ে এঁটে মোটা খোঁপা বেঁধে থাকে। শুধু একবার সদ্য স্নানের পর ওদের সত্যকারের জীর্ণ স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে।

ওদের নিয়ে আসবার সময় রীতুবাবুই বলে দিয়েছিল—শোন্, গোটা কতক কথা কিন্তু বলে দি আগে। আসরে নামবার সময় পেন্ট করবি চড়া করে। থিয়েটারে যা করতিস তার থেকেও চড়া। আর চুলে 'ঝরি' লাগাবি ভাল করে। 'ঝরি' কিনে নে। নিজের ঝরি রাখা ভাল। পোশাক আমাদের নতুন। আর একটি কথা, দলে যত দিন ঘুরবি তত দিন এই যেমন রয়েছিস এমন থাকলে চলবে না। কাপড় জামা পরিষ্কার চাই, একটু চটকদারও চাই। কোন কারণে

ময়লা কাপড় জামা পরে বাইরে বের হওয়া চলবে না। কি রে বাবা, বুঝলি ?

তাদের মধ্যে আঙুর সকরুণ হেসে বলেছিল—বুঝেছি বাবা। গিল্টির গয়না তেঁতুল দিয়ে না মাজলে দিনে বের করা যায় না।

—হ্যাঁ বাবা। সন্ন্যেসীদের লম্বা লম্বা জটা। বটের আঠা ছেঁড়া চুল শন দিয়ে বানাতে হয়, গজায় না। সাজতে তাদেরও হয়। ভিক্ষের কারবার। তার উপযুক্ত ভেক নিতে হয় এ কারবারে—বুঝিস তো!

অন্যজন মীনা। সে বলেছিল—কিন্তু আমাদের মাইনেতে কুলোনো চাই তো বাবা।

—নিশ্চয়। তা আমি ভেবেছি। মাইনে যা ঠিক হল তার থেকে দু টাকা বেশী পাবি মাসে। ওটা মাইনেতেই ভুক্তান করতে বলে দিচ্ছি গোপালকে। নইলে তো অন্য সকলে গোলমাল করবে।

এরা সখীর দলটা সত্যিই বেশ আকর্ষণীয় করে তুলেছে। বাচ্চা ছেলেগুলোর সামনে ওরা থাকে। এবং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ ছলাকলা বিস্তারের কটাক্ষ ক্ষেপণের ক্ষেত্রে ওরা ছেলেগুলোর থেকে দক্ষ। ওদের বিশেষ আকর্ষণ দলের লোকের কাছে নেই কিন্তু দর্শকদের কাছে আছে। মাত্র ওরা পনের দিন এসেছে। এসেই ওরা ওদের বয়স ভুলেছে—জীর্ণতা ভুলেছে—এবং দলের মধ্যেও ওরা এই খেলায় মেতেছে। মীনা একটু সঙ্কুচিত এবং সংযত, কিন্তু আঙুর তা নয়। দলের নীচের তলার লোকদের সঙ্গে হাসি তামাশা রঙ্গরস এবং তাদের উপর কটাক্ষ নিক্ষেপে ওদের লজ্জা নেই। তবে নজর ওদের বয়স্ক লোকের উপর প্রখর।

* * * *

যোগাবাবু গান গাইছিল, রানা লাহিড়ী শুনছিল। অনেককাল আগের গান। এক রাজ্যহারা রাজার দুই ছেলে—একজন বীর—

পিতৃরাজ্য উদ্ধারে কৃতসংকল্প। অন্যজন—ছোটটি আজন্ম বৈরাগী উদাসী। এই ছোটটিই শত্রুর গুপ্ত বাণে আহত হয়ে মরছে, বড় ভাই কাঁদছে। এ গান গাইছে ওই ছোট ভাই। গানটার ভাব বা ভাষার প্রতি রানার কোন মোহ নেই, যোগাবাবুর কণ্ঠস্বর এবং গায়কী তার ভাল লাগে। তা ছাড়া পুরনো কালের যাত্রার ধারাও সে বুঝবার চেষ্টা করে এ থেকে।

বাধা দিলে এসে গোপাল ঘোষ—মাস্টার, এত জোরে নয়। একে বলে আস্তে গাও।

—আস্তে? যোগামাস্টার তার মুখের দিকে তাকালে।

—হ্যাঁ গো। একে বলে—একটু আস্তে।

—তোকে বলে—আস্তে গান হয়? আমি কি মাইকে গাইয়ে নাকি? গলার জোর না থাকলে গান? গান গাইবে—হুই, চলে যাবে উ গাঁয়ের ধার পর্যন্ত। আমি কি দিবে গাইয়ে নাকি? কণ্ঠ-মশায়ের দলে জুড়ির গান করেছি—

বাধা দিয়ে রানা লাহিড়ী বললে—বেশ তো, একটু আস্তেই গান না।

—আমি মশাই গাইব না। যোগামাস্টার মুহূর্তে উঠে পড়ল।

—একে বলে—ভ্যালা বিপদ রে বাবা! মাস্টার, রাগ করছ কেন?

—রাগ করছি কেন? মুখ্যু কোথাকার।

হঠাৎ তার রাগটা চরমে উঠে গেল—ব্রহ্মহত্যা করলি তুই। গানে বাধা দিলি, তাল ভঙ্গ করলি—তোর ব্রহ্মহত্যার পাতক হল। অঁঃ—মেয়েগুলো খিলখিল করে হাসছে, বড় অ্যাক্টররা ফষ্টমো করছে, মদ খাচ্ছে, তাতে দোষ হল না। দোষ হল গানে—

—আরে শোন শোন—

রীতুবাবু বাইরে এসে গলা ঝেড়ে দাঁড়াল—কি হল? মাস্টারের কি হল?

যোগাবাবু এগিয়ে এসে বললে—দেখুন তো মশাই, এই হাফ

ম্যানেজারের বাত শুনুন তো—বলে আস্তে গান গাও। গান আস্তে হয়, বলুন আপনি!

রীতুবাবু বললে—কিন্তু দূত অবধ্য। শ্রীযুত গোপালচন্দ্র দূত মাত্র, মহর্ষি দুর্বাসা! শুন মহাভাগ, আমিই পাঠিয়েছিনু—

মুহূর্তে যোগানন্দ অন্য মানুষ হয়ে গেল। একমুখ হেসে বললে—অ্যাই যা! তাই বলতে হয়! দেখুন দেখি। আপনার নাম করলে। কিন্তু আপনার ভাল লাগল না গান? একটা খানদানী সমঝদার, আমীর লোক—

—উঁহু, রিহারস্যাল বসছে। বসছে কেন বসেছে। শেফালীকে বসাচ্ছে মণি। তোমার গানে মন টানলে সে মনকে ফেরাই কি করে বল?

—বেশ বেশ। তা আস্তেই গাইছি। না হয় সরে যাচ্ছি একটুকুন। তা বলতে হয়। তা না, একেবারে হোঁৎকার মত এসেই ম্যানেজারি ঢঙে—। হুঁঃ! চলুন লাহিড়ীবাবু—

রীতুবাবু বললে—তাও যে মাফ করতে হয় মহর্ষি। ওঁকেও যে দরকার রিহারস্যালে। পার্টগুলো বলে নেন। পার্ট তো সোজা নয়। প্রবীর, তার উপর শঙ্খচূড় আমাকে ঠিক মানায় নি। ওদিকে শিবের পার্টে খামতি হচ্ছে। শঙ্খচূড়ও ওঁকে করতে হবে। প্রোপ্রাইট্রেসের মনে মনে তাই ইচ্ছে। নতুন বই ধরতে হবে। এস ব্রাদার লাহিড়ী ভায়া! খুব হেভী টাস্ক!

—গানের মানে ধ্রুপদাঙ্গ গানটান যেন থাকে বুঝলেন বাবু।

যোগানন্দ বললে রীতুবাবুকে; তাকে তুষ্ট করবার জন্যে একেবারে বাবু বলে সম্বোধন করলে, যেটা যাত্রার দলে একমাত্র মালিককেই বলে—অন্যথায় সবাই মাস্টারমশায়।

রীতুবাবু রানা লাহিড়ীকে নিয়ে চলে গেল।

যোগানন্দের ক্রোধসুলভ উত্তর না পাওয়ার জন্যে মুহূর্তে তার ক্রোধ হয়ে গেল। সে রীতুবাবুর চলনভঙ্গী নকল করে চলে বলে উঠল—ছাতি ফুলিয়ে যেন মদমত্ত গজ! ওঃ!

বলেই সে কৃষ্ণযাত্রার বক্তার ভঙ্গিতে বক্তৃতা করে উঠল—ম—দো—ম—ত্ত মাতঙ্গকে আর কদলীবন দ—লনের জন্য বারংবার অঙ্কুশাঘাতে উত্তে—জিত করতে হবে না। অ্যাঃ, উত্তেজিত হয়েই আছেন!

তারপর সে চেয়ে দেখলে—কে কে দেখলে।

ছোট ঘর। আসানসোলের বাসা। কলিয়ারী অঞ্চলে বায়না বেশী ছিল এবার। সেই কারণে আসানসোলে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছে মঞ্জরী অপেরা। কালীপূজোর পর তারা গ্রামে জগদ্ধাত্রী-পূজোর গাওনা গেয়ে রাসে কাঁদীতে বায়না। কথা ছিল—জগদ্ধাত্রী-পূজোর পর বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে কাঁদীর দিকে। পথে মুরশিদাবাদ বহরমপুরে বিধু দালালকে পাঠিয়ে বায়না যোগাড় করে দু রাত্রি গাওনা করে চলে যাবে কাঁদী। ওখানকার ফেরত কলকাতা। তারপর বড়দিন পর্যন্ত একটা ছুটি। বড়দিনে অনেক জায়গায় মানে অনেক গ্রামে কালীপূজো হয়. চাকুরে বাবুরা বাড়ি ফেরে দল বেঁধে ওই সময়। এ সব গ্রাম অধিকাংশই চব্বিশ পরগনা হাওড়া হুগলী জেলায়। হুগলী জেলায় বাকুলিয়া গ্রামে একটা বড় গাওনার আসর। ওই বায়নাটার উপর মঞ্জরী অপেরার নজর ছিল। সব বড় বড় বাবু। সব কলকাতা বাসিন্দে ব্যবসাদার ও চাকুরে। কালীপূজো হয়, যাত্রা হয়, নিজেদের অ্যামেচার থিয়েটার হয়। খাওয়া-দাওয়া সমারোহ সাত দিন ধরে চলে। আসরে কলকাতার সেরা দল ছাড়া ছোট দল কখনও নামে নি। গণেশ অপেরা মথুরশা সত্যেম্বর রয়েল বীণাপাণি শ্রীচরণ ভাণ্ডারী এই সব দল গেয়ে এসেছে। এবার মঞ্জরী অপেরা যে দল গড়েছিল—তাতে বায়না তাদের পাবার কথা। না পেলে অন্য গ্রাম আছে। বিধু ঠিক বায়না আনবে। কিন্তু এই ঘটনার পর সব উৎসাহ দমে গেছে। দলের সবাই ম্রিয়মাণ। কিন্তু দলকে আবার এগিয়ে তুলতে রীতুবাবুর প্রবল উৎসাহ। মঞ্জরী মুখে নীরব।

কিছুই বলে না কিন্তু তার ওই নীরবতার মধ্যেই একটা জেদ আছে তা বোঝা যায়। সে বলেছে—যা বলবেন তাই করব আমি। আপনারা শুধু বলুন—করুন—আমি সবেতেই মেনে চলব। শুধু দলকে বাঁচান।

এখন সমস্যা কতকটা পূরণ হলেও খামতি অনেক আছে, থাকবেও। গোরাবাবুর অভাব রানা লাহিড়ী ঠিক পূরণ করতে পারবে না। অলি যা নেচেছে, যা পার্ট করেছে তার থেকে শেফালী নাচবে ভাল, পার্টও ভাল করবে কিন্তু ওই যে ভদ্দর ঘরে লেখাপড়া জানা মেয়ে সিনেমা-স্টার—ওই ছাপটার মোহ শেফালী পূর্ণ করতে পারবে না। আর সমস্যা—বইগুলো সবই পুরনো বই হয়ে গেল। নতুন বই গন্ধর্বকন্যা বাতিল হয়েছে। ওইখানেই মঞ্জরী বলেছে—না। ওই না অর্থাৎ ও বই হবে না—এ কথা সে পালটায় নি।

দু-চারটে কথা শুধু রীতুবাবুর সঙ্গে হয়েছে। রীতুবাবু বলেছিল, বইটা তৈরী বই। মার খেতে-খেতে উত্‌রে গেল—নাম হল। তা ছাড়া এতে একটি পার্ট—গোরাবাবুর পার্ট হলেই আর কোন গণ্ডগোল নেই। অলির নাম এ বইয়ে বিশেষ হয় নি। রানা লাহিড়ীকে এতে মানাবেও ভাল। গোরাবাবুকে একটু ভারী লাগত। এখন গাওনার মুখ—এতে নতুন বই নইলে চলে! আমি বলি—

—না। বইটা অপয়া। তা ছাড়া—

একটু থেমে মঞ্জরী বলেছিল—ওই বইটাই সব অনর্থের মূল। আপনি আজও ধরতে পারলেন না মাস্টারমশাই?

চোখ দুটো একবার জ্বলে উঠতে গেল কিন্তু পরক্ষণেই সে ম্লান হাসিতে বিষণ্ণ হয়ে গেল; বললে—নিজের কথা লিখেছে—গন্ধর্বকন্যা আমিই বটে—কিন্তু অলকা যেদিন এল সেদিন থেকে গন্ধর্বকন্যা হয়ে গেল ওই অলকাই। আমাকে দিলে রাজকন্যার পার্ট। এত বড় নাটক ওরা যা করে গেল—তার প্রথম অঙ্ক তো ওইটেই। ওই বই বাদ দিন।

—তা হলে? নতুন বই তো চাই।

—নতুন বই!

—চাই না? প্রথমেই তো সবাই বলবে—নতুন বই করুন। কি করবেন?

কথাটা খুব সত্য। যাত্রাদলের বায়না করবার সময় লোকের বিচার দুটো। অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস আর নতুন বই। নতুন বই দুখানা হলে ভাল হয়। অন্ততঃ একখানা নতুন বই আর অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস ভাল হলে চলে—তবে সেখানে অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস একেবারে বাছাবাছা হওয়া চাই। সাধারণতঃ বায়না হয় দু-রাত্রি আর তিন-রাত্রি। এক রাত্রির বায়না দল নিতে চায় না, নিতে হলে দেড়া দক্ষিণে না হলে পোষায় না। আর তিন রাত্রির পর চার রাত্রি বায়না—সে গাওনা খুব ভাল হলে তবে নায়কপক্ষ বলে আর একরাত্রি হোক। সেও শতকরা ষাট ভাগ বলে ওই নতুন বইটা আর একরাত্রি হোক। মঞ্জরী অপেরার জনার মত নামডাক সচরাচর কোন বইয়ের হয় না। গোরাবাবুর প্রবীর, মঞ্জরীর জনা খুব বিখ্যাত। তার ওপর এবার অলি চৌধুরী এসে ওই নাচ নেচে বইটার নাম বাড়িয়েছে। তারপর মঞ্জরী অলির ওই নাচ নেচে আরও একটা বিস্ময় সঞ্চার করেছে। গোরাবাবু চলে গেল, রানা লাহিড়ী খারাপ করে না—তবু গোরাবাবুর মতনটা করতে পারে নি। এখন লোকের আকর্ষণ হয়েছে একা মঞ্জরীর দুটো পার্ট। একসঙ্গে জনা আর মোহিনীমায়া। এখন বই বলতে গন্ধর্বকন্যা বাদ দিলে জনা আর সতী তুলসী। নতুন বই না হলে সত্যিই চলবে না। গতবার বই ছিল কর্ণবধ। কিন্তু থিয়েটারে কর্ণার্জুনের এত নাম যে, কর্ণ কেউ শুনতে চায় না।

মঞ্জরী বললে—তা হলে গন্ধর্বকন্যাই করুন। আমি নামব না।

রাঁতুবাবু ঘাড় নেড়ে বললে—লোকে শুনবে না। মারতে আসবে।

—তা হলে!

একটু ভেবে মঞ্জরী বললে—তা হলে রাসের বায়না সেরে কলকাতা ফিরে যার যা পাওনা মিটিয়ে দিয়ে—

—দল তুলে দেবেন ?

চুপ করে রইল মঞ্জরী।

—এতগুলো লোক খাবে কি ? মরে যাবে যে! আমরা যাব কোথায় ?

এবার মঞ্জরী বললে—আমায় একটু ভাবতে দিন।

—ভাবুন। কিন্তু মনে রাখবেন একেবারে আনকোরা নতুন বই—পাঁচ-সাত দিনে তৈরীও হবে না—আর বই-ই বা এখন কোথায় পাবেন ?

মঞ্জরী নিজের জন্যে ছোট একখানি ঘর নির্দিষ্ট করে নিয়েছিল। গোরাবাবু চলে যাওয়ার পর থেকে কতকটা সে একলা একলাই থাকতে চেয়েছে এবং থাকে। মঞ্জরী অপেরার যে ক্ষতি হয়েছে তা হয়েছে কিন্তু তার যা হয়েছে সে তার একান্ত নিজস্ব। সে কথা গোপন নয়—প্রকাশ্য। তার অন্তরের বেদনা আজ সকলের কাছে লজ্জার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরুষের ভালবাসার নারী যে তাকে অপরে যখন গোপনে ভালবেসে একদিন ছিনিয়ে নিয়ে যায় তখন পুরুষের আর মুখ দেখাবার উপায় থাকে না ; এত বড় হার আর পুরুষের হয় না। ধন যায়, সম্পদ যায়, সব যায়—মানুষ পথে দাঁড়ায়। তখন যদি তার ভালবাসার ধন নারীটি তার পাশে থাকে—তা হলে তার সব গিয়েও সব থাকে। লজ্জা তার হয় না। কিন্তু ধন সম্পদ থাকতেও তার নারী যদি অন্যের প্রেমে পৌরুষে মুগ্ধ হয়ে অন্যের সঙ্গে চলে যায় তখন আর তার মুখ দেখাবার পথ থাকে না। পরের কাছে দূরে থাক—আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের চোখেও চোখ রাখা যায় না। মেয়েদেরও তাই। ভদ্র ঘরের মেয়েরা লজ্জাকে ঢেকে রাখে ধর্ম, আচার, কৃচ্ছ্রসাধনকে আঁকড়ে ধরে। কিন্তু তাদের সমাজে এ বড় লজ্জা। নারীত্বের চরম লজ্জা। অবশ্য এর পথ একটা আছে।

সঙ্গে সঙ্গে আর একজনকে ভালবাসার জন বলে জীবনে টেনে নিয়ে অন্তত লোক-দেখানো উল্লাসের মধ্যে জীবন আরম্ভ করে দেওয়া। না হয় পুরোপুরি দেহের ব্যবসায়ে মাততে হয়। প্রমাণ করতে হয় যে গেল তার আসল দাম কিছুই ছিল না তার কাছে। তার দলে এ খেলা অনেক হয়ে গেছে। কিন্তু তার ব্যাপারটাই স্বতন্ত্র। আলাদা। তারা, তিন পুরুষ অর্থাৎ তিন মেয়ে—দিদিমা, মা এবং সে তিন জনেই এই নাম পেয়েছে বটে কিন্তু ঠিক দেহব্যবসায়িনী নয়। দিদিমা মা যদি বা এ ব্যবসায় বাধ্য হয়ে কিছুকালের জন্যে করে থেকেছে কিন্তু সে করে নি। তার ভাগ্যকে লোকে ঈর্ষা করত। জীবনে সংকল্প নিয়ে বিয়ে করেছিল যে, জন্ম তার যে কুলেই হোক কর্মে সে তাদের সমাজেও স্মরণীয়া হয়ে থাকবে। সে তো জানে তাদের সমাজের শতকরা অন্তত পঞ্চাশ জনের বুকের ভিতর ঘর-সংসারের জন্যে আকাঙ্ক্ষা থাকে। যারা এই কুলে জন্মায় তারাও বারবার এমনি করে ঘর বাঁধতে চেষ্টা করে। সে ঘর বারবার ভাঙে। যাদের একুলে জন্ম নয়, যারা সমাজের সংসারে জন্মে, ভাগ্য দোষে কর্মফেরে তার দিদিমার মত এসে পড়ে এখানে এই সমাজে তারাও তাদের সেই ফেলে-আসা কুল-সংসার কখনও ভোলে না, ভুলতে পারে না।

মনে পড়ে গেল সুশীলা মাসীর কথা। অপরূপ সুন্দরী ছিল সুশীলা মাসী। ঘর ছেড়ে চলে এসেছিল স্বামীর উপর আক্রোশে। নাচ গান শিখে থিয়েটারে ঢুকেছিল, তার রূপের আগুনে অনেক পতঙ্গ পুড়েছে। সুশীলা মাসী শুধু রূপসী ছিল না, ও কুল ছেড়ে অন্য কুল বা অকুল হোক, ঐ কূলে এসে লাস্যে হাস্যে হয়ে উঠেছিল সেই আগুন যে আগুন ঘরে লাগে—সব পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। থিয়েটারে প্রথম ছিল সখী। তারপর অ্যাক্‌ট্রেস। তারপর এল ভাদুড়ী মশায়ের যুগ। তাঁর থিয়েটারে কাজ করতে করতে তার প্রতিভা গেল খুলে। বয়স তখন চল্লিশের নিচে, যৌবনে রূপে তখনও জোয়ারের পালা। হঠাৎ সুশীলা মাসী খুন হল। ছোরার আঘাত

খেয়েও মরে নি—যখন পুলিস এসেছিল তখনও বেঁচেছিল, জ্ঞান ছিল। পুলিস বারবার জিজ্ঞাসা করেছিল—বল, তোমাকে কে খুন করেছে। কিন্তু সুশীলা মাসী বলে নি। বলেছিল—জানি না, চিনি না। সুশীলা মাসী মারা গেল হাসপাতালে। পুলিস খুনীর খোঁজ পেলে না। খোঁজ পেলেও প্রমাণ হয়তো পেলে না। সব চাপাই পড়ে গেল। কিন্তু কে খুন করেছে তা লোকের কাছে বিশেষ করে তাদের সমাজে চাপা রইল না। শেষ দিকে সুশীলা মাসীর যখন খুব নাম-ডাক তখন তার স্বামী তার কাছে এসেছিল। কেউ বলে পয়সার জন্যে, কেউ বলে, না, থিয়েটারে তার পার্ট দেখে মুগ্ধ হয়ে লোকটি একদা এসেছিল তার কাছে। সুশীলা মাসী কৃতকৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল তার তপস্যায় যত পাপই হয়ে থাকুক সে যা চেয়েছিল তাই পেলে। তার সেবায় তাকে আত্মদানে নিজেকে উজাড় করে ঢেলে দিতে চেয়েছিল। সেই স্বামীই তাকে খুন করেছিল। সুশীলা মাসীর সে মরণ সুখের মরণ মনে হয়েছিল। হাসিমুখেই মরেছিল। কোনক্রমেই স্বামীর নাম করে নি।

তুষারদিদি—সেও থিয়েটার জগতে বিখ্যাত। সে যখন সখীর দলে নাচত তখন তার হাসি আর কটাক্ষে দর্শকেরা বাণ বিদ্ধ হয়ে যেত। তুষারদিদির বাড়ীতে বড় বড় সরকারী চাক্‌রে, ব্যাঙ্ক মালিকেরা ধর্ণা দিত। শেষ তুষারদিদি প্রেমে পড়ল এক সরকারী চাক্‌রের। ওই প্রেমের জন্য বাবুটি মস্ত বড় চাকরী ছেড়ে থিয়েটার খুলতে এল। ওই থিয়েটারের মালিক বলতে গেলে তুষারদিদিই হয়েছিল। নিজের টাকাকড়ি, গহনাগাঁটি সর্বস্ব দিয়ে ওই ভালবাসার মানুষের সংসার পুষেছে। তার ছেলেকে বিলেত পাঠিয়েছে। তারপর বিপর্যয় ঘটল, থিয়েটার উঠে গেল। নিজের সংসার নিয়ে তুষারদিদির ভালবাসার জন সংসারে ফিরতে বাধ্য হলেন। তুষারদিদির টিবির মত হল। তখন সর্বশান্ত তুষার-দিদি, তার ভালবাসার জনও তাই। তার উপর ছেলেরা আর তার

দিকে মুখ ফেরাতে দিলে না। তুষারদিদির ছেলেপুলে হয় নি, কিন্তু পোষ্য ছিল, ভাই-ভাইয়ের সংসার। দিদির তবু ভাগ্য ভাল, থিয়েটারেই একজন অ্যাক্‌ট্রেস বিখ্যাত কীর্তন গাইয়ে শ্রীমতী তাকে চিকিৎসা করিয়েছিল। ভাল হয়ে দিদি আবার থিয়েটারে নামবে ঠিক করেছিল ; যোগও দিয়েছিল কিন্তু সেই সময়েই হাতীবাগানে পড়ল বোমা। তুষারদিদি ভাইয়ের সংসার নিয়ে পালিয়ে গেল নবদ্বীপ। তারপর নবদ্বীপ থেকে চলে গেছে পণ্ডিচেরী। সেখানে তুষারদিদি নাকি কাজ নিয়েছে আশ্রমের এঁটো বাসন ধোয়ার কাজ। শুনে গোরাবাবু বলেছিল, বড় ভাল কাজ নিয়েছে। বহুজনের উচ্ছিষ্ট মেজে ধুয়ে পরিষ্কার করার কাজ। ভেবে-চিন্তে নিয়েছে বোধ হয়।

মঞ্জরী বলেছিল—কেন?

—কেন? হেসে গোরাবাবু বলেছিল—জীবনে যে দেহপাত্র বহুজনের ভোগে ভোজনে উচ্ছিষ্টে উচ্ছিষ্টে বিষাক্ত হয়েছে সেটিও ওরই মধ্যে মাজাঘষা হয়ে পরিষ্কার পবিত্র হবে।

এবার কথাটা বুঝতে পেরেছিল মঞ্জরী। তারও খুব ভাল লেগেছিল।

গোরাবাবু তুষারদিদির ভালবাসার লোকটিকে গালাগাল করেছিল। কিন্তু সে কথা মনে করতে ভাল লাগল না। একটু বিষণ্ণ হাসলে। মনে প্রশ্ন জাগল তুষারদিদির মনে একেবারে মনের মনে কোনও কামনাই কি নেই? লক্ষহীরার মত? সে কি কামনা করে না যে আগামী জন্ম সৎকুলে জন্মে যেন ওই প্রতারক ভালবাসার জনটিকেই পায়!

এ যে কি হল তার! এ তো সে কোনদিন কল্পনা করে নি! একবার হঠাৎ তার মনে হল, এ হয়তো তার কর্মফল। সে গোরাবাবুকে কেড়ে নিয়েছিল কমলার কাছ থেকে। এ তারই ফল। পরক্ষণে নিজেই সে প্রতিবাদ করেছিল। না না না। তা সে নেয় নি। গোরাবাবুকে দেখে মন তার পাবার আকাঙ্ক্ষা করেছিল।

তার বেশী তো কিছু করে নি সে। যতদিন না কমলা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, যতদিন না গোরাবাবু ঘর ছেড়ে কমলাকে, ছেলেকে, ঘরকে ফেলে বেরিয়ে এসে যাত্রাদলে যোগ দিয়েছিল, যতদিন সে দুঃখের চরমে না পৌঁছেছিল ততদিন তো সে তার দিকে হাত বাড়ানো দূরের কথা, চোখের দৃষ্টিতে ইঙ্গিতেও সে তাকে আহ্বান করে নি। নিমন্ত্রণ জানায় নি।

—মঞ্জরী!

—শোভাদি! এস।

শুধু শোভা নয় বুঁচীও এসেছিল তার সঙ্গে। শোভা বসেই বললে—ওরে বাবা শিউনা, পান দে না বাবা। পানের দুর্ভিক্ষ। আমার পান ফুরিয়েছে। দে না বাবা।

শিউনন্দন শুয়েছিল বাইরে। শীতের আমেজে বারান্দায় আধ রোদে একখানা র‍্যাপার আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে আরাম করছিল। সে শুয়ে শুয়েই বললে—পান হামার ভি কমতি আছে। পান মিলছে না। ওহি বাটমে আছে, বানাইয়ে নাও।

—তুই ওঠ্ না। মঞ্জরী বললে।

সে জানে শিউনন্দন তার চাকর বলে দলের লোকদের উপর খানিকটা মালিকানি চালিয়ে নেয়। অন্তত ওদের কথায় কাজ করতে সে সাধ্যমতে চায় না।

শিউনন্দন বললে—বহুৎ আরাম লাগছে, গা-গতর দুখাইছে, রোদমে আরাম লাগছে। আধা ঘণ্টা বাদ উঠবে হামি।

—কটা বাজল ঠিক আছে! চারটে বাজছে। ওঠ্, চা কর্। ওঠ্, ওঠ্।

শোভা বললে—থাকুক না একটু শুয়ে, আন না বুঁচী বাটাটা। সাজ না ভাই।

—আরে, ওই তো তোমার কাছেই রয়েছে, নাও না হাত বাড়িয়ে, সেজে না হয় দিচ্ছি আমি।

—ওরে ভাই, গতর নড়াতে গেলে মনে হয় পড়ে যাব বুঝি!

তারপর গভীর আক্ষেপে 'বাব্বা' বলে কাত্‌রে বাটাটাকে টেনে নিয়ে বুঁচীকে দিলে। তারপর বললে—কেউ যেন মোটা না হয় জীবনে!

বুঁচী হেসে ফেললে। শোভা বললে—তুই আর হাসিস নে। ঘুঁটে পোড়ে—গোবর হাসে। সেই বৃত্তান্ত। তুইও যা হয়েছিস না! দেখবি? আমার বয়েস হতে হতে ঢোল নয় ঢাক হয়ে যাবি।

—সত্যি ভাই বড্ড মোটা হয়ে যাচ্ছি।

—যাবি নে! যা বীয়ার খেতে ধরেছিলি!

—যাঃ! মিছে কথা।

—মিছে কথা? আমি সব জানি। আমাকে খোদ সুরো মাসী বলেছে। বলে, রাত দুপুরে আজকাল—

—কি বলেছে? রাত দুপুরে ওর কাছ থেকে বীয়ার আনাই? ভারী মিথ্যুক বুড়ী। একদিন। রাতুবাবু গিয়েছিলেন—সেই দিন। কিছুতে ছাড়লে না। খেতেই হবে। তখন বললাম—ওসব কড়া বিষ খাব না—বীয়ার আনাও। সেই দিন।

মঞ্জরীর খুব ভাল লাগছিল না। সে চুপ করে বসেছিল। মনের মধ্যে চিন্তা ঘুরছিল। ওদের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল—এরা বেশ আছে। জীবনের দুঃখকে বেশ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দিব্যি হেসে-খেলে খেয়েদেয়ে কাটিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। যে সমাজে তাদের জন্ম তার ধারাটাই এই—এ ছাড়া পথও নেই। শোভাদি তার ভালবাসার গাইয়ে লোকটি মরার পর খুব মদ খেয়ে বলেছিল—আমাদের কি শোকে গা ঢেলে উপুড় হয়ে পড়ে থাকবার উপায় আছে? গেরস্ত ঘরে স্বামী মরে—ননদ কি ভাজ কি মেয়ে কি বউ খাবার তৈরী করে তুলে খাওয়ায়? কচি বয়সে হলে ভাসুর খেতে দেয়, বাপ দাদায় খেতে দেয়. বেশী বয়েসে হলে ছেলেতে দেয়, মেয়ে-জামাই দেয়। কেউ না থাকলে ভাত রান্না করে খায়। আর আমাদের, না বাপ—না মা, না ভাই, না ছেলে। নো মাতা নো পিতা। ভাত রাঁধতেও কেউ নেবে

না, ঝি-গিরি করতে গেলেও গিন্নীরা দেখেই চিনবে, বলবে—না। ভিক্ষে—তাও কেউ দেবে না। তা হলে? পেট? আর শোক দুঃখ—তাই বা কিসের? ও এক বোতল মদেই ভেসে যায়। মদ খেয়ে খুব ভেউ ভেউ করে কাঁদছি—চোখের জলে ধারা বইছে—ওতেই সাফ।

বলে হি হি করে হেসেছিল নেশার ঘোরে। কথাটা মিথ্যে বলে নি শোভাদি। জন্মদোষে তাদের ভাগ্যই এমনি যে একজনকে স্মরণ করে দুঃখ কষ্ট করেও বেঁচে থাকবার উপায় নেই। বিধাতা তাদের ও অধিকার দেন নি। তারা অন্ন নয়, অন্নকে পচিয়ে মদ তৈরি করার মত বিধাতা তাদের মদ করেই সংসারে পাঠিয়েছেন। কথাটা বলেছিল তার দিদিমা রাধারাণী; তার মাকে বলেছিল। যখন তার বাবার সঙ্গে মায়ের বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল তখন নতুন যে মাড়োয়ারী বাবুটি এসেছিল সেই সময় আক্ষেপ করেছিল তার দিদিমা। তারা মদ—অন্ন নয়। অদৃষ্ট! ধন্য অদৃষ্ট! পেটের জন্য তাকে হয় এখন নিজেকে বেচতে হবে। না হয় নাই বেচলে। তার বাড়িটা আছে। নিচের তলায় ভাড়াটে আছে। ভাড়া পায় তিনখানা ঘরে পঁচাত্তর টাকা। এখন উপর তলার তিনখানা ঘরের একখানা রেখে বাকী দুখানাও ভাড়া দিলে আরও একশো টাকা আসবে। এখন ভাড়া বাড়ছে কলকাতায়। নিচের তলার ঘরের ভাড়াও বাড়ালে বাড়বে। তা ছাড়া যাত্রাদলের সাজপোশাক, সাজ-সরঞ্জাম বিক্রী করে দিলেও কয়েক হাজার টাকা পাবে। ব্যাঙ্কেও টাকা পাবে। গহনা আছে। ভেঙে ভেঙে হয়তো খাওয়া পরা চলবে। কিন্তু সেই তো সব নয়। কি নিয়ে থাকবে সে? কাকে নিয়ে থাকবে? শূন্যদৃষ্টিতে ঘরের ছাদের একটা কোণের দিকে তাকিয়েছিল মঞ্জরী। শোভা বুঁচী এরা দুজনে কথা বলতে বলতে কখন চুপ হয়ে গেছে মঞ্জরীর মুখের দিকে তাকিয়ে। ওরা শুধু পান খেতেই আসে নি—কিছু বলতেও এসেছে। কথাটা সরাসরি পাড়তে পারে নি

বলেই ওই সব রসিকতার কথা-কাটাকাটি দিয়ে ভূমিকা তৈরী করছিল। হয়তো এসে পড়ত আসল কথায় কিন্তু মঞ্জরীর মুখ চোখের দৃষ্টি দেখে চুপ করে গেছে।

শোভা মঞ্জরীর বাড়ীর ভাড়াটে। মঞ্জরী অপেরার গোড়া থেকেই দলে আছে। তার সাহস বুঁচীর থেকে বেশী। সে পানের খুকি লাগার ছল করে কেশে উঠে বললে—মা গো! এবং বেশ কয়েকবার কেশে উঠল।

মঞ্জরী ফিরে তাকালে তার দিকে।

বুঁচী এবার বললে—তোমার সব বিত্যেব শোভাদি। কোঁত কোঁত করে দোক্তাশুদ্ধু রসগুলো গিললে। কাশী হবে না!

শোভা উঠে গিয়ে বাইরে পানের পিক ফেলে এল। এসে সোজা বললে—একটা কথা বলতে এসেছিলাম ভাই মঞ্জরী।

শান্ত কণ্ঠে মঞ্জরী বললে—বল।

এবার বুঁচী বললে—বাইরে দলের মধ্যে কথাটা নিয়ে খুব কানাকানি হচ্ছে। বলছে—

বুঁচী চুপ করে গেল। তারপর যেন হঠাৎ বললে—তুমিই বল না শোভদি।

শোভা বললে—বলছে মাথামুণ্ডু, বলছে দল তুলে দিচ্ছ তুমি।

—তুলে দিচ্ছি? না না। দল আমি তুলব না। না না না।

—ওই শোন। হল তো। আমি জানি। দল তুলে দেবে? কেন? রাজা মরলে রাজ্য উল্টে যায়? হুঃ!

হেসে বুঁচী বললে—এতদিন নাটক করলে শোভাদি—তারপরও এই কথাটা বললে?

—কেন?

—রাজা মরলে কত রাজ্য কত বিদেশী অধিকার করে নেয়। মন্ত্রী সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। রাণী ভিখারিণী হয়। হয় ? দেবলাদেবীতে কি হল? ঐতিহাসিক নাটকে অনেক

আছে। আর হয়তো রাণীরা বীরত্ব দেখিয়ে মরে। রাজা যাওয়া কি সোজা কথা ?

—তা বটে। শোভা হাসলে—কথায় বলে—মেয়ে অবলা। তা, মঞ্জরী অপেরা রাজ্য নয়—দল। আর দল—মঞ্জরী চালিয়েছে গোরাবাবুর থেকে কম নয়।

মঞ্জরীর মনের মধ্যে হঠাৎ একটা কথা যেন বিদ্যুতের মত চমকে উঠে খানিকটা আলোর ঝলক ফেলে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে একটা আশ্রয় অবলম্বন দেখিয়ে দিলে।

রিজিয়া নাটক মনে পড়ে গেল। বুঁচীর ওই কথাটাতেই মনে করিয়ে দিলে—রিজিয়া। আজকাল ঐতিহাসিক নাটক হচ্ছে যাত্রার পালায়। মঞ্জরী অপেরাই ঐতিহাসিক নাটক করে নি। গোরাবাবুই করতে দেয় নি। বলত—দেশ তো পুরাণ টুরাণ জলে ডুবিয়েছে। কেউ রামায়ণ মহাভারত পড়ে না। থিয়েটার থেকে ঐতিহাসিক নাটকও যেতে বসেছে। যাত্রার দল করেছি। মদ খাচ্ছি, হৈ হৈ করে জীবন কাটাচ্ছি ; রাত্রি হয়েছে দিন, দিনকে করেছি রাত্রি ; অন্তত একটা পুণ্যকর্ম করে যাই। পৌরাণিক পালা করে পুরাণ কথার প্রচারটা করে যাই।

মঞ্জরী শোভার দিকে ফিরে তাকালে। এতক্ষণ যে সে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবছিল। সজাগ হয়ে শোভাকে বললে—ভেবো না শোভাদি—রাজ্যই বল আর দলই বল আমি চালাব।

বলতে বলতে একটা তিক্ত হাসি তার মুখে ফুটে উঠল—বললে, যাকে রাজা বলছ তার ক্ষমতা হয়তো আছে কিন্তু ভাগ্য তার মেয়ের ভাগ্যে। গরীবের ছেলে বড় লোকের মেয়েকে বিয়ে করেছিল। তাকে ছেড়ে এসেছিল—তাতে বড় লোকের মেয়ের রাজ্য, জমিদারী, ব্যবসা অচল হয় নি। সে স্ত্রী বেশ চালাচ্ছেন সব। তারপর আমার কাছে এসে আমাকে নিয়ে যাত্রার দল করেছিল। এবার আবার অলি চৌধুরীকে ধরে ফিলিমে থিয়েটারে গিয়ে ঢুকেছে।

হোক তার উন্নতি। আমার দলও অচল থাকবে না। আমি চালাব। ওই কমলাদিদির মতই চালাব। জান তো কমলাদিদি মানে ওর প্রথম পক্ষের স্ত্রী আর আমি এক বাপের মেয়ে। বাবাই আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলেন—দল সেই টাকাতেই হয়েছে।

সে উঠে দাঁড়াল কথা বলতে বলতে; তার সঙ্গে শোভা বুঁচীকেও উঠতে হল। শোভা জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় যাচ্ছ?

—গোপাল মামাকে চাই। শিউনন্দন, ওরে, আর গোঁতোর মত পড়ে থাকিস নে। ওঠ্। চা কর্। একবার গোপাল মামাকে বল্ তো মাস্টারমশাইকে নিয়ে এখানে আসতে। জরুরী কাজ আছে। খুব জরুরী।

বুঁচী বললে—আর একটা কথা ছিল ভাই।

—কি বল?

—একবার বরাকরে কল্যাণেশ্বরী মায়ের ওখানে যাবার সবারই ইচ্ছে। আমরা অবিশ্যি আপন আপন খরচে যাব। তুমি একটু গোপালবাবুকে বলে দাও।

—যাবে তো আজই যাও—কি কাল। আমরা রাসের গাওনা সেরেই কলকাতা ফিরব।

—কলকাতা ফিরবে! এখানে বাড়ী ভাড়া করলে—

বাধা দিয়ে মঞ্জরী বললে—নতুন পালা সেট করে একমাস পর দল বের করব। নতুন পালা না হলে দলকে লোকসান খেতে হবে। শিউনন্দন, ডাকলি? উঠলি?

—হাঁ, উঠলাম। চায়ের জল চড়াইলাম। এবার ডাকছি।

পনের

বড়দিনের মুখে মঞ্জরী অপেরার নতুন প্রচার-পত্র ছাপা হয়ে বিলি হয়ে গেল। গোরাবাবু তার নতুন ফ্ল্যাটে বসে চা খাচ্ছিল। অলি চৌধুরী একখানা কাগজ হাতে করে এসে ঘরে ঢুকল। বাঁকা হাসি হেসে ঠোঁট মচকে বললে—দেখ!

বিকেলবেলা। গোরাবাবু সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে। চোখে মনে ঘুমের ঘোর রয়েছে। সেই ঘোরের মধ্যেই বললে—কি?

—মঞ্জরী অপেরার প্যাম্পলেট। বিরাট ব্যাপার—বিপুল আয়োজন। নাট্যকুলরাজ্ঞী মঞ্জরী দেবী এবার রিজিয়া। মঞ্জরী অপেরার প্রথম ঐতিহাসিক নাটক।

চোখ দুটো বিস্ফারিত করলে গোরাবাবু। অলি চৌধুরী তার কোলে প্যাম্পলেট ফেলে দিলে।

অলি বললে—শুধু রিজিয়া নয় তার সঙ্গে সতী সাবিত্রী। চেঁচাবে আর ফোঁপাবে।

গোরাবাবু প্যাম্পলেটখানা চোখের সামনে তুলে ধরে একদৃষ্টে চেয়েই রইল। অলি চলে গেল অন্য ঘরে। বলে গেল—ভাল করে দেখ। আমি একবার বেরুচ্ছি, কেক-প্যাস্ট্রি কিনে নিয়ে আসি, সন্ধ্যের সময় বম্বের প্রডিউসার আসবেন তো।

গোরাবাবু বললে—বোতলটা কোথায় রেখেছ? দিয়ে যাও।

—চা খাও আগে।

—ও ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

—বলে দিচ্ছি, আবার করে দিক। এখন থেকে শুরু করবে, সন্ধ্যে পর্যন্ত মাতাল হয়ে যাবে।

—ও কথা গোরাবাবুকে বললে অপমান করা হয়। দাও।

অলি বোতলটা সরিয়েই রেখেছিল। সে এনে নামিয়ে দিলে—নাও।

গোরাবাবু তখনও তাকিয়েছিল প্যাম্পলেটটার দিকে। অলি বললে—কি, আপসোস হচ্ছে? রিজিয়ার প্রেমিক অন্যলোক সাজবে?

মুখ টিপে হাসলে সে।

—আপসোস বিজয় চক্রবর্তীর ধাতে নেই। যতদিন যৌবন আছে ততদিন সে সিংহ। কার সাধ্য রোধে তার গতি! একটু হাসলে গোরাবাবু—শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি—সে বলতে গেলে রাজ্য একটা। অন্তত রায়বাহাদুরী খেতাব মিলতে পারত সেখানে থাকলে এতে সন্দেহ নেই। এবং যে এলেমে সায়েবসুবোদের খুশী করা যায়—সে এলেম তার ছিল। কিন্তু বেরিয়ে পড়েছিল এক কাপড়ে। তারপর মঞ্জরী অপেরায় ভাগ্য গড়েছিল। সেখানে লেগে থাকলে শ্রেষ্ঠ দল সে গড়ত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু—

চুপ করে গেল গোরাবাবু। অলি বললে—কি?

হেসে গোরাবাবু বললে—কি আর? সেই চিরন্তন খেলা কিংবা লীলা যা বল। ভাগ্য আমার নারীর হাতের পুতুল-নাচের পুতুল! সিংহদের তাই হয়। অন্ততঃ পুরুষসিংহের। নবীনা সিংহিনী এসে দেখা দিয়ে লীলায়িত ভঙ্গিতে দাঁড়ায়—অপাঙ্গে তাকিয়ে বনান্তরে চলে যায়, সিংহ ছোটে। পিছনে পড়ে থাকে তার জয়-করা বন—তার এতদিনের সঙ্গিনী। ভ্রূক্ষেপও করে না।

অলি বললে—আমাকে ফেলেও তো তা হলে আবার ছুটবে?

গোরাবাবু হেসে বললে—অসম্ভব নয়, তবে সিংহেরও যৌবন যায়, জরা আসে। হয়তো এবার নবীনাই ফেলে পালাবে বিগতযৌবন সিংহকে ফেলে। উল্টো হবে।

অলি তার পাশে এবার বসে পড়ল। বললে—কথা খুব জান। লেখক লোক তো—তার ওপর অ্যাক্টর! মেয়েরা এত নেমোখারাম নয়।

—নেমোখারাম সংসারে কেউ নয় নবীনা প্রেয়সী! কিন্তু জীবন

মানে না যে। ওই তো জীবনের নিয়ম। মানুষের গড়া নিয়ম মানুষ মেনে চলতে চায়, জীবন চলে জীবনের নিয়মে। একসঙ্গে ঘর করে মায়া একটা জন্মায় বইকি—কিন্তু তার থেকেও যখন নতুনকে চাওয়ার চাহিদা বড় হয়ে ওঠে, মনে হয় ওকে নইলে সব ঝুট। তখন সে ছোটে পুরনোকে ফেলে নতুনের পেছনে। কি করবে। আবার নতুনকে পেয়েও সুখ নেই। অনবরত ভাবে—যদি পুরনোটা কোন নতুনকে পেয়ে থাকে! জ্বলে যায় মন। মনে হয় খুন করে দিয়ে আসি। দেখ না—এই কাগজটার দিকে তাকাচ্ছি আর মনে জ্বালা ধরছে।

—হুঁ। তবে যে বললে আপসোস করে না গোরা চক্রবর্তী?

—না। আপসোস করি না। কারণ তার থেকে বড় আপসোস হত তোমার সঙ্গে চলে না এলে।

—কিন্তু মনের জ্বালাটা কেন?

—দেখ না—রিজিয়াঃ যাত্রাদলের নাট্টরাজ্ঞী মঞ্জরী দেবী। বক্তিয়ারঃ নটবীরেন্দ্র রীতুবাবু। বিজয় সিংহঃ রানা চৌধুরী।

—তাতে কি হল?

—তা হলে তো কথা বলতে হয়। বইখানা আমারই লেখা। প্রথম যখন দল খুলি তখন জনা আর রিজিয়া বই দুখানা লিখে-ছিলাম। মানে—থিয়েটারের নাটক সামনে রেখে উল্টেপাল্টে বদলে যাত্রার দলের উপযুক্ত করে নিয়েছিলাম। কিন্তু রিজিয়া শেষ পর্যন্ত আমারই ভাল লাগল না—ওরও না। তার কারণ জান? পার্ট ওর পছন্দ হল না, আমারও হল না। রিজিয়া বিজয় সিংহকে ভালবাসে—বক্তিয়ার দুর্ধর্ষ সেনাপতি—মুসলমান তাতারী সে ভালবাসে রিজিয়াকে। আলতুমিসের ক্রীতদাস—সে নিজের শক্তিতে প্রধান সেনাপতি হয়েছে। বিজয় সিংহ রিজিয়াকে ভালবাসে না। সে ভালবাসে রাজপুত রাজকুমারীকে। পার্ট হিসেবে বক্তিয়ারের পার্ট বড় শক্ত—যাকে বলে দুর্দান্ত। বিজয় সিংহের পার্টও ভাল এবং সেই হল রোমান্টিক নায়ক। বয়েসে চেহারায় ওটা আমাকেই নিতে

হত। বক্তিয়ার রীতুবাবুকে দিতে হত। সেটা আমার পছন্দ হল না। তা ছাড়া, পরে ভেবে দেখছি—আরও কারণ ছিল; তখন তো আমাদের বছর খানেকের প্রেম মিলন—মঞ্জরীর সঙ্গে রীতুবাবু লাভ সিন করবে তাও পছন্দ হয় নি। বই হবে মোটামুটি ঠিক হয়েছে। রীতুবাবু খুব খুশী। ভাল পার্ট পেয়েছে। হঠাৎ একদিন রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে আছি—মঞ্জরী হঠাৎ বললে, দেখ! বললাম, কি? ও বললে, আমার বাপু রিজিয়া ভাল লাগছে না। ওটা বন্ধ করে অন্য বই ধর। বললাম, কেন? বললে, কি সব কাণ্ড! বিশ্রী! খুনখারাপী মুসলমানী ঐতিহাসিক কাণ্ড লোকে বুঝতে পারবে না। তা ছাড়া রীতুবাবুর পার্ট বড় হয়ে যাচ্ছে। না না। সবচেয়ে খারাপ লাগছে কি জান, রিজিয়া বিজয় সিংহকে—মানে আমি তোমাকে ভালবাসি—আর বিজয় সিংহ রিজিয়াকে ভালবাসে না—ঘেন্না করে। আমার খুব খারাপ লাগছে। তোমার লাগছে না? আমিও বললাম, লাগছে। তা ছাড়া রীতুবাবু বক্তিয়ার সেজে তোমার কাছে প্রেম নিবেদন করবে—বলবে—"আমি তব ক্রীতদাস অর্থমূল্যে নয়—তোমারে বাসিয়া ভাল আপনারে দিয়েছি বিকায়ে, তোমার চরণপ্রান্তে। পিতা তব—মোর শৌর্যবীর্য হেরি মুক্তি দিয়ে গেল, রাজ্যখণ্ড রূপসী রাজার কন্যা চেয়েছিল দিতে পুরস্কার। আমি লই নাই। কেন জান? হেতু তার তুমি, সুলতান নন্দিনী—সুলতানা রিজিয়া—হেতু তার তুমি। বেহেস্তের অধিকার হুরী পরী কোন প্রলোভনে তোমা হতে দূরে যেতে মন চাহে নাই। দেবী তুমি বসে থাক দিল্লীমসনদে, আমি দূরে বসে মুখপানে চেয়ে থাকি চন্দ্ররূপ মুগ্ধ এক চকোরের মত।" এ আমারও ভাল লাগছে না। মঞ্জরী হেসে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও।

অলকা হেসে উঠল—সে বুক থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা খিল খিল হাসি। গোরাবাবু ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে বললে—হাসলে যে?

অলকা বললে—ভারী মজা তো!

গোরাবাবু বললে—এ মজা বোঝা শক্ত সখী। নইলে হাসতে না।

—বুঝি না? প্রশ্ন করে স্থির দৃষ্টিতে তাকালে অলকা তার মুখের দিকে।

—বোঝ? হাসলে গোরাবাবু।

—না বুঝলে আমি দল ছেড়ে পালিয়ে এলাম কেন? যখন ছাড়লাম তখন তো তুমি চলে আসবে তা তুমিও বল নি, আমিও জানতাম না। অথচ চাকরী ছেড়ে তো অকূলে ভাসা তখন আমার। ছাড়লাম আমার মোহিনীমায়ার পার্টটা কেড়ে নেওয়াতে। পার্টটা খুব ভাল লেগেছিল। অন্য কেউ প্রবীর হলে আমি এমনি করে মোহিনীমায়া করতাম, না করতে পারতাম?

গোরাবাবুও এবার সশব্দে হেসে উঠে অলকাকে জড়িয়ে ধরে সমাদর করে বললে—ওরে সয়তানী!

—আর তুমি? বাপ রে, প্রবীরের চোখে সে কি দৃষ্টি! মঞ্জরী কিন্তু ধরেছিল ঠিক।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গোরাবাবু বললে—মঞ্জরী যদি এতখানি হিংসেটা বাইরে প্রকাশ না করত তা হলে হয়তো—

একটু ভেবে নিয়ে বললে—হ্যাঁ, তা হলে আমিও এমন করে এক কথায় ছেড়ে আসতে পারতাম না। ভাল তোমাকে আমার প্রথম দিন থেকেই লেগেছিল।

হেসে অলকা বললে—ছুঁতো খুঁজছিলে?

—বলতে পার। তবে তোমার দিক থেকেও আকর্ষণ ছিল—সে তুমি অস্বীকার করতে পারবে না।

হঠাৎ বাইরে থেকে আগন্তুকের আভাস পেয়ে দুজনেই চকিত হয়ে উঠল। কলিং বেল আছে ফ্ল্যাটে, সেটা বেজে উঠল। অলকা উঠে দাঁড়িয়ে বললে—ওমা! বোম্বাইয়ের উনি এসে গেলেন এরই

মধ্যে! হাতের ঘড়ি দেখে বললে—এখন তো সাড়ে পাঁচটা। ওঁর সাড়ে ছটায় আসার কথা তো! সে গোরাবাবুর মুখের দিকে তাকালে।

গোরাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললে—যাও, দেখ, ঘরে যা আছে তাই থেকে যা হয় কর। চাকরটাকে ভাল রাজভোগ আনতে দাও। নাই বা হল কেক প্যাস্ট্রি—বাংলার রসোগোল্লা রাজভোগ এবং অলকা চৌধুরী বোম্বাইয়ের লোকের কাছে কম লোভনীয় হবে না।

লজ্জা পেল অলকা—এবং পুলকিতও হল সে। কিশোরীর মতই বলে উঠল—আ-হা-হা! বলে ঝটকা মেরে ঘুরে দ্রুতপদে ও ঘরে চলে গেল। গোরাবাবু বাইরের দরজা খোলবার জন্য এগিয়ে গেল। বাইরের ঘরটায় অনেক জিনিসপত্র ছড়ানো রয়েছে। কিছুর একটা আয়োজন হচ্ছে—দেখলেই বোঝা যায়। জিনিসপত্র-গুলোর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলে গোরাবাবু। আয়োজন হচ্ছে বোম্বাই যাবার। প্রডিউসারের সঙ্গে চুক্তি সই হয়ে গেছে। নারীকে নিয়ে তার ভাগ্যের কথা মিথ্যা আবিষ্কার নয় তার। নতুন নারী জীবনে এলেই নতুন ভাগ্য আসে। মঞ্জরীকে ছেড়ে অলকার প্রতি উন্মত্ত মোহে সে যেদিন কলিয়ারীর যাত্রার বাসা থেকে চলে এসেছিল সেদিনও সে চিন্তিত হয়েছিল। কিন্তু কলকাতায় এসেই সে মুন থিয়েটারে চাকরী পেয়ে গিয়েছে। একা সে নয়—অলকার চাকরীও হয়েছে সেখানে। বড়দিনের আসরে মুন থিয়েটারের নতুন বই—ঐতিহাসিক নাটক—শকারী বিক্রমাদিত্য। সেই নাটকে গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি গোরাবাবু হূন দলপতি। প্রচণ্ড বর্বর। লম্ফেঝম্ফে অট্টহাস্যে নিষ্ঠুর চীৎকারে দুর্দান্ত পার্ট।

বিক্রমাদিত্য নায়ক হলেও শক দলপতি হাবস্কের পার্টই মূল পার্ট। আর একটি কালকাচার্য। পার্ট দুটির একটি শিশিরকুমারের দিগ্বিজয়ী নাটকের নাদিরশাহের অনুকরণ, কালকাচার্য একাধারে চাণক্য এবং শকুনির অনুসরণ। কাহিনীটি ভাল। বিক্রমাদিত্যের পিতা মালবের অধিপতি, প্রবীণ বয়সে কালকাচার্যের ভগ্নী তরুণী

'শ্রাবস্তী'র রূপে মুগ্ধ হয়ে তার উপর অত্যাচার করেন। প্রতিহিংসায় কালকাচার্য ভগ্নীকে নিয়ে মালব ত্যাগ করে চলে যান গুজরাটের দিকে। সেখানে হবিস্কের আশ্রয় নেন। কালকাচার্য ছিলেন বিখ্যাত জ্যোতিষী। সেই গুণে তিনি হবিস্কের পরম আস্থাভাজন হন। এবং গণনায় বুঝতেও পারেন যে এই হবিস্ককে দিয়েই মালবের অধিপতি ধ্বংস হবে। হবিস্ক শুধু কালকাচার্যের গণনাতেই মুগ্ধ হন নি। শ্রাবস্তীর রূপেও মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু কালকাচার্য নিষেধ করেছিলেন। কারণ তিনি গণনায় দেখিয়েছিলেন যে এ মিলন হলে ছুজনেরই ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু হবিস্ক দুর্দান্ত মানুষ. সে কাউকে কিছুকে ভয় করে না। সে যা চায় তাই তার চাই-ই। তাতে যা হয় হোক। কালকাচার্যকে সে বলেছিল—মৃত্যু? মৃত্যুকে কে করে ভয়? মৃত্যুভয়ে অমৃত মদিরা যেবা নাহি করে পান মৃত্যু তারে দেয় অব্যাহতি? অট্টহাস্য করে উঠেছিল। কালকাচার্য শ্রাবস্তীকে দূরে বনে তার শিষ্য, অরণ্য-অধিবাসী শবররাজাকে দিয়ে এসে বলেছিল, একে তুমি কন্যারূপে পালন কর। তোমার কল্যাণ হবে। সেখানে তাদের দেবতার পূজারিণী করে দিয়ে এসেছিলেন। সেখানে দেবতার সম্মুখে দেবদাসীর মত নৃত্যগীতে তাঁর পূজা করত। কিন্তু ভাগ্যচক্র বিচিত্র। মালব জয় করে মালবাধিপতিকে হত্যা করে বনে শিকার করতে গিয়ে শ্রাবস্তীকে আবার দেখলেন। ছুজনের আলাপের মধ্যে ছুজনেই বললে—মৃত্যু চেয়ে প্রেম বড়। রাজ্য চেয়ে প্রেম বড়। শ্রাবস্তী বললে—প্রেম বড় দেবতারও চেয়ে। তারপর হবিস্ক নিয়ে গেল শ্রাবস্তীকে উজ্জয়িনীতে। সেখানে প্রমত্ত হয়ে উঠল শ্রাবস্তীকে নিয়ে। নৃত্য গীত আর দেহবিলাস। দৃষ্টান্তে শকেরাও হয়ে উঠল বিশৃঙ্খল এবং ব্যভিচারী। তারই মধ্যে তরুণ বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর অত্যাচারিত প্রজাদের সংঘবদ্ধ করে করলেন বিদ্রোহ। শকেরা পরাজিত হল। রাজপ্রাসাদের তোরণে উন্মুক্ত কৃপাণ হাতে এসে দাঁড়ালেন বিক্রমাদিত্য। তখনও হবিস্ক শ্রাবস্তীকে বাহুপাশে বদ্ধ

করে সুরা পান করে সুখস্বপ্ন দেখছে। কোলাহলে যখন চেতনা হল, তখন পুরপ্রবেশ করেছে বিদ্রোহীরা। হবিস্ক এবং শ্রাবন্তী দুজনেই উঠে অস্ত্র হাতে নিলে।

হঠাৎ শ্রাবন্তী বললে—না।

—কি না?

—যুদ্ধ নয়।

—তবে?

—মৃত্যু?

—হ্যাঁ মৃত্যু। তোমার কৃপাণ দিয়ে কর তুমি মোর বক্ষভেদ। আমার কৃপাণে হোক তব বক্ষভেদ। এস, অসিনৃত্য করি মোরা আজি এই পরম লগনে।

শ্রাবন্তীর পার্ট করেছিল অলকা।

তিন সিনের পার্ট। এক সিনে ধর্ষিতা শ্রাবন্তী। এক সিনে বনের মধ্যে দেবতার কাছে নৃত্য এবং হবিস্কের সঙ্গে দেখা। শেষ সিনে ওই মৃত্যু। কিন্তু তাতেই অলকা খুব নাম করেছিল। বিশেষ করে লাস্য নৃত্যে।

বম্বের একজন ফিল্ম প্রডিউসার অভিনয় দেখতে এসে গোরাবাবুর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে বম্বে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। বইটার ছবির রাইটও তিনি কিনেছেন, হিন্দীতে ছবি করবেন। গোরাবাবু বলেছে—যেতে পারি। শ্রাবন্তীর পার্টের জন্য অলকাকেও নিতে হবে। হেসে বলেছে—She is my sweetee, ওকে ফেলে আমি যেতে পারব না।

প্রডিউসারও হেসে বলেছে—ঠিক হ্যায়। ও-কে। লেকেন ওহি শ্রাবন্তীকে রোল লিয়ে নেই। উ পার্টমে বোম্বই বিউটি দেনে পড়ে গা। উনকি লিয়ে একঠো ছোটিসে পার্ট—নাচা গানা বানায়া যায়েগা।

কন্‌ট্রাক্ট সই হয়ে গেছে—দু বছরের কন্‌ট্রাক্ট। কোম্পানীর

বাঁধা আর্টিস্ট হয়ে থাকতে হবে দু বছর। মাইনে অনেক। গোরাবাবুর প্রথম বছর মাসে আটশো। দ্বিতীয় বছর হাজার। অলকার মাইনে চারশো, পাঁচশো। এরই মধ্যে নতুন নারী তার জন্যে নতুন ভাগ্য নিয়ে আসবে এই সত্যটা তার কাছে যেন হঠাৎ উদ্ঘাটিত হল। চোখের সামনে অহরহ পড়ে-থাকা একটা কাচের মত পাথর অকস্মাৎ যেন একটা নতুন আলো পড়ে ঝলমল করে উঠে ধরা দিল—কাচ নয় হীরে বলে। ঘরের ভিতর ছড়ানো জিনিসগুলো বম্বে যাবার আয়োজন। কাল সন্ধ্যেবেলা থেকে আজ বেলা একটা পর্যন্ত জিনিসগুলো কিনে এনে রাখা হয়েছে। এখনও গোছানো এবং বাঁধা-ছাঁদা হয় নি। নতুন স্যুটকেস থেকে জিনিস অনেক। বম্বের বাজার এবং কলকাতার বাজারে সমাজে তফাত অনেক। পুরনো জিনিসগুলো খারাপ না হলেও সিনেমা-স্টারদের ঠিক যোগ্য নয়। তা ছাড়া উৎসাহ অনেক। ভাগ্যের দরজা—দরজা কেন, সিংহদ্বার যখন খুলে গেল, তখন প্রবেশ করবার সময় দীনজনের মত প্রবেশ করবে কেন! কলকাতা ভারতবর্ষের শিল্প সাহিত্য অভিনয় বলতে গেলে সংস্কৃতির তীর্থ ক্ষেত্র। বম্বেতে চাল আছে, টাকাও অনেক—বলতে গেলে গিল্‌টীর কারবার, তার ঝলমলানি সোনা থেকেও বেশী। কিন্তু সোনাকে যখন গিল্‌টীর বাজারে গিয়ে নিজের দামে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে তখন অন্ততঃ সাবানজলে ধুয়ে মুছে নতুন পালিশ করিয়ে নিতে হবে বইকি। এসব জিনিসের দামের জন্য একটা টাকাও অ্যাডভান্স দিয়েছেন প্রডিউসার। জিনিসগুলি অলকাকে সঙ্গে নিয়ে পছন্দ করে কিনেছে। অলকার রুচি এবং পছন্দ সত্যিই ভাল। তার থেকেও ভাল। সেই জিনিসগুলি দেখে তার মুখে তৃপ্তির একটি স্মিত হাসি ফুটে উঠল। সব থেকে ভাল হয়েছে ফ্লাস্ক দুটো। ফ্লাস্ক দুটো একটা টেবিলের উপর রেখেছে। তার একটাকে সে হাতে তুলে নিয়ে একবার দেখলে। প্রডিউসারের কাঁধে একটা ফ্লাস্ক ছিল। সেটা ভাল। সেটার থেকেও এটা ভাল।
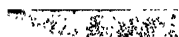
বেলটা আবার বেজে উঠল। ফ্লাস্কটা সযত্নে রেখে দিয়ে গোরাবাবু এগিয়ে দরজা খুলতে খুলতেই বললে—গুড আফটারনুন। আইয়ে—

কথাটা অর্ধসমাপ্তই থেকে গেল। দরজার ওদিকে বম্বের প্রডিউসার নয়—রাতুবাবু আর তার সঙ্গে যোগামাস্টার।

চকিত হয়ে উঠল গোরাবাবু। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। পর-মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—আরে, আপনি! আসুন আসুন আসুন। কি ভাগ্যি আমার!

রাতুবাবু হাসলে—তাই কি হয় স্যার। আপনি জাঁহাপনা লোক—দীনজন আসিয়াছে রাজেন্দ্র সঙ্গমে। ভাগ্য আমার। দেখা পাব ঠিক ভাবি নি।

যোগামাস্টার বললে—নমস্কার স্যার।

—নমস্কার। এস এস। কি খবর তোমার?

—আমি স্যার নেমন্তন্ন খেতে এলাম। মানে—একে চন্দ্র দুয়ে পক্ষ তিনে নেত্র। বলতে বলতে হাত দুটি জোড় করে বললে—আমি স্যার ইতুরে বামুন। বিয়ের ভোজ পাব না স্যার?

ধমক দিয়ে উঠল রাতুবাবু—এই যোগামাস্টার! কি বলছ! এই জন্যে বুঝি ভালমানুষের মত সঙ্গ নিয়েছিলে!

গোরাবাবু হেসে উঠল হা-হা করে। বললে—থাক থাক। যোগাকে আমি জানি। তা কি খাবে? মুরগীর ঠ্যাঙের কাটলেট বাড়িতে আছে। খাবে?

—মুরগীর ঠ্যাঙ! রাধা মাধব—

—তা হলে দক্ষিণেটা নিয়েই যাও—চার আনা ভোজন-দক্ষিণে। গাঁজা হবে দু ছিলুম। কি বল? না, আমার চাকরটাকে ডাকবে, ঘাড় ধরে বের করে দেবে?

তারপর হঠাৎ অত্যন্ত কঠিন কণ্ঠে গোরাবাবাবু বললে—গেট আউট—গেট আউট—গেট আউট—আই সে। বেরিয়ে যাও—

রীতুবাবু বললে—বিশ্বাস করুন আপনি—ও যে এই মতলব নিয়ে—

বাধা দিয়ে গোরাবাবু বললে, আপনি না হলে সে বিশ্বাস আমি করতাম হয়তো। কিন্তু আপনি—! আপনাকে আমি চিনি—জানি মাস্টারমশাই।

—প্রোপ্রাইট্রেসও এর বিন্দুবিসর্গ জানেন না। ভগবানের দোহাই!

—তাও দিতে হবে না। মঞ্জরীর ওপর সে বিশ্বাস আমার আছে। ও কথা ছাড়ান দিন। তারপর বলুন—কেমন আছেন, দল কেমন চলছে?

—দল! আপনি নেই—

—তার জন্যে কি? এক রাজা যায় অন্য রাজা আসে। রানা লাহিড়ী ছোকরা কেমন? নামটাম শুনেছি। প্রবীর কেমন করছে?

—করছে। তবে নিউ ইস্কুল না কি বলে তাই! অসুবিধে হচ্ছে। গোঁ আছে। নিজের ঢঙ ছাড়বে না। তবে ছোকরা বেশ শক্ত। মদ খায় না—সিগারেট না।

—ভাল। দেখতেও তো ভাল শুনেছি!

—তা ভাল। বেশ প্রিয়দর্শন। যদি টেঁকে তবে তো—

—টিঁকিয়ে নিন। মেয়েযাত্রার দল—বেঁধে ফেলুন।

মুখের দিকে তাকাল রীতুবাবু। ঠিক এই মুহূর্তেই অলকা এসে দাঁড়াল।

—আপনি!

—হ্যাঁ, আমি। ভালো তো?

—হ্যাঁ, ভালো। খুব ভালো। বাবুলদা কেমন আছে?

—ভালো।

—আমার নাম করে না? গাল দেয় না?

হাসলে রীতুবাবু। বললে—না।

—বসুন, কাটলেট ভাজা আছে—নিয়ে আসি।

অলকা চলে গেল।

—তা হলে—।

গোরাবাবু উঠে গিয়ে আর একটা গ্লাস এনে বোতল খুলে গ্লাসে ঢেলে বাড়িয়ে ধরলে—খান। নিন। মঞ্জরী অপেরার 'রিজিয়া', 'সাবিত্রী সত্যবানে'র জয়জয়কার হোক। আসুন।

গ্লাসটি হাতে নিয়ে গোরাবাবুর গ্লাসে ঠেকিয়ে রীতুবাবু বললে—আসছে শুক্রবার রিজিয়া ওপনিং। ওই পাইকপাড়ার রাজবাড়িতেই। আপনাকে কিন্তু আসতে হবে। আমি নেমন্তন্ন করতে এসেছি।

—একটু বেশী—মানে বাড়াবাড়ি হল না মাস্টারমশাই ?

—না। এতটুকু না।

—মঞ্জরী পাঠালে ? সত্যি বলবেন।

হেসে রীতুবাবু বললে—ইচ্ছে তার ছিল। কিন্তু কথাটা সে তোলে নি। তুলেছি আমি। সে বলেছে, হ্যাঁ।

একটু চুপ করে থেকে গোরাবাবু বললে—যাওয়া আমার হবেই না। যাকে বলে আউট অব কোশ্চেন।

—কেন ? বই দুখানা তো আপনার।

—আমি বম্বে চলে যাচ্ছি মাস্টারমশাই।

—বম্বে !

অলকা সামনে কাটলেটের প্লেট নামিয়ে দিয়ে বললে—ফিল্মের কনট্রাক্ট হয়ে গেল। ওঁর আমার দুজনেরই।

—তাই নাকি !

—দেখলেন না সামনের ঘরে কত জিনিসপত্র !

—কনগ্র্যাচুলেশন। ভাল—খুব ভাল। অনেক উন্নতি হোক।

হেসে গোরাবাবু বললে—আপনার জন্যে ওখানে চেষ্ট করব ? যাবেন ?

—তা মন্দ হয় না। তবে—

—কি? আবার তবেটা কি?

—তবে কি জানেন—এ ছেড়ে হয়তো সুখ পাব না। ষাট বছর পার হচ্ছে—বত্রিশ বছর যাত্রাদলে ঘুরছি। ভোগের বয়স নেই। ঘরে মানে নিজের বাসায় ঘুম হয় না। ওই আসর আর যাত্রার বাসা ছাড়া মনে হয় জলের মাছ ডাঙায় উঠেছি। আর নতুন জীবন রপ্ত হবে না।

হাসলে রাঁতুবাবু।

—আমি স্যার হাউই। উঠছি—থামবার উপায় নেই। আর নতুন নারী হল আমার জীবনের নতুন বারুদ। বুঝেছেন?

হাসতে লাগল গোরাবাবু। রাঁতুবাবু একটু চুপ করে থেকে বললে—তা হলে তো উপায় নেই। তাই গিয়ে বলব প্রোপ্রাইট্রেসকে।

অলকা বললে—তাঁকে আর একটা কথা বলবেন—

—আঃ, অলকা!

—না। কেন বলব না। বলবেন—ওই নাচটাই আমি মুন থিয়েটারে শ্রাবস্তীর পার্টে নেচেছি। কাগজে কত প্রশংসা করছে—পড়তে বলবেন। আবার ফিল্মেও ওই নাচই নাচব।

রাঁতুবাবু হেসে বললে—সে নাচ তো উনিও নেচেছেন একসঙ্গে জনা-মোহিনীমায়া। একটু তফাত করেছিলেন। শ্রাবস্তীর পার্টে তুমি সেইটেই নকল করেছ। আমি বিক্রমাদিত্য দেখেছি তোমাদের।

—ও সব কথা থাক মাস্টারমশাই। যা হয়ে গেছে তা গেছে।

—হ্যাঁ। সেই ভাল। যো গেয়া উসকো যানে দো—যো আয়া উসকে আনে দো। আপসোস মাৎ করনা। আচ্ছা, আমি উঠি। আশীর্বাদ করছেন তো? বই আপনার, দল একসময় আপনি গড়েছেন—

—খুব আশীর্বাদ করছি। কিছু ভয় নেই। মঞ্জরী রিজিয়া, আপনি বক্তিয়ার ওই দুটো পার্টেই টেনে নিয়ে যাবে। গমগম করে চলে যাবে। তার উপর স্টাফ—ভাল। শেফালীকে এনে ভাল করেছেন।

রীতুবাবু উঠে পড়ছিল। তাকে এগিয়ে দিতে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে গোরাবাবু বললে—মাস্টারমশাই—

—কিছু বলছেন ?

—হ্যাঁ, চলুন নীচে পর্যন্ত যাই।

—না না। কেন কষ্ট করবেন।

—কি কষ্ট। চলুন। বলতে বলতেই যাই।

কয়েকটা সিঁড়ি নেমে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গোরাবাবু বললে—মঞ্জরীকে বলবেন—

রীতুবাবু তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। গোরাবাবু বললে—নিজেকে—মানে—সামলাতে পারলাম না নিজেকে।

হাসলে গোরাবাবু।

—এটা কি বলবার মত কথা জাঁহাপনা ?

—তা হলে বলবেন—আমি তাকে মুক্তি দিলাম। সে—

—এ কথার বোঝা ঘাড়ে করতে পারে এক উল্লুকে আর শয়তানে। আপনি পত্র লিখবেন।

—বেশ, তাই লিখব। তা হলে আমি ফিরছি। উইশ ইউ সাকসেস। তবে আপনাকে একটা কথা বলি। ওই গানটা মনে করে আমাকে দোন-টোষ যা হয় দেবেন। ওই কালস্রোতে দাদা ভাসিয়ে ভাসিয়ে, তোমায় আমায় হেথা মিলেছি আসিয়ে—

রীতুবাবু বললে—আমার কাছে হেসে নাও দুদিন বই ত নয়—গানটা আরও ভাল। যো খুস চাহে ওহি করনা, আপসোস না করনা জাঁহাপনা। "পাপপুণ্য অর্থহীন বচনবিন্যাস—যেখানে যে ভাবে তার ওঠে প্রতিধ্বনি।" সব মিথ্যে। বিলকুল ঝুট।

হেসে গোরাবাবু বললে—অমৃতের দিবাস্বপ্ন রাত্রির নিশ্ছিদ্র নিদ্রা মৃত্যু এসে মুছে নিয়ে যায়।

রীতুবাবু বললে—নমস্কার।

ষোল

অপেরার রিজিয়া কিন্তু আশানুরূপ জমল না। তবে সাবিত্রী সত্যবান আশাতীত সাফল্য অর্জন করলে। সাবিত্রী সত্যবান যা জমল, তেমন জমাট বই এক জনা ছাড়া আর কোনটা নয়। অথচ ও বইটার উপর কারুরই ভরসা ছিল না। এবং রিজিয়া সফল করবার চেষ্টার ত্রুটি রাখা হয় নি। খরচপত্রও করেছিল মঞ্জরী অপেরা। পোশাকপরিচ্ছদ যা ছিল তা সবই পৌরাণিক নাটকের। ঐতিহাসিক নাটকের পোশাক ছিল না। সেগুলি বেশ খরচ করে তৈরি করানো হয়েছিল। দলের ফাণ্ডের টাকায় কুলোয় নি—মঞ্জরী নিজে থেকে টাকা দিয়েছিল। সে প্রায় ছ-সাতশো। পোশাক সব নতুন। দলকে কলকাতায় ফিরিয়ে এনে পুরো এক মাস রিহারশ্যাল দেওয়া—মোট কথা চেষ্টার বাকী রাখা হয় নি। রিহারশ্যাল জমেছে বলেই মনে হয়েছিল সকলের। রীতুবাবু নিজে বলেছিল—এর মার নেই, প্রোপ্রাইট্রেস! এই আপনার সেরা বই হবে দেখবেন।

মঞ্জরী হেসে বলেছিল—এমনি একটা কিছু না হলে দল চলবে না মাস্টারমশাই। ভরসা আপনি। আমার কিন্তু মধ্যে মধ্যে ভয় হচ্ছে।

—কোন ভয় নেই। দেখবেন আপনি। রমরম করবে বই ফার্স্ট সিন থেকে। গোরাবাবু সত্যিকারের জাত নাট্যকার ছিলেন। কি বইয়ের ধরতা! থিয়েটারের নাটক থেকে অনেক জমাট। নেপথ্যে চীৎকার—বাঘ—বাঘ—বাঘ! ওতেই তো আসর চুপ হয়ে যাবে। তারপরই আমার কণ্ঠ—সে আমি আকাশে তুলে দেব—হুঁশিয়ার! তারপরই আপনার খিলখিল হাসি। রানা—বিজয়-

সিংহ এসে তখন আসরে ঢুকেছে।—এ কি, এ কি, সাক্ষাৎ যমের মত ভীষণ শার্দূল বৃক্ষান্তরাল থেকে লাফ দিতে হয়েছে উদ্যত! আরে আরে কুটিল চরিত্র পশু, আক্রমণ কর অতর্কিতে পিছন হইতে? জ্ঞান নাকো ক্ষাত্রবীর বিজয়সিংহেরে! আয় পশু—আয়। একি! কোথা থেকে কে করিল ভল্লাঘাত! একটি কিশোর বালক এক কৌতুকের সাথে বাঘেরে আঘাত করে সম্মুখে তাহার। নাহি ভয় আহত শার্দূলে। আহত শার্দূল সাক্ষাৎ যমের দূত। কিন্তু কি করি! অস্ত্রক্ষেপণের নাহিকো উপায়।—ওরে ওরে রে বালক—সাবধান! একি! এইবার হিংস্র পশু দিবে লাফ! কি করিব? নাহিকো সময়। যা হবার হবে। আমি করি শরক্ষেপ। আ! জয় একলিঙ্গ! জয় অস্ত্রগুরু! নরঘাতা শার্দূলের বক্ষভেদ করেছে আমূল। বালকও করেছে তারে অসির আঘাত।

মঞ্জরী বলেছিল—এখানটায় রিজিয়া ক্রুদ্ধ হয়ে প্রবেশ করবে—কিন্তু আমার ঠিক ভাল লাগছে না। কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত। রেগে বলবে—কে তুমি—উদ্ধত কাফের যুবা—আমার শিকার 'পরি করিয়াছ শরাঘাত! ঔদ্ধত্য তোমার অমার্জনীয়! কিন্তু—

—ওখানে একটু থেমে বরং দুপা এগিয়ে এসে বলবেন—একটু হেসে বলাই ভাল—কিন্তু তুমি অপূর্ব সুন্দর। বেহেস্তের পৌরুষ সুষমা, এক অঙ্গে এত রূপ এত শৌর্য্য এত বীর্য্য পেলে কোথা থেকে! কি অমোঘ লক্ষ্যভেদ! কি সবল—কি প্রবল শরাঘাত! আমার বক্ষের পরে শরের গতির বাতাস তরঙ্গ স্পর্শ দিয়ে আমূল করিল বিদ্ধ বাঘের পঞ্জরে!

—বুঝলেন, ওতেই জমে যাবে।

—তারপরই আপনি ঢুকছেন। হ্যাঁ, তখন আর ভাবনা থাকবে না।

—ভাবনা গোড়া থেকেই নেই। রানা বেশ বলছে। খাসা হচ্ছে বিজয়সিং।

মঞ্জরী বললে—আপনার সামনে একটু থতমত খাচ্ছে। আপনি যখন বক্তিয়ার হয়ে ঢুকে চোপরও বেতমিজ বলে ঢুকছেন—ধমকটা খুব জোর হচ্ছে। রিহারশ্যালে রপ্ত হলেও চমকে ওঠে। শুধু ও কেন, আমিও উঠি। বাপ, কি ধমক!

হাসলে সে।

হেসে রীতুবাবু বললে—ওটার পিছনে একটি ছোট্ট গল্প আছে। একবার ট্রামে যাচ্ছিলাম। যে সিটে বসেছিলাম আমার পাশেই বসেছিলেন একজন খুব নামী লোক। পণ্ডিত সমঝদার। কমল সোম। নাম শুনেছেন তো? তিনি একখানা কাগজে মাসিকপত্রে একটা ছবি দেখছিলেন। খুব মন দিয়ে। ছবিখানা রিজিয়ার ছবি। রিজিয়া মসনদে বসে আছে, তার পায়ের তলায় একটা কালো বাঘ। দেখতে দেখতে তারিফ করে পিছনের সিটে বসা এক বন্ধুকে বললেন, দেখ, ছবিটা দেখ। খুব ভাল এঁকেছে। বুঝতে পারছ? কালো বাঘটা হল সেই হাবসী যে রিজিয়াকে ভালবাসত। পায়ের তলায় পড়ে আছে। এবং রিজিয়ার ইঙ্গিতমাত্রেই যে কোন লোকের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কি কেউ কাছে এলেই গর্জন করে উঠবে। বুঝেছ! সেইদিনই মনে হয়েছিল—যদি কোনদিন রিজিয়া নাটক হয়, বক্তিয়ারের পার্ট করি, তবে ঠিক বাঘের মতই করব।

হাসতে লাগল রীতুবাবু।

—হ্যাঁ। হাবসী ক্রীতদাস, খুব বড় বীর, রিজিয়ার প্রেমমুগ্ধ। কিন্তু—

—কি কিন্তু?

—সত্যি বলতে মাস্টারমশাই, লাহিড়ীর থেকেও যেন আমি নার্ভাস হই বেশী। কেমন মানে—

চুপ করে গেল মঞ্জরী। সম্ভবত মনের ভাব প্রকাশ করবার মত কথা খুঁজে পেলে না।

—তা হলে ঢঙটা পাল্টে দেব বলছেন? একটু ঠাণ্ডা করে দেব?

—দেখুন না আজকে রিহারশ্যাল দিয়ে।

সেদিন রিহারশ্যাল জমল না। সকলেই বললে—মাস্টারমশাই আজ অন্যরকম করছেন কেন ?

মঞ্জরীও বললে—না মাস্টারমশাই—যা করছিলেন তাই করুন। এ চোখে লাগছে না।

অভিনয়ের রাত্রে মঞ্জরী রিজিয়ার ভূমিকায় প্রথম দৃশ্যেই পুরুষ বেশে তার সৈন্যদল নিয়ে দিল্লী যাচ্ছে—ভাইকে সৎমাকে বন্দী করে সে মসনদে বসবে। তার শ্রেষ্ঠ বল হল তার দুর্দান্ত সাহস—নারী হয়েও পুরুষের মত বিক্রম আর ওই হাবসী মনসবদার। যে সম্রাট ইলতুমিসের অনুগ্রহে ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে রিজিয়ার লোভে ক্রীতদাসের মতই আছে, যে রাজ্য জায়গীর পেয়েও রাজ্য নেয় নি রিজিয়ার কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে বলে। দুর্দান্ত দুঃসাহসী প্রচণ্ড বলবান হাবসী বক্তিয়ার। দিল্লীতে ওমরাহরা সকলেই রিজিয়াকে আহ্বান করেছে। রিজিয়া মনের উল্লাসে চলছে। পথে বনের মধ্যে হঠাৎ বাঘ পড়ল সামনে। বাঘটা পিছন দিক থেকে অগ্রবর্তী বিজয়সিংহের উপর লাফ দিতে উদ্যত হয়েছে। রিজিয়া দুঃসাহসিনী খিল খিল করে হেসে উঠে আক্রমণ করলে বাঘকে। আসরে রাজপুত কুমার বিজয়সিংহ দেখলে একটি কিশোর বালক যুদ্ধ করছে তারই উপর আক্রমণোদ্যত বাঘের সঙ্গে—সে শর নিক্ষেপ করে বাঘের বুক এঁফোড় ওফোঁড় করে দিলে—বালকবেশী রিজিয়া এসে বললে—কে তুমি উদ্ধত কাফের যুবা, আমার শিকার 'পরি করিয়াছ শরাঘাত! কিন্তু তুমি অপূর্ব সুন্দর !

মঞ্জরী আসরে ঢুকবে। তার আগে সে হাতজোড় করে দেবতাকে প্রণাম করে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবকে প্রণাম করে রীতুবাবুকে প্রণাম করলে। হঠাৎ তার কানে এল—শোভা শেফালীকে বলছে—কালো বাঘের চাউনি দেখ ! যেন গিলে খাবে। বলে হেসে উঠল।

মঞ্জরী তখন প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়েছে। কথাটায় মেয়েরা সকলেই হাসছিল। শোভা রীতুবাবুর সঙ্গে চিরকাল রঙ্গরস করে, হাসি তামাসা করে—সকলেই ভাবছিল রীতুবাবু একটা জবাব দেবে। মঞ্জরীও তাই ভেবেছিল। সে যেতে যেতেও ফিরে তাকালে রীতুবাবুর দিকে। রীতুবাবু কঠিন নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে শোভার দিকে তাকিয়ে আছে। কথা শুধু একটি বললে—নিষ্ঠুর কণ্ঠে বললে—শোভা! তাতে সকলেই চমকে উঠল। ব্যাপারটা এমনই অস্বাভাবিক এবং রীতুবাবুর দৃষ্টি ও কণ্ঠ এমনই রূঢ় কঠিন যে গোটা সাজঘরটি অকস্মাৎ দু-চার সেকেণ্ডের জন্য বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। মঞ্জরীরও বিস্ময়ের অবধি রইল না। রীতুবাবুর দৃষ্টিতে ক্রোধ এবং অবজ্ঞা যেন উপচে পড়ছিল। শোভা বিবর্ণ পাংশু হয়ে গেছে। মঞ্জরীও কেমন হয়ে গেল, বিস্ময়ের ঘোর যেন তাকে প্রায় অভিভূত করে দিচ্ছে।—এ কি! এত রাগ করলেন মাস্টারমশাই! কি হল!

গোপাল দ্রুতপদে ঢুকল সাজঘরে—বলে উঠল—বাঘ—বাঘ—বাঘ—

নেপথ্য বক্তৃতাটা সেই শুরু করে দিলে—সঙ্গে সঙ্গে সুইচ টিপে মেশিন চালু হওয়ার মত যাত্রার দলযন্ত্রটি মুখর হয়ে উঠল—কয়েক জনেই চীৎকার করলে—বাঘ বাঘ বাঘ। সঙ্গে সঙ্গে রীতুবাবুর নেপথ্য কণ্ঠস্বর—হুঁশিয়ার! কিন্তু রীতুবাবু এখনও যেন নিজেকে সামলাতে পারে নি। তার চীৎকার করতে দেরী হয়ে গেল। মঞ্জরীর খিল-খিল হাসিতেও প্রাণ এল না। আসরে ঢুকতেও বাধা পড়ে গেল। শতরঞ্জির মুখে পা আটকে গেল। পড়েই যেত—কিন্তু রানা লাহিড়ী ছিল আসরে। বিজয়সিংহ বেশে সে নেপথ্যে শরক্ষেপ করে বাঘকে বিদ্ধ করবার অভিনয় করতে গিয়ে সামনে ঝুঁকে কয়েক পা এগিয়ে এসেছিল। সে মঞ্জরীকে ধরে ফেললে। এই দুর্ঘটনাটিতে মঞ্জরী কয়েক মুহূর্তের জন্যই অভিভূত হল না—গোটা দৃশ্যটার মধ্যেই সে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পারলে না। সে তাকাতে পারছে না

দর্শকদের দিকে। মনে হল তারা যেন হাসছে। বিজয়সিংহবেশী রানা লাহিড়ীর দিকে তাকিয়েও চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারছে না। অথচ গোটা দৃশ্যটিতেই রিজিয়া উদ্ধত চপল বালকের মত কৌতুক করছে বিজয়সিংহের সঙ্গে। মধ্যে মধ্যে খিল-খিল করে হাসছে, মধ্যে মধ্যে উদ্ধত হয়ে তাকে শাসন করছে কপট ক্রোধে। এই দুটোর মধ্যেই সে ঠিক স্বচ্ছন্দ হয়ে প্রাণবন্ত করতে পারলে না। তারপর এল বক্তিয়ারবেশী রীতুবাবু। রীতুবাবুরও তালভঙ্গ হয়েছে। তার মনের রাগ যেন এখনও সে সামলাতে পারে নি। পার্টের মধ্যে তার রাগ ছিল; রিজিয়া বিজয়সিংহকে বলছে—"কিন্তু তুমি অপূর্ব সুন্দর। বেহেস্তের পৌরুষ সুষমা, একসঙ্গে এত রূপ এত শৌর্য এত বীর্য তুমি কোথা থেকে পেলে?"

সে কথা শুনে বক্তিয়ার ক্রুদ্ধ হয়েছে, কারণ মনে-মনে সে রিজিয়ার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। কিন্তু তবুও তার রাগ যেন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। চীৎকার যেন বেশী হল। পার্ট শুধু রানা লাহিড়ী ভাল করে গেল। তাতে দৃশ্যটা ঠিক যতটা জমে ওঠার কথা তা উঠল না।

দৃশ্য শেষ করে সাজঘরে এসেই মঞ্জরী বললে—ছি ছি ছি! এমন আটকে গেল পা!

রীতুবাবু তখনও গম্ভীর। গম্ভীর মুখেই সে সাজঘরে ঢুকেছিল। মঞ্জরীর সঙ্গেই সে আসর থেকে বেরিয়েছে। পিছন থেকে মঞ্জরীর কথা শুনে সে বললে—সব গণ্ডগোল করে দিলে ওই শোভা। যাক, কিচ্ছু হয় নি, ঘাবড়াবেন না। প্লে জমে যাবে—নেক্সট সিনেই। না জমে পারে না এ বই। কিন্তু—

থেমে গেল রীতুবাবু। তার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত ভারী হয়ে উঠেছে। মঞ্জরী তার মুখের দিকে তাকালে। মুখখানা থমথম করছে রীতুবাবুর। রানা লাহিড়ী আসর থেকে এসে ঢুকল এতক্ষণে। দ্বিতীয় সিনের অ্যাক্টররা সাজঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। রানা

লাহিড়ী ঢুকেই সামনাসামনি রীতুবাবু এবং মঞ্জরীকে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখে থমকে দাঁড়াল। রীতুবাবু তাকে বললে—যাক, তুমি মানটা রেখেছ।

রানা বললে—হ্যাঁ, গণ্ডগোল হয়ে গেল খানিকটা। ওঃ, উনি যা পড়তেন!

মঞ্জরী তার মুখের দিকে একবার তাকিয়েই আবার লজ্জিত-ভাবে মুখ নামাল। আসরের সেই সংকোচটা এখনও তার যায় নি। রানা বললে—আপনার লাগে নি তো?

লজ্জিত ভাবেই নতমুখে মঞ্জরী বললে—না।

—শতরঞ্জিটা ওইভাবে গুটিয়ে গেল কি করে, ওগুলো কারুর দেখা উচিত।

মঞ্জরী বললে—শতরঞ্জি ঠিক গোটায় নি। আমি অন্যমনস্ক ছিলাম, আর একটু তাড়াতাড়িও করেছিলাম। পা কেমন করে ঢুকে গেল বুঝতে পারলাম না।

—মুখ থুবড়ে পড়তেন—আমার ওইভাবে না ধরে উপায় ছিল না।

রীতুবাবু অন্যমনস্কের মতই দাঁড়িয়েছিলেন। কথাটা কানে যেতেই ঘুরে ওদের দিকে তাকিয়ে বললে—একটু অকওয়ার্ড হয়েছে। তাতে কিছু হত না, যদি সেরে নিতে পারতে।

রানা লাহিড়ীর ভুরু কুঁচকে উঠল। বললে—সেরে কি করে নেব?

রীতুবাবু বললে—কেন? বললেই হত—বালক, আহত তুমি—তবু ছোটো উন্মাদের মত?

—তার পর? উনি?

—উনি ঠিক উত্তর গড়ে নিতেন।

মঞ্জরী বললে—তা হয়তো নিতাম। বলতাম—সামান্য আঘাত। কিন্তু কেবা তুমি উদ্ধত কাফের যুবা, আমার শিকার 'পরি করিয়াছ

শরাঘাত? তা মন্দ হত না। লোকে হাসত না। সিটি দিত না। এ কিন্তু বড়—

—অলং—অর্থ সবং মাটি। বলতে বলতে সাজঘরে এসে ঢুকল বাবুল বোস। সে গোড়া থেকেই এতক্ষণ পর্যন্ত বাইরে আসরের ধারে জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখছিল।

—কি হল? মাটি মানে?

বাবুল একটা পোশাকের বাক্সের উপর বসে পড়ে বললে—ফার্স্ট সিনে গণ্ডগোল—অ্যাক্সিডেন্টে। আপনি বিগ ব্রাদার লাউড লাউডার লাউডেস্ট করে কংক্রিট করতে গিয়ে বেশী সিমেন্ট দিয়ে ফাটিয়ে দিলেন। এখন সেই ক্র্যাকের মধ্য দিয়ে ওয়াটার লিকিং। জল ঝরছে। অল নার্ভস; ড্যাম্প হয়ে গেছে গলা। ওয়াটার হয়ে লিকিং আউট।

রীতুবাবু বললে—ঠিক আছে। পরের সিন—শেফালী আর রানা ব্রাদার। লাভ সিন। গান আছে। তারপরই রিজিয়ার সিংহাসন দখল। বিজয়সিংহ আসছে বাধা দিতে—এসে মস্ত সারপ্রাইজ। সেই বনে দেখা বালক বালক নয়—স্বয়ং রিজিয়া। বাধা দিতে এসে আনুগত্য স্বীকার। ভাল সিচুয়েশন—ড্রামা খুব। ওখান থেকেই উঠে যাবে। কিন্তু তুমি মেক-আপ নাও। তোমারও তো রয়েছে।

—আমার তো ফকিরী আলখেল্লা আর চুল দাড়ি। ওয়ান টু থ্রি—থ্রি মিনিটস—অর্থাৎ থ্রি ইণ্টু থ্রি—নটা তুড়ি দিয়ে সেরে দেব। রঙটঙ আমি নেব না—নেব না। চোখের কোলে ওয়ান পোঁচ কালির শেড। ব্যাস।

—ব্যাস নয়—ওঠো।

—অল রাইট। স্ট্যাণ্ড আপ—হয়ে গেছে। দে রে বাবা—দে, দাড়ি চুল দে। কই—

রীতুবাবু গিয়ে বসলেন নিজের বাক্সের উপর। রানাও চলে

গেল। মঞ্জরীও গিয়ে ঢুকল মেয়েদের জন্য কাপড় দিয়ে আড়াল করা জায়গার মধ্যে।

প্লে হচ্ছিল পাইকপাড়ার রাজবাড়িতে। এখানে প্রকাণ্ড একখানা বড় ঘরের মধ্যে সাজঘর। দু-চারখানা চেয়ার—খান-কয়েক টেবিল আছে—কিন্তু টেবিলের উপর রঙ রাখা হয় না। দাগ লাগবে। সুতরাং পোশাকের বাক্সের একদিকে বসে অন্য দিকটায় নিজের নিজের মেক-আপ স্যুটকেস খুলে রঙ মাখবার ব্যবস্থা। মদ্যপানও নিষিদ্ধ। বাইরে গিয়ে খোলা ছাতটার কোন অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে খেয়ে আসতে হয়। মেয়েদের সাজবার জায়গায় এখানে মঞ্জরীর জন্যও কোন বিশেষ ব্যবস্থা হয় না। এটা বরাবরেরই নিয়ম। মঞ্জরী সেখানে ঢুকেই কেমন সঙ্কোচ অনুভব করলে। কখনও ঠিক এই ভাবে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে পার্ট খারাপ করে সাজঘরে ঢোকে নি। আজ প্রথম। নিজের জায়গায় বসে সে যেন একটু ম্রিয়মাণ হয়েই বসে রইল। কারুর দিকেই সে তাকায় নি। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অনুভব করলে সাজঘরটা অস্বাভাবিক রকমে চুপচাপ।

তার লজ্জা যেন বেড়ে গেল। আড়চোখে সে একবার দেখে নিলে। দেখে সে বিস্মিত হল। সর্বাগ্রে শোভার দিকেই চোখ পড়ল তার, শোভা বসে আছে—যেন রাগে ফুলছে। চোখে মুখে তার সে রাগের লক্ষণ অত্যন্ত স্পষ্ট। বাকী সবেরা চুপচাপ বসে আছে। বুঁচী মাথা নিচু করে রয়েছে। শেফালী ছাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আশা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। গোপালীর মুখে মুচকি হাসি শুধু। এটা অস্বাভাবিক। গোপালী মুচকে নিঃশব্দে হাসে না। তার হাসি সশব্দ। এবার সে সবিস্ময়েই মুখ তুলে তাকাল। তারপর প্রশ্ন করলে—কি হয়েছে?

কেউ উত্তর দিলে না। বাইরে থেকে গোপাল হাঁকলে—শেফালী, আশা—

তৃতীয় সিনে ওদের পার্ট। আশা সখীর দলের নেতৃত্ব করবে। বিজয়সিংহের প্রণয়িনী ক্ষত্রিয় রাজকন্যা অরুন্ধতীর উদ্যান। সেখানে বিজয়সিংহ এসেছে বিদায় নিতে। সে যাচ্ছে দিল্লী—সেখানে আলতামাসের পুত্র, অকর্মণ্য অপদার্থ সুলতানের বিপদ। আলতামাসের কন্যা রিজিয়া আসছে তাকে সিংহাসনচ্যুত করতে; সে নিজে মসনদে বসবে। রিজিয়ার সঙ্গে আছে দুর্ধর্ষ সৈন্যদল। তার উপর ওমরাহেরা বিরোধী হয়েছে। তার কারণ শুধু সুলতানের অপদার্থতাই নয়, সুলতানের মা আলতামাসের এক বাঁদী পত্নীর ঔদ্ধত্য। দৃশ্যের প্রথমেই সখীরা নৃত্যগীতে বিজয়সিংহকে সম্বর্ধনা করছে।

শেফালী আশা উঠে পড়ল। বেরিয়ে গেল তাড়াতাড়ি।

মঞ্জরী জিজ্ঞাসা করলে—কি হয়েছে গোপালী!

গোপালী বললে—শোভাদি—

বলেই সে আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না। হেসে গড়িয়ে পড়ল। মুহূর্তে শোভা প্রায় ফেটে পড়ল।

—হাসি কিসের? এতে হাসি কিসের এত?

গোপালীর হাসি বেড়ে গেল। সে মুখে কাপড় দিয়ে উঠে পড়ল। শোভা বলে উঠল—পেঁচী মাতাল—আর ইয়ে খানকী—এরাই এমন করে হাসে। তুই ইয়ে খানকী। আমি তোর সব কীর্তি জানি।

খানকীর বিশেষণ হিসেবে সে একটা অতিকুৎসিত কথা উচ্চারণ করলে। মুহূর্তে গোপালীর হাসি বন্ধ হয়ে গেল। ভীষণ হয়ে উঠল তার চোখমুখ। সে বলে উঠল—আর তুই! তুই রীতুবাবুর জন্যে···। কেমন দিয়েছে? আজ কেমন হয়েছে?

—আর তোকে? রানা লাহিড়ী? তাকিয়েছে তোর দিকে?

মঞ্জরীর মধ্যে দলের মালিক জেগে উঠল—সে বলে উঠল—শোভাদি, এটা পাকপাড়ার রাজবাড়ি। এটা আমাদের নিজের পাড়াঘর নয়, চীৎপুরের আপিসও নয়। চুপ কর।

—আমি আর চাকরী করব না তোমার দলে।

গোপালী বলে উঠল মৃদুস্বরে—ভাদুড়ীমশায় সাধছেন—সেখানে যাবে ?

—ভিক্ষে করে খাব। ভিক্ষে করে খাব। খেতেই হয়—না হয় দু দিন আগে থেকেই খাব।

—গোপালী, শোভা।

স্তব্ধ হয়ে গেল সব। মঞ্জরী অস্বস্তিও অনুভব করলে—আবার এই কর্তৃত্ব করার মধ্যে দিয়েই যেন খানিকটা দুর্বলতাও কাটিয়ে উঠল। শিউনন্দন পর্দার ওপার থেকে সাড়া দিয়ে বললে—বেশকারী পোশাক লাইয়েছে গো।

ওঃ! তাকে পোশাক বদল করতে হবে। এবার নারীর বেশ। সুলতানা রিজিয়া সাজবে বালক-বেশ ছেড়ে।

—আনো।

মখমলের পেশোয়াজ বডিস ওড়না, মাথার তাজ মুক্তার মালা, বুকের উপর বাদশাহী বস্ত্রের হুক-কাটা একটা মখমল পিস—বাঁকা তলোয়ার সব আনকোরা নতুন। বেশকারী সব সাজিয়ে দিয়ে গেল। সাজতে নিজেকেই হবে। চুল খোলা থাকবে! থাকবে। এতক্ষণ চুল আফগানী পাগড়ী এবং তুর্কী টুপির মধ্যে বাঁধা ছিল। টুপি পাগড়ী খুলে সে ডাকলে বুঁচীকে—বুঁচীদি, একটু হাত লাগিয়ে দাও না ভাই।

বেশকারী পুরুষ। ওদের কাছে মেয়েদের সাজার অনেক অসুবিধা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েরাই পরস্পরকে সাহায্য করে। বিশেষ প্রয়োজনে সাজা হয়ে গেলে খুঁত মারতে হলে বেশকারীকে ডাকে।

বুঁচী তাড়াতাড়ি উঠে এল। পোশাকগুলির দিকে তাকিয়ে বললে—পোশাক ভাই, খুব ভাল হয়েছে। থিয়েটারের থেকে ভাল।

মঞ্জরী বললে—অনেক আশা করেছি ভাই বইটাকে নিয়ে। কিন্তু এমন বাধা পড়ল—

—ও কিছু না। ও ঠিক হয়ে যাবে। চুলটা এলানো থাকবে?

—হ্যাঁ। ছবিতে না কি তাই আছে।

—ঝরি নেবে না কি?

—তাজ থাকবে মাথায়, ঝরি ভাল লাগবে?

একটু ভেবে বুঁচী বললে—না। তোমার কোঁকড়া চুল, তাজের চারিদিকে ফুলে ছড়িয়ে থাকবে, ভাল লাগবে।

শোভা ও-প্রান্ত থেকে বলে উঠল—আমাকে তুমি তাহলে জবাবই দেবে?

—তার মানে? সে কথা কখন বললাম শোভাদি?

—মুখে না বল, ইশারায় বলছ। এতকাল তো সাজবার সময় শোভা ছাড়া কাউকে ডাক নি। আজ বুঁচীকে ডাকলে।

গোপালী বলে উঠল—তুমি তো নিজেই বলেছ তুমি থাকবে না, জবাব দেবে।

—সে বলেছি, রাতুবাবু আমাকে সবার সামনে ওইভাবে ধমক দিলে, ওই রকম হেন্টা-কেন্টা করে তাকালে সেই জন্যে। কি দোষ করেছিলাম আমি? কি তাকানি! কি ধমক! আমি যেন দাসী বাঁদীর পার্ট-করা তিরিশ চল্লিশ টাকার আসামী!

মঞ্জরী বললে—ও সব কথা এখন থাক। তা ছাড়া—

কথা কেড়ে নিয়ে শোভা বললে—কিন্তু তার তো বিচার চাই—

গোপালী এবার কথার মাঝখানেই বললে—বিচার একতরফা হয় না। নিজের দোষ বলতে হয়।

—কি দোষ আমার শুনি?

শোভা নরম হয়ে এসেছে। এই প্রৌঢ় বয়সে তার এ চাকরী গেলে তাকে সত্যিই হয় ভিক্ষে করে খেতে হবে, নয় ঝি-গিরি করতে হবে। নয়তো যে পেশা তার তাতে পঙ্ককুণ্ডের গভীরে কৃমিকীটের মতই ডুবতে হবে। তা ছাড়া সে মঞ্জরীর বাড়িরই ভাড়াটে। গোপালীর ক্রোধ এখনও অন্তরে পাক খাচ্ছে; শোভা তাকে এমন অশ্লীল

গালাগালি করেছে যে, যে এই জায়গাটা সাজঘর না হলে কুৎসিত কলহের চরম জঘন্যতায় সমস্ত বীভৎস হয়ে উঠত। সে বলে উঠল—বল নি তুমি? কালো বাঘ? বল নি গোরা বাঘ ডোরা বাঘ বনে পালাল, এবার আমাদের প্রোপ্রাইট্রেসের পায়ের তলায় কালো বাঘ লেজ নাড়ছে। ম্যানেজার হয়েছে মিনসে—এরপর নজর মালিকানির দিকে। বল নি? বলুক না, বুঁচীদি বলুক না, সে কথা রীতুবাবু শোনে নি?

বদ্ধ ঘরের কোণে পোরা বেড়ালের মত অবস্থা শোভার, সে নখ দাঁত বের-করা রোঁয়া-ফোলানো বেড়ালের মত মরিয়া এবং হিংস্র হয়ে উঠল—দুই হাত নেড়ে উদ্ধত কণ্ঠে বলে উঠল—শুনেছে তো শুনেছে, বয়ে গেছে আমার। আমায় না হয় তাড়িয়েই দেবে। বলেছি, যা চোখে দেখেছি বুঝেছি তাই বলেছি। আমি বুড়ী হতে চললাম, আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। বলেছি—আবার বলব। কি চাউনিতে তাকাচ্ছিল ও, মঞ্জরী যখন প্রণাম করলে? দু বেলা মঞ্জরীর বাড়ি গিয়ে কত পরামর্শ! বুঝি না?

মঞ্জরী স্তম্ভিত হয়ে শুনছিল। সে দলের প্রোপ্রাইট্রেস, আসরে অভিনয় চলছে; এই মুহূর্তে কোন একটা হাঙ্গামা হলে সে এক বিশ্রী কাণ্ড হবে। তাদের মধ্যে ঝগড়া যখন চরম পর্যায়ে ওঠে তখন যে সে কি বীভৎস কি কদর্য হয়ে দাঁড়ায় সে তা জানে। ধৈর্য না ধরে তার উপায় নেই। তা ছাড়া মনে মনে তার এমনি একটি সন্দেহের অগ্নি-কণা যেন ধোঁয়াচ্ছিল এতদিন; তাতে শোভা আজ নির্লজ্জ চীৎকারের ফুৎকারে তাকেও দীপ্ত করে তুলেছে। সে দীপ্তিতে রীতুবাবুর দৃষ্টি, রীতুবাবুর ভাবভঙ্গিগুলি নতুন রূপ নিচ্ছে বলে মনে হল তার। বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। দ্রুতস্পন্দনে স্পন্দিত হয়ে একটা উদ্বেগে তাকে উদ্বিগ্ন করে তুললে। কিন্তু সে তো নিজে তা ভাবে নি। সে তো তা পারবে না। না, তা পারবে না।

বুঁচী মুখ বুজে তাকে পোশাক পরাচ্ছিল। সে নিম্নস্বরে বললে—

মরণ, যেপে গেছে যেন! তিলকে তাল করছে। ব্যাটাছেলের স্বভাব আর কি!

মঞ্জরী নিজেকে আকর্ষণ করে বললে—ছাড় তো বুঁচীদি।

—না, তুমি যেয়ো না ওদের ওদিকে। প্লে চলছে মনে রেখো।

কিন্তু মঞ্জরী উদ্বেগে অধীর হয়ে উঠেছিল—সে আত্মসম্বরণ করতে পারলে না—হঠাৎ হাত জোড় করে বললে—হাতজোড় করছি শোভাদি, দোহাই তোমার, থাম তুমি। আজকের মত—শুধু আজকের মত।

তারপর সে বুঁচীকে বললে—ছাড় বুঁচীদি। আমি ড্রেসারকে দিয়েই ঠিক করিয়ে নিচ্ছি। বলে সে বেরিয়ে চলে গেল।

বুঁচী বললে—তুমি কি করলে এ তো শোভাদি? এসব কথা—

—সে আমি তুলেছি, না গোপালী তুলেছে?

—তুলব না? ফোঁস করে উঠল গোপালী।—কত বড় কথাটা তুমি আমাকে বললে বল দেখি?

বুঁচী বললে—ছি-ছি-ছি! এই তো একমাস গোরাবাবু চলে গেছে। ওর মনে কাঁচা ঘা—

—কাঁচা ঘা! মরণ! কু[illegible] পুত্রশোক!

—থাক শোভাদি, থাক।

বাইরে রীতুবাবুর গম্ভীর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল—পার্ট এসেছে। শোভা!

শোভা চমকে উঠল। শুধু চমকে উঠল না—সে যেন ভয় পেয়ে গেল। সে সেজেই বসেছিল। সে সেজেছে—আলতামাসের বিধবা পত্নী—বর্তমানে সুলতানের মা। আসলে বাঁদী। চরিত্রে নীচ উচ্ছৃঙ্খল। এই সিনে রিজিয়া দরবারে সসৈন্যে প্রবেশ করে সৎভাই এবং সৎমাকে বন্দী করবার আদেশ দেবে। বন্দী করবে বক্তিয়ার। বন্দী করে তার চোখ অন্ধ করে দেবে। আতঙ্কে থরথর করে কেঁপে উঠল শোভা মনে মনে। রীতুবাবুকে সে জানে। সে না পারে এমন কাজ নেই। কতবার আসরে তার হাত ধরে বদমায়েশী করে

চিমটি কেটে দিয়েছে, সুড়সুড়ি দিয়েছে। কতজনকে সে অভিনয়ের ছলে কিল মেরেছে, ঘাড় টিপে ধরেছে। সাজঘরে এসে বলেছে—কি করব। ইমোশনের মাথায় হয়ে গেছে। বড় অ্যাক্‌টর, সাতখুন মাপ। আজ যদি—

—শোভা! দেরী হয়ে যাবে।

শোভা যেন দড়ির টানে বাঁধা জন্তুর মত বেরিয়ে এল। আসর। আসরে পার্ট এসেছে। জ্বর নিয়ে নামতে হয়। মুখের খাবার ফেলে ছুটতে হয়। বোধ হয় সামনে মরণ এসে দাঁড়ালেও বলতে হয়—দাঁড়াও, পার্টটা সেরে আসি। সে বেরিয়ে এল। রীতুবাবু সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। তার পিছনে বাবুল বোস, পাগল ফকীর সেজে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। শোভা হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসল। সে হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে রীতুবাবুর পা দুটো ধরে বলল—আমার দোষ হয়েছে। আমার—। সে কেঁদে ফেললে।

রীতুবাবু চমকে উঠল এবার। কিন্তু সে ক্ষণিকের চমক। মুহূর্তে সে হেসে তার হাত ধরে তুলে বললে—ওঠো, ওঠো। পাগল একটা! যাও। পার্ট এসেছে। আরে, এ কি! চোখের জলে যে চোখের কালি ধুয়ে পড়ছে! এই, এই, একটা গামছা কি তোয়ালে—

বিপিন চাকর ছুটে একটা পেন্ট মোছা ডাস্টার নিয়ে এল। রীতুবাবু শোভার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললে—যাও, যাও।

শোভা চলে গেল। বাবুল নিজের পার্ট আবৃত্তি করতে লাগল। সে পাগল ফকীর। পথে পথে ঘোরে আর বলে—বয়েল মুলতানকি, সুলতান দিল্লীকে, ভল্লুকী কন্দরকে, বেয়গম অন্দরকে—ওজীর আমীর ওমরা, তামাম হোমরা-চোমরা, উল্লুক আউর বন্দর—ইন্দুর আউর ছুছুন্দর; নসীব হিন্দুস্তানকা।

পার্টটা সম্বন্ধে বাবুল খুব উৎসাহী নয়। ঠিক গন্ধর্বকন্যার বিদূষকের পার্টের মত নয়। তার উপর প্লের অবস্থা যা হয়েছে তাতে একটু বেশ দমে গেছে। এই সিনেই সে ঢুকবে। সুলতানের

দরবারে সে গিয়ে ওই বলতে বলতে ঢুকবে। সুলতান খুব চটবে। তাকে দরবার থেকে বের করে দিতে বলবে সুলতানের মা। ফকীর পাগলের মতই বলবে—বাগদাদ মদিনা মক্কা—খোদা দে ঘুরায় দে, সুলতানী হো যায় ফক্কা—

এরই মধ্যে ঢুকবে রিজিয়া। ঢুকবে একলা। তারপর ঢুকবে বক্তিয়ার।

বাবুল বোসের পার্ট এসে পড়ল আর। সুলতানের মা—আলতামাসের নীচজাতীয়া বেগম শোভা আমীরদের সঙ্গে ঝগড়া করছে। বক্তব্য—আমি নীচজাতীয়া, আমি হীন, আমার ছেলে মূর্খ অপদার্থ; আর ওই রিজিয়া—যে পুরুষের মত ঘুরে বেড়ায়, যার পরম প্রিয়পাত্র হল ওই কালো হাবসী—সেই হল সিংহাসনের উপযুক্ত?

বাবুল বোস তাড়াতাড়ি সাজঘর থেকে বেরিয়ে আসরের মুখে দাঁড়াল। আসর সেই মুহূর্তে করতালিতে ভরে গেল।

শোভার অ্যাক্‌টিংয়ে হাততালি পড়ছে। পাশে দাঁড়িয়েছিল গোপাল ঘোষ; গোপাল তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—খুব ভাল বলছে শোভা। জোর অ্যাক্‌টিং করেছে। যান যান, ঢুকে পড়ুন।

সত্যিই শোভার অ্যাক্‌টিংয়ে হাততালি পড়েছে। এতক্ষণ পর্যন্ত সবই যেন ঝিমিয়ে গিয়েছিল আবার। প্রথম দৃশ্য দুর্ঘটনার জন্য জমে নি। দ্বিতীয় দৃশ্য নাচে গানে রানা লাহিড়ী আর শেফালীর লাভ-সিনে একটু উঠেছিল। কিন্তু এ সিনে উজীর মণি এবং কজন ওমরাহ প্রথমে ঢুকেই কেমন ঝিমিয়ে গিয়েছিল। তারা ষড়যন্ত্র করছিল—নীচজাতীয়া সুলতান জননী এবং তার গর্ভজাত মুর্খ অপদার্থ সুলতানের হাত থেকে অব্যাহতি পেতেই হবে। হোক রিজিয়া নারী—তবু সে সুলতানের প্রধানা বেগম উচ্চবংশীয়া জননীর কন্যা। বাল্যকাল থেকে সুলতান আলতামাসের সঙ্গে থেকে সে পুরুষের থেকে কর্মক্ষম, বিচক্ষণ, তাকেই সিংহাসনে বসানো হোক। এমন সময় সপুত্রক সুলতান জননী দরবারে ঢুকে বলেছে—

ভাল ভাল, উজীর মহান তুমি নাকি মহাবিজ্ঞ
খাঁটী মুসলমান। বলিয়াছ ভাল। আমি নীচ,
নীচ বংশে জন্ম মোর—অতি হীন চরিত্র আমার,
দেহে মোর নীচ রক্ত বয়ে যায় শিরায় শিরায়।
বাঃ—বাঃ! চমৎকার! বিগত যৌবনা
আমি—কটাক্ষে আমার নাহি ছুটে পঞ্চবাণ।
ধিক্—ধিক্। আর রিজিয়া—সে সুলতান নন্দিনী,
সুন্দরী যুবতী; বসরাই গুলাব ফোটে কপোলে তাহার।
সুরমায় সুরঞ্জিত নয়ন যুগলে—পঞ্চবাণ নয়
ছোটে শতবাণ। বাঃ বাঃ! আমি ভ্রষ্টা নারী।
আর সুলতান নন্দিনী সুন্দরী রিজিয়া সতীসাধ্বী!
বলি, কালো সেই হাবসী ক্রীতদাসে মনে নাহি পড়ে?
হা—হা—হা—হা—।

কথাগুলি শোভা সত্যিই চমৎকার বলেছে। খুব ফিলিং দিয়ে বলেছে। তাতে ঝিমনো আসর একটু গরম হয়ে উঠেছে, তবে হাততালিটা স্বতঃস্ফূর্ত নয়। প্লে জমাবার জন্য রাজকুমাররা ইচ্ছে করে দিয়েছেন। বড় রাজকুমার রসিক এবং গুণগ্রাহী লোক—তিনি বলেছেন—হাততালি দাও হে। বেশ বলছে। জমিয়ে দাও প্লেটা। বলে নিজেই শুরু করেছেন—সঙ্গে সঙ্গে বিশিষ্ট অতিথিরাও দিয়েছেন এবং ক্রমে সেটা সঞ্চারিত হয়েছে সারা আসরে।

বাবুল বেশ একটু উৎসাহিত হয়েই আসরের প্রবেশ-মুখটিতে দাঁড়িয়ে আরম্ভ করলে—দু হাত প্রসারিত করে বলতে শুরু করলে—বয়েল মুলতানকে—

কিন্তু সেই মুহূর্তটিতেই আসরের মধ্য থেকে কোন কূটরসিক জন বলে উঠল—আচ্ছা আচ্ছা বহুৎ আচ্ছা—শ্রীমতী জালা—!

জালা মানে মাটির জালা। বললে শোভাকে। শোভা স্থূলাঙ্গী। মুহূর্তে শোভা বিবর্ণ হয়ে গেল। আসরে উচ্চহাস্য রোল উঠেছে।

বারান্দার বিশিষ্ট আসর থেকে ছোট কুমার উঠে দাঁড়ালেন—হাঁকলেন, চুপ, চুপ—সাইলেন্স। কথাটায় কাজ হল। ছোট কুমার বললেন—এ কি অসৌজন্য! ছি!

বাবুল আবার আরম্ভ করলে—বয়েল সুলতানকে, সুলতান দিল্লীকে, ভল্লুকী কন্দরকে—বেয়গম অন্দরকে! লা ইলাহি ইলাল্লা, হজরতে রসুলেল্লা!

উজীর ক্রুদ্ধ হয়ে বললে—এই পাগল, এ দরবার।

বাবুল বললে—ওজীর আমীর ওমরা, দিলকুল হোমরা চোমরা, উল্লুক আও বান্দর; ইন্দুর আও ছুছন্দর—নমো হিন্দোস্থান কি!

সুলতানের মা—শোভা হাঁকলে—বন্দী কর উদ্ধত ফকীরে।

উজীর হাঁকলে—প্রহরী!

বাবুল হা হা করে হেসে উঠল। বললে—লে—লে—লে গদানা—পেটমে নেহি ন দানা—, তবে শুনো ভল্লুকী সুলতানা—তুম হো যায়েগা কানা—আউর তুম বয়েল সুলতান—তুমাহারা যায়েগা জান আবার সে হাসতে লাগল। কিন্তু লোকেরা ঠিক এতে হাসছে না. তার কারণ হিন্দী কথা। বাবুলও দমে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই বইটা আবার ধরে গেল। উজীর এসে ওর চুলের মুঠো ধরে বললে—সয়তান, কে তুই?

বাবুল বলে উঠল বাঙাল ভাষায়—আহা-হা-হা, গেছি রে বাবা গেছি রে, মইরা গেছিরে। ছাড়, ছাড়, ছাড় রে—

উজীর বললে—তুই রিজিয়ার চর?

—চড় নয় বাবা চাপড় বলতি পার। মুই বাবা চাটগাঁইয়া মোসলমান—বক্তিয়ার খিলজী আনছে এ হানে। এইন্যা ছেড়ে দিলে চইরা খা গিয়া। কি করুম। ভ্যাক লইলি ভিক্ ম্যালে না—ফকীর বন্যা গেলাম। লোককে ডর দেখালি পর ভিখ বেশী ম্যালে। তাই কইছি বাবা—দাও, ছাইড়া দাও চুলের মুঠা।

এবার সারা আসর হেসে গড়িয়ে পড়ল।

উজীর ছেড়ে দিলে চুল। বাবুল বললে—তবে মুই হাত ছ্যাখতে জানি। মুখ ছ্যাইখা কইতে পারি নসীবে কি আছে। যা আমি কইছি রে বাবা তা ফইলা যাবে। সাবধান হইতে হইব সুলতান আর সুলতানের মাকে। তোমাগো আমীর ওমরাদের পোওয়া বারো, লুটীর পরে তালের বড়া কইয়া দিলাম। রিজিয়ারে রুখতে তুমরা পারবা না। তার একাদশে বিরস্পতি। মঙ্গল তুঙ্গী, রাজ্য লাভ ঠ্যাকায় কে? ওমরা আমীর লোকেরা বশকিস পাবে। খেলাত পাবে। মেলা—বহুৎ—আনেক!

সুলতান জননী শোভা বলে উঠল—মূর্খ, অতি মূর্খ। ভাগ্যবিদ্যা সব মিথ্যা কথা।

রিজিয়ার পক্ষ থেকে চতুর প্রচার করে এইসব ভবিষ্যদ্বাণী।

বাবুল বলে উঠল—না। মুরুখ্যু নই। আলেক বে—পে তে আমি জানি।—

আলেক বে—পে—তে। আল্লা খেতে দে।

অ—আ—ই—ঈ—পান্তি আর পুঁইশাক চচ্চড়ী।

হা—হা—হা—হি—দে বাবা এই বাদশাহী—

সুলতান এবার মায়ের কাছে এসে বললে—মা, পালাই, চল। ফকীর ঠিক বলেছে। মা. আমার ভয় পাচ্ছে। আমি সুলতানী চাই না। মা—

শোভা বলে উঠল—মূর্খ, স্তব্ধ হও। ধৈয ধর। কার ভয়ে পালাইব? যাও তুমি—বস গিয়া সিংহাসনে।

এবার রিজিয়া ঢুকল—বলতে বলতে ঢুকল—স্তব্ধ হও মূর্খ তুমি। আমার আদেশে।

রিজিয়ার হাতে উন্মুক্ত কৃপাণ।

হাততালি পড়ে গেল। কে বললে—বহুৎ আচ্ছা।

রিজিয়া বললে—ওই মসনদে অধিকার নাহিক তোমার। কলঙ্কিত করো নাকো কুতুবউদ্দীন-শাহী পবিত্র মসনদ! ক্রীতদাসী পুত্র তুই।

অপদার্থ অকর্মণ্য। সুরা আর নারীতে প্রমত্ত সদাই। আলতামাস নামের গৌরব কলঙ্কিত তোমা হতে। তার জন্য দায়ী এই নীচমনা ক্রীতদাসী নারী।

শোভার পার্ট ছিল। বললে—আমি ক্রীতদাসী, আর তুমি?

—সুলতান নন্দিনী আমি—শাজাদী রিজিয়া—

—শা জাদী! সুলতান-জাদী! উচ্চমনা পবিত্র গঙ্গার জল! আলতামাস ছিল ক্রীতদাস। ছিল নাকো?

—জিহ্বা তোর ছিঁড়ে নেব।

—তার আগে উচ্চ কণ্ঠে বলে যাব—তোর ও আমার মাঝে কিসের প্রভেদ? আলতামাস ক্রীতদাস—পিতা তোর, মাতা তোর কুতুবউদ্দিন সুতা। সেও ছিল ক্রীতদাস কুতুব-দুহিতা। তবে আর প্রভেদ কিসের? পবিত্র গঙ্গার জল! নারী হয়ে পুরুষের বেশে লোলুপ পুরুষ মাঝে বিচরণ তোর; কৃষ্ণ বর্ণ, ভীষণ দর্শন মহিষের মত হাবসীর লালসায় অপার আনন্দ! প্রভেদ আমাতে তোতে? কি প্রভেদ? হা—হা—হা—হা! উর্জীব ওমরাহগণ, এখনও দাঁড়ায়ে সবে পুত্তলিকা সম? বন্দী কর, আদেশ আমার রাজ্যখণ্ড দিব পুরস্কার।

সত্যিই শোভা খুব ভাল বললে। যেন প্রাণের একটা জ্বালাময় আবেগ ক্ষোভ ঢেলে বিষাক্ত কণ্ঠে বলে গেল। রিজিয়া-বেশিনী মঞ্জরীও বিস্মিত হয়ে গেল তার বক্তৃতায়। উত্তরে তার ছিল হা-হা-হাসি। তারপর বাঁশী বাজাবে—সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করবে বক্তিয়ার। হাতে উদ্যত ভল্ল এবং পিছনে চার-পাঁচজন সৈন্য। কিন্তু সে হাসলে না—শুধু বাঁশীতেই ফুঁ দিলে। বক্তিয়ার প্রায় লাফ দিয়ে এসে প্রবেশ করলে। বললে—তামাম শহর দিল্লী সুলতানা রিজিয়ার করে জয়ধ্বনি। উল্লাসিত তারা—মূলতানী বয়েল তুল্য সুলতানের রাজ্য হতে অব্যাহতি পেয়ে।

রিজিয়া বললে—বন্দী কর, ওই নীচ নারী আর বলীবর্দসম ওই

দাসীপুত্রে। আর উজীর প্রধান! আর ওমরাহগণ! কি প্রত্যাশা কর মোর পাশে?

মণি ঘোষ উজীর বললে—কি প্রত্যাশা? ভাগ্যচক্রে হার মানিয়াছি। সুলতান পুত্র জেনে ভুল করে অক্ষম এই নিরক্ষরে সিংহাসনে বসায়েছি। ধর্ম আর রাজনীতি বিধানে নিয়মে কন্যা সে নারী, তারে মানিতে চাহি নি। সেখানে করি নি ভুল। এ জীবন জুয়াখেলা। হারিয়াছি—মাসুল হইবে দিতে। দিব। তার তরে আক্ষেপ করি না। কর, বন্দী কর।

—হ্যাঁ। বন্দীত্ব নিশ্চিত ধ্রুব। বক্তিয়ার, কেথায় শৃঙ্খল? নিজহাতে বন্দী আমি করিব উজীর ওমরাহগণে।

একজন প্রহরী এক থালার উপর মুক্তার মালা নিয়ে এসে দাঁড়াল। সেই মুক্তার মালা উজীরের হাতে জড়িয়ে দিয়ে রিজিয়া বললে—বন্দী তুমি উজীর প্রধান, শাস্তি তব রিজিয়ার সিংহাসন পাশে উজীরের কর্ম করে যাবে। রিজিয়া করিলে ভুল তুমি তারে সংশোধন করি স্নেহ তিরস্কারে বুঝাইয়া দিবে।

তারপর একে একে মুক্তার মালা সকল ওমারোহের হাতে দিয়ে রিজিয়া বললে—সম্মানিত আমীর-ওমরাহগণ, পিতৃতুল্য সকলে তোমরা; মহামান্য উজীরের যেই শাস্তি সেই শাস্তি তোমা সবাকার।

উজীর ধ্বনি দিয়ে উঠল—জয় সুলতানা রিজিয়া, হিন্দোস্তান অধিশ্বরী দিল্লীর সুলতানা!

সঙ্গে সঙ্গে সকলেই উঠল ধ্বনি দিয়ে। রিজিয়া আসরে পাতা সিংহাসনে বসে বললে—বক্তিয়ার, বন্দী দুইজনে নিয়ে যাও। কর্তব্য তোমার কর সমাপন। শাস্তি দুজনের প্রাণদণ্ড—আর—.

শোভার দিকে তাকিয়ে বললে—অন্ধত্ব। যেই চক্ষে দেখে নারী আমার কলঙ্ক—সেই চোখ দুটি দাও নিভাইয়া তপ্ত শলাকায়।

চীৎকার করে উঠল শোভা। বক্তিয়ার রীতুবাবু তার কাছে

তখন গিয়ে দাঁড়িয়েছে। শোভার চীৎকারও খুব ভাল হল। সে ভয়ে থরথর করে সত্যিই কাঁপছিল।

অভিনয় সত্যিই তখন জমেছে। শোভার হাত ধরে টেনে বক্তিয়ার রীতুবাবু অট্টহাস্য করে উঠল। প্রায় সত্যিই যেন টেনে নিয়ে গেল।

সুলতানা ডাকলে—সিদ্ধ ফকীর!

বাবুল বোস এগিয়ে এল—হাসতে হাসতে বললে—সিদ্ধ ফকীর? সোলতানা—বাংলা দ্যাশে কচু আসল হইলে সিদ্ধ হয়। আধ সিদ্ধ হইলে সেটা কচু নয়, দকর কচু। ফকীর পুরা সিদ্ধ হইলে হয় ফকীর। আধ সিদ্ধ হইলে হয় ফিকির। আমি সিদ্ধ ফকীর না। আধ সিদ্ধ —আমি ফিকির। আল্লারে কই আমি—আলেক বে-পে-তে—আল্লা খাইতে দে বাবা—আল্লা খাইতে দে। উ মুক্তার মালা লইয়া কি করুম। প্যাটে দানা দাও। খাত্তি দাও। সি তোমার ওই পোলাও না, কালিয়া না। দ্যাশ ছাইড়া আইসা পান্তাভাত পুঁইশাক চচ্চড়ী খাই না। খিলাতি পার?

নেপথ্যে কোলাহল উঠল—হর হর মহাদেব!

রিজিয়া চমকে উঠল—কি হল?

ফকীর বললে—নসীব সুলতানার আর পোড়াকপাল ফকীরের। সুলতানার নসীবে তারা উঠছে। আর আধ সিদ্ধ ফিকিরের পান্তি পুঁইশাকে ছাই পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে দূত ছুটে এসে বললে—রাজপুত রাজা বিজয়সিংহ সসৈন্যে দুর্গদ্বার আক্রমণ করেছে। সে বলে—সুলতানা রিজিয়াকে সে মানে না, সে মানে সুলতানকে।

উজীর বললে—হুঁশিয়ার। প্রবেশ করতে দিয়ো না। সে দুশমন।

রিজিয়া বললে—না, দাও, তারে প্রবেশ করতে দাও। সসৈন্যে নয়। রাজপুত বীরের যদি সাহস থাকে, তবে প্রবেশ করুক সে তার দেহরক্ষী নিয়ে। বল, যুদ্ধে নাহি প্রয়োজন। সুলতানা রিজিয়া

তারে দ্বন্দ্বযুদ্ধে করেছে আহ্বান। পরাজিত হলে, সুলতানা রিজিয়া তার আদেশ মানিয়া, সিংহাসন ত্যাগ করে চলে যাবে অরণ্যে কন্দরে। যাও।

দূত চলে গেল।

ফকীরও তার পিছন ধরলে—বাগদাদ মদিনা মক্কা, ফিকিরের নসীবে ফক্কা। দে আল্লা, একমুঠো পান্তি ভাত।

উজীর ডাকলে, ফকীর—

সুলতানা বললে—যেতে দাও পাগল ফকীরে।

ওদিক থেকে বিজয়সিংহ প্রবেশ করলে উন্মুক্ত কৃপাণ হাতে।—উদ্ধত নারী—

কথা তার মুখেই থেকে গেল, স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে গেল আসরের প্রবেশ-পথে।

রিজিয়া হেসে উঠল খিলখিল করে।

—এ কি, সেই বিচিত্র বালক হেথা, সুলতানা রিজিয়া!

—হ্যাঁ, আমি সেই বিচিত্র বালক। ব্যাঘ্র সনে বনে করি রণ। আর দরবার যুদ্ধক্ষেত্রে তরবারি হাতে প্রতীক্ষা করিয়া আছি রাজপুত সিংহশূর বিজয়সিংহের তরে।

মৃদু মৃদু হাসছিল সুলতানা রিজিয়া।

এতক্ষণে মঞ্জরী যেন সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। এর পূর্ব পর্যন্ত সে অভিনয় করেছে, ভালই করেছে বলতে হবে, কিন্তু তা মঞ্জরীর পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে নি। সে যেন আচ্ছন্ন হয়েছিল বিমর্ষতার মধ্যে। সে বিমর্ষতা কাটল এতক্ষণে।

বিজয়সিংহ রানা লাহিড়ী বললে—সুলতানা রিজিয়া, তুমি বিচিত্র-রূপিণী। অসঙ্কোচে করিনু স্বীকার। যোগ্যা তুমি দিল্লীর সুলতানশাহী মসনদে বসিতে। কিন্তু তবু তুমি নারী—তব সনে দ্বন্দ্বযুদ্ধ ক্ষাত্রধর্ম নয়। আর তুমি প্রাণরক্ষা করেছ আমার।

রিজিয়া হেসে বলে উঠল—তবে তুমি মানিয়াছ পরাজয়?

—পরাজয় ? না। কৃতজ্ঞতা করিব স্বীকার, নহে পরাজয়।
শুন সুলতানা ! ভ্রাতা তব বন্দী সুলতান মোর দুধভাই।
মাতা তার ছিল ক্রীতদাসী আমার পিতার। সে করিত
পরিচর্যা মোর। তব পিতা বীরশ্রেষ্ঠ সুলতানপ্রবর
আলতামাস বন্ধু ছিলা আমার পিতার ; আমাদের রাজ্যে
আসি অতিথি হইয়া, এই দাসী রূপে মুগ্ধ হয়েছিলা।
পিতা মোর বহু উপঢৌকনের সাথে দাসীরেও দিয়েছিল
উপহার সুলতান সমীপে। তারে ত্যাগ করি তব পাশে
নতি আমি মানিতে নারিব। কিন্তু শত্রুতা তোমার সঙ্গে
কভু না করিব, ধর্ম হবে বাদী। বিদায় সুলতানা,
আপনার রাজ্যমাঝে ফিরে যাব আমি।

রিজিয়া বললে—না না, যেতে নাহি দিব। কে আছ, রুদ্ধ কর গতি।

—কে রোধিবে গতি মোর।

—হুঁশিয়ার !

প্রবেশপথে বক্তিয়ারবেশী রীতু বল্লম উদ্যত করে দাঁড়াল। তার হুঙ্কার যেন বাঘের গর্জন।

বিজয়সিংহ ঢাল সামনে ধরে তলোয়ার খুললে। রিজিয়া ছুটে এসে দুজনের উদ্যত অস্ত্রের সামনে দাঁড়াল। দাঁড়াল বক্তিয়ারকে পিছনে রেখে বিজয়সিংহের সামনে।—স্তব্ধ হও। তারপর বললে—যেতে যদি হয়, এস মোর সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজয় কিংবা বধ করে যেতে পার তুমি। সুলতানা রিজিয়া অসিহস্তে মসনদে বসেছে। বিরোধীরে সে ক্ষমা করিবে না। এস—

তলোয়ার খুললে সে।

বিজয়সিংহ এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে নতজানু হয়ে তার তলোয়ার রাখলে। রিজিয়া তার গলা থেকে মুক্তাহার খুলে তাকে পরিয়ে দিলে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বললে—আজিকার দরবার সমাপ্ত হেথায়।

উজীর প্রধান, সিংহাসন আরোহণ লাগি কোষাগার মুক্ত কর। দরিদ্রেরে কর অর্থ দান। সৈন্যদলে জনে জনে স্বর্ণমুদ্রা দাও। সে ফকীর কই ? সেই বিচিত্র ফকীর ?

মুখ ফেরাল সে। বক্তিয়ারের চোখ জ্বলছে। সে বললে—সে গিয়েছে চলে। সুলতানা যখন একাগ্র দৃষ্টিতে এই কাফেরের পথ চেয়ে সব ভুলেছিল, সেই অবসরে সুলতানার দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে গিয়াছে চলিয়া।

—গিয়াছে চলিয়া ? কি যেন সে বলে গেল ? কিন্তু—। এ কি, বক্তিয়ার চোখে তব একি দৃষ্টি ? রক্তরোষ বিচ্ছুরিছে কেন ? বক্তিয়ার !

বক্তিয়ার নতজানু হয়ে বললে—সুলতান মাতার চোখ নিজ হাতে নিভায়ে দিয়েছি, তারই রক্ত বুঝি চোখে লাগিয়াছে। কিন্তু সুলতানা, আমার ইনাম ?

হেসে রিজিয়া বললে—এই লও—হীরক খচিত এই দুই বহুমূল্য কঙ্কণ আমার !

রিজিয়া চলে গেল। বক্তিয়ার দাঁড়িয়ে রইল কঙ্কণ হাতে। তারপর বর্বর চীৎকার করে দাঁতে সে দুটো চিবিয়ে ফেলে দিলে।

বারান্দা থেকে কুমারেরা এবং সঙ্গে সঙ্গে দর্শকেরা অজস্র করতালি দিয়ে উঠল। অভিনয় সত্যিই জমে উঠেছে।

সেই যে বই ধরল, এরপর আর ম্লান হল না। শেষও হল করতালি সাধুবাদের মধ্যে, তবু যেন কোথায় কি ফাঁক থেকে গেল। সে দলের লোকেরাও অনুভব করলে।

অভিনয়ের শেষে বড় কুমার বললেন—তা ফার্স্ট নাইট হিসেবে ভাল উতরেছে। হল কি জানেন, মানে—ঠিক নদীর চালে একটানা চলল না, পাহাড়ী চালে মানে কোথাও উঠে গেল কোথাও নামল, মধ্যে মধ্যে যেন বড় খদ এসে যোগটাকে ভেঙে দিলে। তবে মশায়, সুলতানের মা ওই শোভা ভাল পার্ট করেছে। এক সিনে বেশ করে

গেল। বেশ। বিজয়সিংহ খাসা, অরুন্ধতী ভাল, ফিকির ফকীর গুড। আপনার আর রিজিয়ার পার্টে মধ্যে মধ্যে জমল, মধ্যে মধ্যে কেমন হয়ে গেল। কিছু মনে করবেন না তো?

রীতুবাবু বললে—না না না। আপনার মত লোকের ওপিনিয়নের জন্যই তো আমি আপনাদের বাড়ি—

—মঞ্জরী দেবী?

সলজ্জ বিনয়ে মঞ্জরী হাত জোড় করে মৃদুস্বরে বললে—ও বললে আমার অপরাধ হয়। দোষ গুণ আপনাদের মত দেখিয়ে না দিলে বুঝব কি করে? সামান্য মেয়েছেলে, লেখাপড়া যৎসামান্য—

—না না না। অন্তত অভিনয়ে আপনি অসামান্য। আপনার দুটি পার্ট যা দেখেছি—সতী তুলসীতে, জনাতে—সে অদ্ভুত।

নতমুখে বসে রইল মঞ্জরী। বড় কুমার বলে গেলেন—বক্তিয়ার যেন ওভারডুইং করলেন। চীৎকার যেন বেশী হল। তবে দু এক জায়গা সুপার একসেলেণ্ট। আর আপনার হল ঠিক উল্টো—কেমন ঠাণ্ডা হয়ে গেল—জোর যতটা হওয়া উচিত ছিল তা হল না। ওঁর ওভারডুইংয়ের জন্য আপনি ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন, না আপনি ঠাণ্ডা হওয়ার জন্যে উনি ওভারডুইং করলেন—বিচার করা মুশকিল। তবে তাই হল।

—আমার কিন্তু খুব ভাল লেগেছে স্যার। বললেন একটি ভদ্রলোক।

কুমার বললেন—উনি হলেন মিস্টার মুখার্জী—দেবেন্দ্র মুখার্জী—খিদিরপুরের মস্ত ব্যবসাদার। যাত্রায় খুব শখ।

দেবেনবাবু বললেন—আমাদের বাড়ি হল বাকুলিয়া। হুগলী জেলা—

রীতুবাবু সঙ্গে সঙ্গে নত হয়ে নমস্কার করে বললে—ওরে বাপরে! বড়দিনে বাকুলিয়ার যাত্রার আসর বিখ্যাত আসর। খুব জানি। আমি অনেক আগে ওখানে মথুরশা'র দলের হয়ে গাওনা করে এসেছি।

দেবেনবাবু বললেন—আমাদের এবার ঠিক হয়েছিল মঞ্জরী অপেরা বায়না করবার, কিন্তু হঠাৎ গোরাবাবু চলে গেলেন শুনে অনেকের মন খুঁতখুঁত করছে। তাই আমি ইচ্ছে করে আজ শুনতে এসেছিলাম। কুমার যা বললেন, সেটা ঠিক নয় তা আমি বলছি নে, তবে ফার্স্ট নাইটে ওটা হয়ে থাকে। সেকেণ্ড কি থার্ড নাইটে ও ঠিক হয়ে যাবে। এই আমার মত।

—হ্যাঁ, ওতে আমিও একমত।

—কালও আর একখানা নতুন বই খুলছেন—

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সাবিত্রী সত্যবান।

—সাবিত্রী সত্যবান? বড় জানা পুরনো হচ্ছে না?

—কি করব। তাড়াতাড়ির জন্যে করতে হল। মানে গোরাবাবু যে সব বইয়ে পার্ট করেছেন—সে সব বইয়ে ওঁর করা পার্ট অন্য লোকে ভাল করলেও লোকের মনে ধরবে না তো। সেই জন্যে—

—উনি চলে গেলেন কেন?

—উনি—। একটু চুপ করে ভেবে নিয়ে রীতুবাবু বললে—প্রথমে মুন থিয়েটারে ডাকলে। তারপর বম্বে থেকে ফিল্মওয়ালারা এসে অফার দিলে।

মঞ্জরী উঠে নীরবে নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বুক ঠেলে তার কান্নাও আসছে আবার মাথার মধ্যে যেন কি একটা আগুনের শিখার মত জ্বলছে। মঞ্জরী চলে যেতেই বড় কুমার বললেন—দেবেনবাবু, আপনি জানেন না? গোরাবাবু—

—জানি বইকি। ওই তো মঞ্জরীর বাড়িতেই বাস করত—

—আরে মশাই, আমাদের দেশে. মুর্শিদাবাদ জেলার ছেলে—ওই অঞ্চলে বিয়ে হয়েছিল—আমি ওর নাড়ীনক্ষত্র জানি। বাড়ি থেকে চলে এসে মঞ্জরীকে বৈষ্ণবমতে বিয়ে করেছিল। সে সব অনেক কথা। ভাল সম্পত্তিবান শ্বশুরের একমাত্র কন্যাকে বিয়ে করেছিল—অবশ্য স্ত্রী খুব—মানে হেসে বললেন—হেভী—ভেরী হেভী ওয়াইফ।

বুঝেছেন না—তার একটু দম্ভ হবে বইকি। তাকে ছেড়ে চলে এল। একটা স্কাউণ্ড্রেল—। বলেই চুপ করে গেলেন। বললেন—রীতুবাবু কিছু মনে করবেন না যেন।

রীতুবাবু বললে—না না না। কি মনে করব?

—তা আপনাদের দলের স্ট্রেংথ খুব কমেছে—তা কমে নি। এ ছোকরা লাহিড়ী ভাল ছোকরা। প্রথম একটু ফাঁকা ঠেকতে পারে। কিন্তু ও ঠিক হয়ে যাবে। প্রোপ্রাইট্রেস ঠিক থাকলেই দল চলবে। কিন্তু কাল একটু সকাল সকাল শুরু করুন।

রীতুবাবু বললে—করব। প্লেও ছোট রিক্সিয়ার চেয়ে।

তারপর সে বাকুলিয়ার মুখার্জীবাবুকে হাতজোড় করে বললে—আপনিও আসবেন স্যার, আপনার সঙ্গে আলাপ হল—আমাদের মহাভাগ্য!

মুখার্জী বললেন—আসব। বেশ দল আপনাদের। বেশ দল। আরও কয়েকজনকে নিয়ে আসব। অবিশ্যি আজকে আনলেই ভাল হত। কালকের তো পৌরাণিক বই। আর সব এরা ইয়ংম্যান—। এদের আবার পুরাণ টুরাণ ভাল লাগে না। আসছে বার সোসাল বই করুন—দেখবেন খুব চলবে।

* * *

আশ্চর্য! সাবিত্রী পৌরাণিক নাটক—পুরনো বই—ক্ষীরোদ-প্রসাদের সাবিত্রী থেকে পনের আনা বেমালুম চুরিই হোক আর নেওয়াই হোক—এটা রীতুবাবু করেছে। গোরাবাবুর একটা ছকা ছিল—কিন্তু সেটা সে নেয় নি। তবে নাট্যকার হিসেবে নাম নিজের দেয় নি—দিয়েছে গোরাবাবুরই নাম। বইখানা আশ্চর্য রকমে জমে গেল।

অথচ ভরসা কেউই করে নি বইখানার উপর। শুধু রীতুবাবুর জেদেই হয়েছে। তার জেদের কারণ—শহরে না হোক পল্লীগ্রাম—আধা শহরে—যেখানে লোকেরা এখনও হিঁদু আছে তাদের ভাল

লাগবে। মেয়ে পুরুষ সকলে খুশী হবে। মঞ্জরীর নিজের ইচ্ছেও খুব ছিল না। এক সময় ইচ্ছে ছিল সাবিত্রীর পার্ট করবার। সে একেবারে দলের প্রথম দিকে। আসল ইচ্ছে হয়েছিল—সাবিত্রী-ব্রত করার। গোরাবাবু সেবার সাবিত্রীব্রতের দিন মদ খেতে খেতে বলেছিল—কমলা আজ সাবিত্রীব্রত করছে। বুঝেছে। একখানা ফার্স লিখব আমি। গরু মেরে জুতো দান।

মঞ্জরী সেদিন গভীর রাত্রি পর্যন্ত ঘুমোয় নি। গভীর রাত্রে গোরাবাবুকে জাগিয়ে তুলে বলেছিল—আচ্ছা, আমি যদি সাবিত্রীব্রত করি? হয় না?

গোরাবাবু বলেছিল—এ বছর তো হয়ে গেল—আসছে বছর দেখা যাবে। এখন ঘুমোও।

মঞ্জরী পরের দিন সকালেও কথাটা তুলেছিল। গোরাবাবু বলেছিল—না হবার কোন কারণ নেই। তবে পাঁচজনে পাঁচরকম বলবে। তার চেয়ে সাবিত্রী নাটক করব, তুমি সাবিত্রীর পার্ট করবে। আমি সত্যবান। ফল ওতেই পাবে।

বইও ধরেছিল গোরাবাবু, কিন্তু ঠিক ভাল লাগে নি তার। মঞ্জরীও ভুলে গিয়েছিল। এতকাল পর রীতুবাবু সাবিত্রী নাটকের কথা বলতে তার ভুরু কুঁচকে উঠেছিল। সাবিত্রী! না। ও—

রীতুবাবু বলেছিল—আমার কথা শুনুন। এ বইয়ে লোকে কাঁদবে। ভরপুর মন নিয়ে ফিরে যাবে। যমকে হারিয়ে মৃত স্বামীকে বাঁচানো—এ এই মড়ক রোগ দুর্ভিক্ষের যুগে খুব ভাল লাগবে।

অগত্যা মঞ্জরী রাজী হয়েছিল।

সাবিত্রী মঞ্জরী, নাটুকে দিয়েছিল মহর্ষি মাণ্ডব্যের পার্ট। বাবুলকে দিয়েছিল মাণ্ডব্যের শিষ্যের পার্ট—ঔদরিক। অহরহই ক্রোধের ভান করে বেড়াচ্ছে—ভস্ম করবে সমস্ত কিছু। একটা নতুন পার্ট তৈরি করেছিল—মৃত্যুর। সত্যবানের অকাল মৃত্যুর জন্য মৃত্যু কাঁদছে। এখানে যম এবং মৃত্যু ভিন্ন। উদাসিনী ব্যথাতুরা মৃত্যুর গানের পার্ট।

সেটা পেয়েছিল শেফালী। গোপালী সাবিত্রীর সখী। যমের ভূমিকা ছুটি দৃশ্যের। সে পার্টটি নিয়েছিল রীতুবাবু নিজে। বড় ভাল পার্ট—অন্ততঃ তার মনে লেগেছিল। সত্যবান—রানা লাহিড়ীকে দিয়েও মন খুঁতখুঁত করেছিল তার। মনে হয়েছিল হালকা দেখাচ্ছে তাকে। বড় যেন তরুণ মনে হয়। মঞ্জরী বলেছিল—না, থাক মাস্টারমশাই, রানাবাবুই চালাবেন। তরুণ দেখাচ্ছে ওঁকে—আমি মেক-আপে যতটা পারি ঠিক করে নেব। না হয় শেফালীকে দিন সাবিত্রী—আমি মৃত্যু করি।

—না। সাবিত্রী আপনি ছাড়া হয় না।

—বেশ। দেখুন একদিন সাজি। সরস্বতী পুজোয় বের হবার আগে কলকাতায় ছুটো বায়না ধরে ছু'দিন হোক। আমি একদিন সাবিত্রী, শেফালী মৃত্যু আর একদিন পালটে আমি মৃত্যু। দেখুন।

—না। রীতুবাবু দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিল—তা হয় না।

অগত্যা তাই হয়েছিল। মৃত্যু সে ভালই রিহারস্থাল দিলে। কর্ণার্জুনে নিয়তিটা সে অ্যামেচারে করেছে ভাড়াটে আর্টিস্ট হিসেবে। সেই রকম ঢঙ নিলে সে। মঞ্জরী রিহারস্থাল দিয়েছিল—সে রিহারস্থাল বড় ঠাণ্ডা হত। আর তার সমস্যা ছিল—কিন্তু সাবিত্রীর রূপসজ্জায় নিজেকে সত্যবান রানা লাহিড়ীর সঙ্গে মানিয়ে কি করে তরুণী দেখাবে! ভেবে-চিন্তে সে বি. দাসের মেকআপ-ম্যানকে ডেকে সমস্ত বলে মেক-আপ করিয়ে নিলে প্রথম রাত্রে এবং শিখেও নিলে। সে লোকটি হগ মার্কেটে গিয়ে মেক-আপের জন্যে দামী জিনিস কিনে এনেছে। সাজা হয়ে গেলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে সে খুশী হল। না, রানা লাহিড়ীর সামনে তাকে বড় দেখাচ্ছে না—বেমানান মনে হল না।

* * * *

আসরে সেদিন লোক প্রথম রাত্রের চেয়ে কম। সেটা সাবিত্রী

বইয়ের জন্যে। পৌরাণিক বই—জানা গল্প। তবে আসরটি বেশ ঝরঝরে। রাজবাড়ির উঠোনের পশ্চিম দিকের বারান্দায় বিশিষ্ট লোকের ভিড় বেশী। দেবেন্দ্র মুখার্জী এসেছেন অনেক কটি সঙ্গী নিয়ে—বাড়ির মেয়েরাও বিশেষ কন্যাস্থানীয়ারা এসেছেন। তবে মেয়েদের আসরে ভিড় বেশী।

মঞ্জরী সাজ শেষ করে নিজেকে আয়নায় দেখে বেরিয়ে পুরুষদের সাজঘরে দাঁড়াল।—মাস্টার মশাই!

রীতুবাবু তার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল—শুধু রীতুবাবু নয়, বাবুল, রানা লাহিড়ী সকলে। সত্যিই যেন ষোড়শী যুবতী।

রানাই প্রথম কথা বললে—অপূর্ব দেখাচ্ছে আপনাকে। অপূর্ব!

বাবুল বললে—লর্ডস আর অলওয়েজ ইডিয়টস্—বুঝলেন বিগ ব্রাদার। থ্রোজ অ্যাওয়ে গোল্ড—পিকস্ আপ গিল্টি।

রীতুবাবু অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। এতক্ষণে বললে—খুব ভাল হয়েছে। রানার থেকে অনেক কম বয়স দেখাচ্ছে। এবার মনে জোর করুন। আপনি আসরে নামলেই লোক মুগ্ধ হয়ে যাবে। দেখবেন।

মঞ্জরী একটু হেসে মেয়েদের সাজঘরে চলে গেল।

গোপাল এসে খোঁজ করলে সকলের মেক-আপ হয়েছে কি না। রীতুবাবুর মেক-আপ হয় নি—তার পার্ট তৃতীয় অঙ্কে। তবে সেও সাজপোশাক সাজিয়ে বসে আছে। পেণ্টের সঙ্গে সবুজ রঙ মেশাচ্ছে। ধর্মরাজ যম ঘনশ্যাম বর্ণ। সেই রঙ করবে। গোপাল গলার সাড়া দিয়ে মেয়েদের সাজঘরের পর্দার সামনে দাঁড়াল—তোমাদের সব হল? শেফালী?

শেফালী মৃত্যু। সে গৈরিক কাপড় পরেছে—রুদ্রাক্ষের মালা পরেছে। চুল এলানো। চুল শেফালীর ভালই আছে। তার

উপর ঝরি দিয়ে তাকে প্রচুর করে তুলেছে। রুক্ষ চুল। চুলে সে দিনের বেলায় সাবান দিয়ে রেখেছে।

শেফালী অন্যদের দিকে তাকিয়ে দেখলে। জিজ্ঞাসা করলে—হয়েছে সকলের? বুঁচীদি? শোভাদি?

শোভা এক কোণে বসেছে। সেজে চুপ করে বসে আছে। কাল রাত্রি থেকে তার আর চিন্তা উৎকণ্ঠার শেষ নেই। স্বভাববশে ওই একটা কথা যে এত কথার সৃষ্টি করবে—এত বড় হয়ে উঠবে—সে তো সে ভাবে নি! কি থেকে কি হয়ে গেল! ওঃ, সে যেন পাগল হয়ে গিয়েছে। দোষ সে কাউকে দিতে পারবে না। মঞ্জরীকে তো পারবেই না। না, সে কাল একটি কথাও বলে নি। সেই তাকে মন্দ কথা বলেছে। সাজঘরে সকলের সামনে যা বলেছে তার থেকেও সে আসরে মনের ক্ষোভে রিজিয়াকে যে কটু কুৎসিত কথাগুলো নিষ্ঠুর ক্ষোভের সঙ্গে বলেছে। শোভা জানে যে সে সত্য আসরের লোক না বুঝুক—মঞ্জরী বুঝেছে। দলের মেয়েরা বুঝেছে। রীতুবাবু তো সে সত্য তার হাত ধরার সময়েই বুঝতে পেরেছিল। উঃ, কি শক্ত করে ধরে, কি ঝাঁকি দিয়ে তাকে টেনেছিল! তার ভয়ের চীৎকারের মধ্যে অভিনয়ের চেয়ে সত্য বেশী ছিল।

তারপর সে সাজঘরে ফিরে অনেক কল্পনা করেছে। আসরে হাততালি পেয়েছিল—সেইটে তাকে জোর দিয়েছিল। কত রকম ভেবেছিল সে। ভেবেছিল কালই সে থিয়েটারে গিয়ে কর্তাদের হাতে পায়ে জড়িয়ে ধরবে। যত কম মাইনে হোক একটা চাকরী যোগাড় করবে সে। ছেড়ে দেবে মঞ্জরীর বাড়ির ঘর। খোলার চালের বাড়িতে গিয়েই থাকবে বস্তীতে। তাদের জীবনের এই তো শেষ ধ্রুব পরিণাম। কত কত রূপসী উর্বশী যৌবনে দোতলা তেতলায় খাটের উপর পা ঝুলিয়ে হীরে জহরতে সেজে নাচে গানে মদে মাতালে স্বপ্নলোকে কাটিয়ে প্রৌঢ় বয়সে সব হারিয়ে গেছে

বস্তীতে বাস করতে। তারপর একদিন মাথার চুল ছেঁটে হাত শুধু করে ভিক্ষে করেছে কতজনে। তাই যদি থাকে ভাগ্যে তাই করবে সে। গোপালীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল কাল। সমস্ত ক্ষণটাই দুজনে দুজনকে ঠেসিয়ে কথা বলেছে। রাজবাড়ির সাজঘর—তাই মুখোমুখি চুলোচুলি ঝড়গা হয় নি। রাত্রে বাড়ি গিয়ে ঘরে লুকনো মদ খেয়েছিল সে অনেকটা। ঘরের দরজা বন্ধ করেই সে আপন মনে আস্ফালন করেছে। উপরের ঘরে মঞ্জরী ছিল—তাকেই বলেছে কথাগুলো। প্রথমটা সাবধান করেছে, আপন মনে ছাদের দিকে মুখ করে বলেছে—বুঝবে, আজ না বোঝ—দশদিন বাদে বুঝবে। বুঝবে—ওই হুম্‌দো মাম্‌দো কী চিজ! অজগর! অজগরে শিকার ধরে আস্তে আস্তে গেলে—ও তাই গিলছে তোমাকে। পেটে পুরবে। তাও যদি তোমাকেই ভজে থাকত, জানতাম তাও হত। তা থাকবে না। থাকবার লোকও নয়। ওর নজর বয়সের দিকে।

এমনিতরো অনেক কথা। তারপর হঠাৎ সব আক্রোশ মঞ্জরীর উপরেই পড়েছিল।—তুমি? আর তুমি? বুঁচীদি, সেপটিপিনটা এঁটে দাও না ভাই। কেন? শোভার কথা যে আঁতে ঘা দিয়েছে। সতীসাধ্বীর কন্যে আমার সতীসাধ্বী। তোমার মন আমি বুঝি না। রাম ভজি, না কেষ্ট ভজি! রাতু মিনসে, না রানা লাহিড়ী! আঃ মরি মরি আমার! তা দুজনকে ভজলেই তো পার। এত লজ্জা কিসের? সতী শল্লা কাঁচ কল্লা!

বকতে বকতে সে পাশের ঘরের ভাড়াটে মেয়েটির ক্লকঘড়িতে তিনটে বাজা শুনেছিল। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। উঠেছিল নটার পর। উঠে মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হয়েছিল। অ্যাসপিরিন ঘরে থাকে, কিন্তু ছিল না। দোকান থেকে জিনিসপত্র এনে দেয় ঠিকে ঝি। তাকে দিয়ে অ্যাসপিরিন আনিয়ে খেয়ে ভাম্‌ হয়ে বসেছিল।

এ ঘর থেকে যদি মঞ্জরী তুলে দেয় সে কোথায় যাবে!

কাল রাত্রে জেদের বশে ঠিক করেছিল বস্তীতে গিয়ে থাকবে। মনে মনে স্মরণ করেছিল তাদের দলের কত বিগত রূপযৌবনা নাম-করা মেয়ে বস্তীতে থেকেছে, না খেয়ে মরেছে। হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়ি এসে শ্মশানে নিয়ে গেছে। কিংবা কর্পোরেশনের লোক এসে ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু কালকের জেদ আজ আর নেই। বলতে গেলে অনেকদিন আগেই তাকে বস্তীতে যেতে হত। তার ভালবাসার মানুষ যাত্রার দলের খ্যাতনামা গাইয়ে ছিল, সে সব উপার্জন তাকে দিত। তার জন্যই সে কম মাইনেতেও মঞ্জরী অপেরায় চাকরী নিয়েছিল। সে নিজে মঞ্জরীর মনোরঞ্জন করে চলত। গোরাবাবু খুশী হয়ে বলেছিল, তোমরা নিচের ঘরটায় থাক। এবং মনে মনে অন্তরে অন্তরে মঞ্জরীকে সত্যিই ভালবাসে। মঞ্জরীও অকৃতজ্ঞ নয়; গাইয়ে ঘোষালের মৃত্যুর পর সে তাকে দল থেকে বা ঘর থেকে তাড়াবার কথা মুখে আনে নি। কিন্তু কাল সে এ করলে কি! ছি ছি ছি! নিজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে ওপরে আকাশের দিকে তাকালে। মনে হল, গোটা সংসারটা এমনি খাঁ খাঁ করছে।

শিউনন্দন বাজার করতে গেল, বাজার করে ফিরে এল, তাকে দেখে বললে—কাল রাতে কি হইয়েছিল শোভাদিদি? ভূত চাপিয়েছিল কন্ধায়!

সে উত্তর দেয় নি, ঘরে ঢুকছিল।

কিছুক্ষণ পর রীতুবাবু এবং গোপাল এসেছিল মঞ্জরীর কাছে। কিছুক্ষণ পর গোপাল এসে ডেকেছিল—শোভা!

শোভার বুক ধড়াস করে উঠেছিল, বুঝেছিল এসেছে নোটিস। সে শুধু বলেছিল—অঁ্যা?

গোপাল ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলেছিল—একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম।

—কি?

—আজ পার্ট করবে তো ? না—

কথা কেড়ে নিয়ে শোভা বলেছিল—করব না কেন ?

তাই জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন মাস্টারমশাই। অর্থাৎ রীতুবাবু।

শোভার গলায় যেন কিছু একতাল ন্যাকড়ার মত আটকে গেছে। চীৎকার করে না কাঁদলে সেটা যেন বের হবে না। তবুও কোন রকমে বললে—কাল তো ওঁর পায়ে ধরেছি সকলের সামনে।

—আচ্ছা। তাহলে তাই বলি গে।

সে বলেছিল—আমি যাব ?

—আমি গিয়ে জিজ্ঞেস করি, যদি বলে তো ডাকব।

চলে গেল গোপাল। এরপর সারাদিন সে চেষ্টা করেছে, উপরে যায় মঞ্জরীর কাছে, তার হাতে ধরে বলে, তুমি মাফ করো ভাই। কিন্তু পারে নি।

এর মধ্যে রীতুবাবু চলে গিয়েছিল। মঞ্জরী উপরে একলাই ছিল, তবু পারে নি। এগারোটা নাগাদ বুঁচী এসেছিল, সে সিঁড়ি থেকে জিজ্ঞাসা করেছিল, শোভাদি, কি হচ্ছে ?

শোভার ইচ্ছে সত্ত্বেও তার সঙ্গে জুটে উপরে যেতে পারে নি। নীরস কণ্ঠে বলেছিল—কি হবে ভাই! বসে বসে অদৃষ্টের কথা ভাবছি।

মঞ্জরীও তাকে ডাকে নি। সে ভাবতে ভাবতে এর দিশে একটা পেয়েছে। তাতে সে শিউরে উঠেছে। সে বুঝেছে আজকের আসরে তাকে দিয়ে পার্টটা করিয়ে নিয়ে কাল তাকে বলবে তোমাকে দিয়ে চলবে না আর।

তারপরই হয় শিউনন্দন নয় গোপাল এসে বলবে—শোভা, ই ঘর সামনের মাস থেকে ছেড়ে দিতে হবে। ভয়ার্ত হয়ে উঠেছিল। একবার ভেবেছিল, মদ আনিয়ে মদ খায়। মদ খেলে সাহস পাবে। প্রচুর পরিমাণে মদ খেলে সে আজও সেই উন্মত্ত দেহব্যবসায়িনী হয়ে

ওঠে। যার কোন কিছুকে ভয় থাকে না, কোন কিছুতে সঙ্কোচ থাকে না—যে সব পারে। কিন্তু তাও সাহস হয় নি।

তার সুবুদ্ধি বলেছে, আর সর্বনাশ করিস নে নিজের। আবার এক সময় কৌতুকবোধ জেগে উঠেছিল, তখন বেলা চারটে, রীতুবাবু আবার ফিরে এসেছিল, সঙ্গে বাবুল বোস, আর রানা। সকলে তৈরী হয়ে এসেছে এখান থেকেই আসরে যাবে।

তক্তাপোশের উপর একটা টুল পেতে তার উপর উঠে দাঁড়িয়ে শুনতে চেষ্টা করেছিল ওদের কথাবার্তা। হাস্যপরিহাস কথাবার্তার মধ্য দিয়ে আসল সত্যটি বালির তলায় জলের মতন চলে। শোভা তার সন্ধান বালি খুঁড়ে পেতে জানে। বোতল গ্লাসের টুংটাং শব্দের জন্য সে উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল। মঞ্জরীর ঘরে বসে রীতুবাবু যেদিন মদ খাবে, সেই দিনই একেক্যে এক, অর্থাৎ এক একে এক হয়ে যাবে। দুই আর থাকবে না। ওই পাষণ্ড লোকটা তারই সুযোগ খুঁজছে সে জানে। মঞ্জরীও জানে। এবং মঞ্জরী যে একদিন আর একজনকে ধরবে, গোরাবাবুর জায়গায় বসাবে তাতে তো সন্দেহ নেই। কিন্তু বোতল গ্লাসের শব্দ পায় নি। সে বুঝতে পারছে মঞ্জরী মনে মনে টানছে রানা লাহিড়ীকে। রানা মদ খায় না—সিগারেট খায় না, তার জন্যেই সে ও আসর পাততে দিচ্ছে না। কিছুক্ষণ টুলের উপর দাঁড়িয়ে থেকে উৎসাহজনক কিছু না শুনতে পেয়ে সে নেমে পড়েছিল। ভাগ্যে পড়েছিল তাই রক্ষে, নইলে হয়তো পড়ে গিয়ে আছাড় খেত। কারণ নামবার পরমুহূর্তটিতেই রীতুবাবু ডেকেছিল—শোভা! তৈরী হয়ে নাও, বেরুবার সময় হল।

শোভার বুকটা ধড়ফড় করে উঠেছিল। সে প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে বাইরে এসে সাড়া দিয়ে বলেছিল—এই যে আমি, তৈরী হয়ে আছি।

—হ্যাঁ, গোপাল গাড়ি নিয়ে আসছে, তুমি দলের সঙ্গে চলে যাও।

—হুঁ। মুখ থেকে একটি 'হুঁ' শব্দ আপনি বেরিয়ে এল শোভার। এতকাল পর্যন্ত সে বড় অ্যাক্টর অ্যাক্‌ট্রেসদের সঙ্গে যেত। গোরাবাবু

যাওয়ার পর থেকে মঞ্জরীর সঙ্গে যেত সে বুঁচী শেফালী গোপালী। তাদের সঙ্গে থাকত শিউনন্দন। এবার থেকে সে যাবে সকলের সঙ্গে।

তাই এসেছে সে, আপত্তি করে নি। এবং এসে সর্বাগ্রে মেক-আপ করে একদিকে প্রায় চুপচাপ বসে আছে।

শেফালী জিজ্ঞাসা করলে—হয়েছে সকলের—বুঁচীদি, শোভাদি?

শোভা মুখ তুললে এবং অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে বললে—চোখের সামনেই তো সেজে বসে আছি ভাই।

শেফালী বেরিয়ে চলে গেল মেয়েদের ঘর থেকে।

ওদিকে ঘণ্টা পড়ল। কনসার্ট বাজছে।

* * *

প্রথমেই শেফালীর গান। মৃত্যু গান গাইছে, করুণ সুরে—একটি কালো কাপড়ের আবরণের মধ্যে আবৃতা।—

আমার বেদনা কেহ তো বোঝে না, আমি চির-অপরাধিনী।

আমাকে বিধাতা সৃষ্টি করেছেন বুকের নিধি অপহরণ করবার জন্য, তাই আমাকে করতে হয়। আমি কাঁদি—কিন্তু সে কান্নায় চোখে জল ঝরে না, কণ্ঠে স্বর বের হয় না—শুধু বুক আমার বিদীর্ণ হয়। মানুষ আমাকে অভিসম্পাত দেয়। আমি চির-একাকিনী চির-বিষাদিনী! হায়, কেউ কি আমাকে পরাজিত করে আমার হাত থেকে আপন প্রিয়কে নিয়ে যেতে পারে না!

দৈববাণী হল নারীকণ্ঠে—তোমার এ দুঃখ বেদনা আমি মোচন করব।

—কে তুমি মা?

—আমি সতী—আমি সৃষ্টির আদ্যা—আমি মহিমা।

মৃত্যু প্রণাম করে বললে—আমি তোমার প্রতীক্ষায় রইলাম মা। কত দিন? কত দিন অপেক্ষা করতে হবে?

—আজ হতে সতের বছর পর। আজ আমি সাবিত্রী রূপে পৃথিবীতে জন্ম নিচ্ছি।

নেপথ্যে সাজঘর থেকে শঙ্খধ্বনি হল। তারপরই আরম্ভ হল নাটক। আরম্ভের আগেই কিন্তু এই প্রস্তাবনাটিতেই দর্শকেরা অভিভূত হয়ে গেল।

তারপরই প্রথম দৃশ্যে ষোড়শী সাবিত্রী এসে ঢুকল পিতা অশ্বপতির রাজসভায়। বিনম্র পদক্ষেপে। অপরূপা দেখাচ্ছিল তাকে। সত্যিই তাকে ষোড়শী দেখাচ্ছিল। আকাশী রঙের পাড়হীন বুটিদার কাপড়, গাঢ় সবুজ রঙের ব্লাউস, আলুলায়িত চুল—সে এক পবিত্র মনোরমা মূর্তি।

তত্ত্বকথায় বইয়ের আরম্ভ। ষোল বছর অতিক্রম করবে সাবিত্রী এক সপ্তাহের মধ্যে। অতিক্রম করলেই শাস্ত্রানুযায়ী পিতৃপুরুষ নরকস্থ হবে। তারই আলোচনা। এমন আলোচনা বইখানির মধ্যে অনেক আছে। যম এবং সাবিত্রীর মধ্যে কথাবার্তা তো দর্শনের কথা। সকলেরই আশঙ্কা ছিল। ছিল না শুধু রীতুবাবুর। ষাট বছর বয়স হল—পয়ত্রিশ বছরের উপর যাত্রা করে বেড়াচ্ছে—সে এ দেশের শ্রোতাদের জানে। যখন বই পড়া হয় তখন বাবুল প্রশ্ন করেছিল—তাই তো বিগ ব্রাদার, ভেরী ভেরী হার্ড হল না?

রীতুবাবু বলেছিল—হোক হে, হোক।

বাবুল বলেছিল—আপনার একটা নিউ নেমকরণ করব।

—কি রকম?

—ডেন্টিস্ট ড্রামাটিস্ট।

—অস্যার্থ?

—পার্ট করতে করতে কাঁচা দাঁত নড়ে যাবে, নড়া দাঁত ব্রেক করে যাবে। ওই যোগাবাবুকে দিন মাণ্ডব্যের পার্ট। বুড়োর দাঁতগুলো পড়ে গেলে বাঁচবে বুড়ো।

যোগা বলেছে—বেশ মশায়, তারপর ফ-ফ করি, চাকরী যাক আমার।

শোভার সঙ্গে তখনও হাসি মস্করার দিন। শোভা বলেছিল—ওটা তুমি নাও মেনাহাতী। দাঁতগুলো ভাঙলে নতুন দাঁত বাঁধিয়ে নবযুবক হবে।

মঞ্জরীও বলেছিল—সহজ করা যায় না আরও মাস্টারমশাই ?

এবার একটু দমেছিল রীতুবাবু—সহজ ? সহজ করলে এর গাম্ভীর্য থাকবে না। তা হলে বাদ দিতে হয় এসব তত্ত্বকথা।

হঠাৎ বাবুলই বলে উঠেছিল—থাক বিগ্র ব্রাদার, থাক। দিজ আর নট কয়লাজ—পাথরের নুড়ি ভেঙে উনোনে আঁচ দেবে। হীরে হার্ডই হয়। তা বলে নো বডি থ্রোজ ইট অ্যাওয়ে। যে চেনে না সেও ঝকমকানি দেখে—ঠাকুর বলে পুজো করে। থাক।

রানা লাহিড়ীও বলেছিল—থাক না। পরে বাদ দিলেই হবে।

বাবুল বলেছিল—না হয় ঝড়ের মত বলে যাবে। ঝড়ের মত। হাঁ করে চেয়ে থাকবে লোকে। কানে যা শুনবে তা ঝড়ের গোঁ-গোঁ গোঙানী, যার মানে নেই—হয় না। মীনিংলেস। শুনে শুধু বলবে—বা বাঃ! ভাববে কি ব্যাপার ? অর্থাৎ সামথিং ভেরী সাংঘাতিক। জমে যাবেই। বিগ ব্রাদার, বলুন না—সেদিন যা বলছিলেন।

রীতুবাবু হেসে বলেছিল—সে একবার মফস্বলে পর পর প্লে হচ্ছে। সে অনেক দিনের কথা—তখন লোকে সোসাল প্লে পছন্দই করত না। আমি আর রমেশবাবু গিয়েছি ভাড়া খাটতে। প্লে ঝুলছে—কিছুতে জমছে না। হঠাৎ রমেশবাবু বললে, দাঁড়াও। সেটা সেই বেশ্যা বাড়িতে ব্যাটেল অব এজিন কোটের বছর নিয়ে ঝগড়া। উনি মাঝখানে উঠে দুজন ঝগড়ার লোককে ধমক দিয়ে থামিয়ে আরম্ভ করলেন রঘুবীরের বক্তৃতা—উত্তাল তরঙ্গময়ী ফেনিলা নর্মদা—ফেনিল রাক্ষসীমুখে তুলিয়া হুঙ্কার কার পানে ছুটিয়াছে উন্মাদিনী ?—সে ওয়াণ্ডারফুল এফেক্ট। যে ঢুলছিল সে সোজা হয়ে বসল, যে ঘুমুচ্ছিল তাকে খোঁচা দিয়ে তুলে পাশের লোক বললে, ওঠ ওঠ, শোন। তারা ধড়মড় করে উঠে বসল।

সকলেই হাসতে লাগল। রীতুবাবু বললে—বাবুল ব্রাদার ঠিক বলেছে—মাণ্ডব্য নাটু—আর সত্যবান রানাবাবু—একটু ফিলিং দিয়ে পার্ট বলবেন। মনে হয় জমে যাবে।

আজ অভিনয়ের আসরে দেখা গেল—সত্যিই তাই। বরং যেন ফিলিং কম হলেই জমছে আরও বেশী। লোকে মানে বুঝতে চাচ্ছে এবং তত্ত্বকথা অপছন্দ করছে না। ওই যে প্রস্তাবনা সিনে শেফালীর গানে আর দৈববাণীতে বই ধরল তা আর ঝুলল না। মৃত্যু কাঁদছে এবং সে হার মানতে চাচ্ছে জীবনের কাছে—মানুষের কাছে—এতেই মানুষের মন নিবিষ্ট হয়ে গেল। তারপর ষোড়শী সাবিত্রীর মিষ্ট ধীর কথা—শান্ত দৃঢ় পদক্ষেপে মানুষকে শান্ত অথচ সম্ভ্রমপূর্ণ একটি মোহে আবিষ্ট করে তুললে। সে শান্তকণ্ঠে যখন বললে—পিতা, আপনার চরণ স্পর্শ করে এই মুহূর্তে আমি যাত্রা করলাম। আমার যিনি বিধাতা-নির্দিষ্ট স্বামী তাঁর যদি এই সপ্তাহ মধ্যে দেখা পাই তবে এ গৃহে প্রত্যাবর্তন করব—অন্যথায় এই শেষ দেখা পিতা—আমি আর ফিরব না, জ্বলন্ত চিতায় জীবন আহুতি দেব।

ওই প্রথম দৃশ্যেই লোকের চোখ সজল হয়ে উঠল। হাততালি পড়ল না—বারান্দার বিশিষ্ট দর্শকেরা সাধুবাদ জানালেন। যুদ্ধের উত্তেজনা নেই, হৈ হৈ নেই—শান্ত বিষণ্ণ একটি পরিণামের দিকে বইখানি চলেছে—প্রসন্ন পবিত্র একটি ধারার মত। বড় ভাল লাগল লোকের।

বইখানা চতুর্থ অঙ্কের মাঝে এসে অদ্ভুত হয়ে জমে গেল। বিষয়বস্তু যেন একটা মহিমা সঞ্চারিত করে দিল।

এ সেই দিন যে দিনে সত্যবানের মৃত্যুতিথিতে সত্যবান রাত্রিকালে ঘরে যজ্ঞকাষ্ঠ নেই দেখে সেই রাত্রেই যজ্ঞকাষ্ঠ আহরণের জন্য কুঠার নিয়ে বের হচ্ছেন। সাবিত্রী অবৈধব্য ব্রত করে ত্রিরাত্রি উপবাসী রয়ে যেন ত্রিনেত্র প্রসারিত করে চেয়ে রয়েছেন সেই ভয়ঙ্কর ক্ষণের দিকে। তিনি অন্ধ শ্বশুরের কাছে এসে গলবস্ত্র

হয়ে এই রাত্রে স্বামীর অনুগামিনী হবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। বললেন, আজ রাত্রি আমার ব্রত উদ্‌যাপনের রাত্রি—এ রাত্রে স্বামীর সঙ্গে আমাকে থাকতেই হবে। এই নিয়ম।

শ্বশুর অনুমতি দিতে বাধ্য হলেন। বনপথে প্রবেশ করলেন সাবিত্রী সত্যবান। সাবিত্রীর অপলক দৃষ্টি সত্যবানের মুখের দিকে নিবদ্ধ! কোন ছায়া কি পড়ছে তাঁর সুন্দর মুখের উপর! পায়ে কাঁটা বিঁধছে ভ্রূক্ষেপ নেই। হঠাৎ সত্যবান এটা লক্ষ্য করে তাকে বললেন, এমন করে আমার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি দেখছ সাবিত্রী!

ক্লান্ত বিষণ্ণ হেসে সাবিত্রী বললেন, আপনাকেই প্রভু।

সত্যবান হেসে বললেন. আমার এ মুখের দিকে তো দেখি অহরহই তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। নিশীথরাত্রে জেগে উঠে দেখি. তুমি নিষ্পলক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছ। দিনের বেলা দেখি আমি কর্ম করি—তুমি দূর থেকে আমার দিকেই তাকিয়ে আছ। বনে যাই ফল সংগ্রহে, বনে প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে দেখি তুমি আমার গমনপথের দিকে তাকিয়ে আছ। আবার বন থেকে ফিরি অপরাহ্ণ বেলায়, আশ্রম প্রবেশপথে দেখতে পাই তুমি দাঁড়িয়ে আছ পথের দিকে তাকিয়ে। পথের বাঁকটি ফিরতেই তোমার দৃষ্টি আমার দৃষ্টিতে পড়ে যেন প্রদীপের মত জ্বলে ওঠে। আজ এই কৃষ্ণাচতুর্দশীর তমসার মধ্যেও তোমার দৃষ্টি আমার মুখে। পথের কাঁটা তুমি অবলীলাক্রমে মাড়িয়ে চলেছ। তোমার ক্লান্তি হয় না?

সাবিত্রী স্বগত-উক্তি করলেন, কি দেখি তা যদি তুমি জানতে প্রিয়তম!

—সাবিত্রী?

এবার মাথায় একটু ঘোমটা টেনে যেন ঈষৎ সলজ্জ হয়ে মঞ্জরী বলেছিল—প্রভু, কাব্যশাস্ত্রে পড়েছি চন্দ্র একবার চকোরীকে ঠিক

এই প্রশ্নই করেছিলেন। প্রিয়া চকোরী, তোমার আমার সৃষ্টির আদিকাল থেকে দেখছি, রাত্রে তুমি নিদ্রাহীন হয়ে ঊর্ধ্বমুখে আমার দিকে চেয়ে আকাশে পাখা মেলে ভেসে রয়েছ। তোমার কি নিদ্রা আসে না? ক্লান্তি বোধ হয় না? চকোরী বলেছিল, ওগো প্রিয়, যে দিন তোমার ওই মুখ দেখলাম সেই দিনই তোমার রূপবহ্নিতে আমার চোখের নিদ্রা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আর ক্লান্তি? তোমার মুখের হাসিতে যে অমৃত ঝরে সেই অমৃত আমি অহরহ পান করছি—ক্লান্তি কেমন করে আসবে বল!

আশ্চর্য। লোকে একেবারে 'বাঃ বাঃ' ধ্বনি তুলে যেন বিভোর হয়ে পড়েছিল।

তারপর যমের সঙ্গে সাবিত্রীর দৃশ্য। যম এসে দাঁড়ালেন। সাবিত্রী প্রণাম করে বললেন, কে প্রভু আপনি—অপরূপ ভীমকান্তি! সর্বাঙ্গে অমৃতধারা! দুর্নিরীক্ষ্য কৃষ্ণবর্ণ অথচ উজ্জ্বল জ্যোতির্ময়! প্রসন্ন গম্ভীর—ধীর—! কে আপনি প্রভু!

যম বললেন, সাবিত্রী, আমি মৃত্যু-অধিপতি যম, মৃত্যুর আমি অধিপতি তাই আমার কান্তি ভীমকান্তি, অমৃতের ভাণ্ডারী আমি, তাই আমার অঙ্গে অমৃতধারা—আমি সকল ধর্ম, সকল নিয়মের কেন্দ্রে দণ্ডস্বরূপ অবস্থান করি—তাই আমি ধীর গম্ভীর। নিয়ম এবং আমি অভিন্ন—তাই যম। সাবিত্রী, তুমি পুণ্যবতী, তপস্বিনী; তোমার অশেষ পুণ্য। তাই তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ। অন্যথায় জীবজগতের দৃষ্টিপথে আমি শুধু ঘন অন্ধকার, দুর্ভেদ্য তমসা। মহাভয়ঙ্কর! সত্যবান সত্যপালনে স্থির ছিল, সেও পুণ্যবান—তবুও ধনী নির্ধন, গুণী অগুণী, পণ্ডিত মূর্খ, জগতের অমোঘ নিয়ম জন্ম এবং মৃত্যুর অধীন—সেই অমোঘ নিয়মে সত্যবান আজ মৃত্যুর অধীন হয়েছে। আমি তার প্রাণপুরুষকে গ্রহণ করতে এসেছি। ভদ্রে, তুমি শোকে বিমূঢ়া হয়ো না; দেহখানি পরিত্যাগ কর—আমি সত্যবানের প্রাণপুরুষকে গ্রহণ করি।

ধীরে সাবিত্রী সরে দাঁড়ালেন। যম সত্যবানের প্রাণপুরুষকে গ্রহণ করে চলতে লাগলেন। সাবিত্রী অনুসরণ করলেন তাঁর। হঠাৎ যম ফিরে তাকিয়ে চমকে উঠে বললেন, এ কি সাবিত্রী! তুমি আমার অনুসরণ করে কোথায় চলেছ? আমার গতি নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্য দিয়ে। কোন জীবের চক্ষু সে অন্ধকার ভেদ করতে পারে না। তুমি যে এটুকু আসতে পেরেছ সে আমি তোমাকে স্নেহের চক্ষে দেখেছি বলে এবং আমার সঙ্গে তুমি রয়েছ বলে। ফের মা—ফের। অবুঝ হয়ো না।

সাবিত্রী বললেন, প্রভু, শাস্ত্রে আছে ত্রিপাদ একসঙ্গে বিচরণ করলে বন্ধুত্ব হয়। আপনার সঙ্গে ত্রিপাদেরও অধিক পাদ ভ্রমণ করে আপনার বন্ধুত্বলাভে ধন্য হয়েছি। দেখতে পাচ্ছি সেই কারণে আপনি আমাকে স্নেহ করতে বাধ্য। শুধু বন্ধুত্বের কারণেই নয়, আমার পুণ্যবলে। নয় কি ধর্মরাজ?

—হ্যাঁ মা, হ্যাঁ। তুমি মূর্তিমতী পুণ্য, মূর্তিমতী বিদ্যা। আমি তোমার উপর তুষ্ট হয়েছি। তোমাকে বর দিতে চাই। নাও মা, কি বর নেবে। সত্যবানের প্রাণ ছাড়া আর যে কোন বর তুমি চাইবে, পাবে। নাও।

অসাধারণ বাক্‌যুদ্ধ। শাস্ত্রকথা। তত্ত্ব—শুধু তত্ত্ব। যম রীতুবাবু, সাবিত্রী মঞ্জরী। দুজনের বাক্‌যুদ্ধ মানুষ শুনলে রুদ্ধশ্বাস হয়ে। একটি ছুঁচ পড়লে শোনা যায় এমন স্তব্ধতার কথা মিথ্যা নয়। সেই স্তব্ধতার মধ্যে শুনলে লোকে। এক-আধবার কোন বাচ্চা হঠাৎ কেঁদে উঠলে তার মা তাকে মুখ চাপা দিয়ে নিয়ে উঠে গেল।

পরিশেষে মৃত্যুপুরীর দ্বারে প্রবেশোদ্যত যম দাঁড়ালেন। সাবিত্রী পিছন থেকে ডেকে বললেন, ধর্মরাজ!

যম তাঁকে সত্যবানের ঔরসে শতপুত্রের জননী হবার বর দিয়ে চলে এসেছেন। ভেবেছেন নিষ্কৃতি পেয়েছেন। কিন্তু ডাক শুনে

চমকে উঠলেন যম, এ কি সাবিত্রী! তুমি যে আমাকে নিষ্কৃতি দিয়েছ মা!

—আমি দিয়েছি কিন্তু আপনি নিচ্ছেন কই নিষ্কৃতি।

—ফিরে যাও মা—এখুনি আমি পুরঃপ্রবেশ করব। আর মহা অন্ধকারে তুমি নিজেকে হারিয়ে ফেলবে।

—পুরঃপ্রবেশ আপনি করতে পারবেন না ধর্মরাজ!

—কি বলছ? আমি পুরঃপ্রবেশ করতে পারব না?

—না। ভেবে দেখুন, আপনি ধর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত—নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আপনার দ্বারা বিশ্বভুবন নিয়ন্ত্রিত। আপনি আমাকে বর দিয়েছেন—সত্যবানের ঔরসে আমি শতপুত্রের জননী হব। অথচ ওই প্রাণপুরুষকে আপনি হরণ করছেন। এতে আপনার বাক্য ব্যর্থ হবে। আপনি মিথ্যাবাদী হয়ে ধর্মচ্যুত হতে চলেছেন। ধর্মরাজ, ওই ধর্মপুরী—ও কিন্তু ধর্মহীন হবে না। আপনার সম্মুখে সিংহদ্বার আর খুলবে না। ওখানে আপনার আর প্রবেশাধিকার নাই।

থরথর করে কেঁপে উঠলেন যম। নতজানু হয়ে বসে বললেন—মা, মা—কে তুমি?

সাবিত্রী বললেন, আমি সত্যবানের প্রিয়তমা—শাস্ত্রে আমার নাম সাবিত্রী। ধর্মরাজ, আমি সেই চিরন্তনী সতী। আমার অস্তিত্বেই তোমার অস্তিত্ব। তুমি ধর্মরাজ ধর্মহীন হতে চলেছিলে—ওই পুরে প্রবেশাধিকারচ্যুত হচ্ছিলে। তোমাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে আমি এতদূর এসেছি। সত্যবানের প্রাণপুরুষ আমার হাতে অর্পণ করে তুমি ধর্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হও।

ধর্মরাজ তাঁর হাতে দিলেন প্রাণপুরুষ। একখানি নীল রুমালে মোড়া কিছু একটা শক্ত বস্তু সেটা।

সাবিত্রী বললেন, ওই তোমার পুরীর সিংহদ্বার উন্মোচিত হল—

আমি সানন্দে বলছি তোমার অধিকারে তুমি অধিষ্ঠিত হও। পুরে প্রবেশ কর।

ধর্মরাজ বললেন, জয় সতী, জয় সতী, জয় সতী।

ঠিক এই মুহূর্তটিতে মৃত্যুরূপিণী শেফালী এসে হাত জোড় করে নতজানু হয়ে বসে বললে—আজ আমি ধন্য, আমি মৃত্যু, আমি অমৃতে পরিণত—হে মহাদেবী, তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ কর।

মৃত্যু বললে, আজ উন্মোচিত হোক তোমার কৃষ্ণাবরণ—। অমৃতরূপিণী অপরূপা মৃত্যু, তুমি আনন্দময় রূপে প্রকাশিত হও।

খুলে ফেললে কৃষ্ণাবরণ শেফালী।

তপস্বিনী কুমারীবেশিনী শেফালীকে ভারী ভাল মানিয়েছিল। চারিদিক থেকে সাধুবাদ উঠল। সকলের চোখে জল।

মঞ্জরী, রীতুবাবু, শেফালী সাজঘরে ফিরে দেখলে দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে আছেন বাকুলিয়ার দেবেনবাবু।

বললেন—বড় ভাল, বড় ভাল অভিনয় হয়েছে। প্রচুর আনন্দ পেয়েছি।

মঞ্জরী কিন্তু দাঁড়াল না। সে এসে তার মেক-আপ টেবিলের উপর মাথা রেখে যেন ভেঙে পড়ল। একটা আবেগ যেন তার বুকের ভিতর থেকে ঠেলে ঠেলে উঠছে। এক রুদ্ধ ক্ষোভ বা অভিমান বা এমনি একটা কিছু আজকের এই অসাধারণ সাফল্যে ফেটে ছড়িয়ে পড়েছে। এবং তার সব শক্তি নিঃশেষিত করে দিয়েছে। তার উপর সে আজ সারাটা দিন কিছু খায় নি। সাবিত্রীর পার্ট করবে বলেই খায় নি। কয়েকজন বড় গায়িকার এই ধরনের উপবাসের কথা শুনেছে। তার দিদিমাও কীর্তনের দিন আসর না ভাঙা পর্যন্ত কিছু খেতেন না। তা ছাড়াও একটু গোপন কথা আছে—যেটা একমাত্র শিউনন্দন ছাড়া আর কেউ জানে না। সে কাল রিজিয়ার পার্ট করে বাড়ি ফিরে দু-হাতে মাথা ধরে বসেছিল। ঘুমোয় নি। কেবল ভেবেছিল—কেন আজ

তার এমনটা হল? রিহারস্যালে তো হয় নি। আজ আসরে—? কারণ ওই শোভার ব্যাপারটাই বার বার মনে হয়েছিল। কি কুৎসিত মন! কি কদর্য দৃষ্টি! সারাটা দলের লোকের মাঝখানে একেবারে কেচ্ছা কেলেঙ্কারির অন্ত রাখলে না। এক সময় রাগ হয়েছিল নিজের ওপর। কেন সে নিজে এমন ভাবে দমে গেল? লজ্জা পেলে? কিসের লজ্জা? এতে তার লজ্জার হেতুটা কি? সে কুল-কামিনী নয়। সেও কীর্তনওয়ালী রাধারাণীর মেয়ের মেয়ে, তুলসীর মেয়ে। তার মা, তার দিদিমা যা করে গেছে—তা করতে তারই বা লজ্জা কোথায়? লজ্জা কেন?

সে নিজে তো গোরাবাবুকে ছাড়ে নি। ছেড়েছে গোরাবাবু। অলিকে নিয়ে তাকে ছেড়েছে। সেই বা আর কাউকে নিয়ে জীবন বাঁধবে না কেন? আর একজনকে নিয়ে সে আবার নতুন করে জীবন বাঁধবে। মঞ্জরী অপেরা চালাবে। আর অনেক গুণে ভাল করে চালাবে। যাত্রাদলের নাট্যসাম্রাজ্ঞী মঞ্জরী দেবী! যেমন হয়েছিল তারাসুন্দরী থিয়েটারে। মনটা প্রসন্ন হতে চেয়েছিল—কিন্তু ঠিক পারছিল না। হঠাৎ একসময় উত্তেজনাবশে উঠে গিয়ে একটা বাক্স হতে খুঁজে বের করেছিল বিলিতী মদ। গোরাবাবু কিছু বিলিতী মদ কিনে বাড়িতে রাখত। কখনও কখনও খুব বিলাস করে খেত। এ মদ মঞ্জরীও মধ্যে-মাঝে ওষুধের মত খেয়েছে। কচিৎ কখনও গোরাবাবুর শখের চাপে তার সঙ্গে বিলাস করেও খেয়েছে। একটা বোতলে প্রায় সিকি বোতল ছিল। আর একটা পুরো বোতলও ছিল। সিকি বোতলটা বের করে সে সন্তর্পণে গ্লাসে ঢেলে জল মিশিয়ে খেয়ে নিয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাথা তার টনটন করে উঠেছিল। কান দুটো হয়ে উঠেছিল গরম। নিশ্বাসও তাই। নিচে শোভা বকছে, কুৎসিত কথা বলছে, তাও শুনতে পেয়েছিল সে। চেঁচিয়ে সে তার জবাব দেয় নি

কিন্তু বিছানায় শুয়ে মৃদু স্বরে হাসতে হাসতে তার জবাব দিচ্ছিল এবং শুনছিল সে নিজেই।

—হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। বেশ করব, খুব করব। করব, ওই রীতু-বাবুকেই সর্বময় কর্তা করব। তোমার লোভ জানি। তুমি পাবে না মণি, তুমি পাবে না।

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লেগেছিল—রীতুবাবু, না রানা লাহিড়ী!

—রানা—

—না, রানা পালাবে—ওই গোরাবাবুর মতই পালাবে।

—না। রানা যদিন থাকে! যদিন তাকে পাই! ছেড়ে যেতে দেব না।—উঠে আবার খানিকটা মদ খেয়ে নিয়েছিল। গাঢ়তর নেশার মধ্যে তার অন্তরের মধ্যে জেগেছিল আদিম বহু-বল্লভা। দুজন—দুজনকে নিয়েই সে খেলবে। হেসেছিল সে খিল খিল করে। হাসছিল। হঠাৎ কার গলার সাড়ায় চমকে উঠেছিল।

—কে?

—হাম। শিউনন্দন। কি হইল গো তুমার! আঁ?

—কুছ না। তু যা। নিদ যা।

বুকখানা ধড়াস ধড়াস করছিল। তারপর সে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু সকালে উঠে তার আর মানসিক গ্লানির শেষ ছিল না। নিজেকে ছি-ছি করে সারা হয়েছিল। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেও লজ্জা হচ্ছিল।

শিউনন্দন এসে বলেছিল—ই তুমি কি কিয়া রাতমে? আঁ? বাচপনসে তুমাকে মানুষ করলাম, তুমারি পর বহুৎ হামার মায়া—ওহি লিয়ে দুখ হামার। না—এসা মাৎ করো। মাৎ খাও। এই হোগা তো হম চলা যায়েগা।

ক্লান্তি এবং লজ্জায় যেন ভেঙে পড়ে সে বলেছিল—না, আর কখনও খাব না শিউনা। কখনও না। দেখিস—

—আব আস্নান কর। আচ্ছাসে আস্নান কর।

—তুই একটা রিক্‌শা ডাক, গঙ্গাস্নান করে আসি।

গঙ্গাস্নান করে ঘাট থেকে ফুল কিনে সে ফিরে অনেকক্ষণ পূজো করেছিল। এবং ওই আসনে বসেই ঠিক করেছিল যে—সে আজ কিছু খাবে না।

শিউনন্দন তাকে পুরো উপোস করতে দেয় নি, কিন্তু যা খাওয়াতে পেরেছে সে সামান্যই। কিছু মিষ্টি আর ফল, আর দুধ। এ ছাড়া কয়েক কাপ চা। এবং গতরাত্রের অনুশোচনার সঙ্গে একটি ধ্যানও যেন পেয়েছিল মনের মধ্যে।

সারাটা অভিনয়ের আসরেও তার সেই ধ্যানটি জাগ্রত ছিল। অভিনয় শেষে সার্থকতার পরম উল্লাসের মধ্যে কোথা থেকে এসে যোগ দিল একটি হাহাকার। যার জন্য তার কান্না পাচ্ছিল।

মাথা হেঁট করে মেক-আপের টেবিলের উপর রেখে সে চোখ বুজলে। কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল—আর কয়েকটা দীর্ঘশ্বাস।

বোজা চোখের ভিতর যে কল্পনার দৃষ্টি আছে সেই দৃষ্টির সামনে ছবি ভেসে উঠল। রানা লাহিড়ী! গোরাবাবু! রীতুমাস্টার! যমবেশী রীতুমাস্টার বক্তিয়ার হয়ে যাচ্ছে যেন! তারপর সব অন্ধকার। তার মধ্যে কয়েকটা ছুটন্ত আলোকবিন্দু। তারপর সব অন্ধকার। সব স্তব্ধ। গভীর নিথরতার মধ্যে ডুবে গেল।

তার এ অবস্থা আবিষ্কার করলে বুঁচী। এ কি, মঞ্জরীর যে সাড়া নেই! সে ছুটে এল পুরুষদের ঘরে।

তখন বাবুল বাইরে তার বোতলটা শেষ করে সাজঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলছে—মঞ্জরী অপেরা হ্যাজ ওয়ান দি ম্যাচ। লঙ লিভ মঞ্জরী অপেরা। চ্যালেঞ্জ টু গোরালি অ্যাণ্ড কোং—

অর্থাৎ গোরা ও অলি।

বুঁচী বললে—রীতুবাবু, গোপাল মামা, মঞ্জরী অজ্ঞান হয়ে গেছে।

শিউনন্দন মঞ্জরীর জন্যই চা নিয়ে ঢুকছিল, সে বলে উঠল—

ইয়ে দেখো, তামাম দিনভর উপোস করলে, কিছু খাইলোনা, হামি বারণ করলাম। পানি—পানি—পানি—

চায়ের কাপটা রেখে সে ছুটে গেল জলের জন্যে।

সকলে চকিত হয়ে উঠল—সারাদিন উপোস করে আছে!

সতেরো

মঞ্জরীর জ্ঞান হতে খুব দেরী হয় নি। চোখে মুখে জল দিতেই চেতন হয়েছিল। তার আর লজ্জার সীমা ছিল না। বারবার বলেছিল—না না, ও কিছু নয়। মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। এবার আমি ঠিক হয়েছি।

রীতুবাবু নাড়ী দেখে বলেছিল, পাল্‌স্‌ উইক রয়েছে। কি কাণ্ড বলুন দেখি! সারাদিন না খেয়ে আছেন। একটা কথা রাখুন।

—বলুন।

—আউন্সখানেক ব্রাণ্ডি—

—না না না! শিউরে চমকে উঠেছিল মঞ্জরী।

বাবুল এসে অকস্মাৎ হেঁট হয়ে তাকে প্রণাম করে বলেছিল—আজ থেকে ইউ আর মাই 'ওন' দিদি।

বাইরে থেকে যোগানন্দ এসে বললে—মুখার্জীবাবু। এখনও দণ্ডায়মান।

মুখে একমুখ হাসি যোগাবাবুর। বাকুলের বায়না।

রীতুবাবু বেরিয়ে গেল এবং ফিরে এল মুখার্জীবাবুকে নিয়ে। তিনি মঞ্জরীকে বললেন—উপোস করে পার্ট করেছেন। তাই এমন পবিত্র সুন্দর হয়েছে। খুব সুন্দর হয়েছে। বড় আনন্দ পেয়েছি। ব্রাহ্মণ, বয়স হয়েছে, আশীর্বাদ করে যাচ্ছি আর বাকুলের বায়না দিয়ে যাচ্ছি। যেতে হবে।

মঞ্জরী উঠে তাঁকে প্রণাম করলে।

বাকুলিয়া। বাকুলিয়া থেকে দল আবার গিয়ে বাসা নিলে আসানসোলে। রীতুবাবু লোক পাঠালে সাহেবদের কলিয়ারীতে, ওখানকার বড়বাবুর কাছে এবং বরাকর বাজারে। নতুন মঞ্জরী অপেরা আগের থেকেও ভাল গাইছে। একরাত্রি গাওনা করে দেখাতে চায়।

দেবেনবাবুর কথাই সত্য হয়েছে, বাকুলিয়াতে রিজিয়ার অভিনয়ে রাজবাড়িতে প্রথম অভিনয় আসরের ত্রুটিগুলি শুধরে গিয়েছিল। রিজিয়াতে রীতুবাবুর অভিনয় হয়েছিল সব থেকে ভাল। রানা লাহিড়ী—নিউ স্কুল—লেখাপড়া জানা—বেশ একটু দেমাকে লোক, সেও বলেছিল, অদ্ভুত করেছেন আপনি! অদ্ভুত!

শোভা আছে। শোভার জবাব হয় নি, মঞ্জরী দিতে দেয় নি। কিন্তু শোভার অভিনয় প্রথম রাত্রে ভাল হয়েছিল, এখানে তেমন হল না।

মঞ্জরী প্রথমটা আরম্ভ করেছিল অতিসুন্দর। বলতে গেলে প্রথম সিনে কিশোরবেশী রিজিয়ার যে কৌতুকপরায়ণতা আছে, চাপল্য আছে বিজয়সিংহের সঙ্গে, সে ধরনের পার্ট তার পক্ষে নতুন। তবুও এখানটা করেছিল সে বড় ভাল। যৌবনচাপল্যে জীবনস্বপ্নে সে যেন হাওয়ায় ভেসে বেড়ালে। দ্বিতীয় দৃশ্যে বিজয়সিংহকে জয় করে বেরিয়ে গেল সত্যই সাম্রাজ্ঞীর মত। প্রতি পদক্ষেপে তার অভিনয় জীবন্ত হয়ে উঠল। বিজয়সিংহের সঙ্গে প্রণয়স্বপ্ন নিয়ে একটি সলিলকি ছিল, সেটি সে এমন আবেগ দিয়ে সুরেলা আবৃত্তি করলে যে আসরে 'বাঃ বাঃ' ধ্বনি উঠে গেল। কিন্তু এর পরই উঠল একটা তীক্ষ্ণ মর্মান্তিক চীৎকার, তার সঙ্গে বক্তিয়ারের হিংস্র গর্জন। চমকে উঠল রিজিয়া। ডাকলে বক্তিয়ার। বক্তিয়ার রক্তাক্ত ছুরি হাতে প্রবেশ করলে। সে ওই কথাগুলি শুনে উন্মত্ত হিংস্র হয়ে একটা খোজাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে। বক্তিয়ারের সঙ্গে এইখান থেকেই রিজিয়ার বিরোধ শুরু হল। এইখান থেকেই রীতুবাবু যত

উঠল মঞ্জরী তত উঠতে পারলে না। বরং যেন দুর্বলই হয়ে গেল। তারপর রিজিয়াকে হত্যা করে বক্তিয়ারের সে বিলাপ—বুক চাপড়ানো অভিনয় মানুষের মনকে যত করলে বিচলিত, তত হল বিস্ময়ে অভিভূত। এ এক আশ্চর্য শোক। যত করুণ তত বর্বর।

অনেকে বললে—এ এক শিশিরবাবু আর অহীনবাবু ছাড়া কেউ পারে না। দোষের মধ্যে বড় লাউড। একটু ক্রুড।

আসর থেকে সাজঘরে এসে রীতুবাবু অনেকক্ষণ হাঁপিয়েছিলেন। বড়দিন, শীত প্রবল, তার মধ্যেও ঘাম হয়েছিল তাঁর। বাবুল তাকে বাতাস করেছিল। তারপর একটা বড় গ্লাস সামনে ধরে বলেছিল—খান। ওয়াণ্ডারফুল! অত্যাশ্চর্য! সাবাস! মাই লর্ডও এমনটা পারত না। এগেন চ্যালেঞ্জিং গোরালি অ্যাণ্ড কোং।

যাত্রাদলের ছেলেগুলো পর্যন্ত বিস্ময়দৃষ্টিতে রীতুবাবুকে দেখছিল। নায়কপক্ষ হতে দু-তিনজন এসে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন।

দেবেনবাবু বলেছিলেন—আবার কাল দেখবে সাবিত্রী। সে আর এক বস্তু, আর এক স্বাদ! আ—হা—হা!

কথা মিথ্যে হয় নি তাঁর। সাবিত্রী সেদিন আরও ভাল হয়েছিল। মঞ্জরী কথা শোনে নি কারও, উপোস করেই ছিল অভিনয়ের জন্য। অবশ্য ফল দুধ সেদিন ভাল করেই খেতে হয়েছিল। বাবুল রীতুবাবু দাঁড়িয়ে থেকে খাইয়েছিল।

সারা অভিনয়টি একটি অতি মনোহর স্বপ্নময় কাব্যকথা। মৃত্যু কাঁদে মানুষের মৃত্যুর জন্য। প্রিয়ার কাছ থেকে প্রিয়কে কেড়ে নিতে কাঁদে; মায়ের কোল থেকে ছেলেকে নিতে কাঁদে। প্রতিটি তৃণকণার মৃত্যুর জন্য তার বেদনা। সে প্রার্থনা করে কবে কোন্ মানুষের তপস্যার ফলে তার কাছে তাকে হার মানতে হবে, তার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় রয়েছে, অশ্রুধারার বিরাম নেই। কিন্তু সে কবে আসবে!

সে এল। সে এক অপরূপা রূপসী।

বিশ্বের আদ্যাশক্তি। তিনি সাবিত্রী। সত্যবানের প্রিয়তমা।

এই মিথ্যার সংসারে, মিথ্যার পাপে চক্রান্তে সত্যবানের ঘটে অকাল-মৃত্যু। সাবিত্রীর তপস্যায় মৃত্যু হার মানে, সত্যবান বেঁচে ওঠে। এ এক আশ্চর্য স্বপ্নকল্পনা। এবং এ কল্পনা অপরূপ মর্মঢালা অভিনয়ে জীবন্ত সত্য হয়ে উঠল। অন্ন এমন একটা বস্তু যা না খেয়ে অন্য যা কিছু খেয়ে নিক না কেন, অন্নের রস সঞ্চার করে না। এবং উপবাস করেছি এই চেতনাও একটা ক্রিয়া করে। তারই ফলে মঞ্জরীর অভিনয়ের মধ্যে ফুটে উঠেছিল একটি পবিত্র মহিমা। দর্শকেরাও কানাকানি করেছিল উপবাস করে অভিনয় করছে। সহ-অভিনেতা দর্শক সকলের মনে এরও একটা ক্রিয়া ছিল যা জাগিয়েছিল একটি সম্ভ্রম এবং অনুকূল মনোভাব। সব মিলিয়ে 'সাবিত্রী' অভিনয় হয়ে উঠল আশ্চর্যরূপে সার্থক। দর্শকেরা কাঁদল। মঞ্জরীর নিজের চোখেও জল পড়ল। যখন সে তার হাতে ফিরে পেলে যমের দেওয়া নীল সিল্কের রুমালখানি—সত্যবানের প্রাণ পুরুষের প্রতীক!

অভিনয় শেষে সে এসে আবারও টেবিলের উপর মাথা রেখে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। মেয়েরা বুঁচী শোভা শেফালী গোপালী উৎকণ্ঠিত ভাবে তার পাশে দাঁড়িয়ে রইল এই সময়টুকু। হঠাৎ এক সময় শোভা এসে তার পিঠের এলানো চুলের উপর হাত রেখে ডাকলে—মঞ্জরী!

মঞ্জরী সাড়া দিলে—উঁ।

—শরীর খারাপ করছে না তো?

—না। ঠিক আছি শোভাদি।

তারপর মাথা তুলে বিষণ্ণ হেসে বললে—একটু জল খাব। তারপর বললে—পার্টটায় কেমন ঘোর লাগে।

বাইরে পুরুষদের সাজঘরেও সকলে উৎকণ্ঠিত ছিল। গোপাল দাঁড়িয়েছিল মেয়েদের সাজঘরের দরজায়। রীতুবাবু বাবুল গ্লাসে মদ ঢেলেও হাতে নিয়ে বসেছিল। তাকিয়েছিল গোপালের দিকে।

শিউনন্দন দুধ গরম করছিল, মঞ্জরীকে খাওয়াবে। গোপাল বললে—না, ঠিক আছেন। একটু—মানে—একে বলে—ঘোরের মত হয়েছিল। মাথা তুলেছেন। কথা বলছেন।

বাবুল বলে উঠল—জয় কালী কলকাত্তাওয়ালী! বাস্, আসুন। বিগব্রাদার!

রীতুবাবু গ্লাসটা নিঃশেষে পান করে সিগারেট ধরিয়ে বললে—তুমি দেখবে লিটল ব্রাদার, এ প্লে দেখে লোককে বলতে হবে, হ্যাঁ—রাজা যায়—রাজ্য থাকে। রাজ্যই রাজা তৈরী করে নেয়।

বাবুল সিগারেট ধরিয়ে বললে—নো ডাউট অ্যাবাউট ইট।

রীতুবাবু বললে—কিন্তু হিরো কই? রানা?

যোগা বললে—বাইরে দাঁড়িয়ে আছে স্যার, মাঠের উপর—আকাশের দিকে তাকিয়ে। বুঝলেন কিনা—সে এক্কেরে ভাবুকের ভাব গো!

সত্যই রানা দাঁড়িয়েছিল মাঠের মধ্যে। শীতের রাত্রি, আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। সেই দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল স্তব্ধ হয়ে।

রীতুবাবু এসে পাশে দাঁড়াল। রানা লাহিড়ী পায়ের শব্দ শুনেও ফিরে তাকায় নি, নক্ষত্রভরা আকাশের দিকেই তাকিয়েছিল।

রীতুবাবু ডাকলে—রানাবাবু!

—অ্যাঁ! আপনি!

—হ্যাঁ, আমি। এখানে এমনভাবে দাঁড়িয়ে কেন ভাই?

একটু হেসে রানা বললে—এমনি। শীতের আকাশে একটু আগে উল্কা খসল একটা। সবুজ হয়ে গেল আকাশ। যদি আর একটা হয়! আর মাথাটা আজ বেশ ভারী হয়ে গেছে পার্টটা করে।

—ভাল লেগেছে পার্ট করে?

—খুব ভাল লেগেছে রীতুবাবু। আপনাকে বলব ভেবেছিলাম।

—পার্টও খুব ভাল করেছ তুমি। এই দেখ—তুমি বললাম। মনে করলে না তো কিছু? বয়স হয়েছে। এ দলে গোড়া থেকে আছি। সবাইকে 'তুমি' বলে এমন বদস্বভাব হয়েছে না—মনেই থাকে না।

—না না, তাতে কি হয়েছে। আমি অনেক ছোট। আর অনেক গুণ আপনার। মিথ্যে বলব না আপনাকে। যখন আপনার কথায় বাঁকড়ো আসি তখন অনিচ্ছেতেই এসেছিলাম। বি-এ পর্যন্ত পড়েছি। নাটক নিয়ে পড়াশুনোও করেছি। শখও আছে। বাসনা ছিল বড় অ্যাক্টর হব। তা চান্স পাচ্ছিলাম না। হিস্টোরিক্যাল মাইথোলজিক্যাল আমার আদৌ পছন্দ নয়। মাইথোলজি আমার ভালই লাগে না। গাঁজা বলি। মুন থিয়েটারে বড্ড চাপ ছিল। ছেড়ে দিয়ে বসেছিলাম। ভাবছিলাম আই-পি-টি-এ টাই-পি-টি-এ এই রকম দলের মধ্যে ঢুকব। একটা ড্রামা মুভমেণ্ট করব। সিনেমাতে বনে নি। বসেছিলাম। টাকার দরকার পড়েছিল—আপনার কথায় এলাম। ভাবলাম মাসে দুশো করে সাত মাসে চোদ্দশো টাকা কামিয়ে নি। তারপর আবার দেখব। বাঁকড়োতে কান্দীতে ঠিক ভাল লাগে নি। সুরেলা অভিনয়। মাইথোলজিক্যাল বই। দূর! এই বই কলকাতায় রিহারস্যাল দিয়েছি—মনে মনে নিজের ওপর রাগ হয়েছে।

একটু থেমে হেসে বললে—মানে, ধর্ম পুরাণ এ সবের ওপর অশ্রদ্ধাই শুধু নেই। এগুলোকে মুছে দিতে পারলে আমি খুশী হই। যত কুসংস্কারের মূল এগুলো। এবং জীবনকে এমন পঙ্গু করে দিয়েছে—।

আবারও হাসলে।

রীতুবাবু হেসে বললে—আজকে পুরাণ ভাল লাগল?

—সত্যি বলব? লাগল। আজকের অভিনয়ে একেবারে আমি যেন কেমন হয়ে গেছি। বুঝেছেন—মনে হচ্ছে যাকে রিয়াল বলি বা বলে দেখি, মনে করি তা রিয়াল নয়। রিয়াল যদি ট্রুথ হয়, সত্য হয়

তবে ড্রিম ইজ ট্রুথ। ওঃ, কি অপূর্ব ড্রিম! আশ্চর্য! জন্মজন্মান্তরের দেখা—দেখবা মাত্র চেনা—এবং মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রিয়জনের জীবন ফেরানো—এই তো, এই তো ড্রিম অব লাইফ! এবং এখনও কাটে নি। নেশা করি নে—তার ঘোর নয়—নেই। এই ড্রিমের ঘোর। এখনও মনে হচ্ছে নিশ্চয় সম্ভবপর এবং সত্য হয়, হতে পারে, যদি প্রেম সত্য হয়। হয়তো পৃথিবীতে এমন একটি কি দুটি কি চারটি দম্পতি আজও জন্মজন্মান্তর বেয়ে আসেন যান। কি যে ভাল লাগছে!

—বাঃ! রীতুবাবু বললে—বেঁচে থাক ভাই। তোমাদের এইসব কথা শুনলেও আনন্দ হয়। আগে তো যাত্রার দল ছিল বাউণ্ডুলে ভবঘুরের রাজ্য। তবে আমার বিশ্বাস ছিল—লোক আসবে। গোরাবাবুকে দেখে ভাবতাম। আবার তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে—এই তো, তোমাদের জন্যেই তো আমরা অপেক্ষা করে রয়েছি। তোমরা এলে যাত্রাদলের আত্মার মুক্তি হবে। তুমি পার্ট আজ বড় ভাল করেছ। সুন্দর হয়েছে। আমি এতটা ভাবি নি।

—সেটা—দেখুন, সেটা মঞ্জরী দেবীর জন্যে। আমার, যেটাকে আমি ড্রিম বলছি—ঘোর—সেটা উনি কো-অ্যাক্‌ট্রেস না হলে কিন্তু ধরত না। এমন রিয়ালিজিমের বাতিক আমার। কিন্তু বলব কি রীতুবাবু, উনি যখন স্বামী অন্বেষণে বের হলেন—বাপ মা এমন কি দাসীটিকে যখন হাতজোড় করে বললেন, না, আপনাদের পদধূলি আমার মঙ্গল করুক—আপনাদের আশীর্বাদ আমার পাথের, আপনারা বলুন যেন আমার স্বামী—জন্মজন্মান্তর হতে যাঁর সঙ্গে আত্মার বন্ধন, সতীর শিবের মত যিনি আমার প্রিয়তম, যাঁর পাদনখ হতে কেশাগ্র পর্যন্ত আমার পরিচিত, তাঁকে যেন লাভ করে আমি ফিরে আসি। অন্যথায় এ গৃহদ্বার আমার পশ্চাতে চিরদিনের মত রুদ্ধ হোক। তারপর বটবৃক্ষ তুলসীবৃক্ষ তাদের পর্যন্ত বললেন, আশীর্বাদ কর। আশীর্বাদ কর। ওগো মানুষেরা, তোমরা আশীর্বাদ কর। রীতুবাবু, আমি দেখলাম মুখখানা ওঁর থমথম করছে। চোখের

যেন কেমন হয়ে গেছে। আমার ঘোর লাগল মশায়। বেশ নার্ভাসও হলাম। প্রথমটা সেই কে—কে? ও কে? আহা-হা—ওটা বলে গেলুম, ক্ল্যাপ পেলুম—নিজেরও ভাল লাগল কানে। না, এ তো বেশ লাগছে। তারপর মশাই ওইখানটায়—মৃত্যু সিনে সাবিত্রী—কৃষ্ণা চতুর্দশী রাত্রি—বনপথ—এখানেও আমি লক্ষ্য করেছি, বারবার—বারবার তুমি আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছ। কি আছে এ মুখে? অ্যাঁ? গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে দেখেছি, ওইটের উত্তরে উনি যখন বললেন, প্রভু, একবার আকাশের চন্দ্র চকোরীকে ঠিক এই প্রশ্ন করেছিল। ওইটে যখন বলে গেলেন তখন কি ঘোর যে লাগল! মনে হল রিয়াল ইজ নট রিয়াল। ড্রিম ইজ রিয়াল। তাই এখনও ভাবছি।

—অদ্ভুত! এস, ঘরে এস। খাওয়া হয়েছে তো? কোন্ ক্লিটে খাচ্ছ?

—না। কোন ক্লিটে খাই নে। ক্লিটে সব রান্নাবান্না যা হয় তা দেখে ঠিক ভাল লাগে না আমার। পেন্ট-টেন্ট ওই তেল মেখে রঙ তোলা গামছায় হাত মুছে আর হাতটাত ধোয় না। ময়দা ঠাসতে লেগে গেল। আমি পাঁউরুটি কিনে রাখি—মাখন আছে, ডিম ঠাকুরদের দিয়ে সিদ্ধ করিয়ে কৌটোয় রেখেছিলাম, রাত্রে এসে খেয়ে নিয়েছি। কাল থেকে মিষ্টি কিনে রাখব। তাতেই চালাব।

—না না না। আপত্তি না থাকে তো আমার সঙ্গে খেতে পার। ও এসব বিষয়ে পরিচ্ছন্ন। নয় তো প্রোপ্রাইট্রেসকে বলব—

—না রীতুবাবু, না।

—কেন? বাবলু তো খায়।

—উনি ওঁকে দিদি বলেন—ওঁর কথা আলাদা।

—তুমিও বলবে।

—না।

—কেন ?

—চাকরি করছি চাকরি করছি। প্রোপ্রাইট্রেস উনি। কি দরকার ?

—বিগ ব্রাদার ! হ্যালো !

বাবুল ডাকছে।

—কি ?

রীতুবাবু উত্তর দিলেন।

—এখানে আসুন। বলি—বাসায় ফিরতে হবে ? না—না ?

সাজঘর থেকে দলে দলে লোক বেরুতে শুরু করেছে। বাসায় যাবে। খাওয়াদাওয়া সারবে। বাসাটা এখান থেকে কিছু দূর। কিছু কেন—বেশ একটু দূর। সুতরাং দলে দলে বেরিয়েও সব দাঁড়িয়েছে। দুটো হ্যাজাক আলো, একটা সামনে, একটা মাঝখানে দিয়ে সকলেই একসঙ্গে ফিরবে। রীতুবাবু রানাকে বললে—চল, ফেরা যাক।

রীতুবাবু এবং রানা লাহিড়ী আসতেই গোপাল বললে—আপনাদের জিনিসপত্র সব বিপিন নিয়েছে। তবু একবার সাজঘর দেখবেন না কি ?

রীতুবাবু হেসে বললে—দেখতে হয় বইকি। কটা হীরে ছিল আর লাখ টাকার নোট ছিল, সেগুলো ? তারপর বললে—তা থাক। চল, মাঝে মাঝে হারানো ভাল।

সস্তা রসিকতা; কিন্তু আজকের সার্থকতার আনন্দে সকলেই হাসবার জন্যে প্রস্তুত ছিল। সকলেই হেসে উঠল। বিশেষ করে ছেলেগুলো।

শেফালী বলে উঠল—হায় হায়, রানাবাবুর মণিমুক্তোগুলো যে আকাশে ছড়ানো রইল, ওগুলোর কি হবে ? রানাবাবু কি সারারাত্রি ধরে কুড়োবেন ?

রানা একটু বিরক্ত হল। শেফালী মধ্যে মধ্যে এমনই ভাবে গায়ে পড়ে কথা বলে। ভাল লাগে না তার।

আর একটা হ্যাজাক আলো এল এই সময়। শিউনন্দন মঞ্জরীকে নিয়ে বেরিয়ে এল। সঙ্গে বুঁচী শোভা।

মঞ্জরী এখনও স্তব্ধ হয়ে রয়েছে, পদক্ষেপে ক্লান্তি রয়েছে। গোপালীর মনে মনে একটা কথা গুঞ্জন করে উঠল—ঢঙ!

সে চটেছে মঞ্জরীর উপর, শোভাকে ক্ষমা করার জন্য। তাই মঞ্জরীর এই অভিভূত অবস্থাকে সে ব্যঙ্গ করে ঢঙ বলছে মনে মনে।

সেদিন রাত্রে আর একটা কাণ্ড ঘটল, ড্যান্সিং মাস্টার বংশী বাসার বারান্দা থেকে পড়ে গিয়ে মুখখানাকেই কেটেকুটে ক্ষতবিক্ষত করে ফেললে।

বাকুলিয়া থেকে আসানসোল। ওখান থেকে দালাল গেল বরাকর বাজার, সাহেবদের কলিয়ারী। এইটেই বলতে গেলে মঞ্জরী অপেরার ভাতঘর—কর্মক্ষেত্র—যা বলবে তাই। গোপাল বলে—বাঁধাঘর। গোরাবাবু এবং অলি চলে যাবার পরও অবশ্য মঞ্জরী অপেরা 'ভারা' আসানসোলে অভিনয় করে গেছে। অভিনয়ও মোটামুটি ভালই করেছে। তবু লোকেরা খুঁতখুঁত করেছে। গোরা-বাবুর সঙ্গে রানা লাহিড়ীর তুলনা করেছে। নতুন বইয়ে সে তুলনার সুযোগ নেই। সুতরাং নতুন বই অভিনয় করে দেখিয়ে নামের উপর যে মালিন্য পড়েছে তা মুছে ফেলতে হবে। প্রমাণ করতে হবে, ক্ষতি তো হয়ই নি বরং দল আরও জবরদস্ত এবং উজ্জ্বল হয়েছে।

সামনে সরস্বতী পুজোর আসর আসছে, এ সময় নানান জায়গায় যাত্রার আসর পড়ে। সুতরাং তার আগেই নামটা জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন।

এসেই আসানসোলে যোগাযোগ করে দু রাত্রি অভিনয় করে ফেললে। ভালই হল অভিনয়। যেমন বাকুলেতে হয়েছিল তেমনি। রিজিয়াতে রিজিয়া নরমই রয়ে গেল। বক্তিয়ার সব থেকে শ্রেষ্ঠ। সাবিত্রীও খুব ভাল হল। তবে আসানসোলের শহরে লোকে

পৌরাণিক নাটক বলেই নামটা খুব করলে না। আর একটা হল মঞ্জরী নিজেকে সামলে নিলে। উপোস করা সে ছাড়ে নি কিন্তু অভিনয় করে আর সে তেমন করে টেবিলে মাথা রাখলে না। সহজ হয়েই রইল।

শুধু তাই বা কেন, বরাকরের বাজারে গাওনার দিন সাহেব কলিয়ারীর বড়বাবু সুরেনবাবুকে সে বললে—আমাদের তো ভগবান আলাদা করে তৈরী করেছেন বাবা। আমাদের জাত আলাদা। সে সব কথা মনে রাখলে চলেও না, থাকেও না। কই, মনে তো আমার নেই। সত্যি বলছি আপনাকে, নেই। বরং লজ্জাই পাই যে তাকে নিয়ে গেরস্ত হতে গিয়েছিলাম। গেরস্ত হয়ে যাত্রার দল! বলে হেসেছিল।

সুরেনবাবু পালার শেষে দেখা করতে এসে কথায় কথায় গোরা-বাবুর কথা তুলেছিলেন।

সুরেনবাবু বলেছিলেন—সত্যি বলছ না মা।

—কেন?

—তা হলে সাবিত্রী এমন ভাল হয়!

হেসেছিল মঞ্জরী। বলেছিল, হয়। হওয়াতে পারলেই হয়।

—না।

—কেন? আপনার—। বলতে গিয়ে থেমে গিয়েছিল, থেমে আবার বলেছিল—আপনি সে দেখেন নি। ওটা তো কাচ্ছিদের কলিয়ারিতে হয়েছিল। আমি জনা মোহিনীমায়া দুটো পার্ট করে-ছিলাম। অলির চেয়ে খারাপ করি নি।

সুরেনবাবু বলেছিলেন—শুনেছি বটে। হ্যাঁ। তা বটে।

মঞ্জরী বলেছিল—পার্ট পেলে যার যেমন শক্তি তেমনি করে। আমাদের খেলা—ওই আমাদের যোগাবাবু গান করেন, ওই মায়া প্রপঞ্চমায়া ভবের রঙ্গমঞ্চ মাঝে—

সুরেনবাবু পূরণ করে নিজেই বলেছিলেন—রঙ্গের নটবর হরি

যারে যা সাজান সেই তা সাজে। তাই বটে। একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, আহা, সে সব গান কি গানই ছিল!

তারপর সরস্বতী পুজোয় বায়না করে গিয়েছিলেন। দু রাত্রি বায়না।

সুরেনবাবু চলে গেলে মঞ্জরী বলেছিল—আমার ভারী বিচ্ছিরি লাগে এই সব কথা বুঁচোদি। এই সব বুড়োদের কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান নেই। আহা আর আহা!

পরের দিন আসানসোলের বাসায় আবার কলিয়ারির লোক এল। বাইরে সেদিন রীতুবাবুদের আসরে খুব জমজমাটি। গোপাল খুব খুশী। আজ বেলা দুটো পর্যন্ত তিনটে বায়না এসেছে। সবই কলিয়ারিতে। শনি আর রবি। শনিবার একটা সন্ধ্যে সাতটা থেকে। রবিবার দুটো, একটা বিকেল পাঁচটা থেকে সাড়ে আটটা, আর একটা দশটা থেকে সাড়ে বারোটা একটা। এবং বায়না করতে এসে সকলেই বলে গেছে, হ্যাঁ, দল আগের থেকে জোরালো হয়েছে।

সাধারণত দিনে মদ্যের ঝোঁকটা কম। ঘুমের ঝোঁক বেশী। বড় বড় অ্যাক্টরদের কাছে ছোকরাগুলো কিছু রোজগার করে গা হাত টিপে দিয়ে।

বেলা আড়াইটে তখন, সাহেব কলিয়ারির লোক এল। বড়বাবুর চিঠি খোদ প্রোপ্রাইট্রেসের কাছে। বড়বাবু লিখেছেন—মা, বিপদে পড়িয়া লিখিতেছি। এখানকার ম্যানেজার অ্যাংলো সাহেবটি মঞ্জরী অপেরার প্লে হইবে শুনিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। সে ধরিয়াছে, বড়াবাবু, জনা—সেই জনা বইটা করিতে হইবে। অ্যাণ্ড সেই ড্যান্স। ছাট ড্যান্সার! বলিলাম সে মেয়ে দল ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। তো বলে, তাহাদিগকে বল, লোক পাঠাইয়া লইয়া আসুক। আমি বলিয়াছি, সাহেব, তাহার চেয়েও ভাল নাচ দেখাইবে। কিন্তু সাহেব নাছোড়বন্দা। বলে জনা চাই অ্যাণ্ড ছাট ভেরী ড্যান্স। আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, এখানে রিজিয়ার বদলে জনা করিতে। এবং

শুনিয়াছি তুমি নিজে মোহিনীমায়ার নৃত্য আরও ভাল করিয়াছ। তুমিই ও পার্ট করিবে।

গোপাল বললে—ও হবে না মশায়। যা কথা হয়েছে তাই।

রীতুবাবু বললে—কি ?

—দেখুন আবদার !

চিঠিখানা পড়ে রীতুবাবু বললে—হুঁ। উনি জনা-টনা পুরনো বইগুলো করতেই চান না। তার ওপর জনা। মনে তো হয় না। তবু দেখানো ভাল—ওঁকে দেখাও।

বাবুল বলেছিল—হোয়াই ? প্রোপ্রাইট্রেস করবেন কেন ? অন্যে করবে।

—শেফালী ? হেসেছিল রীতুবাবু।

—ইয়েস। ত্যাট ডাবা হুঁকোর মত অলি চৌধুরী থেকে তার ফিগার ভাল, অ্যাণ্ড সী উইল ডু বেটার। দিন, পত্র দিন, আমি যাচ্ছি।

মঞ্জরী তখন ঘুমুচ্ছে। শিউনন্দন বললে—ঘুমাচ্ছে খুব। আভি ডাকবে না বোসবাবু।

শোভা ঘুম ভেঙে উঠেও বসে বসে ঢুলছে। সে সেই অবস্থাতেই রসিকতা করতে ছাড়লে না। সেই পুরনো স্বভাবটা ক্রমশ সে যেন ফিরে পাচ্ছে। বললে—এই শীতেও শেফালী আঁচল বিছিয়ে এলিয়ে পড়েছে গো। তাকে খুঁজছ তো।

বাবুল বললে—রাবিশ !

শোভা বললে—তা যা বলেছ। নোনাধরা পলেস্তরার মত চামড়ায় ফাট ধরেছে, রাবিশ বলেছ ঠিক।

—শিউনন্দন !

ঠিক এই মুহূর্তটিতেই ডাকলে মঞ্জরী। ঘরের মধ্যে তার ঘুম ভেঙেছে। শিউনন্দন বললে—যাচ্ছে।

—চা কর্। মাথা ধরেছে রে। অ্যাসপিরিন খাব।

বাবুল সাড়া দিয়ে ডাকলে—দিদি, আমি এসেছি।

—বাবুল! এস। কি হল?

—ওয়ান লেটার, সাহেব কলিয়ারির বড়বাবু পাঠিয়েছে।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল সে। ছোট্ট একখানা ঘর। একজনের পক্ষেও উপযুক্ত নয়। একটা ফালি শুধু। অনেকটা ভাঁড়ারের মত। শীত কাল—তাই মানুষ থাকতে পারে। ছোট একটা তক্তাপোশ, বাজার থেকে ভাড়া করে এনেছে শিউনা। মঞ্জরী বললে—বস।

বাবুল বসে চিঠিখানা দিয়ে বললে—খোদ তোমাকে লিখেছে দিদি, নইলে আমি রিপ্লাই দিয়ে দিতাম। জনা প্লে দেখতে চেয়েছে সাহেব। তোমাকে জনা মোহিনীমায়া করতে হবে। ওল্ড ম্যান যেন তোমার জ্যেঠামশাই। মেটারন্যাল আঙ্কলের বাড়ির আবদার। তা একবার দেখাতে এলাম। রিপ্লাই আমি ঠিক করে রেখেছি।

মঞ্জরী পড়ে দেখে একটু ভাবলে—কি উত্তর দেবে?

—দেব, করতে নিশ্চয় পারি। তবে মোহিনীমায়া তুমি করবে না। অন্য লোকে করবে।

—কে? শেফালী? একটু হাসি ফুটে উঠল মঞ্জরীর মুখে।

বাবুল নির্বিকার, সে বললে—ইয়েস। সী উইল ডু গুড। ভেরি স্লিম ফিগার। ভেরী স্মার্ট।

মঞ্জরী একটু চুপ করে বোধ হয় ভাবলে। তারপর মাথা তুলে গম্ভীর মুখেই বললে—না, আমিই করব। বলে দাও। তবে আর একরাত্রি বায়না হলে করতে পারি। দু রাত্রি আমাদের নতুন বই হবে।

বাবুল বললে—দলের অবজেকশন কিন্তু। তোমার শরীর খারাপ হবে। সাবিত্রীতে উপোস করবে—আবার জনাতে দুটো পার্ট করবে—

—না। শরীর খারাপ হবে না। নায়কপক্ষ চেয়েছে—তাই হবে। পিছলে দলের দুর্নাম হবে। ও আমার ঠিক সয়ে যাবে। সাবিত্রীর দিন উপোস করি, মোহিনীমায়ার পার্ট করবার আগে এক আউন্স ব্রাণ্ডি খাব। যাও, বলে দাও।

অবাক হয়ে বাবুল চলে এল।

বাইরে তখন খবরের কাগজের উপর ঝুঁকে পড়েছে রীতুবাবু। আশেপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে নাটুবাবু, মণি ঘোষ, গোপাল দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে; যোগানন্দ বলেছে—অঃ, বিরাট অ্যাক্‌টর গো! জিন্দে অ্যাক্‌টর। অঃ, তুই পুরুষে না—কি কাণ্ড বল দিকি—

বাবুল সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে—কি? কে?

গোপাল বিড়ি টানতে টানতেই একটু পা ডুলিয়ে বললে—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী মারা গিয়েছে।

—বিশু ভাদুড়ী দি গ্রেট! কি হয়েছিল?

—আবার কি! একে বলে হার্ট ফেল!

—এঃ!

—যাক, প্রোপ্রাইট্রেস, একে বলে, কি বললেন?

—বললেন, উনিই করবেন। তবে দু রাত্রির বাইরে আর একরাত্রি বায়না করতে হবে।

রীতবাবু কাগজ থেকে মুখ তুলে বললে—উনি করবেন?

—হ্যাঁ। সী ইজ মরিয়া। বুঝেছেন?

—হুঁ।

একটু নিরিবিলি হলে, বাবুল বললে—বিগ ব্রাদার, আই অ্যাম অ্যাস্টনিশড্। বিস্মিত, স্তম্ভিত—উদ্‌ভ্রান্ত, বিভ্রান্ত।

রীতবাবু বলেলে—হোয়াই?

—প্রোপ্রাইট্রেস হয়তো টার্ণিং ম্যাড—বুঝেছন!

—বল কি? কেন?

—উনি বললেন কি জানেন—? বলে মঞ্জরীর কথা বলে বললে—বুয়েচেন—এই শুরু। এক আউন্স ব্রাণ্ডি—আসছে বছর হতে হতে—

—তা যে বিবাহের যে মন্ত্র। এ তো এক রকম এ জীবনের মৃণালে কণ্টক—চন্দ্রে কলঙ্ক!

একটু চুপ করে থেকে রীতুবাবু বললে—দেখ ভাই, মানুষ চায়

এক রকম হতে, কিন্তু সংসার তাকে করে দেয় আর এক রকম। বুঝেছ? আমিই কি চেয়েছিলাম এই হতে? না, তুমিই চেয়েছিলে? তবে?

আবার একটু থেমে বললে—তবে ও নিয়ে খেদ করেও লাভ নেই, যা হয়েছি তাই ভাল। শুধু হেসে যেতে পারলেই ভাল। আর কাউকে যদি দুঃখও না দিয়ে যেতে পারি—তাহলে তো চরম কথা। সাধুরা মুক্তি মুক্তি বলে—ওতেই মুক্তি।

বাবুল বললে—মাই আল্লা, এয় গড—! এ যে ফিলজফি করে ফেললেন বিগ ব্রাদার!

—যা বল।

বাইরে দলের জনকতক কোথা থেকে ফিরে এল। রানা লাহিড়ীর সঙ্গে বেরিয়েছিল তারা। বার্ণপুরের কারখানা দেখতে গিয়েছিল।

* * *

বরাকর লায়েকডিতে সাহেবদের কলিয়ারীতে সত্য সত্যই মঞ্জরী অবলীলাক্রমেই জনা এবং মোহিনীমায়া অভিনয় করলে। এবং মোহিনীমায়ায় সে লীলায়িত দেহে যে ছন্দের খেলা এবং কটাক্ষের লীলা দেখালে, তা অলকার মোহিনীমায়াকে যেন ছাড়িয়ে গেল। এবং সাজঘরে ফিরে এসে এতটুকু বিচলিত বা মুহ্যমান হল না। রিজিয়াতেও সে এই প্রথম নিজের যে দুর্বলতাটুকু এ পর্যন্ত কাটাতে পারে নি—তা কাটিয়ে উঠে রীতুবাবু এবং রানার সঙ্গে সমান গৌরব অর্জন করলে।

কেবল রানা জনাতে যেন ম্লান হয়ে গেল। বলতে গেলে প্রবীরের পার্টের আট-আনাই জনার সঙ্গে। কিছুটা মোহিনীমায়ার সঙ্গে। এবং সেই জায়গাটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। সে যেন মঞ্জরীর সামনে দাঁড়াতে পারছিল না।

জনার শেষে রানা রীতুবাবুকে বললে—প্রবীর আর আমাকে দেবেন না। ওটা ঠিক হচ্ছে না।

রীতুবাবু হেসে বললে—না না, বেশ হচ্ছে। দেখবে, আর দু-এক রাত্রিতেই ঠিক হয়ে যাবে।

একটু চুপ করে থেকে বললে—আচ্ছা, একটা কথার আমায় ঠিক সত্যি উত্তর দেবেন?

—কি বল তো?

—নেশা, মানে, মদ খেলে কি সত্যিই অ্যাক্‌টিংয়ে জোর পাওয়া যায়?

—মদ কখনও খাও নি? কোন এক্সপিরিয়েন্স নেই?

—নেই বলব না। কিন্তু তাতে তো ব্রেন ঠিক থাকে না। অ্যাক্‌টিং হবে কি করে?

—ক্রমে সয়ে যায়। ওই বাবুল, ধর না—যখন এল তখন খেতো, কিন্তু সে সামান্য। এখন পিপে। না খেলে পার্টে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু কথাটা জিজ্ঞাসা করছ কেন?

রানা উত্তর দিলে না, যেন উত্তর ভাবছিল। হঠাৎ রীতুবাবু বললে—ও! প্রোপ্রাইটেসের মুখে গন্ধ পেয়েছ বুঝি!

রানা বললে—হ্যাঁ। কাল রিজিয়ার পার্টে একটু পেয়েছিলাম। ফার্স্ট সিনেই যখন অ্যাপিয়ার হলেন। তখন 'কে তুমি উদ্ধত কাফের যুবা' বলে যেন বেশী কাছে এলেন চলার ঝোঁকে। গন্ধ একটু পেলাম। কিন্তু মনে হল, স্পিরিট গাম-টামের—স্পিরিটের গন্ধ। আজ মোহিনী-মায়ায় উনি যখন আমার টেলটা টেনে নিজেকে ঢেকে নিলেন, তখন তো যাবার সময় একেবারে গায়ে গায়ে ঠেকিয়ে চলেছি, তখন আর সন্দেহ রইল না। আর আগেও দুবার জনা করেছি, উনি মোহিনী-মায়া করেছেন, কিন্তু এবার যেন একেবারে উদ্দাম হয়ে গেলেন। মুখখানা পেণ্ট করেছিলেন জনার পেণ্টের উপরে। কিন্তু ফ্ল্যাশি হলে সে এক রকম হয়, সেটা তাতেও ধরা যাচ্ছিল।

রীতুবাবু বললে—দেখ ব্রাদার, যাত্রার দল—এখানে কিছু দেখে আশ্চর্য হয়ো না। সব হয় এখানে—সব। বুঝেছ? গোরা-

বাবুও বলতেন, মানুষের জীবনের ভিতর বার দুটোই এখানে দিন রাত্রির মত খেলা করে।

—উনি—মানে সাবিত্রীর পার্টে উপোস করে পার্ট করেন?

—হ্যাঁ, করেন। ওটা উপোস করে করলে সেই রকম মনটা পাওয়া যায়। করেন আবার মোহিনীমায়ায়—বুঝছ? তা ছাড়া ব্রাদার, ও যাই হোক, কুলীন অভিনেত্রী তো। দিদিমা, মা, নিজে তিন পুরুষই বল আর কন্যেই বল—অপ্সরা গোত্রা কন্যা তো!

—বাঃ, কথাটা তো ভাল বলেছেন, অপ্সরা গোত্রা—

—কথাটা গোরাবাবুর। গন্ধর্বকন্যা তো লিখেছেন। বড় মাই ডিয়ার লোক ছিল হে। গুণী লোক। ওঁর হিস্ট্রি জান তো?

—শুনেছি।

গোপাল এসে দাঁড়াল—এই দেখুন! আমি আপনাদের দুজনকে খুঁজে সারা। এখানে দাঁড়িয়ে কি করছেন?

রীতুবাবু বললে—বাবুল হলে বলতাম ফ্রাইং ভেরেণ্ডা। তোমাকে কি বলব? এক বলতে হয় তুমি কি অন্ধা গোপাল ঘোষ? গল্প করছি ব্রাদারের সঙ্গে।

গোপাল হেসে বললে—তা, একে বলে, অন্ধা বলতে পারেন মাস্টারমশাই। দুবার এদিকে দূর থেকে অবিশ্যি দেখে ফিরে গেছি। একে বলে, এবারেও একটু এগিয়ে এসেও দেখতে পাই নি। কথার আওয়াজ শুনে এসেছি।

—কি সংবাদ, কহ।

—প্রোপ্রাইট্রেস শুয়ে পড়েছেন। শরীর খারাপ।

—কি হল?

—জানি না। শিউনন্দন বললে, মৎ যাও বাবা গোপালচন্দর। উনকে আজ দিক্ মৎ করো। তবিয়ৎ আচ্ছা নেহি হ্যায়।

—বুঁচী কি শোভাকে পাঠিয়ে দেখ না। শরীর খারাপের তো কথা বটে! জান তো?

—তাও জানি। কিন্তু সে মশায় সামান্য ব্যাপার। শিউনন্দন বলেছে আমাকে। এই এতটুকু করে দুবার। কত হবে, দু আউন্সও হবে না। তা নয়। আবার বুঁচী শোভা কাউকেই যেতে দেবে না শিউনন্দন। সম্ভবত—

—কি সম্ভবত?

—মনে হচ্ছে কাঁদছেন-টাঁদছেন।

—হুঁ। একটু ভেবে নিয়ে বললে রীতুবাবু—কি করব বল ম্যানেজার? কাঁদতে দাও। দুনিয়া বহুরঙ্গের পুরী, দুনিয়ার মধ্যে যাত্রার দল আজব দুনিয়া। বহুরঙ্গের পুরী—কেউ হাসছে, কেউ কাঁদছে, কেউ করছে চুরি। চোখের পাণিতে দিলের গর্দা সাফা হয়ে যাবে।

—তা বটে। সাঁই ম্যানেজারকে যেদিন বিনোদিনী যাত্রাওয়ালী ভাগালো, সেদিন শয্যা নিয়ে কেঁদেছিল। কিন্তু আমার যে বিপদ! জলপাইগুড়ির চা বাগানের এক বাবু সাহেব-কুঠীতে কয়লা কিনতে এসে যাত্রা দেখেছে। তারপর এসেছে, বলছে, তোমরা দল নিয়ে নর্থ বেঙ্গলে চল। বায়না প্রচুর হবে। তা ওঁকে তো বলতে হবে। মত হলে কথাবার্তা সে আপনি আমি বলব।

—নর্থ বেঙ্গল! চা বাগান! খুব ভাল ফিল্ড।

—সে আমি জানি।

—তুমি যাত্রাদলের ঘুঘু—নিশ্চয় জানবে। চল—আমি যাই। এ ছাড়া হবে না। ওদিক থেকে আসাম পর্যন্ত রাস্তা সিধে। তবে আসামে এখন যুদ্ধ নিয়ে হৈ-চৈ। চল, যাই।

ঘরে তখন বাবুল বোস সুটকেস বাজাচ্ছে, নেশা তার জমেছে। সে মঞ্জরী অপেরার জয় ঘোষণা করছে। এবং ওই চা বাগানের বাবুটির সঙ্গে বাকচাতুরী করছে।

বাবুটি চা বাগানে চাকরী করেন, সঙ্গে সঙ্গে ও অঞ্চলে ব্যবসাও করেন বেনামীতে। তিনি বায়না করবেন। চা বাগানও সাহেব

কোম্পানীর। সাহেব বিলেত চলে যাবে, ফেরারওয়েল দেবে কর্মচারীরা, বায়না সেই উপলক্ষ্যে। তবে তিনি বললেন—এবং রীতুবাবু, গোপাল ঘোষ জানে যে দল গিয়ে পড়লে বায়না অনেক হবে।

মঞ্জরীকে না জানিয়েই বায়না হয়ে গেল।

সারা দলে সাড়া পড়ে গেল। এবার মঞ্জরী অপেরার কপাল খুলে গেছে।

আঠারো

সত্যই মঞ্জরী অপেরার কপাল খুলে গেল। প্রথম বায়না তাদের মোটা টাকায় হয়েছিল। অর্থাৎ যাবার এবং ফেরবার ভাড়া সমেত। তারপর ওখানে পৌঁছে প্রথম আসরেই সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। জলপাইগুড়ি শহরের বহু লোক নিমন্ত্রিত হয়েছিল, সাহেবের ফেয়ারওয়েল পার্টি—সমারোহ অনেক; তারা সকলেই অভিনয় দেখে খুশী হল। এবং শেষ অভিনয়ের দিন জলপাইগুড়ি শহরে বায়না হল রায় মশায়দের বাড়িতে। ধনসম্পদ অনেক শহরটিতে। এই জলপাইগুড়িতেই আট দিন গাওনা হল। প্রতি রাত্রে দুটি অভিনয়। একটি এ মহল্লায়, অন্যটি অন্য মহল্লায়। ওদিকে দালাল বেরিয়ে পড়ল বায়নার খোঁজে। একা দালালটি নয়—বংশী মাস্টারও ঘুরতে বেরুল। এবার গোপাল ঘোষের ট্রাঙ্কে দুটো তালা পড়ল। প্রোপ্রাইট্রেসের ঘরের দরজা আগলে একা শিউনন্দন নয়, বিপিন শুদ্ধ শুতে লাগল।

মঞ্জরী ক্রমশ সহজ থেকে সহজতর এবং স্বচ্ছন্দ হয়ে এসেছে। অনেকটা পাল্টেও গেছে। আগে হাস্যপরিহাস এবং কৌতুক খুব কম করত। গোরাবাবুর অন্তরালবর্তিনী হয়ে থাকত অনেকটা, এখন যেন সে সময়ের বধূটি অনাবৃত মুখে স্বাধীন অধিকারে স্বচ্ছন্দ বিচরণে বিচরণ করে ফিরছে। নিজের যে কর্তৃত্ব এতকাল গোরাবাবুর

হাতে দিয়ে রেখেছিল এবার সেটা নিজের হাতে নিয়ে নতুন একটা স্বাদ পেয়েছে। এবং শোভা বলে একটা কথা—বুঁচীকে বলেছে সেদিন ; বলেছে—রক্তের স্বাদ বাঘের জিভ। কথাটার অর্থ বুঝতে বুঁচীর এক মুহূর্তও বিলম্ব হয় নি। সে হেসে বলেছিল—তা বটে। এতদিন তো ঘরের বউ সেজে ছিল !

—হুঁ। দেখ্‌ কি হয় !

অন্যদিকে গোরাবাবুর নাম প্রায় যেন মুছে গেছে। কেউ করেই না বলতে গেলে। ক্বচিৎ কোনদিন শোভা সকালে উঠে ফিস্‌ফিস্‌ করে বুঁচীকে বলে—কাল রাত্রে—

চোখ নাচিয়ে ইশারায় বাকীটা জানিয়ে দেয়।

অর্থাৎ মঞ্জরী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে—কেঁদেছে—ঘুমোয় নি।

শোভাই এখন মঞ্জরীর কাছে শোয়। মঞ্জরী তাকেই আবার ডেকে নিয়েছে। শোভা একরকম তার পায়ের তলায় গড়িয়েই পড়েছিল। মঞ্জরীও তাকে ক্ষমাই করেছে। শোভা কেবল রীতুবাবুকে ভয় করছে। তার সে ভয় আর যায় নি। এবং ম্যানেজার হয়ে অবধি রীতুবাবুও ঠিক আর সে রীতুবাবু নেই। সেও পাল্টেছে। সময় সময় এমন গম্ভীর হয়ে ওঠে যে সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

রীতুবাবু এখন প্রায়ই প্রোপ্রাইট্রেসের কাছে আসে, শোভা তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে যায়। কথাটা একদিন বলে দিয়েছিল রীতুবাবু। বেশ মোলায়েম করেই বলেছিল—শোভা, একটা কথা বলে দি। শিখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে, অন্যরকম ভেবো না। দেখ, আমাকে উনি এখন ম্যানেজার করেছেন ; ওঁর কাছে আসতে হয় আমাকে অনেক কথা নিয়ে। দলের নানান জনের সম্পর্কে নানান কথা থাকে। তা নিয়ে কথাবার্তা বলি, সেগুলোর সব গোপালকেও জানানো হয় না।

শোভা বসে পান সাজছিল। সে বলেছিল, বাইরে যাব আমি ?

—হ্যাঁ। কিছু মনে করো না যেন। তা দু-খিলি পান আমাকে দিয়ে যাও না।

আগের কাল হলে হয়তো রীতুবাবুই আরও কিছুটা বলত। বলত, দেখ, জড়িটরি মানে ভেড়া বানাবার জন্যে কিছু দিয়ো না পানের সঙ্গে।

শোভাও উত্তর দিত, বনতে বাকী আছো নাকি? আয়নায় মুখ দেখ না?

কিন্তু সেদিন যেন শোভারও গেছে, রীতুবাবুরও গেছে। মধ্যে মধ্যে বুঁচী এবং শোভা দুজনেই এ নিয়ে কথা বলে। বুঁচীর একটি অনুরাগ রীতুবাবুর উপর ছিল, রীতুবাবুরও ছিল। সেটার সূত্রপাত এবারেই—বুঁচী যেদিন এ দলে চাকরী নেয় সেইদিন থেকে। কিন্তু তাতেও ছেদ পড়েছে। তবে বুঁচী শোভা নয়। সে এসব বিষয়ে খুব সংযত। তবে শেফালী তার বাবুলকে নিয়ে সকলেই কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। বাবুল শেফালীতে মুগ্ধ হয়েছে সেটা ধরা পড়েছে সকলের চোখেই এবং বাবুল সেটা গোপন করবার চেষ্টাও করে না। প্রায় তার প্রকাশ্য অনুরাগ। লজ্জিত সে হয় না। তবে শেফালীকে ঠিক বোঝা যায় না। সে রানা লাহিড়ীতে অনুরক্তা সেটা গোড়াতেই প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু রানা লাহিড়ী আলাদা জাতের মানুষ। তাকে ঠিক ছোঁয়া যায় না, ধরা বা বাঁধা তো দূরের কথা।

কতদিন শেফালী তাকে পান দিতে গিয়েছে। সে বলেছে, আমি তো পান খাই নে।

কতদিন রসিকতা করেছে। রানা হেসেছে, কিন্তু পাল্টা রসিকতা করে নি।

কতদিন শেফালী তাকে বলেছে, আচ্ছা, আমাকে আপনি বলেন কেন? তুমি বললেই তো পারেন।

রানা বলেছে, চেষ্টা করব। কিন্তু আসা চাই তো। কাউকে তুমি বলতে যেন পারি নে আমি। অবিশ্যি ওই বাচ্চা ছেলেগুলো ছাড়া।

শেফালী দমেছে বলে মনে হয় না—তবে সে বাবুলের সঙ্গে হাসি রসিকতাতেও বিমুখ নয়। এবং তাকে নিয়ে তার কৌতুকের সীমা নেই। সেদিন ওরা চারজনে তাস খেলতে বসেছিল—বুঁচী, শোভা, শেফালী আর মঞ্জরী। গোপালী যেন দল থেকে একটু সরে গেছে। সেই শোভার সঙ্গে ঝগড়ার পর থেকে। তার হাসিও কমেছে। কথায় কথায় আর হেসে ঢলে পড়ে না। অসুখ অসুখ বাতিক্ হয়েছে একটু। বলে, কিছু হজম হচ্ছে না। নাটু তার ভালবাসার লোক। তাকে সে আগে সর্বস্বই দিত। তার মাইনের টাকা নিয়েও নাটু বাড়িতে মনিঅর্ডার করত। কিন্তু এখন আর ঠিক তেমন ভাবে দেয় না। লোকে সন্দেহ করছে, নাটুর সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হবে। এটা যে কেন হয়েছে তা কেউ ধরতে পারে নি। কারণ নাটুর মনের নড়ন-চড়ন নেই। তার মন পয়সার নোঙরে বাঁধা নৌকোর মত, গোপালীর জীবনঘাটেই সে বাঁধা। গোপালীর মন যে কোন্ দিকে ছুটেছে—তাও কেউ ধরতে পারে না। সে যাক—সেদিন শেফালীরা তাস খেলছিল, তখন দলের আড্ডা শিলিগুড়িতে। বাজার এলাকায় দুদিন গান হয়ে গেছে। বুধ বৃহস্পতি। শুক্রবার বন্ধ আছে, শনি-রবি স্টেশন এলাকায় গান হবে। হঠাৎ সেখানে এসে হাজির হল বাবুল। তারা যাবে দার্জিলিং। তারা একদল যাবে দার্জিলিং দেখতে।

বাবুল বললে—তা হলে আমরা ঘুরে আসি দিদি। আমি, গি ব্রাদার, রানাবাবু, মণি। বংশী, আশা সকালেই চলে গেছে। অনেকগুলি ছেলেও গেছে। ডাকিয়ে নিয়ে আসব।

মঞ্জরী বললে—গোপালমামা থাকছে তো?

—হ্যাঁ। মেটারন্যাল আঙ্কল, যোগাবাবু, নাটুবাবু সবাই রইল প্রায়।

শেফালী বুঁচীকে বললে—মজা করব?

—কি?

—দেখ না। বলেই বললে—এইটে আপনার উচিত হল বাবুলবাবু ?

পা বাড়িয়েছিল বাবুল, থমকে দাঁড়িয়ে বললে—মানে ?

—খুব! আপনি খুব মানুষ!

—হোয়াই ?

—আমাকে দার্জিলিং দেখাবেন বলেন নি ?

—বাবুল অবাক হয়ে বললে—বলেছিলাম নাকি ?

—বলেন নি ?

—বাবুল বললে—yes, বলেছিলাম। তা হলে চলুন।

—আজ নয়। আর এক দিন।

বাবুল বললে—বেশ, তবে আজ আমি যাব না। ওঁরা যান।

শেফালী বললে—না না, যান আপনি আজ। সেজেছেন—

—খুলে ফেলছি সাজ। টু মিনিটস।

হেসে গড়িয়ে পড়ল শেফালী বুঁচী। মঞ্জরী বললে—যাও যাও বাবুল। ও তোমাকে নিয়ে নাচাচ্ছে।

বাবুল হেসে বললে—আই নো মঞ্জরীদি। বাট উনি নাচিয়ে সুখী, আমিও নেচে সুখ পাই। ও কে, টা-টা!

গোপালী দূরে শুয়েছিল, সে বললে—মরণ!

ওদিকে আরও ঘটনা ঘটেছে। রীতুবাবু যে দুটি নতুন মেয়ে এনেছিল ড্যান্সিং ব্যাচের জন্য, যাদের একটু সেজেগুজে থাকতে বলেছিল, তার মধ্যে মীনা দেখতে ছিপছিপে, সাজলে তাকে মোটামুটি মানায়। তার সঙ্গে ভালবাসা হয়ে গেছে প্রৌঢ় রমণী নাগের।

ব্যাপারটা ঘটেছে জলপাইগুড়িতে। আবিষ্কার করেছিল গোপাল ঘোষ। বলেছিল—হায় রমণীদা--

—কি ?

—শেষকালে মীনা ডোবায়—

রমণী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। রমণী গাঁজা খায়, মদও খায়। মেজাজ কখন কি রকম থাকে, ঠিক থাকে না। সে চীৎকারে প্রায় গগন বিদীর্ণ করে বলেছিল—বেশ করেছি। খুব করেছি। তুই বেটার মত—

রীতুবাবু এসে পড়েছিল, এবং থামিয়ে দিয়েছিল একটি কথায়—চুপ কর।

সব শুনে হেসে বলেছিল—নিশ্চয়। বেশ করেছ—সে একশো বার। কিন্তু চেঁচিয়ে বলে বেশ কর নি। বুঝেছ না—

রমণী মাথা হেঁট করেছিল এবার।

রীতুবাবু আবার বলেছিল—আর একটা কথা বলি রমণী। সেটা কি জান, সেটা হল গোপালকে যে কুৎসিত কথাটা বলছিলে না, ওটা বলো না। পাপ হবে। বুঝেছ? ছেলেটা গোপালের ছেলে।

—ছেলে?

—হ্যাঁ। ছেলে। সন্তান। পুত্র। বুঝেছ?

কথাটায় গোটা দল অবাক হয়ে গেছে। রীতুবাবু ছেলেটাকে ডেকে বলে দিয়েছে—এই, গোপাল তোর বাপ। বুঝেছিস? আজ থেকে বাবা বলবি। আর গোপাল, তুমি স্বীকার কর। ওটা চেপে রেখে মিথ্যে আর মানুষের থুতু গায়ে মেখো না।

গোপাল হাউ হাউ করে কেঁদেছিল। প্রায় একটা দিন গোটা। পরের দিনটা বিমর্ষ হয়ে একলা বসে বসে শুধু ভেবেছিল। তার পরদিন থেকে আবার সহজ হয়েছে।

মঞ্জরীকে সব প্রকাশ করে বলেছে। শুধু মঞ্জরী কেন, দলের প্রায় লোকই জেনেছে। গোপাল আর এক মানুষ হয়ে গেছে।

যোগাবাবু শুধু সেই যোগাবাবু আছে। তার সবতাতেই কণ্ঠমশায়ের দোহাই। সে বলেছিল—বুয়েচেন মা, কণ্ঠমশায়ের দলে এমনি ঘটেছিল। বদ্ধমানের বাজার থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন একটা পথের বাচ্চা। বুয়েচেন কিনা—সুন্দর ফুটফুটে বাচ্চা।

বাড়িতে মানুষ করে যাত্রাদলে সাজাতেন; প্রথমে সখী। তা পরেতে রাধা। কেউ তার জাত নাই বললে বলতেন, বাবা রে, জাত ওর ছিল না। কিন্তু জাত ও পেয়েছে। আর জাতে কিবা আসে যায়, কণ্ঠে যার মধু ক্ষরে হরিনাম রসনায়!

* * *

দার্জিলিং থেকে রীতুবাবুরা ফিরে এল সুসংবাদ নিয়ে।

যুদ্ধ না কি শেষ হতে চলেছে। টোকিয়োতে খুব বোমা ফেলেছে মিত্রপক্ষ। জার্মাণীতে ঢুকে পড়ছে। আরও একটা খবর দেখে এসেছে, পূর্ণ থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা মারা গেছেন।

রীতুবাবু মঞ্জরীকে বললে—আসছে বারের আয়োজন এখন থেকে করে রাখতে হবে। দার্জিলিং পর্যন্ত দলের নাম ছুটেছে, শুনে এলাম। দার্জিলিঙের কজন উকীল আমাদের প্লে দেখে গেছেন।

মঞ্জরী বললে—যেমন ব্যবস্থা করবেন, তেমনিই হবে।

রীতুবাবু একটু চুপ করে রইল। তারপর বললে—আচ্ছা। একটা ছকে ফেলেছি আমি। যদি অবশ্য ষোল-আনা ভার আমাকে দাও। বলেই বললে—তুমি বলে ফেললাম।

হেসে মঞ্জরী বললে—তাতে কি হয়েছে মাস্টারমশাই!

—না না, হাজার হলেও তুমি প্রোপ্রাইট্রেস!

—কি হল তাতে?

—বেশ। আজকে আমার শুভদিন। একটা বড় অধিকার পেলাম।

উঠে চলে গেল রীতুবাবু। মঞ্জরীও খুশী হল। বাইরের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

ঘরের দরজায় সাড়া দিলে গোপাল ঘোষ। মঞ্জরী বুঝলে, গোপাল ডাকছে। সে বললে—গোপাল মামা?

—হ্যাঁ।

—আসুন, ভেতরে আসুন। কিছু বলছেন?

—হ্যাঁ। স্টেশনের ওঁরা এসেছেন, বলছেন, আমরা জনা আর সাবিত্রী চেয়েছিলাম। তা জনাতে মত হচ্ছে না। ওঁদের থিয়েটার আছে, তার বড় অ্যাক্‌টর এসেছে পার্বতীপুর থেকে। তিনি বলেছেন, গোরাবাবু নেই, জনা কি শুনব। তিনি ওর পার্ট দেখেছেন। বলছেন, অন্য বই চাই।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস আপনি ঝরে পড়ল মঞ্জরীর বুক থেকে। বেশ কিছুদিন পর গোরাবাবুকে মনে পড়ল, তার পার্ট মনে পড়ল।

গোপাল প্রশ্ন করলে—তা হলে?

—রিজিয়া হবে।

—না। এখানে পৌরাণিক ছাড়া চলবে না।

—মাস্টারমশায় কি বলছেন?

—উনি বলছেন, সতী তুলসী। আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পাঠালেন।

—সতী তুলসী?

—হ্যাঁ।

—শঙ্খ—? প্রশ্নটা করতে গিয়ে থেমে গেল মঞ্জরী।

—রানাবাবু করেছেন। আবার মাস্টারমশাইও রয়েছেন। যাকে বলবেন আপান।

একটু ভেবে মঞ্জরী বললে—রানাবাবু করেছেন একবার। উনিই করুন। নইলে কিছু মনে করতে পারেন।

—তা পারেন। তা ছাড়া, মাস্টারমশায়কে একটু বেমানান হবে।

—হ্যাঁ। তা হবে। হুঁ, বেমানান হলে বড় খারাপ লাগে চোখে। তাই হবে তা হলে।

—দালাল এসেছে। মতি দালাল। সুরঞ্জন অপেরার মতি। বলছিল—

—কি?

—বলছিল, ও পূর্ণিয়া কাটিহার অঞ্চল গিয়েছিল বায়নার

জন্যে। ও অঞ্চলে তো ওরা প্রতি বছর গাওনা করে। প্রায় একচেটে করে ফেলেছিল পাঁচ সাত বছর। বলেছিল, আমাদের দলের নাম খুব উঠেছে ওখানে। এ দিকে তো অনেক লোক আসে ওদিককার। বলছিল, ও দিকে গেলে আমাদের গাওনা হবে। তা, এদিকে পার্বতীপুর হয়ে ফেরার চেয়ে ওদিক দিয়ে ফিরলে হয় না?

—মাস্টারমশাইকে বল। পরামর্শ করে যা হয় কর।

—উনি রাজী রয়েছেন। আমাদের লোক পাঠাই তা হলে।

গোপাল চলে গেল।

মঞ্জরী অকস্মাৎ উদাস হয়ে গেল। বিচিত্রভাবে আজ জনার কথায় গোরাবাবুকে মনে পড়ে গেছে। সে থাকলে—। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। যে ভদ্রলোক বলেছেন, গোরাবাবু নেই—জনা কি দেখব। তিনি তো মিথ্যা কথা বলেন নি। গোরাবাবুর সেই দীর্ঘকায় চেহারা, সেই রঙ, সেই কণ্ঠস্বর—! সেই অভিনয়! তার সঙ্গে তুলনা রানা লাহিড়ীর অভিনয়ের! শুধু তাই নয়, তার জন্যই দল।

চোখ থেকে জল গড়িয়ে এল।

সতী তুলসী হবে। শঙ্খচূড় করবে রানা! পারবে না। ওর সে সাধ্য নেই। তা ছাড়া সে নিজেই কি রানা শঙ্খচূড় সাজলে সেই আবেগ দিয়ে অভিনয় করতে পারবে?

অভিনয় হয়। লোকে কতটুকু বোঝে অভিনয়ের অন্তরালে অভিনেতা অভিনেত্রীর হৃদয়!

নাঃ, কাজ নেই সতী তুলসীর অভিনয়ে। জনা, সতী তুলসী গন্ধর্বকন্যার মতই বাদ দিতে হবে।

সে ডাকলে—শিউনন্দন!

বাইরে শিউনন্দন বসে দলের সব থেকে ছোট মেয়েটা যাকে বংশী এনেছিল তার লাস্যলীলা দেখছে আর হাসছে আপন মনে। ওদিকে ছোকরা গায়ক ভূদেব এসে বিড়ি টানছে। কয়েকটা ছোকরা

বসে আড্ডা দিচ্ছে। আর মেয়েটা একটা আয়না নিয়ে মুখ দেখার ছল করে ছটা ফেলছে ভূদেবের চোখে। ভূদেব মিটিমিটি হাসছে

শিউনন্দন এসে দাঁড়াল—চা বানাইব ?

—না। একবার ডাক গোপাল মামাকে।

গোপাল আসতেই মঞ্জরী বললে—সতী তুলসী থাক গোপাল মামা।

—সে কি ! আমরা যে বলে দিলাম।

মঞ্জরী একটু চুপ করে থেকে বললে—জনা, সতী তুলসী এরপর থেকে বাদ দিতে হবে। বুঝেছেন ?

—বাদ দিতে হবে !

—হ্যাঁ। ও ঠিক হয় না।

* * *

মঞ্জরীর অনুমান মিথ্যে হল না। রানা শঙ্খচূড় করলে বটে, দর্শকেও খুশী হল কিন্তু দলের লোক খুশী হল না। কিন্তু এ সংসার যে বিচিত্র। এবং যাত্রার দলের ভাগ্য আরও বিচিত্র। বিচিত্র সংসারের ভালোলাগাটাকেই মেনে চলতে হয়।

শিলিগুড়ি থেকে পূর্ণিয়া কাটিহার পর্যন্ত প্রায় সর্বত্রই বেশী চলল ওই দুখানা বই। সতী তুলসী এবং সাবিত্রী। রিজিয়া শুধু পূর্ণিয়ায় একরাত্রি, কাটিহারে একরাত্রি হয়েছে। সেখানে বাংলা থিয়েটার আছে। থিয়েটারের বাবুদের রুচিতে হয়েছে।

এ সব অঞ্চলে সাধারণ লোক যে ভাষায় কথা বলে, সে হিন্দি আর বাংলা মেশানো একটা ভাষা। তারা বাংলাও বেশ বোঝে। তবে তারা ইতিহাসের ভক্ত নয়। পুরাণের ভক্ত। রিজিয়া তাদের ভাল লাগে না।

ওখান থেকে মঞ্জরী অপেরা এল মণিহারী ঘাট হয়ে সাহেবগঞ্জ। সাহেবগঞ্জে দালাল গিয়ে আগে থেকেই বায়না ধরেছিল। ওখানে এসে হাঁপ ছাড়লে মঞ্জরী। বরাত এখানে রিজিয়া।

সাহেবগঞ্জে গাওনা দুদিন, তারপরও একদিন থেকে দল যাবে জামালপুর। জামালপুরে গাওনা সেরে দল ফিরবে কলকাতা মুখে।

সাঁইথিয়া থেকে অণ্ডাল হয়ে রাণীগঞ্জে দলের শেষ গাওনা। তারপর দলের ছুটি। বৈশাখ থেকে ভাদ্র। ছুটি নয়, দল এক রকম ছেড়ে দেওয়া হয়। আবার দল গড়া হয় নতুন বছরে নতুন করে। মঞ্জরী অপেরা গতবার আষাঢ় মাসে রথযাত্রার দিন থেকে দল গড়েছিল। নতুন বই, কিছু নতুন লোক নেওয়া হয়, কিছু পুরনো লোক অন্য দলে যায়।

গোপাল এর মধ্যেই দলের লাভ-লোকসান হিসেব করতে বসে গেছে। লাভ এবার অনেক হয়েছে তাতে কোন সন্দেহই নেই। তবু কত সেটাই সে কাগজে কলমে মিলিয়ে ঠিক করছে।

সাহেবগঞ্জে সাবিত্রী হল প্রথম রাত্রি। দ্বিতীয় রাত্রে রিজিয়া। কিন্তু মঞ্জরী কেমন স্তিমিত হয়ে গেল। প্রথম প্রথম যেমন হত তেমনি হয়ে গেল। রীতুবাবু বিস্মিত হল। শুধু রীতুবাবুই নয়, দলের সকলেই।—কি হল?

রীতুবাবু সাজঘরে এসে গলার সাড়া দিয়ে ঘরে ঢুকে বললে—কি হল মঞ্জরী? এমন তো হবার কথা নয়?

মঞ্জরী নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

—কি? শরীর-টরীর—

—না।

—তবে?

—কি জানি! বিষণ্ণ ভাবে একটু হাসল সে।

—না না, এ হলে চলবে না।

—দেখি—

রীতুবাবু চলে গেলে মঞ্জরী একটু দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ডাকলে—শিউনা!

শিউনন্দন এসে দাঁড়াল।

—আর একটু দে শিউনা—

অর্থাৎ ব্র্যাণ্ডি

—আউর পিবে ?

—না হলে হবে না, দে। জোর পাচ্ছি নে।

—খারাব করছ তুমি।

—জানি। দে।

আরও একটু ব্র্যাণ্ডি খেয়ে, সে মনকে শক্ত করতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারছে না। কিছুতেই পারছে না। আজ সকাল থেকেই তার নজরে পড়েছে, দোলের রঙ খেলা শুরু হয়ে গেছে। চারদিন পর দোল—হোলি। এ দেশে হোলি হোলির দিনটিতেই শুধু নয়, তার আগে থেকে শুরু হয়ে যায়। এই দোলযাত্রাতেই তার মায়ের বায়না হয়েছিল চৌধুরী বাড়িতে—তার বাবার বাড়িতে। এই দোলের দিনই সে প্রথম দেখেছিল তাকে। শুধু তাই নয়, পরের বছর দোলের দিনেই নবদ্বীপে গিয়ে তারা বৈষ্ণবমতে মালাচন্দন প্রথায় বিয়ে করেছিল।

তারপর থেকে এ পর্যন্ত দোলের দিনে তাদের গোপন উৎসব ছিল। দল নিয়ে বিদেশে গিয়েও এ উৎসব তারা পালন করত।

কথাটা মনে পড়ে গেছে। যে ব্র্যাণ্ডিটুকু খেয়েছে, তাতেও তার সে স্মৃতিকে চাপা দেওয়া সম্ভবপর হয় নি। চোখ জলে ভরে আসছে। কি করবে সে!

সে আরও ব্র্যাণ্ডি না খেয়ে দাঁড়াবে কি করে!

কিন্তু—

আশ্চর্য! সে এ ক'মাস ভেবে এসেছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে সে বুঝেছে যে, তার এ সাজে না। তাকে ভেবে জীবন কাটানো তার পক্ষে সাজে না, সম্ভবপর নয়, হয় না। আর সংসারে এর যে দাম ওই ঘরের গৃহিণীদের কাছে থাক, তার আসল মূল্য শূন্য। শূন্য।

শূন্য। এক' মাস ধরে নতুন জীবনের গোড়াপত্তন করেছে। তবুও এমনটা হল কেন? হয় কেন?

শিবু বেশকারী বলল—মা, সাজা হল?

চমকে উঠল মঞ্জরী। পোশাক বদলাতে হবে। বালক বেশ ছেড়ে তাকে সুলতানা সাজতে হবে।

যাবার সময় সে শিউনন্দনকে ডাকল—শিউনা!

—কি? ফিন্—

—হ্যাঁ হ্যাঁ। দে।

চনচন করছে মাথা। সে বেরিয়ে গেল। রিজিয়ার পার্টে তাকে দাঁড়াতে হবে।

বই শেষে সে ঘরে এসে যেন ভেঙে পড়ল। কিছুক্ষণ পর ডাকল—শিউনা, গোপাল মামাকে ডাক।

গোপাল এসে দাঁড়াল—কি মা?

ক্লান্ত কণ্ঠে সে বলল—রিজিয়া আর হবে না গোপাল মামা। কোথাও না।

—জামালপুরে?

—না।

—ওরা যে বলে গেছে মা—

—বায়না তো হয় নি?

—না, তা হয় নি।

—তা হলে বায়না নেবেন না। এখান থেকেই চলে যাব রাণীগঞ্জ।

—বেশ, কাল সকালে ওরা এলে যা হয় করা যাবে।

—যা হয় নয়। যা বললাম, তাই ঠিক।

সে আর পার্ট করবার জন্যে মদ খেতে পারবে না। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে তার। ওঃ! মাথায় যন্ত্রণা, মনে যন্ত্রণা। না না সারাটা অভিনয়ের মধ্যে বেশী মদ খেয়েও সে গোরাবাবুকে ভুলতে পারে নি।

অথচ না খেয়েও উপায় ছিল না। কি হুর্দান্ত পার্ট করলে বক্তিয়ার! এ সে পারবে না। ওর সঙ্গে তাল রেখে এ পার্ট করতে মদ না খেলে উপায় নেই। না।

*　　　*　　　*

সাহেবগঞ্জেই একদিন বেশী বিশ্রাম করে দল রাণীগঞ্জেই এল। রীতুবাবু, বাবুল এরাও গিয়েছিল মঞ্জরীর কাছে, কিন্তু মঞ্জরী মত পালটায় নি। বলেছিল—আমার শরীর বড় খারাপ। আমি পারব না।

রীতুবাবু এর একটা কারণ আবিষ্কার করেছে। সে বাবুলকে বলল—জেদ করো না। এখানকার সিনেমায় পোস্টারের ছবি দেখেছ? হিন্দী ছবি শ্রাবস্তী?

গোরাবাবু আর অলকার ছবিওয়ালা পোস্টার পড়েছে। ছবিখানা আসছে।

—মাই খোদা! তাই তো! তা হলে?

—যা বলছে তাই করতে হবে।

তবে রীতুবাবু একটা কাজ করলে—সে দল নিয়ে পরের দিনই বেরিয়ে পড়ল সাহেবগঞ্জ এবং হিন্দী ছবির এলাকা ছেড়ে। এসে উঠল রাণীগঞ্জে। এ তুদিন হিসেব-নিকেশ হবে। রাণীগঞ্জে গাইবার জন্যে একখানা পুরনো বই ঝালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। উর্বশী উদ্ধার। অনেক দিনের পুরনো বই। পার্টের লোক প্রায় সবাই আছে। শুধু দণ্ডীর পার্ট রাণা করবে। এবং উর্বশীর পার্ট করবে শেফালী। ও তুটো গোরাবাবু এবং মঞ্জরীর পার্ট। মঞ্জরী উর্বশী করবে না, সে করবে সুভদ্রার পার্ট। সে বলেছে, আমাকে ও পার্টে দেবেন না। আমি নাচতে আর পারব না।

শেফালী খুব খুশী হয়েছে। রাণা দণ্ডী, সে উর্বশী।

দলের হিসেব-নিকেশে লাভ দাঁড়াল চার হাজার টাকা। দল খুব

খুশী। তারা নিশ্চিত যে তাদের চাকরী থাকবে, হয়তো মাইনেও কিছু বাড়বে।

যুদ্ধের বাজার। যুদ্ধ প্রায় শেষ হব-হব। তবু টাকার খেলা—ভেলকী বাজীর খেলায় পর্দার পর্দায় চড়েই চলেছে। যোগানন্দ গান বেঁধেছে—

রজনী প্রভাত হল, রাতের বাজার গেল না,

ও হায় কালো বাজার গেল না।

দালানবাড়ির চোরকুঠারীর সিন্দুকে তার ছলনা—

সোনার শয্যে পেতে শুয়ে, নোটের বালিশ মাথায় দিয়ে

নাক সে ডাকায় মনের সুখে, ও তার নাগাল পাওয়া গেল না।

জনে জনে গান শোনায় আর বলে—হুঁ হুঁ, শিক্ষে কার জান? কণ্ঠমশায়ের। হুঁ হুঁ—

চার হাজার টাকা লাভের কথা শুনে তার উৎসাহ সবচেয়ে বেশী। সে গোপালকে বললে—মাইনে নিঘাত বাড়াতে হবে।

গোপাল বললে—আসছে বছরে বলো।

—আসছে বছর কি? আসছে বছর! মতলবটা কি? অনেক জনাকে তো বলছ হে চিঠি যাবে। গেলেই যেন এস। কই, আমাকে বলছ না?

—তা বলছি। চিঠি পেলেই এস।

যোগাবাবু চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর 'আচ্ছা' বলে চলে গেল। বিকেলে সটান গেল মঞ্জরীর কাছে। হাত জোড় করে বললে—একটা গান শোনাতে এলাম মা।

আধ-পাগল এই বুড়োকে মঞ্জরীর ভাল লাগে। বললে—কালো বাজার?

—না মা। নতুন।

—তাই নাকি!

—হ্যাঁ। মা, কণ্ঠমশায়ের দু-সতীনের গান জানেন তো? শুনিয়েছি—

—তাও আপনার দৌলতে শুনেছি বইকি।

—হ্যাঁ মা, ও দৌলত আমার আছে। নেই শুধু ধান ধনের দৌলত। বুয়েছেন—গানখানা হল,—গালে হাত দিয়ে ধরল—আ—

ও মা আমি ডুবে মরি, আমায় হাত ধরে মা তোল—
পাঁচ নদীতে তুফান মাতে, পাহাড় প্রমাণ তাতে
খাচ্ছি খাবি সাথে সাথে, ঢোকে ঢোকে
জল খেয়ে মা পেটটা ফুলে ঢোল—।
আমায় হাত ধরে মা তোল।
ঘরে আমার পঞ্চ কন্যে বেড়ে আজ যৌবন বন্যে—
এ জ্বালা বোঝে না অন্যে, তারা করে গোল।
আমায় হাত ধরে মা তোল।

আর হয় নাই মা। কেমন লাগল বলুন দিকিনি?

—বেশ ভাল।

—হ্যাঁ মা। বলে কথায় আরম্ভ করলে—মা, তার ওপর দুটো পরিবার। পাঁচ কন্যের তিনটে পার করেছি। একটা তার বিধবা হয়েছে, দুটো এখনও আইবুড়ো। জমি দশ বারো বিঘে, ভাগে চাষ, নিজে বামুনের মুখ্যু। বিদ্যে বলতে গান। তা আবার আধুনিক মাদুনিক নয়—যাত্রার দল ভরসা। এতদিন তোমার দলে রয়েছি—ছেঁটে-ফেঁটে দিও না—কোথায় অন্য দলে নাও নাও করে ঘুরব!

মঞ্জরী বলেছিল—দল যদি থাকে থাকবেন আপনি। বলব গোপাল মামাকে।

—দল যাবে কোথায় মা? এবারে তো মঞ্জরী অপেরার জয়-জয়কার!

শোভা বলেছিল—তা বলতে। সে গিয়েও যখন দল আছে তখন

দল আর ছেড় না। না হলে অবিশ্যি তোমার বাড়ি রয়েছে—ভাড়া পাও। গয়নাও আছে এক গা। কিন্তু একটা নিয়ে থাকতে হবে তো। এই বয়সে কারুর তাঁবেদারি—মানে—

—চুপ কর শোভাদি। চুপ কর।

গোপাল এসে বলে দিয়েছিল মঞ্জরী—চিঠি দেবার লিস্টি একটা করবেন। যোগাবাবুর নামটা রাখবেন। আর রমণীবাবুর। উনি তো আবার—

—হ্যাঁ। এই বয়সে—

শোভা বলেছিল—মরণ তোমার ম্যানেজার। ভূদেবের বয়স—মীনার বয়স? বাবা, কেন? আমার থেকে বড়! শুঁটকী চেহারা, মনে হয় কম বয়স। রীতু আবার হুকুম দিয়েছে সেজে থেকো একটু। নইলে লোকে বলবে বুড়ী নাচাচ্ছে!

আসানসোলে প্রথম রাত্রি এখানে হয়ে গেছে অষ্টবজ্র। উর্বশী উদ্ধার। ভালই হল। মঞ্জরী সুভদ্রা—ভীম রীতুবা[illegible]। দণ্ডী রানা লাহিড়ী। উর্বশী শেফালী। গোপালী দ্রৌপদী অর্জুন নাটু। শ্রীকৃষ্ণ বুঁচী। যোগাবাবু কাল গানও গেয়েছে, পার্টও করেছে। ভৈরব সেজেছিল। নারদ সেজেছিল বাবুল। খুব জমিয়েছিল। বারকয়েক নারদ-নারদ বলে নেচে খুব হাসিয়েছে। প্লে ভাল হয়েছে। যোগাবাবু গান গেয়েছিল দুখানা— ভরিয়ে দিয়েছিল আসর। প্লের পরই রাত্রে মেঘ করে এসেছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই টিপি-টিপি তখন বৃষ্টি পড়ছে। শেফালীকে যোগাবাবু কড়া কথা শুনিয়ে দিলে। তখন বৃষ্টি পড়ছে। সকাল থেকেই আবহাওয়াটিতে গরমের আমেজ ছিল। খোশমেজাজে এসে বাসায় যোগাবাবু গাঁজা টিপছিল। শেফালী বাসার উঠোনে চটিতে কাদা মাখিয়ে উঠে এসে বলে উঠল—ম্যা গোঃ! কোথায় এলুম রে বাবা! কি বিচ্ছিরি কাদা! অ্যা হ্যা হ্যা, কি করি আমি? এ কাদা—

যোগাবাবু বললে—দেখ বাছা, মরা হাতীর দাম লাখ টাকা। তোমাদের এখন মটরের চোখ, হাতী দেখে গা ঘিনঘিন করে। নতুন মটর—কত দাম? দশ হাজার, বিশ হাজার? আর মরা হাতীর দাম লাখ টাকা। রাণীগঞ্জ মরা হাতী। বুঝেছ সুন্দরী? রাণীগঞ্জের লাল ধুলো গদির ধুলো, জল পড়ে কাদা হয়েছে, নাক সেঁটকাচ্ছেন?

সকলে ভেবেছিল লাগল বুঝি শেফালীর সঙ্গে।

কিন্তু খিলখিল করে হেসে উঠল শেফালী। মনটা তার খুশী আছে। সে এসে অবধি রানা লাহিড়ীকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করেছে। চতুর মেয়ে সে। চতুরতার সঙ্গেই করেছে। খুব চতুরতার সঙ্গে। কাল উর্বশী সেজেছিল সে, দণ্ডী রানাবাবু। সে দণ্ডীর সঙ্গে প্রেমাভিনয়ে নাচে গানে তার মনের কথা প্রকাশ করেছে। তাও খুব চতুরতার সঙ্গে। রানা লাহিড়ীও তার উত্তর দিয়েছে তার অভিনয়ের মধ্যে, তাতে যেন তার আর সংশয় নেই।

কৃষ্ণ অপূর্ব অশ্বিনীর কথা শুনে চেয়ে পাঠিয়েছেন, পত্র এসেছে। উর্বশী রাত্রে স্বরূপ ফিরে পেয়ে নাচছিল দণ্ডীর প্রমোদভবনে। চোখে সপ্রেম দৃষ্টি, নানা আবেদনে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে চক্ষুতারকাও নৃত্য করছে কৃষ্ণভ্রমরের মত। দূত এসে পত্র দিল।

রাজা আর্তনাদ করে উঠল, না না না। দিব না, দিতে পারিব না। সহস্র সুন্দরী আর শতেক সাম্রাজ্য মূল্যে না। পারিব না।

শঙ্কায় চকিত উর্বশী প্রশ্ন করলে, কি, কি প্রিয়তম?

—তোমারে করেছে দাবী যদুকুলপতি। সহস্র সুন্দরী দিবে, বিশাল সাম্রাজ্য দিবে। তার বিনিময়ে! না না না না।

ছুটে এসে উর্বশী তার বক্ষলগ্না হয়ে আর্তস্বরে বলে উঠল, না না না। তার চেয়ে হত্যা কর মোরে। ফিরে নিয়ে দিয়ে এস ভীষণ অরণ্যে। সিংহ ব্যাঘ্র আমারে ছিঁড়িয়া খাবে। না না, তাও পারিব

না। তোমারে ছাড়িয়া প্রিয় যেতে পারিব না। পারিব না ফিরে যেতে স্বর্গরাজ্য মাঝে। ওগো প্রিয়, আমারে ছেড়ো না তুমি।

কণ্ঠস্বরে সে কি আকূতি ফুটে উঠেছিল শেফালীর।

—তোমারে ছাড়িব? তার আগে এই প্রাণ দিব বিসর্জন। এ কি অনাচার, এ কি অত্যাচার অবিচার! প্রতিকার করিবার কেহ নাই? চল চল প্রিয়তমে, তোমারে লইয়া আমি সর্বস্ব ত্যজিয়া চলে যাই দূর-দূরান্তরে নিবিড় অরণ্যমাঝে যেখানে মানুষ নাই। পারিব না, পারিব না ছাড়িতে তোমায় মোর জীবন থাকিতে। শুধু বল, হে অপ্সরী, তুমি ছাড়িবে না মোরে?

—দেখ প্রিয় আঁখিপানে চেয়ে কি কথা সেখানে? ছাড়িব না, কভু ছাড়িব না; দেখ মোর কম্পিত অধর দুটি, থরথর কাঁপে তব অধরের পরশ আশায়। সেখানেও সেই কথা—ছাড়িব না।

—চল, চল তবে এই রাত্রি অন্ধকারে পুরী ত্যজি যাই পলাইয়া।

—চল। সেথা তুমি আর আমি।

—চল। শুধু আমি আর তুমি।

দুজনে বেরিয়ে এসেছিল ছুটে পালাবার ভঙ্গিতে। আসবার সময় শেফালী সবলে চেপে ধরেছিল তার হাত। সে হাত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। রানা লাহিড়ীর হাতের মুঠিও যেন শক্ত হয়ে উঠেছিল। বেরিয়ে এসে হাত ছেড়ে দেবার সময় রানা বলেছিল, সুন্দর হয়েছে।

একটি বঙ্কিম কটাক্ষ হেনে শেফালী বলেছিল, সুন্দর? সত্যি?

বলে চলে গিয়েছিল ছুটে। পায়ের ঘুঙুর ঝমঝম করে সশব্দে বেজে উঠেছিল। তখন থেকে মনের নৃত্যে তার ছেদ পড়ে নি। সেই আনন্দে শেফালী বিভোর।

গোপালী বেরিয়ে নাটুর কাছে যাচ্ছিল, সে হাসি দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বললে—খুব খুশী যে ভাই? খোশখবর কিছু শুনব না কি?

—শুনবে মানে? শোন নি?

—না। বল শুনি।

—ও মা! শোন নি দাছ সে হেন যোগা যে আমাকে সুন্দরী বলেছে!

গোপাল ঘোষ বাসার বারান্দা থেকে নামতে নামতে বললে—কাল সাবিত্রী, পরশু সতী তুলসী।

—সতী তুলসী?

—হ্যাঁ।

—শঙ্খচূড়? রানাবাবু?

—না। খোদ মাস্টারমশাই। রানাবাবু কৃষ্ণ।

—ও মাঃ!

—দেখবে একবার কাল রীতু মাস্টারের কেরামতি!

গোপাল মঞ্জরীর ঘরে ঢুকল। বললে—এরা রিজিয়ার বদলে সতী তুলসীতেই রাজী হয়েছে। তবে মাস্টারমশাই বলছেন রানাবাবু কৃষ্ণ, উনি নিজে সাজবেন শঙ্খচূড়।

—উনি?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে মঞ্জরী। মনে পড়ল গোরাবাবুর সঙ্গে তুলসীর পার্ট। রীতুবাবু করবে শঙ্খচূড়। একটা অসাধারণ কিছু করবেনই। সে কি করবে?

সাবিত্রী ভালই হবার কথা। ভালই হল। এবং তুলসীতে সেদিন সত্যিই রীতুবাবু কেরামতি দেখালেন। নবযুবকই সাজলেন। সেজে মেয়েদের সাজঘরের সামনে গিয়ে ডাকলেন—মঞ্জরী!

—মাস্টারমশাই! কিছু বলছেন?

—আসব ভেতরে?

—আসুন। আসুন। সাজা আমাদের হয়ে গেছে।

—দেখ তো—

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সকলে। মঞ্জরীর চোখেও বিস্ময় এবং যেন আরও কিছু।

রীতুবাবু প্রশ্ন করলে—ঠিক হয়েছে?

শোভা বলে উঠল—সুন্দর হয়েছে।

—মঞ্জরী?

—আমার যে ভয় করছে মাস্টারমশাই!

—ভয়?

—মনে হচ্ছে আমি দাঁড়াতে পারব না।

—কি যে বল!

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে মঞ্জরী বললে—আমি আপনার শিষ্যা, আপনি গুরু। দেখবেন।

—কিছু ভয় নেই। দেখ আজ কি করি।

—না। আমি পারব না আপনার সঙ্গে সমানে চলতে।

—খুব পারবে।

চলে গেল রীতুবাবু।

মঞ্জরী যেন বিবর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটু পর ডাকলে—শিউনন্দন! এক গ্লাস জল দে তো।

জলটা খেয়ে সে যেন সুস্থ হল। শোভা এসে বললে—তাই কখনও পারে তোকে অপ্রস্তুত করতে।

—জানি না।

ঢং শব্দে আসরের ঘণ্টা পড়ল। বেরিয়ে এল মঞ্জরী। প্রথমেই সে আর কৃষ্ণ অর্থাৎ রানাবাবু। রানাবাবু হেসে হেসে বললে—আপনি আগে আমি পিছনে তো?

—হ্যাঁ।

—চলুন।

ঢুকল দুজনে চমৎকার। শুরুতেই যেন জমে গেল। পিছু ফিরে বঙ্কিম দৃষ্টিতে যেন আহ্বান করেই চলেছে তুলসী—মুখে

বলছে, না না না। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। ছাড় ছাড় ছাড় হে অঞ্চল।

গতিটা যেন নৌকোর মত। অনেকদিন—গোরাবাবুর যাবার পর এ নাটক আর হয় নি। তবুও স্বচ্ছন্দ গতিতে চলল। শঙ্খচূড় তপস্বিনী তুলসীর সম্মুখে দাঁড়াল—যেন কত জন্মজন্মান্তরের কত পরিচয় তব সাথে। নয়নে অমৃতধারা—জ্যোৎস্নার মাধুরী বহিয়া যায় সর্ব অঙ্গে তব। শুচিস্নিগ্ধা সুপবিত্রা কে—কে—কে তুমি!

উদাত্ত কণ্ঠস্বর রীতুবাবুর আবেগে থরথর করে কাঁপছে। গোরা-বাবুর থেকে অনেক প্রাণবন্ত। তুলসী বেশে মঞ্জরীর মুখ যেন ঈষৎ শঙ্কিত—ঘাম দেখা দিয়েছে কপালে। শোভা বাবলুকে বললে—কেমন গোড়া থেকেই আজ—। শরীরটা বোধ হয় ভাল নেই, বিকেল থেকেই কেমন মুষড়ে আছে। ওর সঙ্গে তো পার্ট—। কি হল?

বরণের পর পরস্পরের হাত ধরে শঙ্খচূড় আর তুলসী বেরিয়ে আসছিল। হঠাৎ মাঝপথে থমকে দাঁড়াল তুলসী।. রীতুবাবুকেও থমকে দাঁড়াতে হল। হাতটা ছেড়ে দিলে রীতুবাবু।

মঞ্জরী বললে—মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল।

রীতুবাবু বললে—একটু চা খাও।

সাজঘরের দিকে সে অগ্রসর হল। মঞ্জরী বললে—দাঁড়ান। সে এসে প্রণাম করে বললে—আমার দোষ শুধরে নেবেন। আপনি গুরু।

চলে গেল রীতুবাবু। মঞ্জরীও চলে গেল ধীর পদক্ষেপে।

এরপর কিন্তু রীতুবাবু যেন আরও আশ্চর্য অভিনয় শুরু করলে। সত্য, আশ্চর্য অভিনয়। দলের লোক দাঁড়িয়ে গেল আসরের পিছনে। ওঃ, আশ্চর্য!

বাবুল বললে—মাই খোদা—বুড়ো হাড়ে ভেলকি দেখাচ্ছে!

শোভা অবাক হয়ে গেছে। পটলীচারু মরার পর এমন প্রেমের

অভিনয় করে নি। না, পটলীচারু থাকতেও বোধ হয় করে নি। কি কাণ্ড!

বাঃ মঞ্জরী, বাঃ। শচীর সঙ্গে সেই জায়গাটা হচ্ছে। তুমি বারাঙ্গনা! বাঃ!

এরপর সব যেন মগ্নের মত। একটা মগ্নতার মধ্যে আপন আপন পার্ট করে যাচ্ছে। হু-হু করে চলেছে অভিনয়। কনসার্টের সময় সাজঘরে বহু পায়ে তাল পড়ছে। আজ এবারের পালা শেষ। কিন্তু কি আশ্চর্য জমাট আজকের পালা! অবাক হয়ে গেছে রানা লাহিড়ী। রীতুবাবু আশ্চর্য।

গোপাল ঘোষ এসে বললে—যান আপনি, আসরের বাইরে একেবারে পথটিতে দাঁড়াবেন। শ্রেষ্ঠ সিন বইয়ের। বুঝেছেন?

—ও। সেই ছদ্মবেশী শঙ্খচূড় বেরিয়ে এলেই আমাকে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

—হ্যাঁ। তুলসী চোখ খোলবার আগে। অভিসম্পাতের সিন।

সব দাঁড়িয়েছে দলের লোক। দর্শক উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠিত। কৃষ্ণ বলেছেন শঙ্খচূড়ের বেশে তিনি তুলসীর কাছে এসেছেন। তুলসীর হাত ধরে বেরিয়ে গেছেন। এরপর?—

শঙ্খচূড় রীতুবাবু ঢুকল দ্রুতপদে—যেন পালাচ্ছে।

তুলসী ঢুকছে—বিস্রস্তবাসা উদভ্রান্ত দৃষ্টি—দাঁড়াও দাঁড়াও। কে তুমি? কে তুমি? সত্য কহ—কে তুমি শঠ কপট ছদ্মবেশী—

—বাঃ বাঃ বাঃ! দিদি, ওয়াণ্ডারফুল! আহা-হা! বাবুল বলে উঠল।

তুলসী আজ ক্রুদ্ধা তুলসী নয়, যা সে দেখেছিল গোরাবাবুর সঙ্গে অভিনয়ে। এ তুলসী যেন শ্রান্ত ক্লান্ত হৃতসর্বস্বা কাঙালিনী—দুর্ভাগ্যের ভরে কেঁদে ভেঙে পড়ছে। কি করুণ! সত্যই কাঁদছে তুলসী, দু'চোখে ধারা বইছে;—বল বল কে তুমি, কোন্ অপরাধে আমার এ সর্বনাশ! বলতে পারছে না, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে।

দর্শকেরা কাঁদছে। রীতুবাবুও যেন বিচলিত হয়েছে। তবুও সে পার্ট শেষ করে বেরিয়ে এল। বললে—দেখ, চোখ মুদে স্মরণ কর সেই বৈকুণ্ঠলোক। তুমি তুলসী—আমি কৃষ্ণ—

তুলসী চোখ বুজেছে। রীতুবাবু বেরিয়ে এল। ঢুকল কৃষ্ণবেশী রানা লাহিড়ী।

তুলসী ক্লান্তভাবে পার্ট শেষ করলে। করুণ রস যেন বেশী হয়ে গেল। শুধু তাই নয় শেষ সিনে অভিসম্পাত দিতেও সে ঠিক রাগটাকে তুলতে পারলে না। কিন্তু অভিভূত দর্শকসমাজের তাতে ব্যাঘাত হল না। করতালির মধ্যে অভিনয় শেষ হল। এবারের মত মঞ্জরী অপেরার অভিনয় শেষ।

যোগাবাবু বললে—চলো মুসাফের। বাঁধো গাঁঠেরি।

সাজঘরে ক্রেপের জুলপি এবং গোঁফ ছাড়াতে ছাড়াতে রীতুবাবু বললে—বোতলটা খোল ব্রাদার। শীগগির। নাও, ঢাল। ফুল করে ঢাল। এস, ঠেকিয়ে নাও।

বাবুল বললে—লঙ লিভ মঞ্জরী অপেরা।

রীতুবাবু একনিঃশ্বাসে শেষ করে সিগারেট ধরালে। একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললে—আর এক এক গ্লাস।

—মাই খোদা! এত তাড়াতাড়ি—

—সময় কম ব্রাদার।

—মানে ?

—ঢাল ঢাল। আজ রাত্রেই কলকাতা যাব।

—আজ রাত্রেই !

—আজ রাত্রেই।

—ট্রেন—

—প্ল্যাটফর্মে গিয়ে বসব। যখন পাব। ঢাল। নাও, ঠেকিয়ে নাও। এটা আমার ফেয়ারওয়েল।

—ফেয়ারওয়েল ?

—হ্যাঁ।

—রীতুদা—

—ব্রাদার—

কেঁদো না কেঁদো না কেঁদো না আমার তরে এমনও ক'রে—

এ—এ

কালস্রোতে হেথা ভাসিয়ে ভাসিয়ে তোমায় আমায় দাদা

মিলেছি আসিয়ে—

আবার ভেসে ভেসে যাব কোন দেশে জন্মজন্মান্তরে—

এ—এ।

যাত্রাদলের এই নিয়ম ব্রাদার। জিজ্ঞাসা করো না—কেন। আচ্ছা, আমি একবার প্রোপ্রাইট্রেসের সঙ্গে দেখা করে আসি।

রীতুবাবু বেরিয়ে এল। সকলে অবাক হয়ে চেয়ে রইল পরস্পরের দিকে। কয়েক মুহূর্ত পরে আবার যে যার জিনিস গোছাতে লাগল। শুধু বাবুল বোতলটা কোলে নিয়েই বসে রইল।

* * *

—মঞ্জরী!

রীতুবাবু ডাকলে।

—মাস্টারমশাই! চমকে উঠল মঞ্জরী।—এত রাত্রে? কাল সকালে—

—রাত্রেই আমি চলে যাচ্ছি।

—চলে যাচ্ছেন? দরজা খুললে মঞ্জরী।—মাস্টায়মশাই, আমি কি দোষ করেছি?

—না, দোষ আমার মঞ্জরী। শেষ পর্যন্ত নিজেকে সংবরণ করতে পারি নি। অপরাধ স্বীকার করে চলে যাচ্ছি। তুমি আমাকে মাফ করো। আজ শঙ্খচূড় সেজে বলবার জন্যেই পার্টটা নিয়েছিলাম। তুমি কেঁদে জবাব দিয়েছ। আমি ভেসে গেছি। চলে যাচ্ছি আমি।

ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে মঞ্জরী।

—চলি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর নি জানি। নইলে একবারও বলতে, এ কথা তো কেউ জানে না মাস্টারমশাই। আপনি থাকুন।

মঞ্জরী বললে—এটা পড়ুন আগে।

—কি ?

—পড়ে দেখুন।

রীতুবাবু পড়ে গেল। একটু হাসলে—রানা প্রেমপত্র লিখেছে। মুগ্ধ হয়েছে—

—মঞ্জরী অপেরা আমি তুলে দিলাম মাস্টারমশাই।

—তুলে দিলে ?

—হ্যাঁ। নইলে কেমন করে বাঁচব মাস্টারমশাই। বাঁচতে যে আমাকে হবেই। তাকে যে আমি ভালবাসি।

একটু চুপ করে থেকে বললে—মাস্টারমশাই, আমি যা—আমি তাই। আমার মা, আমার দিদিমা সবার ভাগ্যেই এমনি হয়েছে। আমার ছেলেবেলা থেকে মা বলেছিল বিয়ে দেব। দিদিমা তাই বলত। কিন্তু তাতেও তো আমি যা তা বুঝতে বাকী থাকে নি। উনি চলে গেলেন, আমি জেদ করেছিলাম—আমি যা তাই হব। পার্টের ছুতো করে মদ খেয়েছি। খেয়েছিলাম।

—তুমি রানাকে—

—শুধু ওকেই যে নয় মাস্টারমশাই, আপনার কাছে এগুতেও চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু—

একটু থেমে বললে—পারছি না। পারলাম না। জানেন, দোলের সময় তার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল। দোলের সময় পরের বছর বিয়ে হয়েছিল। এবার দোলের রঙ দেখলাম সাহেবগঞ্জে—আমার সব গোলমাল হয়ে গেল। এ পারছি না। সতী অসতীর কথা ওঠে না। বাদ দিন। লোকের ঠাট্টা তাও সয়ে গিছল। কিন্তু এ পারছি না—পারব না।

—তোমার জয় হোক।

মঞ্জরী তাকে প্রণাম করলে। উঠে বললে—একটা কাজ করবেন-বলে দিয়ে যাবেন মঞ্জরী অপেরা উঠে গেল।

উনিশ

তিন বৎসর পর, ১৯৪৫ সালের মার্চ থেকে তিন বছর ; ১৯৪৮ সালের মে মাস ; বৈশাখ মাস। দুপুরবেলা ; জনবিরল চিৎপুর রোডে রীতুবাবু মোহন অপেরার আফিস থেকে সে বছরের মত হিসেব চুকিয়ে পাওনা নিয়ে বেরিয়ে এল। দাঁড়াল। ট্রাম ধরবে। ফিরবে বাসায়। হাওড়ায় থাকে এখন রীতুবাবু। দেহ এখনও সবল রয়েছে। তবে যেন প্রৌঢ়ত্ব বার্ধক্যের দিকে ঝুঁকেছে। তিন বছরে দুটো দল ঘোরা হল। প্রতিবৎসরই দল বদলেছে। এক বৎসর—১৯৪৫ সাল থেকে ৪৬ সাল কোথাও কাজ করে নি। কোথায় ছিল কেউ জানে না। হঠাৎ দেখা হল বাবুল বোসের সঙ্গে। বাবুল এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। রঙ্গরসের অভিনেতা হিসেবে নাম করেছে। যাত্রায় নয়, থিয়েটারে কাজ করে। ছবিতেও কাজ পায়। পোস্টারে নাম থাকে। ফিল্মের বিজ্ঞাপনেও নাম থাকে। নাট্যলোকেও ছবি ছাপা হয়। শেফালীকেই সে বিয়ে করেছে। দস্তুর মত বিয়ে। এবং শেফালীও ঘরের বউ হয়ে গেছে। কখনও কখনও সিনেমায় নামে। কিন্তু থিয়েটারে না। সে ট্যাক্সি করে যাচ্ছিল। মঞ্জরী অপেরার সেই গরুরগাড়ি ট্রাক পায়ে হাঁটা যাকে সে বলত 'চরণবাবুর জুড়ি' তা থেকে অনেক পথ চলে এসে ট্যাক্সি ধরেছে। মঞ্জরী অপেরা উঠে গেছে সেই বছরই। কিন্তু যে সংসারে অকেজো মানুষের দল সংসারে কেরানীগিরি করতে পারলে না, কারখানায় কাজ করতে পারলে না, চাষ করতে পারলে না, অন্নবস্ত্রের অভাবপীড়িত সংসারে একটি বস্তুকণা সৃষ্টি করে একচুল সাহায্য করতে পারলে না ; যাদের নিজেদের হিসেব নেই—নিজেরাও যারা হিসেবের বাইরে,

যারা পারে শুধু নিজেরা ময়লা ছেঁড়া জামাকাপড়ের উপর রঙচঙে পোশাক পুঁতির মালা পরে রঙ মেখে রেখাঙ্কিত মুখ পালিশ করে মিথ্যে হেসে মিথ্যে কেঁদে নেচে গেয়ে কয়েক ঘণ্টার জন্যে অনেক মানুষকে ছেলেভোলানোর মত ভুলিয়ে মাতিয়ে হিসেবের খাতায় অপব্যয়ের অঙ্কে বাঁচেতে তারা তো আছে। মঞ্জরী অপেরার পর নবমঞ্জরী অপেরা হয়েছে। মঞ্জরী অপেরার সুনামটা মোহটা ছাড়ে নি। কিন্তু এবার আর মেয়েযাত্রা নয়। এবার প্রোপ্রাইট্রেস নয়, প্রোপ্রাইটার। দলে দু' তিনটি মেয়ে আছে। শেফালী গোপালীর মত অ্যাক্‌ট্রেস বংশের মেয়েও আছে। একটি অলকার মত মেয়েও আছে। রানা লাহিড়ী আছে ওই দলে। সেই উদ্যোক্তা প্রোপ্রাইটার হিরো অ্যাক্‌টর —সব। আরও কিছু পুরনো লোক আছে, নতুন লোকের ভাগই বেশী। নাটুবাবু দেশে গেছে—সংসারে মন দিয়েছে। টাকা সে কিছু জমিয়েছিল—তা থেকে গুছিয়ে নিয়েছে বেশ। গোপালী তাকে গাল দেয়। তার দুখানা গয়না সে নিয়েছিল—চেয়েই নিয়েছিল —ঋণ শোধ করবার জন্যে, গোপালীকে পরে গড়িয়েও দেবে বলেছিল কিন্তু তা দেয় নি। ভূদেব এখনও সেই মীনার কাছেই থাকে। যোগাবাবু নবমঞ্জরীতে আছে। তার ছোট মেয়েটিকেও দলে এনেছে। তার চেহারা ভাল—গাইতেও পারে। যোগাবাবুর আশা এখান থেকে ছবির রাজ্যে ঢুকিয়ে সেই আশ্চর্য প্রদীপটি হস্তগত করবে যেটি ঘসলেই দৈত্য এসে হুকুমমাত্র গাড়ি বানিয়ে দেবে। গাড়ি একখানা—তাও দেবে। অন্য কুমারী মেয়েটা মরেছে; বিধবা মেয়েটা কোথায় চলে গেছে। আশা বংশীমাস্টার এক মফস্বলের যাত্রার দলে চলে গেছে। গোপাল ঘোষ সব থেকে আশ্চর্য—সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেছে। নিতুকে দিয়ে গেছে শোভার হাতে।

ট্যাক্সি থেকে চীৎকার করে ডাকলে বাবুল—সে দেখতে পেয়েছিল ট্রাম-স্ট্যাণ্ডের তলায় রাতুবাবুকে।

—মাস্টারমশা—ই !

যাত্রাদলের বিশিষ্ট অ্যাক্টর—যাত্রাদলের আফিস এলাকা চীৎপুর রোডে—মাস্টারমশাই ডাক শুনলে ঠিক বুঝতে পারে এ ডাক তাকে। এর বাইরে এটা ভাবে না। মাস্টারমশাই বড় অ্যাক্টরের খেতাব।

কিন্তু কে? কোথায়? ট্যাক্সিটা তার পাশে এসে দাঁড়াল।

—দাদা!—বাবুল হাসিমুখ বাড়িয়ে বললে—আমি।

রীতুবাবু বললে—হ্যাঁ তুমি। সেই তুমি। চিরপুরাতন। কেমন আছ? সঙ্গে সঙ্গেই বললে—ভালই আছ জানি। কাগজে পোস্টারে নাম দেখি। বাঃ বাঃ বাঃ। খুব বড় হও ভাই। কোথায় বাসা?

হঠাৎ বাবুলের যেন কি মনে হল। ট্যাক্সির দরজা খুলে দিয়ে বললে—উঠে পড়ুন।

—উঠে কোথায় যাব? এবারের মত দলের থেকে বিদেয় হয়ে যাচ্ছি। বিলিতি কিনব, কিনে বাসায় ফিরব। হোটেল থেকে মাংস পরোটা আনব। যাব কোথায়?

—আসুন আসুন। যাচ্ছি এমন জায়গায়—গেলে খুশী হবেন। আশ্চর্য হবেন। আসুন। ট্রাম আসছে, গাড়িটা লাইন আটকে রয়েছে—আসুন। না বলবেন না। ঠকবেন। দিদির বাড়ি—

—কার? মঞ্জরীর? সে তো—

—আগে উঠে আসুন।

টেনে সে উঠিয়ে নিলে। ড্রাইভারকে বললে—চলো।

গাড়ি চলতে লাগল। রীতুবাবু বললে—সে তো শুনেছি নাম তীর্থে তীর্থে ঘুরছে।

—ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ দু'বছর ঘুরেছে। প্রথম বছর কন্যাকুমারী থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত। দ্বিতীয় বছর বদ্রীনাথ। এ বছর বেরুনো হয় নি।

রীতুবাবু এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য কোন কৌতূহল প্রকাশ না করে বললে—না বাবুল, আমি যাব না। নামিয়ে দাও আমাকে।

—কেন ?

—না। মানে আমি—। বাবুল, আমি সেই রাত্রে সেদিন মদ খেয়েছিলাম অনেক, আর বুকের মধ্যে অভিনয়ের আবেগ ছিল, তাই গিয়ে দাড়িয়েছিলাম--দাঁড়াতে পেরেছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস কর তিন-চার মিনিটের বেশী নয়। কোন রকমে আমি চলে যাচ্ছি বলে চলে এসেছিলাম। আর আমি কোনদিন তার সামনে যেতে পারি না। পারব না।

—কেন ? তাই তো জিজ্ঞাসা করছি।

—রীতুবাবুর জিভে কথা আটকায় বাবুল ভাই। অবিশ্যি এটা আমিও জানতাম না। সেই দিন জেনেছিলাম।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে রীতুবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—সে দিন মঞ্জরীর ওখান থেকে ফিরে তোমাদের বললাম, মঞ্জরী দেবী বললেন দল উঠে গেল। রাখবেন না তিনি। সে আমাকে বলতে বলেছিল। তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে, কেন ? সকলে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেন ? আমি বলেছিলাম, জানি না। মিথ্যে বলেছিলাম। বলতে পারি নি। ভয়ে উঠিয়ে দিয়েছিল মঞ্জরী। আমার মনের মধ্যে তখন প্রবল বাসনা জেগেছে—মঞ্জরী মঞ্জরী মঞ্জরী। এ বাসনা থাকে বাবুল। তোমার ছিল কি না জানি না। থাকাই স্বাভাবিক। হয়তো দিদি পাতিয়ে বেঁচে গিয়েছিলে। অন্যের যাদের ছিল তাদের কথা বাদ দাও। সামান্য লোক। মনের বাসনা মনেই চাপা থাকে। গোড়াতে আমারও ছিল না। গোরাবাবু ছিল তখন। ওরাও সাবধান ছিল—আমিও সাবধান ছিলাম। মঞ্জরীর সঙ্গে কর্ণে পদ্মাবতী কর্ণ ছাড়া স্বামী স্ত্রী সাজি নি। কর্ণ বইটাও কম করতাম। যাত্রার দল। অভিনয় বড় মারাত্মক বাবুল। চিরকাল কমিক পার্ট করলে। রোমাণ্টিক পার্ট করলে না। অভিনয়ের মিথ্যে যখন মনের মধ্যে সত্যি হয়ে ওঠে— ওঃ, তখন বুকের মধ্যে ঝড় বয়। গোরাবাবু চলে গেল। ধীরে ধীরে বাসনা

জাগতে লাগল। আবিষ্কার করলাম পটলীচারু মরার পর তার ভালবাসার জন্যেই একলা থেকে গেছি তা নয়। মঞ্জরী মঞ্জরী মঞ্জরী। ওর জন্যে। এবার তো পেতে পারব ওকে। ওর জন্যে বুক দিয়ে খাটতে লাগলাম। দেখেছ তুমি। মধ্যে মধ্যে মন বলত, বল—এইবার বল। কিন্তু মনই বলত না। চেয়ে দেখেছ মুখের দিকে ওর? গোরাবাবুর জন্যে কি দুঃখ ওর? আবার মন বলত, ছাই ছাই ছাই দুঃখ! ওদের পেশা এই। যাত্রাদলের প্রোপ্রাইট্রেস নতুন দেখছ? ঠিক ঠিক। তবু পারতাম না। জন্মদোষে পেশা এই—কিন্তু ও তো তা নয়। এই দ্বন্দ্বেই কেটে গেল সারা সিজন। রাণীগঞ্জে আর আত্মসংযম থাকল না। তোমরা লক্ষ্য কর নি কিন্তু আমার চোখ এড়ায় নি—রানা লাহিড়ী, সে সত্যবানের পার্ট করতে গিয়ে মোহে পড়েছে। হয়তো মঞ্জরী—। না, বলব না, সত্য হলেও সেটা সত্য নয়। এবং সেটা রানা লাহিড়ীর মোহ দেখে মঞ্জরীর ভয়ও হতে পারে। প্রথম দু' তিন রাত্রি কেমন ভাবে ও মুখ থুবড়ে পড়ে থাকত দেখেছ?

—দেখেছি। কিন্তু আপনি কি করেছিলেন? দিদি সব কথাই আমাকে বলেছে—আমি তো তার সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়ি নি। যাই, গল্প হয়। জীবনের তার সবই শুনেছি, কিন্তু এ কথা—

—বলে নি সে। বড় ভাল মেয়ে। আমার প্রতি শ্রদ্ধা কত! আর আমি—। বাবুল, রাণীগঞ্জে শেষ রাত্রি অভিনয়—মন তোলপাড় করছে—বলব—বলব—বলব। কি করে বলব? যেমন করে আমরা যাত্রাদলের আসামী আসামিনীরা মনের কথা বলা কওয়া করি তেমনি করে। যেমন করে অলকা গোরাবাবুতে কথা হয়েছিল। যেমন করে মঞ্জরী রিজিয়াতে নতুন হতে চেষ্টা করেছিল তেমনি করে। শেষ রাণীগঞ্জে গোপালকে সেদিন ডেকে বললাম—আজ সতী তুলসী হবে, এতে আমি শঙ্খচূড় করব। বল গে। হতেই হবে। এতে আর কে কি বলবে? ভাববে? তোমরাও ভাব না। মঞ্জরী ভেবেছিল,

বুঝতে পেরেছিল। খুব যত্ন করে মেক-আপ করে তরুণ সাজলাম-- মঞ্জরীর পাশে দাঁড়াব। মঞ্জরীকে ডেকে দেখালাম—কেমন হয়েছে দেখ। সকলে তারিফ করলে। ও ভয় পেলে। বিবর্ণ হয়ে গেল। মুখ ফুটে বললে, আমার ভয় হচ্ছে মাস্টারমশাই! লোকে বুঝলে পার্ট করতে ভয় করছে। আমার বদনাম ছিল কো-অ্যাক্‌টর মারার। কিন্তু ও ঠিক বুঝলে—আমিও বুঝলাম। তবু মন মানলে না। জয় করতেই হবে। প্রথম ওর সঙ্গে দেখা, ও তপস্যা করছে—শঙ্খচূড় সেজে আমি বলছি, কে—কে? মনে আছে? প্রাণ ঢেলে বলেছিলাম, মনে হয় কত জন্মজন্মান্তর ধরে চেনা-শোনা—তুমি আমার, আমি তোমার—। দেখলাম মঞ্জরী এত বড় অ্যাক্‌ট্রেস—ও ঘামছে। কপালে নাকের নীচে বিন্দু বিন্দু ঘাম। গলা দুর্বল। পার্ট করলে। বরণের শেষে ওর হাত ধরে বেরিয়ে আসা আছে। আমি হাত ধরলাম। হাতে আমার আগুনের উত্তাপ। ওর হাত ঠাণ্ডা হিম। তবু ছাড়লাম না। ধরে রইলাম। স্পর্শের ইশারায় জানালাম—ছাড়ব না, এই ধরলাম। হঠাৎ ও চমকে উঠল—মনে হল টলে পড়ে যেতে গিয়ে থমকে গেল। কিন্তু না, ও ছাড়িয়ে নিলে। বললে, ছাড়ুন। ছেড়ে দিলাম।

একটু থেমে তারপর আবার নীতুবাবু বললে—ও এসে প্রণাম করলে; বললে, আপনি গুরু। দয়া করে চালিয়ে নেবেন। এ আমি ঠিক পারছি না। ফিরে গিয়ে এক গ্লাস জল খেলে। শেষ দৃশ্যে গোরাবাবুর সঙ্গে রাগ দেখেছিলে? আর সেদিন কান্নায় ভেঙে পড়ল। আমি লজ্জায় মরে গেলাম। ফিরে এসে তখনই ঠিক করে ফেললাম, না—আর না। আজই চলে যাব। আজই—এই রাত্রে। এ দলে আর থাকব না। রাগে নয়, ভয়ে বাবুল—ভয়ে। ওকে সামনে রেখে এ মোহ সামলাতে তো পারব না। যদি পশু হয়ে উঠি! তবু ওর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ক্ষমা চাইব। বেরিয়ে দেখি রানা লাহিড়ী উঠোনে দাঁড়িয়ে কাদার মধ্যে। আকাশের দিকে তাকিয়ে

দাঁড়িয়ে আছে। আমি বুঝলাম। ও এখানে দাঁড়িয়ে আছে উন্মাদের মত। মঞ্জরীর কাছে পৌঁছতে চায় কিন্তু সাহস নেই। আমি ডাকলাম। মনে তখন একটু ক্ষোভও জেগেছে। সন্দেহ হয়েছে—তবে কি মঞ্জরীও ওকে চায়! সেই জন্যেই কি—! ঘরে শোভা ছিল তবু মঞ্জরী বললে—কাল সকালে—। আমি বললাম, আজই চলে যাচ্ছি আমি।—চলে যাচ্ছেন! সে দরজা খুললে। শোভা শুয়েই রইল। হয়তো ঘুমিয়েও পড়েছিল। আমি বললাম, তোমার উত্তর পেয়েছি। লজ্জায় ছোট হয়ে গেছি। আমাকে ক্ষমা কর। আমি আজ রাত্রেই চলে যাচ্ছি। কখনও আর আসব না। সে পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে প্রণাম করে বললে, আপনি গুরু, আমি শিষ্যা—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন মাস্টারমশাই। আমি বললাম, অপরাধ তোমার নেই। তবু বলছ, আমি ক্ষমা করছি, আশীর্বাদ করছি। কিন্তু তুমি আমাকে ক্ষমা করলে না। করলে বলতে আপনি থাকুন মাস্টারমশাই, যাবেন না। আপনি নইলে দল চলবে না। সে কথা না বলে একখানা চিঠি হাতে দিলে—বললে, পড়ে দেখুন। পড়লাম রানার প্রেমপত্র। সে নিজেকে বিকোতে চেয়েছে। মঞ্জরী বললে, দল তুলে দিচ্ছি মাস্টারমশাই। নইলে তো আমি বাঁচতে পারব না। বাঁচতে আমাকে হবেই। তাকে যে আমি ভালবাসি। আমি হাত তুলে আশীর্বাদ করে চলে এসেছি সেই। না—আর না। নামিয়ে দাও আমাকে, ড্রাইভার—

গাড়ি তখন আপনি থেমেছে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছে। চমকে উঠল রীতুবাবু। সেই চেনা বাড়ি। বাড়ির দরজার মাথায় আজও একখানা বিবর্ণ সাইনবোর্ড ঝুলছে—'মঞ্জরী অপেরা'। পাশে খড়ি দিয়ে লেখা—'উঠিয়া গিয়াছে'। স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে গেল রীতুবাবু। চলবার শক্তিও যেন নেই। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে বাবুল দরজার কড়ায় হাত দিল। রীতুবাবু আর্তস্বরে বললে—বাবুল, আমি যাই।

তার আগেই দরজা খুলল—ট্যাক্সির শব্দ পেয়েই দরজা খুলে দরজার মুখে দাঁড়াল মঞ্জরী। সাদাসিধে লালপাড় শাড়ি, সামান্য একটি ব্লাউস, চুল খোলা—সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে ছোট্ট একটি টিপ ; সব সেই—শীর্ণ হয়েও যায় নি, মলিনও হয় নি, শুধু মুখে একটি বিষণ্নতার ছায়া পড়েছে। মনে হচ্ছে অপরাহ্ণের পরিপূর্ণ রৌদ্রের উপর দিগন্তে ওঠা কালো মেঘের ছায়া ফেলেছে। মঞ্জরী বললে—দেরি দেখে ভাবছিলাম ভাই হয়তো আসতে পারলে না আজ।

—ইনজাস্টিস্ দিদি। অবিচার। দিস ব্রাদার ভ্যাগাবণ্ড বটে কিন্তু দিদি হল তার ওয়েসিস। কিন্তু কে এসেছেন, কাকে এনেছি. দেখেছেন ?

—ও মা! পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন, চিনতে পারি নি। মাস্টারমশাই! কি ভাগ্যি আমার!

ছুটে এসে সে প্রণাম করলে—আসুন আসুন। ওগো—ওগো—

ছুটে ভেতরে গেল সে।

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে রীতুবাবু বাবলুর দিকে তাকিয়ে নীরবে প্রশ্ন করলে—কে ?

—গোরাবাবু।

—গোরাবাবু ?

—হ্যাঁ, ওই যে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছেন।

—ওই গোরাবাবু ?

রক্তহীনতায় গৌরবর্ণ গোরাবাবু যেন শবের মত হয়ে গেছে। চিবুকের হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে। মাথার চুল উঠে গেছে। শুধু চোখ দুটো দপদপ করছে। কিন্তু এখনও সোজা। মঞ্জরীর ডাকে উঠে দাঁড়িয়েছে রেলিং ধরে।

—কি ?

—মাস্টারমশাই এসেছেন গো।

—কে ? রীতুবাবু! মাস্টারমশাই! আসুন আসুন আসুন

হাসলে গোরাবাবু। যেন কঙ্কাল হাসলে। বাবলু বললে—টি বি হয়েছে।

—টি বি?

—সেই এক্স-রে প্লেট নিয়েই আসছিলাম। এই তো। দিদি খবর পেয়ে নিয়ে এসেছেন।

* * *

বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে ছিল গোরাবাবু। সামনে একটি টেবিলে কিছু ফল, একটি ফুলদানিতে কিছু ফুল, একখানা খাতা। মঞ্জরী অপেরার নাটকের খাতা। বোধ হয় গোরাবাবু পড়ছিল ওখানা। একখানা চেয়ার এনে পেতে দিল মঞ্জরী।—বসুন।

—তুমি আনছ নিজে? শিউনন্দন—

গোরাবাবু বললে—তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে মঞ্জরী। আমাকে খারাপ কথা বলেছিল। বসুন। বাবুল, তুমি নিয়ে এস একখানা চেয়ার। চা কর। মাস্টারমশাইকে খাওয়াও।

অভিভূত হয়ে পড়েছিল রীতুবাবু। এতক্ষণে বললে—এমন হয়ে গেছেন আপনি!

গোরাবাবু—সেই গোরাবাবু—একটু হেসে বললে—কোন খেদ নেই, কোন ক্ষোভ নেই, কোন অনুশোচনা কোন গ্লানি নেই। ভোগ করলাম অনেক, দেখলাম অনেক, জানলাম অনেক। সব থেকে বড় কথা—এরই মধ্যে শান্তি পেলাম—আমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলাম।

রীতুবাবুর অভিভূত ভাব তবু কাটে নি। সে এরপরও প্রশ্ন করলে—কতদিন—মানে—

—মাস আষ্টেক। বোধ হয় ইনফেকশন আগেই হয়েছিল। বছরখানেক আগে অলকা চলে গেল—

—চলে গেল!

—হ্যাঁ, বম্বেতে ফিল্ম-প্রডিউসার ওকে ফিল্মে হিরোইনের চান্স

দেবার লোভ দেখালে—ও চলে গেল। অবশ্য বিনিময়ে তাকে তার কাছে থাকতে হবে প্রেয়সীর মত। আমাকে বললে, স্ট্রেট বললে। খুব তুই আর তুইয়ে চার মেয়ে। ভালই করেছে। এ মেয়ে তো চিরকাল আছে। তারপর বেশী মদ ধরলাম। বম্বেতে প্রথমটা ভালই করেছিলাম। অলকা চলে গেলে যেন মুক্তি পেলাম, খোলা পেলাম। বেশী জোরে ছুটলাম। প্রথমটা বুঝতে পারি নি। তারপরটা গ্রাহ্য করি নি। তারপর পড়লাম। পরপর তুটো ছবিতে ফেলিওর হলাম। ও দিকে নারী-সঙ্গলোভে সব বিক্রী করে করে সর্বস্বান্ত হলাম। শেষ কলকাতায় ফিরে একখানা খোলার ঘরে আস্তানা নিলাম। প্রতীক্ষা করছিলাম মৃত্যুর। একদিন অলকা খোঁজ করে এল। ওর দরকার ছিল। কিছু মারাত্মক কাগজ আমার হাতে ছিল। দেখে গেল—দিয়েও দিলাম তাকে। কৃতজ্ঞতাবশে—

চা এনে নামিয়ে দিল মঞ্জরী। একখানি প্লেটে কিছু মিষ্টি। নামিয়ে দিয়ে বললে—থাক না ওসব কথা।

—না না, বলে যাই। কতদিন পরে দেখা। বলি। বুঝলেন, আশ্চর্য কথা। এ জীবন নিশার স্বপন নয়। না—স্বপ্নই। তবে সহ্য করতে পারলে আশ্চর্য সুন্দর স্বপ্ন। ওঃ। শুনুন কথা। অলকার মায়া হল আমার উপর। লোকটা বড় কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু মঞ্জরীর উপর তুরন্ত ক্রোধ। এবং ঘৃণা। বলে কি জানেন? বলে, উনি, মঞ্জরী যাই হোক ও যা আসলে তাই। মানে বুঝেছেন? সুতরাং তার কাছে না এসে ও দয়া করে চলে গেল আমার প্রথম স্ত্রী কমলার কাছে। সে শুনে বললে, আমার তো কিছু করবার নেই। তিনি যেদিন ধর্ম ত্যাগ করে জাত ত্যাগ করেছেন সেই দিনই তো তিনি আমার কাছে মৃত। অথবা বিয়েটা বাতিল বা ডাইভোর্স হয়ে গেছে। অলকা খুব তেড়ে উঠেছিল। কমলা বলেছিল, রেগো না। চেঁচামেচি করো না। এই হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা সভ্য হয়ে গেছে। এখন মুসলমানের কথায় বুঝতে পারবে। ও যদি মুসলমানে জাত

দিত তা হলে বলতে আসতে এ কথা? আমি তো ভালবেসে বিয়ে করি নি। ধর্মমতে বিয়ে করে তবে ভালবেসেছি—ধর্মের জন্যে। সুতরাং সে যেদিন ধর্ম ছেড়েছে, সেই দিন থেকে সে আমার কেউ নয়। খুব বড় কথা রীতুবাবু। কথাটা স্মরণ করি আর বলি, ঠিকই তো। আমি যদি মুসলমান কি কৃশ্চান হয়ে যেতাম—তবে সত্যিই তো কোন সম্পর্কের দাবী থাকত না। ওঃ, কমলাকে শেষ জীবনে শ্রদ্ধা করেছি। বুঝলেন? তারপর অগত্যা অলকা চিঠি লেখে মঞ্জরীকে। মঞ্জরী তখন তীর্থে যাচ্ছিল। তখন ওকে তীর্থে পেয়েছিল। কিন্তু চিঠি পেয়ে তীর্থের পোঁটলা খুলে তৎক্ষণাৎ ট্যাক্সি নিয়ে শিউনন্দন আর শোভাদিকে সঙ্গে করে সেই খোলার ঘরে হাজির। আমি খুব ক্ষিপ্ত হয়েছিলাম। মানে—না, অপরাধ ঠিক বলব না। অপরাধ নয়। আমি বিশ্বাস করি না কিছুতে—চাই না বিশ্বাস করতে। আমি বললাম, কেন যাব? যাব না। ও বললে, যাবে। যেতে হবে। তুমি আমায় ভালবাসছ—ভালবাস। আমি বললাম, আমি? আমি ভালবাসি তোমাকে?—হ্যাঁ হাঁ হাঁ। তুমি ভাল না বাস, আমি বাসি। সেই জোরে তুমি আমার—তোমাকে সেই জন্যে যেতে হবে। আর না বলতে পারলাম না।

একটু থেমে একটু হেসে আবার জের টেনে গেল—এসেছি। আরাম বোধ করছি। এবং সেটা আরামের জন্য নয়, শপথ করে বলছি—বিশ্বাস আমার হয়েছে—ভগবান সত্যি হোক না হোক, ভালবাসা সত্যি। মেলে এটা—সবারই মেলে রীতুবাবু। কিন্তু হয় কি জানেন, সেই পরশপাথর খোঁজা—ক্ষ্যাপার মত ভালবাসা। একটার পর একটা পিছনে ফেলে গিয়ে অকস্মাৎ একদিন অনুভব করি—পেয়েছিলাম কিন্তু মিথ্যে বলে ফেলে দিয়ে এসেছি। আমার ভাগ্যে ফেলে দিয়ে আসা ভালবাসা পিছনে পিছনে এসে বলেছে ফিরে এস। নিন, চা খান।

তারপর একটি অখণ্ড স্তব্ধতা। কথা যেন সবারই হারিয়ে গেল। বাবুলেরও। হঠাৎ গোরাবাবুই বললে—মঞ্জরী অপেরার অভিনয় মিথ্যে নয় রীতুবাবু। ওই দেখুন আপনার সাবিত্রীর খাতাখানা পড়ছিলাম। তাই তো এখন দেখছি বাস্তব জীবনে ঘটছে। আমি ঘুমিয়ে থাকি—হঠাৎ চোখ মেলি—দেখি মঞ্জরী চেয়ে রয়েছে। যখন থাকে না ঘরে আমি বাইরে আসি—পায়ের শব্দে ও ঘুরে আমার দিকে তাকায়; ওকেই দেখি। বসে আছি দুজনে—দেখছি ওর চোখ কোথাও নেই, আছে কেবল আমার এই রোগ-কুৎসিত মুখের দিকে। এরপরও কি বলা যায় সাবিত্রীর ওই কথাগুলো মিথ্যে? জীবনটাই মঞ্জরী অপেরা। আমরা সাবিত্রী পালার রিহারস্যাল দিচ্ছি।

রীতুবাবুর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল; বললে—ওয়াণ্ডারফুল বলেছেন। ওয়াণ্ডারফুল!

বাবুল বললে—এবং পালা সাকসেসফুল হবেই।

রীতুবাবু জানেন এ মিথ্যে। ফলবে না। আশীর্বাদ ফলবে না। তবু বললেন—আর কয়েক মাস। মাত্র কয়েক মাস। আপনি সেরে উঠবেন। দেখবেন।

চুপচাপ দুজনে ফিরছিল। হঠাৎ রীতুবাবু বললে—দেখ ব্রাদার—

—বলুন।

—ওই গানটা আজ মিথ্যে মনে হচ্ছে।

—কোনটা?

—ওই যে—এ মায়া প্রপঞ্চময় ভবের রঙ্গমঞ্চ মাঝে—

রঙ্গের নটবর হরি যারে যা সাজান সেই তা সাজে—

—মিথ্যে কেন?

—মঞ্জরী বেশ্যার মেয়ে—তাকে তো ওই পার্টেই নামিয়েছিলেন নটবর। তাতে তো গোরাবাবুর পর অন্য কাউকে নিয়ে নবমঞ্জরী চালানো উচিত ছিল। কিন্তু নটবরের দেওয়া পার্ট ও পাল্টে দিলে।

এক্সটেম্পোর করে গেল। প্রমটিং শুনলে না। পারলে একখানা নাটক লিখতাম হে।

*　　　*　　　*　　　*

সত্য বলতে—শেষ এখানেই।

মঞ্জরী তার জীবন-নাটকটাকে প্রমটিং না শুনে যা ইচ্ছে হল তাই করে গিয়ে ওখানেই শেষ করে দিলে। তারপর আর নাটকের চলার কথা নয়। তবুও রঙ্গের নটবরের আশ্চর্য নাট্যবোধ। তিনি নাটক শেষ না করে ছাড়েন না। এবং শেষ করেন ঠিক নিজের মতেই। সে যে কি বিচিত্রভাবে করেন তা শেষ না হলে অনুমান করা যায় না।

মাস তিনেক পর এটা মানতে হল রীতুবাবুকে। সে দিনও রীতুবাবুর কাছে এল বাবুল।—চলুন।

—কোথায়?

—গোরাবাবু গেলেন। কাল রাত্রে শিউনা এসে চিঠি দিয়ে গেল। শিউনা আবার আপনা থেকেই এসে জুটেছে।

—গেলেন? হাসলে রীতুবাবু। চল, শেষ সেলাম দিয়ে আসি।

মঞ্জরীর বাড়ির বারান্দাতেই গোরাবাবুর দেহ ফুল দিয়ে সাজানো হচ্ছিল। অনেক লোক। সবাই অপরিচিত। একটি মহিলা তার মাথার দিকে বসে আছেন। একটি সুন্দর ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। মঞ্জরী কোথাও নেই।

শোভা দাঁড়িয়েছিল নিজের ঘরের বারান্দায়।

রীতুবাবু এসে বললে—শোভা? এরা সব—

—ওই গোরাবাবুর স্ত্রী—ওই ছেলে। মঞ্জরী কদিন আগে পত্র লিখেছিল। কাল সন্ধ্যেবেলা ওদের লোক এসেছেন—গোরাবাবুকে নিয়ে যাবে কলকাতার বাসায়। তখন শেষ অবস্থা। নিয়ে যাবার উপায় নেই। সে ফিরে গেল। তারপর ওরা এল দল বেঁধে। স্ত্রী এসে মাথার শিয়রে বসল। পুরুত ওকে প্রায়শ্চিত্ত করালে।

গোরাবাবু অজ্ঞান—তাকে ছুঁয়ে স্ত্রী প্রায়শ্চিত্ত করলে। মঞ্জরী আস্তে আস্তে ... গিয়ে ঘরের মধ্যে লুকোল। কি করবে!

রীতু বাবুল চুপ করে দাঁড়িয়েই রইল। উপরে মঞ্জরীর কাছে যাবারও উপায় নেই। দেহটা শ্মশানে নিয়ে যাবার জন্যে ফুল দিয়ে সাজানো হচ্ছিল।

মঞ্জরী নটবরের নির্দেশে এ দৃশ্যে নির্বাসিতা।

মঞ্জরী অপেরার জীবন-নাটকের এতদিনে যবনিকা নামবে।

সমাপ্ত